বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।)

একাদশ ভাগ—একাদশ বর্ষ।

(১৩০৯ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩১০ সালের আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।)

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
"জন্মভূমি" কার্য্যালয় হইতে
সত্ত্বাধিকারী শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত
ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

CALCUTTA:
PRINTED BY NILMONEY DHUR AT THE
Chaitanya Press.
No. 336 Upper Chitpore Road.
1903.

বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।] [ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা।

জন্মভূমি

একাদশ বর্ষের সূচীপত্র।

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক।
১।	অভিষেকোৎসবে (পদ্য) ...	শ্রীযুক্ত হরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩৬
২।	আমার প্রেম (পদ্য) ...	„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৫
৩।	আদেশ দশকম্ (স্তোত্র) ...	„ পূর্ণচন্দ্র দে বি-এ,	৪৫১
৪।	একপদ করি (পদ্য) ...	„ রামচন্দ্র সেন	৩৮,
৫।	একাগ্র কথকঠাকুর ...	„ সম্পাদক	৩৩১
৬।	কত কাছা-কাছি (পদ্য) ...	„ রামচন্দ্র সেন	১৩৬
৭।	কানন (পদ্য) ...	„ কালীপদ মুখোপাধ্যায় বি-এ,	৩৪২
৮।	কাহার অর্থ সার্থক (পদ্য) ...	„ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৩৩
৯।	কালীকীর্ত্তন ...	„ রায়সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত	২৫০
১০।	কে তুমি ? (পদ্য) ...	„ মহিমচন্দ্র মিত্র	৪৪০
১১।	কৌতুকানন্দ ...	„	৩৮৪
১২।	কুর্জ্জনমহিলাষ্টকম্ ...	„ পূর্ণচন্দ্র দে বি-এ,	২৪০
১৩।	খোকাবাবু (গল্প) ...	„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত	৪১৯
১৪।	গান ...	„ রায়সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত	১২৮
১৫।	গীত ...	„ ২৪, ৩৮,৮৫,১২৭,২৩৯, ৩২৯,	৪৭৮
১৬।	গোপ ও সদ্গোপ ...	„ ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	১৩১
১৭।	চীন-চিত্র ...	„ অজিতপ্রসাদ সান্ন্যাল	৩৩৪
১৮।	চৈতন্য ভাগবত (সমালোচনা)	„ সম্পাদক	২৩৮
১৯।	জয়ন্তি (গল্প) ...	„ সুরেন্দ্রনাথ পাল ১৪১, ১৯৮,	২৩১
২০।	ডিটেক্টিভের পুরস্কার (গল্প) ...	„ ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল	৪২৮
২১।	তাড়িত ট্রাম তিন প্রকার ...	„ ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত	২১
২২।	তোরা কি গো মা আমার ...	„ যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ,	৩৯৩
২৩।	দিল্লীর দরবার ...	„	২৪২
২৪।	দীনবন্ধু ও তাঁহার গ্রন্থাবলী ...	„ গোবিন্দলাল দত্ত	১৮৩
২৫।	দেশের অবস্থা ...	„ পঞ্চানন ঘোষ	৫৩
২৬।	দেবীর মর্ত্তে ভ্রমণ ...	„ রজনীকান্ত ভক্তিবিনোদ	২২১
২৭।	দুর্গাপরাধক্ষমাপণ স্তোত্রম্ ...	„ পূর্ণচন্দ্র দে বি-এ,	৮৯
২৮।	ন-আনন্দ ...	„ শ্রীমতী সেন গৃহিণী ২২২,	২৬৯
২৯।	নারীজাতির মহত্ত্ব ...	„ অক্ষয়কুমার ঠাকুর এম-এ,	৩২
৩০।	নিস্বতত্ত্ব ...	„	৩৫৯
৩১।	নীলকণ্ঠ স্তোত্রম্ ...	„ পূর্ণচন্দ্র দে বি-এ,	৯৭
৩২।	পরম কল্যাণ গীতা ...	„ শ্রীমদ্ শিবনারায়ণ স্বামী	৪১,
			৫৭, ১৬১, ২৫৫, ৩৯৬, ৪০৩, ৪৪৩
৩৩।	পাশ্চাত্যজাতীর ভারতাক্রমণ...	„ মধুসূদন চক্রবর্ত্তী	৩৩৭, ৪০৩,
৩৪।	পাঁচির প্রতিশোধ (গল্প) ...	„ ননীলাল বন্দ্যো, বি, এল	১০১
৩৫।	পূজার চিঠি (পত্র) ...	„	১১৩
৩৬।	প্রণয়ে প্রাণদণ্ড ...	„	৪৭৫

৩৭।	প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী	...	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসু	৪৪৮
৩৮।	প্রেয়সী আমার (পদ্য)	...	„ অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২১৮
৩৯।	প্রার্থনার উত্তর	...	„ আশুতোষ দেব এম, এ	৪৬৫
৪০।	বঙ্গসাহিত্যে ত্রিকাল	...	„ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮০
৪১।	বাবু রামচন্দ্র দত্ত	...	„	৬৫
৪২।	বামাদলের উপাধিবিভ্রাট	...	„	৩৮৯
৪৩।	বাঙ্গালা প্রথম প্রাত্যাহিক পত্র		„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	৩০৩
৪৪।	বাসনা (পদ্য)	...	„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত	৪৪৯
৪৫।	বিজয়া	...	„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত	১২৯
৪৬।	বিধবার আত্মকথা (গল্প)	...	„ যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ,	২৫৯
৪৭।	ব্রহ্মময়ী স্তোত্রম্	...	„ মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর K. C. S. I	১
৪৮।	ভূর্লোকে	...	„ উপেন্দ্রনাথ দত্ত	৪১১
৪৯।	মন্দাকিনী (গল্প)	...	„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত	৩৪৯
৫০।	মানবকৃষ্ণ (গল্প)	...	„ চন্দ্রশেখর সেনBar-at-law	২৯১
৫১।	"মাহিষ্য" শব্দ	...	„ ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	৩১৫
৫২।	মুকুন্দমালা (স্তোত্র)	...	„ পূর্ণচন্দ্র দে ১৬৭, ২৭১,	২৯১,
৫৩।	মুর্শীদাবাদের ইতিহাস (সমালোচনা)		... ...	৪০০
৫৪।	যাদু! গিয়াছ কোথায় ?	...	„ মধুসূদন চক্রবর্ত্তী	৩৬১
৫৫।	যাহা চাই, তাহা কই	...	„ মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য	৪০৩,৪৫৯
৫৬।	রাজ্যাভিষেকে সস্ত্রীক যুবরাজ	...	„ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪৯
৫৭।	রাণী ভিক্টোরিয়ার বিজয়গীতি	...	„ অমৃতলাল বসু	২৪৮
৫৮।	লর্ড কিচেনার	...	„	২৩৫
৫৯।	লোকমাতা সরস্বতী দেবীর পূজা		„ ঈশ্বরচন্দ্র পড়্যা	৭৭
৬০।	লোকান্তরপ্রাপ্তি	...	„	৩৬৫
৬১।	শিবাখ্যাকিঙ্কর কাব্য	...	„ দেবেন্দ্রনাথ চট্টো	১৩৪,৩২০,৪৩৭
৬২।	শিবুসাহেবের ঘোড়া	...	„	৩৬৩
৬৩।	শ্রীপঞ্চমী	...	„	২৫১
৬৪।	শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ	...	„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	২৭৬
৬৫।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত	...	„ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি-এ,	৩৬৭
৬৬।	শ্রেষ্ঠরণ (পদ্য)	...	„ ব্রজসুন্দর সান্যাল	৩৯৪
৬৭।	সতীধর্ম্ম	...	„ রায়সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত	৭০
৬৮।	সমালোচনা	...	„ ক্ষীরোদকুমার দত্ত এম-বি,	৮৫
৬৯।	সংস্কৃতের শব্দ সম্পদ্	...	„ যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ	৩৮০,৪৫৪
৭০।	সমালোচনা	...	„	৩৯, ২০৬, ২৮৮,৩২৯, ৪০২,৪৪১
৭১।	স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দ	...	„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত	২৫
৭২।	স্বজাতীয় সাহিত্যের আবশ্যকতা ও উন্নতি	...	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	
৭৩।	হায় এ কাহার পরিণাম	...	„ জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ	

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
ক্রমিক সংখ্যা
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচনা।)

১১শ বর্ষ। | শ্রাবণ, ১৩০৯ সাল। | ১ম সংখ্যা।

ব্রহ্মময়ী-স্তোত্রম্

(শ্রীযুক্ত মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর কে, সি, এস্, আই বিরচিতম্) *

(১)

ন কৃতং সুকৃতং কিঞ্চিৎ বহুশো দুষ্কৃতং কৃতম্।
ন জানে কালিকে কালপ্রশ্নে কিং দেয়মুত্তরম্ ॥

ওমা ব্রহ্মময়ি! এই সংসারে আসিয়া
করেছি কতই পাপ, না পাই ভাবিয়া!
পুণ্যের কথাও মাগো! কি কহিব আর,
ভুলেও না করিয়াছি তাহা একবার!
অন্তিমে যখন যম জিজ্ঞাসিবে মোরে
"কি কার্য্য ক'রেছ তুমি থাকিয়া সংসারে" ?
কি উত্তর দিব তারে জননি! তখন,
সেই বড় ভয় মোর হ'তেছে এখন!

* শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর কে, সি, এস্ আই মহোদয় এই ভক্তিরসাত্মক "ব্রহ্মময়ী-স্তোত্রটী"র রচয়িতা। যিনি বিবিধ বিদ্যায় বিভূষিত ও জ্ঞানবান্ হইয়াও মৌন অবলম্বন করিয়া থাকেন; যিনি প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়াও নিগ্রহ না করিয়া অনুগ্রহ

(২)

অসীমং মম পাপঞ্চ অসীমা করুণা তব।
সভয়ং কালি পশ্যামি কং কো বা পরিলঙ্ঘয়েৎ ॥

আমার অসীম পাপ, শুন গো জননি!
তোমারো অসীম কৃপা, তাও মনে জানি।
তাই মাগো! এই মোর হইতেছে ভয়,
না জানি কাহারে কেবা করে পরাজয়!

প্রকাশ করিয়া থাকেন; যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও প্রাকৃত জনের ন্যায় সাধারণ লোকের সহিত অকুণ্ঠিত চিত্তে সদালাপ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন; যিনি গুণীর গুণ, মানীর মান ও পণ্ডিতের সমাদর করিতে নিরন্তর তৎপর থাকেন; যিনি চির-বিরোধিনী লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে স্বীয় রাজভবনে আনিয়া, তাঁহাদের চির-বিরোধ ভঞ্জন ও পরস্পর প্রণয়-সংঘটন করিয়া দিয়াছেন; ফলতঃ যিনি ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ প্রভৃতি যাবতীয় স্পৃহণীয় লৌকিক গুণসমূহের একমাত্র আধার হইয়াও এই অসার সংসারের অনিত্যতা-নিরূপণ ও সেই সনাতনী পূর্ণশক্তি ব্রহ্মময়ীর সারবত্তা ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহারই পদে এই কয়েকটী শ্লোক-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন, সেই মহারাজ বাহাদুরকে একটী যথার্থ মহাপুরুষ না বলিলে প্রকৃত প্রত্যবায় আছে।

অনেকগুলি ভাষায় মহারাজের বিলক্ষণ অধিকার আছে। বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় তিনি কয়েকখানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বাল্যকালের রচনা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার রচিত সংস্কৃত উদ্ভট-কবিতা যেরূপ নানা রসময়ী, তাঁহার এই ব্রহ্মময়ী-স্তোত্রটীও সেইরূপ ভক্তিরসাত্মক। তিনি যেরূপ ভক্তিনিষ্ঠ ও হৃদয়বান্ পুরুষ, এই স্তবটীও তাঁহার যথার্থ অনুরূপ। প্রত্যেক শ্লোকেই মহারাজ পাপপূর্ণ প্রলোভনময় সংসারের অসারতা বর্ণনা করিয়া, একমাত্র ব্রহ্মময়ীকেই সার বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কি সূত্রে কোথায় এই স্তবটী পাইয়াছি, তাহারও আভাষ দেওয়া অনুবাদকের কর্ত্তব্য। ৺ দুর্গাচরণ তর্করত্ন মহাশয় মহারাজের সভাপণ্ডিত

(৩)

দদাসি দুঃখং হৃদি কালি নিত্যং
তথাপি নো তে চরণং ত্যজামি।
সন্তাড়িতাশ্চেৎ শিশবো জনন্যা
অঙ্কং জনন্যাশ্চ সমাশ্রয়ন্তি ॥

ছিলেন। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছিলাম, "সংস্কৃত উদ্ভট-কবিতা ও স্তব-রচনায় মহারাজ একটী সিদ্ধ পুরুষ। সম্প্রতি তিনি একটী 'ব্রহ্মময়ী-স্তোত্র' রচনা করিয়া মূলাযোড়-দেবালয়ে ব্রহ্মময়ীর পদতলে ইহা রাখিয়া দিয়াছেন।" যে পূজ্যপাদ মহারাজ বাহাদুরের ধর্ম্মপরায়ণা ও পুণ্যবতী জননীর স্বর্গলাভের পর তদীয় শ্রাদ্ধোপলক্ষে বহুদূরাগত বহুসংখ্যক অধ্যাপকের নিকট হইতে প্রায় দুই সহস্র উদ্ভট কবিতা ও অনেকগুলি স্তব সংগ্রহ করাতে আজ পর্য্যন্ত তাহা যথাক্রমে প্রায় ছত্রিশ সহস্র ও সার্দ্ধ সহস্র সংখ্যায় পরিণত হইয়াছে, তাঁহারই স্বরচিত উদ্ভট-কবিতা ও স্তব লইয়া আমার "উদ্ভট-সমুদ্র" ও "স্তব-সমুদ্রে" রাখিবার বাসনা করিয়া, সেই দিনই আমি মূলাযোড়ে গিয়াছিলাম। তত্রত্য সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক পরমপূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শিবরাম সার্ব্বভৌম মহাশয়ের আদেশে একজন পূজক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মময়ী-মূর্ত্তির পদতল হইতে একখানি সুবৃহৎ রৌপ্যফলক আমার সম্মুখে আনিয়া দিলেন। রৌপ্যফলকে খোদিত এই স্তবটীর অর্থগ্রহ করিয়া ও তাহা লিখিয়া লইয়া, সেই দিন রাত্রিতেই ইহার পদ্যানুবাদ করিয়া, পরদিন প্রাতঃকালে ইহা মহারাজের সভাপণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয়ের হস্তে দিয়া আসি। তর্করত্ন মহাশয়ের পরলোক-গমনের কিছু পরেই দেখিলাম, "রত্নাকর" নামক একখানি মাসিক-পত্রে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই স্তবটীর নিম্নভাগে আমার নামোল্লেখ ছিল না; অধিকন্তু ইহার মূল ও অনুবাদেও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। এ জন্য "জন্মভূমি" পত্রিকায় তাহার যথাযথ পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশিত করিয়া এবং ইহা মহারাজের শ্রীকর-কমলে উপহার দিয়া "গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা" করিলাম।—অনুবাদক।

যতই দাও মা! দুঃখ হৃদয়ে আমার,
তথাপি না ছাড়িব মা! চরণ তোমার।
মহা ক্রোধভরে যদি মাতাও কখন
আপনার শিশুকেও করেন তাড়ন,
তবু তাঁর সেই শিশু না দেখি উপায়
তাঁহারি কোলেতে গিয়া লইবে আশ্রয়!

(৪)

ন পূজাং ন মন্ত্রং ন বা যোগযজ্ঞং
ন জানে প্রয়োগং ন বা যোগসিদ্ধিম্।
ত্বদীয়ং পদাব্জং মমৈকাবলম্ব্যং
প্রসীদ প্রপন্নে যতীন্দ্রেঽতিদীনে॥

কারে পূজা বলে, কারে যোগ-যজ্ঞ বলে,
তাহাও না জানিলাম আসি ভূমণ্ডলে।
কারে বা প্রয়োগ বলে, যোগ-সিদ্ধি কাকে,
কিছুই না বুঝিলাম আসিয়া সংসারে।
তোমার শ্রীপাদ-পদ্ম একমাত্র সার,
তাই ত লয়েছি মাগো! আশ্রয় তাহার।
অতি দীনহীন আমি যতীন্দ্রমোহন!
এ বিপদ্ হ'তে মোরে রাখ মা এখন!

(৫)

শরীরং তথা মে মনো জ্ঞানবুদ্ধী
সমস্তং প্রদত্তং তব শ্রীপদান্তে।
ন পুণ্যং ন ধর্ম্মো মমৈবাস্তি কিঞ্চিৎ
প্রসীদ প্রপন্নে যতীন্দ্রেঽতিদীনে॥

কিবা মোর এই দেহ, কিবা মন আর,
কিবা মোর জ্ঞান বুদ্ধি, যা কিছু আমার,

সকলি শ্রীপদে তব অর্পণ করিয়া
সর্ব্বদাই আছি মাগো! নিশ্চিন্ত হইয়া।
কিবা পুণ্যকর্ম্ম, কিবা ধর্ম্মকর্ম্ম আর
লেশমাত্র নাই তার কদাপি আমার।
অতি দীনহীন আমি যতীন্দ্রমোহন!
এ বিপদ্ হ'তে মোরে রাখ মা এখন!

(৬)

ন চান্যা গতি র্মে বিনা পাদযুগ্মং
কুরু ত্বং শরণ্যে যথেচ্ছং হি কালি।
প্রপশ্যাম্যদূরে মহাঘোরকালং
প্রসীদ প্রপন্নে যতীন্দ্রেঽতিদীনে॥

তব পাদপদ্ম বিনা জননি! আমার
অন্য কোন গতি নাই, বুঝিলাম সার।
তাই লইলাম মাগো! তোমারি শরণ,
যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা কর মা এখন।
সম্মুখে রয়েছে যম মহাভয়ঙ্কর,
ভ্রূকুটী দেখিয়া তার পাইতেছি ডর।
অতি দীনহীন আমি যতীন্দ্রমোহন!
এ বিপদ্ হ'তে মোরে রাখ মা এখন!

(৭)

গতং যৌবনঞ্চাতিভোগাভিলাষৈ-
রিদানীং জরা হ্যাগতা দেহমধ্যে।
ন পশ্যামি মাতঃ পরিত্রাণহেতুং
প্রসীদ প্রপন্নে যতীন্দ্রেঽতিদীনে॥

ভোগ-সুখ-অভিলাষে উন্মত্ত হইয়া
বিফলে যৌবনকাল যাইল কাটিয়া।
দুর্জ্জয় বার্দ্ধক্য মোর আসিয়া শরীরে
চাপিয়া ধরিল মাগো! এতদিন পরে।

দেখিতে না পাই আর রক্ষার উপায়,
তুমি না রাখিলে মাগো! কে রাখে আমায়!
অতি দীনহীন আমি যতীন্দ্রমোহন!
এ বিপদ্ হ'তে মোরে রাখ মা এখন!

(৮)

সদা ভীতচিত্তঃ সদা ব্যাকুলাত্মা
ন জানে গতিঃ কা ভবেজ্জীবনান্তে।
অপারা কৃপা তে দৃঢ়জ্ঞানমেতৎ
প্রসীদ প্রপন্নে যতীন্দ্রেঽতিদীনে॥

সর্ব্বদাই মহাভয় মনের ভিতর,
সর্ব্বদাই ছট্‌ফট্ করিছে অন্তর।
না জানি তখন মোর কি উপায় হ'বে
যখন এ দেহ ছাড়ি প্রাণটি পলাবে।
তোমার যে কৃপাসিন্ধু অগাধ অপার,
সে বিষয়ে দৃঢ়জ্ঞান আছে মা আমার।
অতি দীনহীন আমি যতীন্দ্রমোহন!
এ বিপদ্ হ'তে মোরে রাখ মা এখন!

(৯)

দত্ত্বা ব্রহ্মময়ীপাদে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীনিমান্।
তদাশ্রয়ং চিরং যাচে যতীন্দ্রঃ শরণাগতঃ॥

ব্রহ্মময়ী-পদে মন করি সমর্পণ
এই পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলি করিনু অর্পণ।
অতি দীনহীন আমি যতীন্দ্রমোহন!
শরণ লইনু তাই তাঁহারি চরণ।
তাঁহারি চরণ-তলে স্থান দিন মোরে,
এই ভিক্ষা করি আমি চিরদিন ধ'রে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর, বি-এ।

গঙ্গা-স্তোত্রম্

(৺দুর্গাচরণ তর্করত্ন বিরচিতম্) *

(১)

গঙ্গে জগজ্জননি ভীমভবান্ধকূপে
মগ্নঃ স্বকর্ম্মবশতোঽহমচিন্ত্যরূপে।
ত্বাং সর্ব্বদুষ্কৃতকৃতাং শরণং নমামি
ত্বামাশ্রিতো হি ন পুন র্নরকং ব্রজামি॥

ওমা গঙ্গে! ত্রিভুবন-পবিত্র-কারিণি!
ত্রিজগতে তুমি মাগো! অচিন্ত্যরূপিণী!
এই ভব-কূপ ঘোর অন্ধকারময়,
ইহা হ'তে ভয়ঙ্কর কিবা আর রয়?
নিজ কর্ম্মদোষে এই কূপের ভিতর
নিমগ্ন হইয়া আমি আছি নিরন্তর।
সর্ব্বপাপী যেই জন, গতি তুমি তার,
তোমার চরণে গঙ্গে! করি নমস্কার।
আশ্রয় করিনু মাগো! তোমারি চরণ,
যেহেতু না হবে মোর নরকে পতন!

* ৺দুর্গাচরণ তর্করত্ন মহাশয়ের পূর্ণ জীবনচরিত প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে অন্ততঃ দুই চারিটী কথা বলাও অনুবাদকের কর্ত্তব্য। স্বনামখ্যাত দেবপ্রতিম শ্রীযুক্ত মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর কে, সি, এস, আই মহোদয় স্বয়ং একটী সুপণ্ডিত, সুধার্ম্মিক ও পরম নিষ্ঠাবান্ মহাপুরুষ। স্বয়ং গুণগ্রাহী ও সুপণ্ডিত বলিয়া তিনি গুণবান্ ও পণ্ডিতের সমাদর করিতে জানেন। তিনি স্মার্ত্তকুল-চূড়ামণি ৺তারিণীচরণ শিরোমণি মহাশয়কে বিক্রমপুর হইতে আনাইয়া, বহুকাল নিজ সভা অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার লোকান্তর-গমনের পর মহারাজ সমগ্র বাঙ্গালা দেশ আলোড়িত করিয়া পরম স্মার্ত্ত-পণ্ডিত ৺ দুর্গাচরণ তর্করত্ন মহাশয়কে মহাসমাদরে নিজ সভায় আনাইয়া রাখেন।

(২)

মাতঃ শরীরকরপঞ্চবিকারদোষৈঃ
ষড়্ভাবভাবিতহৃদঃ কুপথপ্রবেশৈঃ।
নাকারি কিং কলুষকর্ম্ম ময়াধমেন
কিং বা ন কার্য্যমনিবার্য্যতমেন্দ্রিয়েন ॥

পঞ্চ-ভূতময় এই শরীরে আমার
ক্রমে ক্রমে দেখা দিল অশেষ বিকার।
এই বিকারের দোষে ষড়্রিপু আসি
ফেলিল মনটী মোর একবারে গ্রাসি।
অমনি কুপথে গিয়া প্রবেশিল মন,
নাহি পারিলাম তারে করিতে দমন।

তর্করত্ন মহাশয় যেরূপ শান্ত, ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান্, সেইরূপ আবার তিনি সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। বহুসংখ্যক ছাত্র তাঁহার নিকট আসিয়া স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, এবং কত শত অধ্যাপক তাঁহার নিকট আসিয়া স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থা লইয়া যাইতেন। আমার প্রতি তাঁহার নিরতিশয় স্নেহ ও ও অনুগ্রহ ছিল। পূজ্যপাদ মহারাজ বাহাদুরের ধর্ম্মপরায়ণা ও পুণ্যবতী মাতা ঠাকুরাণীর স্বর্গলাভের পর তদীয় শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রিত বহুসংখ্যক অধ্যাপক ভারতের বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে সমাগত হইয়া তাঁহার প্রাসাদ সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে আমি মহারাজের সভা-পণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠী গৃহে বসিয়া সমবেত অধ্যাপকগণের নিকট হইতে বহুসংখ্যক উদ্ভট-শ্লোক ও স্তব সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বাস্তবিক, মহারাজের কৃপায় এই সকল অধ্যাপকের একত্র সম্মিলন না হইলে এবং আমার প্রতি তর্করত্ন মহাশয়ের বিশেষ স্নেহ ও কৃপা না থাকিলে আমি কখনই "উদ্ভট-সমুদ্র" ও "স্তব-সমুদ্র" রচনায় কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বামনদাস বিদ্যারত্ন মহাশয়, তর্করত্ন মহাশয়ের উপযুক্ত কৃতী সন্তান। ১২৩১ সালে ২০ শ্রাবণ রবিবার বিক্রমপুরের অন্তর্গত মেদিনীমণ্ডল গ্রামে তর্করত্ন মহাশয়ের জন্ম হয়, এবং ১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতায় তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হয়।—অনুবাদক।

পরম দুর্জ্জয় এই ইন্দ্রিয়-নিচয়,
তা'দেরো দমনে মোর শক্তি নাহি রয়।
তাহাদের বশীভূত হইয়াই হায়
কি কুকর্ম্ম না ক'রেছি থাকিয়া ধরায়?
আবার তারাই সবে মিলি এই ভবে
কি কুকর্ম্ম মোরে দিয়া নাহি করাইবে?

(৩)

দুষ্কর্ম্মজং পরিণতৌ বহুদুঃখমুক্তং
দুঃখঞ্চ বা ক্ষণসুখং ভবতীহ যুক্তম্।
জাননপীতি কুমতিঃ কুশলে কুকৃত্যং
কৃত্বা বিভেমি কিমিদং কৃতবানকৃত্যম্ ॥

বহু পাপকার্য্যে সদা মতি যার রয়,
শেষে তার বহু দুঃখ, শাস্ত্রে ইহা কয়।
কিবা তার দুঃখ, কিবা ক্ষণসুখ আর
সমুচিত দণ্ড তার, বুঝিলাম সার।
ইহা জানিয়াও মোর আসিল দুর্ম্মতি,
পাপকার্য্য করিতেই হ'লো মোর রতি।
শেষে এই ভয়, গঙ্গে কুশল-দায়িনি!
কি কুকর্ম্ম করিয়াছি দিবস-যামিনী!

(৪)

ইত্থং কুকর্ম্মনিরতাখিলপাতকস্য
হীনস্য মে নিরয়বর্ত্মনি সঙ্গতস্য।
নাস্ত্যেব নিষ্কৃতিগতি স্ত্বদৃতে শরণ্যে
তন্মাং পবিত্রয় পবিত্রকৃতাং বরেণ্যে ॥

এইরূপে নানাবিধ কুকর্ম্ম করিয়া
কত শত মহাপাপ আসিল মিলিয়া।

নিরুপায় হইয়াছি, না দেখি উপায়,
নরকের পথ শুধু দেখিতেছি হায়!
তোমা বিনা এ সংসারে নিস্তার-কারিণী
আর কেহ নাহি আছে বুঝিনু জননি!
পবিত্র-কারিণী নাই তব সম কেহ,
পবিত্র করা মা! এই অধমের দেহ।

(৫)

কা বাঽস্তি মা তব সমা সদয়াঽত্র বিশ্বে
যৎ পাপিনাং সুকৃতিনাঞ্চ গতিং বিশেষ্যে।
তুল্যাং দদাসি পরমেশি তবাম্বুতীরে
প্রাণার্পণং কৃতবতাং ভবিকৈকসারে॥

আছে বটে এ সংসারে মাতা অগণন,
কিন্তু কার আছে দয়া তোমার মতন?
তুমিই পরমেশ্বরী ত্রিসংসারে শুনি,
একমাত্র শিবময়ী তুমিই জননি!
কিবা মহাপাপী, কিবা মহাপুণ্য জন
করে যদি তব তীরে প্রাণ সমর্পণ,
তা হ'লে পরম স্থানে সবারে লইয়া
তুল্য ফল দাও তুমি ভেদ না রাখিয়া!

(৬)

কা নাম তন্মৃতকথা তব তীরযাত্রাং
কৃত্বাঽপি যন্মৃত উপৈতি গতিং বিচিত্রাম্।
গঙ্গেতি বা স্মরতি যো মরণে কথঞ্চিৎ
সোঽপি প্রয়াতি যদহো সুগতিঞ্চ কাঞ্চিৎ॥

যে জন তোমার তীরে প্রাণত্যাগ করে,
তার মত ভাগ্যবান্ কে আছে সংসারে?

এমন কি, তব তীরে মরিবে বলিয়া
যাত্রা করে যেই জন সংকল্প করিয়া,
পথের মধ্যেও যদি মৃত্যু তার হয়,
তাহারে পরম গতি, দাও সুনিশ্চয়।
অধিক কি! মৃতুকালে যদি কোন জন
বারেক তোমার নাম করে মা! স্মরণ,
অমনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া
পরম সুন্দর পদ দাও মিলাইয়া!

(৭)

আস্তাং স্মৃতি র্গুরুতরা স্থিরযোগজন্যা
ত্বচ্চারুনীরকণিকাঽপি যদত্র ধন্যা।
গোব্রহ্মঘাতমুখপাতকরাশিনাশং
কৃত্বাঽশ্রেয়ং নয়তি জন্তুমুপেন্দ্রবাসম্॥

মন স্থির হ'লে তবে হইবে স্মরণ,
সেই স্মরণেও কভু নাহি প্রয়োজন।
ধন্য এক জলকণা জননি! তোমার,
এ সংসারে যাহা এক বিচিত্র ব্যাপার।
গো-ব্রাহ্মণ-আদি-হত্যা করে যেই প্রাণী,
সে যদি কণিকামাত্র তোমার জননি,
স্পর্শ করিতেও পারে ভুলেও কখন,
স্বর্গধামে সেই জন করিবে গমন!

(৮)

সা চাঽপ্যসর্ব্বসুলভা কণিকা যদি স্যাৎ
স্নানেঽপি কূপসলিলে স্মরতীহ যস্ত্বাম্।
সোঽংহঃসমূহমবধূয় বিশুদ্ধদেহঃ
স্বর্লোকমেতি চরমে ভুবি কীর্ত্তিবাহঃ॥

যদি তব জলকণা সকলে না পায়,
তবু মাগো! কিছুমাত্র ক্ষতি নাহি তায়।
কূপ-জলে স্নান-কালে যদি কোন জন
বারেক তোমার নাম করে মা! স্মরণ,
তা হইলে যত মহা পাপরাশি তার
ধৌত হ'য়ে করে তার দেহ পরিষ্কার!
অমনি তখন মাগো! সেই জন হায়
পৃথিবীতে কীর্ত্তি রাখি স্বর্গধামে যায়!

(৯)

যে বৈ নরা নিরয়নিষ্কৃতিনীসূত্রং
গঙ্গেতি মঙ্গলবচঃ পরমং পবিত্রম্।
উদ্গীরয়ন্তি পরমাদরতোঽপি দূরাৎ
তেষামভীষ্টফলদাঽসি দয়াপ্রচারাৎ॥

পরম মঙ্গলময় "গঙ্গা" এই নাম
নরক-নিষ্কৃতি-নীতি-সূত্র অবিরাম।
বহু দূর হ'তে মাগো! যদি কোন জন
হেন "গঙ্গা" নাম তব করে উচ্চারণ,
তা হইলে তুমি মাগো! সদয় হইয়া
তাহার মনের সাধ দাও মিটাইয়া!

(১০)

যেষামথ শ্রুতিপথং কথমাগতং বা
গঙ্গেতি নাম ললিতং শ্রবণে রুচির্বা।
তে যদ্যশেষকলিকল্মষদোষদুষ্টা
মাত স্তথাপ্যনুগমাৎ প্রভবন্তি শিষ্টাঃ॥

"গঙ্গা" এই মধুমাখা নামটী তোমার
কারো কাণে যায় যদি কভু একবার,

কিংবা শুনিতেও ইহা ইচ্ছা থাকে তার,
তার মত ভাগ্যবান্ কেবা আছে আর?
কলি-কাল-দোষ-দুষ্ট হ'লেও সে জন
এ সংসারে শিষ্ট বলি গণ্য সর্ব্বক্ষণ!

(১১)

তস্মান্ন কাঽপি ভুবনে সদৃশী ভবত্যাঃ
পাপীয়সাং পবনহেতু রতুল্যকীর্ত্ত্যাঃ।
শিষ্টানুবাদত ইদং মম কল্প্যমাত্রং
তত্র প্রমা যদি সমুদ্ধর মামপাত্রম্॥

তোমার অতুল কীর্ত্তি সংসারে সদাই,
তোমার সমান গঙ্গে! আর কেহ নাই।
যে জন পরম পাপী তুমিই তাহার
পাপরাশি ধ্বংস করি দাও অনিবার।
সাধু জন এইরূপ কহেন জননি!
আমার কল্পনা মাত্র,—সত্য নাহি জানি।
সত্য বলি তবে মোর হইবে প্রমাণ,
এই অধমেরে যদি কর পরিত্রাণ!

(১২)

কালঃ কলিঃ প্রবল এষ চ তস্য দোষাৎ
ধর্ম্মান্মনঃ স্খলতি দুষ্টফলাবশেষাৎ।
তং মে ভৃশং প্রশময় স্বয়মম্ব নিত্যং:
ধর্ম্মে মনঃ স্থিরয় পালয় মাঞ্চ ভৃত্যম্॥

এই কলি-কাল গঙ্গে! পরম প্রবল,
ইহাতে কতই পাপ রহে অবিরল।
এই সব পাপে লিপ্ত হয় যেই জন,
ধর্ম্মপথে আর তার নাহি থাকে মন।

তাই বলি ওমা গঙ্গে! তুমি কৃপা করি
যত কিছু পাপ মোর সব লও হরি।
ধর্ম্মপথে স্থির করি রাখ মোর মন,
এ অধম দাসে তব কর মা! পালন।

(১৩)

সশ্রীকদুর্গাচরণাস্যনির্গতঃ
স্তবো নবো দ্বাদশপদ্যনির্ম্মিতঃ।
উদেতি যস্যেহ মুখারবিন্দত-
স্তস্যাঘবৃন্দং হর দেবি মূলতঃ॥

শ্রীদুর্গাচরণ বিপ্র হ'য়ে একমতি
দ্বাদশ-কবিতাময়ী এই গঙ্গাস্তুতি
রচনা করিলা গঙ্গা-মাহাত্ম্য-বর্ণনে,
যেই জন পাঠ ইহা সদা ভক্তি সনে
ওমা গঙ্গে! কৃপা করি তাহারে সদাই
পাপ তাপ নাশ তার, এই ভিক্ষা চাই!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর, বি-এ।

গঙ্গা-স্তোত্রম্

(৺ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ বিরচিতম্) *

(১)

নমস্তে স্যাৎ গঙ্গে দ্রুহিণহরিরুদ্রপ্রভৃতিভি-
র্নুতে মাত র্দীনে ময়ি শরণহীনে কুরু কৃপাম্।
শরণ্যে বিশ্বেষাং তব চরণপঙ্কেরুহমহং
প্রপন্নঃ পাহীমং কৃপণমতিভীমাৎ ভবদবাৎ॥

* ৺ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের পরিচয় সমগ্র বাঙ্গালা-দেশীয় সংস্কৃত-ভাষাজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়গণের অবিদিত নাই। তিনি যেরূপ সুধীর, সুপণ্ডিত ও

ওমা গঙ্গে! নমস্কার চরণে তোমার,
মহিমার কথা তব কি কহিব আর!
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর-আদি দেবগণ
ভক্তিভরে করে তব মহিমা কীর্ত্তন!
আমি অতি দীনহীন, নাহি মোর গতি,
কৃপা কর তুমি এই অধমের প্রতি।
ত্রিলোকের গতি তুমি সকল সময়,
তাই তব পাদপদ্মে লইনু আশ্রয়।
এ ভীষণ দাবানল হইতে আমায়
রক্ষা কর;—এই দীন এই ভিক্ষা চায়!

(২)

স্পৃহাশূন্যা ধন্যা মখজফলভোগে ত্রিপথগে
কৃতাশেষক্লেশাঃ শ্রবণমননাদাববিরতম্।
লভন্তে যাং সন্তস্তব তু সলিলে মজ্জনবতাং
করস্থা সা মুক্তিঃ কলুষকলিতানামপি নৃণাম্॥

সুরসিক, সেইরূপ আবার সুধার্ম্মিক, সুমিষ্টভাষী ও সুকবিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপনায় কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ-গৃহ এক সময়ে নিরতিশয় অলঙ্কৃত হইয়াছিল। তিনি কতকগুলি দুর্ব্বোধ সংস্কৃত গ্রন্থের এরূপ বিশদ টীকা লিখিয়া গিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাকে দ্বিতীয় মল্লিনাথ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

১২১২ সালে বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় দিবস শনিবার পূর্ণিমা রাত্রিতে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শাকরাড়া গ্রামে তর্কবাগীশ মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়া ১২৭৩ সালের ১২ চৈত্র সোমবার ৺কাশীধামে মণিকর্ণিকার ঘাটে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার রচিত এই গঙ্গাস্তোত্রটী হস্তগত করিয়া তাহার পদ্যানুবাদ করিবার জন্য বহুদিন হইতেই প্রয়াস পাইতেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। অবশেষে তাঁহার উপযুক্ত কনিষ্ঠ সহোদর ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর মহাশয়ের প্রকাশিত ৺ তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবন-চরিত গ্রন্থে এই গঙ্গা স্তবটী প্রাপ্ত হইয়া ইহার পদ্যানুবাদ করিলাম—অনুবাদক।

ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গে! এই নিবেদন,
বিষয়-বাসনা সব করিয়া বর্জ্জন
সহিয়া কতই ক্লেশ শেষ নাই যার,
শ্রবণ মনন আদি করি অনিবার,
যে মুক্তি লভয়ে সাধু থাকিয়া সংসারে,
মহাপাপী জন যদি বারেকের তরে
তোমার পবিত্র জলে করে মাগো! স্নান,
মুক্তি আসি করে তার হয় বিদ্যমান!

(৩)

বিধানং যজ্ঞানামভিদদতি কেচিৎ শুভকরং
পরে নিস্ত্রৈগুণ্যে মহসি পরিণামং চ মনসঃ।
অহং ত্বেকং মন্যে সকলজনসাধারণতয়া
নিদানং তে নীরং পরমপুরুষার্থস্য ন পরম্॥

কেহ কেহ এ সংসারে মুক্তিলাভ তরে
শুভকর যাগ যজ্ঞ সমাপন করে।
কেহ বা ত্রিগুণহীন সেই জ্যোতির্ম্ময়
পূর্ণব্রহ্মে রহে সদা হইয়া তন্ময়।
কিন্তু মাগো! আমি ইহা বুঝিয়াছি মনে
মুক্তিফল চায় যদি সাধারণ জনে,
তবে সে তোমারি জল মুক্তির কারণ,
ইহা ভিন্ন আর কিছু না দেখি কখন!

(৪)

পতন্তী স্বর্লোকান্নয়সি পতিতানুচ্চপদবীং
জলধ্যন্তর্যান্তী ভবজলধিভীতিং শময়সি।
জড়াত্মাহপি ব্যক্তং কলুষজড়তাং নাশয়সি তৎ
বিচিত্রং তে কৃত্যং জননি জনমধ্যে বিজয়তে॥

স্বর্গলোক হ'তে তুমি স্বয়ং পতিত,
পতিতেরে কিন্তু স্বর্গে করহ উন্নীত!
সাগর ভিতরে তব স্থিতি সদা রয়,
সংসার-সাগর-ভয় কিন্তু কর লয়!
স্বয়ং জড়াত্মা (জলাত্মা) তুমি, জানে ত্রিভুবন,
কলুষ-জড়তা কিন্তু কর নিবারণ!
পরম বিচিত্র লীলা, জননি! তোমার,
মানবের শক্তি নাই তাহা বুঝিবার!

(৫)

কিমাপঃ কিং তাপত্রয়শমনসিদ্ধৌষধমিদং
কিমাধারো মুক্তেঃ কিনু পরমধাম্নঃ পরিণতিঃ।
বিকল্পান্ যানেব ত্বয়ি জননি লোকা বিদধতে
সমস্তাঃ সত্যাস্তে তব মহিমসীমা ন সুগমা॥

ইহা কি তোমার জল, যা করি দর্শন?
কিংবা সিদ্ধৌষধ ইহা ত্রিতাপ-নাশন?
কিংবা মাগো! ইহা সেই মুক্তির আধার?
কিংবা সেই দিব্যধাম নামটী ইহার?
যা কিছু বলুক্ লোক যে কোন সময়,
সমস্তই সত্য মাগো! মিথ্যা কিছু নয়!
মহিমার সীমা তব কে করে নির্ণয়?
অসীম মহিমা তব বুঝিনু নিশ্চয়!

(৬)

বিদূরেহস্তু স্নানং ন চ সলিলপানং ন যজনং
ন বা বাসস্তীরে জননি সুরলোকাদপি বরে।
তথাপি ত্বন্নাম প্রসরতি যদীয়শ্রুতিপথং
স সদ্যঃ শুদ্ধাত্মা যমনৃপতিরাজধানীং ন বিশতি॥

মহিমার কথা তব কি কহিব আর,
দেবলোক হ'তে তব মহিমা অপার।
দূরে থাক্ পূজা তব, তব জলে স্নান,
দূরে থাক্ তীরে বাস, কিংবা জলপান,
তোমার নামটী শুধু এই ত্রিভুবনে
একবার মাত্র শুনে যে জন শ্রবণে,
অমনি পবিত্র আত্মা হয় মা! তাহার,
দেখিতে না হয় তারে যমের দুয়ার!

(৭)

ভবারণ্যে মন্যে ন হি ভবতি তেষাং নিবসতি-
র্ন বা ভীতির্ভীমাকৃতিকুপিতকালোল্বণমুখাৎ।
ত্বমম্ব প্রোদ্দামাখিলদুরিতদাম্নাং নিরসনে
নিশাতাসি র্যাসি ক্ষণমপি যদীয়েক্ষণপথম্॥

অতিঘোর-পাপচয়-বন্ধন-চ্ছেদনে
একমাত্র তীক্ষ্ণ অসি তুমি মা! ভুবনে।
যে জন তোমায় চক্ষে দেখে একবার,
ভবারণ্যে বাস তার নাহি থাকে আর।
যমের ভীষণ ক্রুদ্ধ বিকট বদন
হেরিয়া তাহার ভয় না হয় কখন!

(৮)

সপর্য্যাসম্ভারৈঃ সততমনুগানৈ র্মনুজপৈ-
রভীষ্টং ভক্তানাং ফলতি সুচিরেণামরগণঃ।
নিমগ্নাঙ্গো গঙ্গে সকৃদপি তরঙ্গে তব পুন-
র্ভবেৎ সদ্যো ধন্যো ভববিলয়বর্ত্মন্যপি জনঃ॥

কিবা সদা মন্ত্রজপ, কিবা মন্ত্রগান,
কিবা যাবতীয় পূজা-দ্রব্য-অনুষ্ঠান,

ভক্তের এ সব দেখি তবু দেবগণ
বহু বিলম্বেও ফল করে বিতরণ।
কিন্তু গঙ্গে! যদি কেহ তরঙ্গে তোমার
একবার মগ্ন করে দেহটী তাহার,
না সহে সংসার-জ্বালা, আর সে কখন,
ধন্য ধন্য বলি গণ্য হয় সেই জন!

(৯)

শিবাভিঃ সংশ্লিষ্টানমরললনাশ্লেষরসিকাঃ
মিলদ্বাঙ্ক্ষোদ্দোষান্ স্ফুরদমরবন্দিস্তুতিগিরঃ।
বিমানে রাজন্তঃ পয়সি তরতস্তে তত ইতঃ
স্বদেহান্ পশ্যন্ত স্ত্রিদশনগরীং যান্তি কৃতিনঃ॥

তুমি কৃপা কর গঙ্গে! যারে একবার,
সশরীরে স্বর্গধামে সে করে বিহার।
তখন তাহার মাগো! সৌভাগ্য এমন,
আলিঙ্গন করে তারে দেবাঙ্গনাগণ।
দেব-বন্দি-গণ তার করে কত স্তুতি,
সুরম্য পুষ্পক-পথে তার অবস্থিতি।
তখন দেহের তার গতি এ প্রকার,
বসেছে শৃগালীগণ ঘেরি চারিধার,
নাচিছে কাকের দল কাকা শব্দ করি,
ছুটিছে চৌদিকে তব জলের উপরি!

(১০)

বিপজ্জ্বালালীঢ়ান্ নিরবধিগতায়াতবিধুরান্
অতিশ্রান্তান্ শশ্বৎপরিচিতকৃতান্তান্ কলুষিতান্।
জনান্ দৃষ্ট্বা নূনং ভবপথিকবিশ্রামপদবী
বিধাত্রা কারুণ্যাৎ জননি জগতি ত্বং প্রকটিতা॥

দুর্জ্জয় বিপদ্-জ্বালা সহিছে সতত,
নিরবধি যাতায়াতে শ্রান্ত অবিরত,
দেখিছে যমের মুখ শত শত বার,
পাপ-রাশি-কলুষিত দেহ অনিবার,
মানবের এই সব দুর্গতি দেখিয়া
স্বয়ং বিধাতা শেষে করুণা করিয়া
করিলা তোমার সৃষ্টি সংসার ভিতরে,
ভব-পথিকের শ্রান্তি দূর করিবারে !

(১১)

ত্বদীয়ং পানীয়ং ত্রিদশনদি তাপত্রয়হরং
ত্রিলোকীবস্তুভ্যঃ পরমতমমেকং বিলসতি।
ন চেদেবং দেবঃ কৃতচরণসেবঃ সুরনরৈঃ
কথং ধত্তে মর্ত্তে গুণগরিমলুব্ধোঽন্ধকরিপুঃ ॥

ওমা সুরধুনি গঙ্গে ! করি নিবেদন,
তোমার পবিত্র জল ত্রিতাপ-নাশন !
ত্রিভুবনে যদি কিছু সার বস্তু রয়,
তবে সে তোমারি জল, বুঝিনু নিশ্চয়।
তাহা যদি না হবে মা ! তবে কি কারণ
পদসেবা করে যাঁর সুর-নর-গণ,
যাঁর মত গুণগ্রাহী নাহি দেখা যায়,
সে শিব ধরেন কেন মস্তকে তোমায় ?

(১২)

ন গঙ্গেতি প্রোক্তং ন চ জননি পীতং তব জলং
ন বা তত্র স্নাতং সকৃদপি ময়া পূর্ব্বজনুষি।
ন চেদিত্থং তথ্যং কথমবনিদাবে নিপতিতো
ভ্রমাম্যাশাস্বাশাশতজনিতদুঃখান্যনুভবন্ ॥

ওমা গঙ্গে ! পূর্ব্ব জন্মে ভুলেও কখন
গঙ্গা-নাম না করেছি মুখে উচ্চারণ ;
তোমার পবিত্র জল না করেছি পান,
তোমার পবিত্র জলে না করেছি স্নান ;
তাহা যদি না হবে মা ! তবে কি কারণ
ভব-দাবানলে দগ্ধ হতেছি এখন ?
করি শত শত আশা, দুঃখ সহি কত
ভ্রমিতেছি দশদিকে আমি অবিরত ?

(১৩)

সুরধুনি ধনদারাপত্যভৃত্যাদিসম্পৎ
ক্ষিতিপরিবৃঢ়তা বা ত্বৎপদান্নার্থনীয়া।
ভগবতি সতি কালে তীরনীরান্তরালে
বপুরপগমমেকং যাচতে প্রেমচন্দ্রঃ ॥

কিবা পুত্র কন্যা ভার্য্যা ভৃত্য ভূমি ধন
কিছুই না চাই, বিনা তোমার চরণ।
ওমা গঙ্গে ! তব তীর-নীর-মধ্যদেশে
এই দেহ লয় পায় যেন অবশেষে।
দীনহীন প্রেমচন্দ্র এই ভিক্ষা চায়,
আর কিছু নাহি চায় অসার ধরায় !

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভট্টসাগর, বি-এ।

তাড়িতট্রাম তিন প্রকার।

ইলেক্‌ট্রিক বা তাড়িত ট্রাম তিন উপায়ে চলিয়া থাকে ;—

১। মাটীর ভিতর সুড়ঙ্গ করিয়া, তাহাতে রেলপাতা হয়। সুড়ঙ্গের ভিতর আলোক বাতাসের পথ রাখা হয়। রাস্তার উপর হইতে সুড়ঙ্গে নামিয়া, ট্রামে চড়া সহজ ; তাহার উপায় নানারূপ। এইরূপ ট্রামকেই বলে, অণ্ডার-গ্রাউণ্ড (ভূগর্ভস্থ) ট্রাম।

কিন্তু গাঁথা সুড়ঙ্গ না করিয়া, এখন বড় বড় বিরাট-নল মাটীর ভিতর বসাইয়া, এক প্রকার সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করা হয়। এই নলের ব্যাস ১৬ ফুটের কম নহে, অর্থাৎ নলের ফাঁদ তিনমানুষ-ভোর। এই নলের ভিতর রেল পাতিয়া ট্রাম চালান হয়। ইহার নাম টিউবট্রাম বা নল-ট্রাম। সুড়ঙ্গের প্রকারান্তর বলিয়া, টিউব ট্রামকেও অণ্ডারগ্রাউণ্ড ট্রামওয়ে বলা হয়।

২। ট্রাম ভূমির উপর দিয়া চলে। ভূমিতে রেল পাতা থাকে; ট্রামের তাড়িত-সংযোগ ভূমিতলেই হইয়া থাকে। ইহাকেই বলে, সরফেস-কন্‌ট্যাক্ট বা ভূমিস্পর্শিনী প্রথা।

৩। ট্রামের রেল ভূমির উপর পাতা। কিন্তু তাড়িত, শূন্যে তারের ভিতর দিয়া, প্রবাহিত। খোঁটার উপর তার পাতা। ইহার নাম ওভার-হেড-ট্রলি প্রথা। ট্রলি অর্থে ক্ষুদ্র চক্র। শূন্যে তারের ভিতর যে তাড়িত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা ঐ ক্ষুদ্র চক্র-সাহায্যে ট্রামে সংযুক্ত থাকে; তাই এরূপ ট্রামকে বলে, ওভারহেড-ট্রলি-ট্রাম। বিলাতে সুড়ঙ্গ ট্রাম আছে; টিউব বা নলের ট্রাম আছে। দুই পথে ট্রাম তাড়িতেও চলিতেছে। বাষ্পও যে না আছে, এরূপ নহে।

দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ সরফেস কন্‌ট্যাক্ট ট্রামও বিলাতে চলিতেছে।

কিন্তু তৃতীয় অর্থাৎ মস্তকস্থ-তার-সংঘটিত ট্রলির ট্রাম বিলাতে এখনও প্রায় অচল।

অথচ আমাদের কলিকাতায় একেবারেই এই ট্রাম-প্রথাই প্রচলিত হইল। রাস্তায় খোঁটার উপর তার পাতা হইয়াছে, ট্রামের সহিত তারের ট্রলি বা ক্ষুদ্র চক্রে সংযোগ আছে। কলিকাতার অনেক পথে এইরূপই ট্রাম চলিতেছে; ক্রমে কলিকাতার সর্ব্বত্র চলিবে।

বিলাতে ট্রাম-কোম্পানিদিগের ভিতর অনেকেই, কলিকাতার মত এই ওভারহেড ট্রলি প্রথায়, ট্রাম চালাইবার জন্য, উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের মত নাই বলিয়া, তাঁহারা বিবাদ করিতেছেন। সমিতি সভায় গবর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ চলিতেছে। সে দিন আর্টসোসাইটীর এক বৈঠকে ক্লিফ্‌টন রবিন্‌সন এক প্রবন্ধ পড়িয়াছেন। তিনি ওভারহেড ট্রলি ট্রামের ঘোর পক্ষপাতী; তিনি যে, ট্রামের ইঞ্জিনিয়ার।

ডাক্তার টম্‌সন্ সভাপতি হইয়াছিলেন। তাড়িত-বিজ্ঞান ও ট্রাম-রহস্যে ইনি অদ্বিতীয়। লণ্ডনে মাটীর ভিতর তাড়িতট্রাম চালাইতে খরচ

অনেক; ট্রাম বসাইতে খরচ প্রতি মাইলে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। গাঁথা সুড়ঙ্গে খরচ অধিক; আর ১৬ ফুট ফাঁদের বিরাট নলেও খরচ বড় কম নহে। সরফেস-কন্‌ট্যাক্ট বা ভূমিস্পর্শী তাড়িতের ট্রামেও মাইল প্রতি পড়ে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।

কিন্তু ওভারহেড-ট্রলি বা কলিকাতার মত তাড়িত ট্রাম চালাইতে, লণ্ডনে পড়ে মাইল প্রতি ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা।

এইটীই খুব সস্তা। এই জন্যই ট্রামের ইঞ্জিনীয়ার রবিন্‌সন সাহেব লণ্ডনে এইরূপ ট্রলি-ট্রামই চালাইবার জন্য জিদ করিয়াছিলেন। কিন্তু সভাপতি ডাক্তার টম্‌সন সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন;—

"যেখানে লোকজনের বসতি কম, যেখানে টেলিগ্রাফ টেলিফোনের তার নাই; সেখানে ওভারহেড বা মস্তকোপরিস্থ তাড়িতে কোনরূপ বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সেইরূপ মফস্বল স্থানে, মাঠে ময়দানে, ওভারহেড তাড়িতে ট্রাম চালান মন্দ নহে। লণ্ডনের মত যে সহর লোকজন ঘর বাড়ী টেলিগ্রাফ টেলিফোনে পূর্ণ, সেখানে ওভারহেড-ট্রলি-ট্রাম চলিতে পারে না।

"লণ্ডনের মত সহরে সরফেস-কন্‌ট্যাক্ট বা ভূস্পর্শী তাড়িতের ট্রামই চালাইতে পারা যায়। সহরের বাহিরে ওভারহেড ট্রলি ট্রাম চলিলে, সহরের ভিতরে সরফেস কন্‌ট্যাক্ট চলিবে। উভয় ট্রামের সংযোগ করিয়া দেওয়া কঠিন হইবে না। তাহা হইলেই, নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য চলিবে। লণ্ডনের মত সহরে, ওভারহেড ট্রলি প্রথায় অর্থাৎ মাথার উপর তাড়িত প্রবাহিত করিয়া, ট্রাম চালাইতে দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে।"

কলিকাতা জনপূর্ণ সহর, কলিকাতা ঘর বাড়ীতে আচ্ছন্ন, কলিকাতায় টেলিগ্রাফ আছে, টেলিফোন আছে। কিন্তু বিলাতের কর্ত্তারা যেরূপ প্রজার মঙ্গলামঙ্গলে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতেছেন, ভারতের কর্ত্তারা সেরূপ করেন না। যাহা বিলাতে হইতে পারে না, তাহা ভারতে অনায়াসেই হয়।

সে দিন যে সভায় রবিনসন সাহেব ওভারহেড তাড়িতের ওকালতী করেন, সেই সভাতেই নানা সভ্য নানা কথা কহিয়াছিলেন। রবিনসন্ সাহেবের প্রবন্ধেও অনেক মজার কথা ছিল। একটা কথার আভাস দিই; প্রস্তাব হইয়াছিল;—

"সহরে অনেক গাড়ী ঘোড়া চলে বলিয়াই, রাস্তায় ভিড় হয়। চারিদিকে ট্রাম চলিলেই গাড়ী বন্ধ হইবে, লোকে গাড়ী ঘোড়া ছাড়িয়া দিবে। আবার, যাহারা পায়ে হাঁটে, তাহারাও ট্রামে চড়িয়া পা-চালা ছাড়িয়া দিবে। তাহা হইলেই লণ্ডনের মত সহরেও ভিড় ঘুচিয়া যাইবে।"

এ আজগবী প্রস্তাব বিলাতী সভায় উপহাসই প্রবাহিত করিয়াছিল।

কলিকাতায় আমাদের আপত্তি অগ্রাহ্য! আপত্তি বাড়িলেও কিন্তু এইরূপ যুক্তি বাহাল হইবে। এমন জায়গা আর নাই, ভারতই বিলাতের ভাঙ্গা কুলা।

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত।

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়াঠেকা।

বল্ মা কালী, শিখ্‌লি কোথা, এমন লুকোচুরি খেলা।
(তুই) সাম্‌নে সাম্‌নে খেলিয়ে বেড়াস্, লুকিয়ে যাস্ তুই ছোঁবার বেলা॥
টু দিচ্চিস তুই অবিরত,
বল্ আমি আর খুঁজবো কত,
(হই) খুঁজে খুঁজে নাটা-পাটা বন উপবন নদী নালা॥
মনে করি ধরি ধরি,
আর তোরে মা ধর্‌তে নারি,
(তুই) ভেজায় দিয়ে ঘুরিয়ে মারিস, ছুট্‌তে ছুট্‌তে গেল বেলা॥
সুদন বলে ক্ষেপা মাগি,
ক্ষেপা নয় সে বড়ই ঘাগি,
পাগলের ভান করে সুধু, ডেলা দিয়ে ভাঙ্গ্‌তে ডেলা॥

স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দ।

যৎপরোনাস্তি শোক-সন্তপ্ত-চিত্তে প্রকাশ করিতেছি,—ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের প্রধান সন্ন্যাসী শিষ্য এবং "রামকৃষ্ণমিশন" বা হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারক সমিতির অধ্যক্ষ স্বামীবিবেকানন্দ ইহ-জগতে আর নাই! গত ২০এ আষাঢ়, ১৩০৯ সাল, শুক্রবার রাত্রি ৯॥০ ঘটিকার সময় ৩৯ বৎসর বয়সে তাঁহার আত্মা জড়দেহ ছাড়িয়া, প্রাণারাধ্যের নিকটে গমন করিয়াছে। হাবড়া জেলার অন্তর্গত "বেলুড় মঠে" এই শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে। পরমহংস দেবের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ সময়ে সময়ে এই মঠে বসতি করিয়া থাকেন। এই মঠ ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী বরাহ-নগরের অপর পারে অবস্থিত। এখানে থাকিবার স্থান ও মর্ম্মর-প্রস্তর-খচিত দেবালয় আছে, নির্জ্জন নিস্তব্ধ; ভগবান্ রামকৃষ্ণ দেবের নিত্য পূজা অর্চ্চনা ও ভোগরাগ সুসম্পূর্ণ হইয়া থাকে। এই স্থানেই প্রতি বৎসর ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। অসংখ্য নরনারী সমবেত হইয়া ও পবিত্র প্রসাদ পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন। স্থান অতি পবিত্র, শিষ্যগণ মহানুভব। এই স্থানই স্বামী বিবেকানন্দের অন্তিমকালের উপযুক্ত স্থান।

ঘাত-প্রতিঘাত সংসারের অব্যর্থ নিয়ম; কোনও বিষয়েই নিয়তির বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখিয়া, স্বামিজী নশ্বর জড়-জীবনের শেষ করিয়া, জননী জন্মভূমির ক্রোড়ে অহা সমাধি-নিমগ্ন হইয়াছেন। আর সেই বেলুড় মঠে সেই সৌম্যমূর্ত্তি, সেই প্রতিভামণ্ডিত মুখমণ্ডল, সেই পরম উৎসাহ-দীপ্ত মহাপুরুষকে দেখিতে পাইব না। আর কেহ স্বামী বিবেকানন্দের মুখ-নিঃসৃত উপদেশাদি শুনিতে পাইবেন না।

স্বীয় অধ্যবসায়গুণে অতি অল্প বয়সেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পাঠ্যাবস্থাতেই পরমহংস-দেবের নিকট যাতায়াত করিতেন, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিও তাঁহার আস্থা ছিল; পরে পরমহংস-দেবের নিকট শিষ্যত্বে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পরমহংস-দেবের লীলা-অবসানের পর সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমহংসদেবের ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্ম্ম প্রচারার্থে সুকুমার বয়সে কঠোর সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়া, নানাতীর্থ ও পর্ব্বতময় প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। অনন্তর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজবাসিগণ তাঁহার উপদেশে ও চরিত্রে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে সুদূর আমেরিকা খণ্ডে চিকাগো-ধর্ম্ম-মেলায় প্রেরণ করেন। স্বামিজী গৈরিকবসন পরিধান করিয়া নিঃসম্বলে তথায় উপস্থিত হইলে, তাঁহার মুখে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব, বেদান্ত ও যোগশাস্ত্রাদি সম্বন্ধে বিচিত্র সারযুক্তিযুক্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণান্তে, কঠোর "মেটিরিয়ালিজম্" মন্ত্রে দীক্ষিত পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী একবারে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; অনেকে হিন্দুধর্ম্মের অপার মহিমায় পৈতৃক ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন; কয়েকটি মার্কিণ মহিলা ও কয়েকজন কৃতবিদ্য পুরুষ শিষ্যরূপে স্বামিজীর সহিত ভারতেও আগমন করিয়াছেন। আমেরিকা হইতে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। তথায় হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতায় সকলকে বিমোহিত করিয়া প্রায় তিন বৎসর পরে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। তাহার পর ফ্রান্স বিলাত আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্যপ্রদেশে ও জাপানে তিনি কয়েকবার নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ অল্পদিনের জন্য গিয়াছিলেন। বিলাতের অদ্বিতীয় পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলার (Max Muller) স্বামিজীকে ভালবাসিতেন। যখন অধ্যাপক চূড়ামণিকে তিনি ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের কথা বলেন, মোক্ষমূলার

তখনই সপ্রেমে বলিয়াছিলেন, "আমি মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে আপনার বলিবার বহুদিন পূর্ব্বেই চিনিয়াছি। যখন স্বর্গীয় কেবশচন্দ্র সেনের মত পরিবর্ত্তনের কথা আমার কর্ণগোচর হয়, তখনই আমি বিস্মিত হইয়া উহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া উক্ত মহাত্মাকে দেবশক্তিসম্পন্ন বলিয়া জানিয়াছি, তদবধি আমি তাঁহার বৃত্তান্ত শুনিতে বড়ই অভিলাষী।" তদনন্তর স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "আজকাল তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নানাদেশে সহস্র সহস্র ব্যক্তি পূজা করিতেছেন।" তখন বৃদ্ধ পণ্ডিত মোক্ষমূলার সানন্দে বলিলেন, "তাঁহার পূজা করিবে না ত কাহার পূজা করিবে?" তাহার পর স্বামিজীকে যখন রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবার নিমিত্ত অধ্যাপক চূড়ামণি আসিয়াছিলেন, তখন স্বামিজী সঙ্কুচিত হওয়ায় তিনি বলিয়াছিলেন, "রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আপনার ন্যায় বিশিষ্ঠ শিষ্যের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।" তৎকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানের হিন্দুসন্তানগণ তাঁহার প্রতি যেরূপ অশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অনেক রাজা মহারাজও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাগ্যে সে সম্মান ও অভ্যর্থনা ঘটিয়াছে কি না, সন্দেহ!

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে বিলাত হইতে মহানগরী কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর বোধ হয়,ভারতের জলবায়ুর দোষে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়—বহুমূত্র, হৃদ্‌রোগ অজীর্ণাদি ভারতীয় জটিল পীড়ায় তিনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন। শুনা যায়, মৃত্যুর প্রায় মাসাধিক কাল পূর্ব্বে তিনি কিছু অধিক পরিমাণে তপ জপ করিতেছিলেন, প্রাতঃকালে ৪টা ৫টার সময় গাত্রোত্থান করিয়া প্রায় ২ ঘণ্টাকাল ও সন্ধ্যার পর অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল নির্জ্জনে তপ জপ করিতেন। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার কোন পীড়াই ছিল না। মৃত্যুর দিবসেও তপ জপাদি যথানিয়মে করিয়াছিলেন। আহারান্তে মধ্যাহ্নে অপর শিষ্যবর্গসহ প্রায় তিন ঘণ্টাকাল যজুর্ব্বেদ পাঠ শ্রবণ করেন, তাহার পর বিলাত ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জনৈক গুরু ভাইয়ের সহিত আন্দোলন চলিয়াছিল, তাহার পর অপরাহ্নে ৫৷৷০ টার সময় তাঁহার সহিত তিনি বেলুড়ের সদররাস্তা পর্য্যন্ত বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সে দিন স্বামিজীর স্বাস্থ্য অন্যান্য দিনের অপেক্ষা উত্তম ছিল। সন্ধ্যার সময় ঈশ্বরচিন্তা করিয়াছিলেন, ইতঃপূর্ব্বে ডাক্তার স্যাণ্ডার্স প্রভৃতি সতর্ক করিয়া দেওয়াতে তাঁহাকে একাকী থাকিতে দেওয়া হইত না। ঈশ্বর-চিন্তার সময় যে ব্রহ্মচারী উপস্থিত

ছিলেন, স্বামিজী তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ, আমি নির্জ্জনে একটু জপ করিব, তুমিও একটু জপ তপ করগে।" ব্রহ্মচারিটী নিকটস্থ ছাদে আপন অভিলষিত দেবের আরাধনা করিতেছিলেন, একঘণ্টাধিক কাল পরে, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমের জানালা উন্মুক্ত গৃহে শয়ন করিলেন, নিদ্রাও হইল, প্রায় একঘণ্টা পরে সহসা কাঁদিয়া উঠিলেন, এবং একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন! একটী দীর্ঘনিশ্বাসেই স্বামিজীর জীবনের সকল আশা ভরসা ফুরাইল! বেলুড় মঠে হাহাকার পড়িয়া গেল!! অবিলম্বে ডাক্তার আসিলেন, যন্ত্রাদির সাহায্যে শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, সকল চেষ্টাই বিফল হইল! সংসারে এরূপ সজ্ঞানে, বিনা রোগে, বিনা যন্ত্রণায় মহাপুরুষ ব্যতীত অল্প লোকের ভাগ্যেই এরূপ মহাপ্রস্থান ঘটিয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের চেষ্টায় রামকৃষ্ণ-মিশনের কার্য্য এতদূর প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে যে, অল্পদিন হইল, স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী তুরিতানন্দ নামক তত্রত্য প্রচারকদ্বয় শীঘ্রই আরও দশ জন হিন্দু প্রচারককে আমেরিকায় পাঠাইয়া দিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া সমগ্র ভারতবর্ষেও এই মিশনের প্রচারকগণ নীরবে অশেষ হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। মান্দ্রাজ আলমোড়ার নিকটস্থ মায়াবতী মুরশিদাবাদ, রাজপুতনার অন্তর্গত কৃষ্ণগড় এবং হরিদ্বারের নিকট কনখলে ইহাঁদের কয়েকটী শাখা "রামকৃষ্ণ-মিশন" আছে, আর হাওড়ার নিকটস্থ বেলুড়ে প্রধান মঠ স্থাপিত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের অন্নকষ্ট-মোচনে সাহায্য, প্লেগাতুরাদিগের রোগযন্ত্রণা নিবারণে সেবা-শুশ্রূষা, মাতৃপিতৃহীন অনাথ বালক-বালিকাদিগের জন্য অনাথ-আশ্রম সংস্থাপন, ইত্যাদি অনেক মহানুভবের কার্য্যই ইহাঁরা করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের অদম্য অধ্যবসায় ও চেষ্টাতেই এই সকল শুভানুষ্ঠান হইতেছিল। এক্ষণে তাঁহার মৃত্যুতে এসকল সাধুকার্য্যের কোনরূপ ব্যতিক্রম হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

বিবেকানন্দ স্বামীর সাংসারিক নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। বসতিবাটী কলিকাতা সিমুলিয়া গৌরমোহন সাহার গলিতে। ইহাঁর মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা আজিও বর্ত্তমান। নরেন্দ্রনাথের পিতা এটর্নী বিশ্বনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত টেম্পল এবং ফ্রেণ্ডস্ নামক বিখ্যাত এটর্নীদিগের আফিসে ম্যানেজিং ক্লার্কের

কার্য্য করিতেন। কলেজ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই নরেন্দ্রনাথ সংসার পরিত্যাগ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি রামকৃষ্ণদেবের ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও অচিরে শিষ্যগণের মধ্যে শিষ্যরত্ন বলিয়া পরিচিত হয়েন। এই সময়ে তিনি জটিল বেদান্ত দর্শনের সারতত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া বেদান্তে ঈদৃশী অভিজ্ঞতালাভ করেন যে, তদ্দর্শনে পরমহংসদেব একদিন সমাধিযোগে তাঁহাকে বলেন, "নরেন্দ্র, তোর ভবিষ্যৎ বড়ই উজ্জ্বল।" ইহার পর নরেন্দ্রনাথ মান্দ্রাজে গমন পূর্ব্বক রামনদরাজের মদুরাস্থ একটী বিখ্যাত দেবমন্দিরে কয়েক বৎসর ধরিয়া বিবিধ দুর্ব্বোধ শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়নে মনোভিনিবেশ করেন। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের অদ্ভুত প্রতিভা ও বেদান্ত শাস্ত্রে বিচিত্র অভিজ্ঞতা দেখিয়া, রামনদরাজ তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হন, এবং চিকাগো মেলার সহিত ধর্ম্ম-মহামণ্ডল বসিবে শুনিয়া, তিনি ও মান্দ্রাজের অন্যান্য প্রধান হিন্দুগণ নরেন্দ্রনাথকেই হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে তথায় পাঠাইয়া দেন। সেই কিশোর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া বিবেকানন্দ ধর্ম্ম-প্রচারই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন, এবং ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগোস্থ উক্ত মহামেলার কথিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গে উপস্থিত হইয়া, হিন্দু-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। The World's Parliament of Religions (London 'Review of Reviews' Office) পুস্তকে সে বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে। সভাপতি সেই বক্তৃতায় বিবেকানন্দের উদ্দেশ্য ঠিক ধারণা করিয়াছেন। সভাপতি ডাক্তার ব্যারোস্ রিপোর্ট-পুস্তকে স্বামীর বিশ্বজনীন ধর্ম্মমত তুলিয়া দিয়াছেন। সে মতটি এই;—

"To the Hindu, man is not travelling from error to truth, but from truth to truth."

"To the Hindu, the whole world of religion is only a travelling, a coming up, of different men and women through various conditions and circumstances to the same goal. The contradictions are only apparent".

বিবেকানন্দ কর্ম্মবীর ছিলেন। তিনি কেবল ভারতের সর্ব্বত্র হিন্দুধর্ম্মের সার-সত্যের প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। ইউরোপে ও আমেরিকায় সেই সত্য প্রচারিত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকদিগের বিকৃত ব্যাখ্যামুক্ত হিন্দুধর্ম্মের কথা জগতকে জানাইয়াছেন। লোককে

বুঝাইবার অসাধারণ ক্ষমতায় তিনি আমেরিকা হইতে বেলুড় মঠের জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনেন।

তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার অভ্যর্থনা হয়। আন্দাজের অধিবাসীরা তাঁহাকে পূজা করিত। কলিকাতার শিয়ালদহ ষ্টেশনে তাঁহার অভ্যর্থনা হয়। বহু ভদ্রসন্তান তাঁহার গাড়ী টানিয়াছিল। শোভাবাজার রাজবাড়ীর নাটমন্দিরে তিনি বক্তৃতা করেন। সে বক্তৃতা যেন এখনও আমাদের কর্ণে বাজিতেছে। বরোদার মহারাজের ন্যায় লোকের মতে বিবেকানন্দ নব্যভারতের শ্রেষ্ঠ রত্ন। তিনি অতি মিষ্টভাষী ও সুগায়ক ছিলেন। তাঁহার সুস্বর শুনিয়াই রামকৃষ্ণদেব তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এত অল্প বয়সে যে তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে—আরও বহু সদনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিবার পূর্ব্বে—বিদেশে হিন্দুধর্ম্মের সত্যপ্রচারের স্থায়ী ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বেই যে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিবেন, এ কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই!

হায় এ কাহার পরিণাম?

মহর্ষি কপিল পরিণামবাদী ইহা সকলেই জানেন, এ জগতে কি সুখ, কি দুঃখ, কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম সকলি চিত্তের পরিণাম, এইত কপিলের মত; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কতকগুলি মানবের গতি মতি অবলোকন করিয়া, তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া, নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না যে, "এ কাহার পরিণাম?"

বর্ত্তমান সময়ে বিবিধ আপদে জড়িত হইয়া ব্রাহ্মণগণ আত্মোচিত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দাসত্বব্রতে দীক্ষিত হইয়াছে, এইরূপ শাস্ত্রোক্ত স্ব স্ব বর্ণ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রায় সকলেই পরধর্ম্মই আশ্রয় করিয়াছে, কিন্তু সকলের মুখেই ধর্ম্ম ধর্ম্ম এই রবটা শুনা যায়, এখন শুনা যায়—আহারের সহিত ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ? যা তা খাও, মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম কর। এক্ষণকার ধর্ম্ম মুখে, আহারে ধর্ম্ম নাই, ব্যবহারে ধর্ম্ম নাই, বিচারে ধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম মুখে। এই কলির ধর্ম্ম অটল অচল ধ্রুব অচ্ছেদ্য অদাহ্য অক্লেদ্য অশোষ্য সর্ব্বগত ও স্থাণু, ঠিক ধর্ম্মটা যেন অবিকল ব্রহ্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তুমি অদ্বিতীয় বিদ্যাদিগ্‌গজ বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য্য, তুমি সন্ধ্যা আহ্নিক শিখা তিলক ছাড়,

চুরুট টান, বিলাত ফেরতকে উদ্ধার কর, তোমার ধর্ম্ম যাইবে না, তুমি তর্কচূড়ামণি বিদ্যার জাহাজ, তুমি তালফলাকৃতি মুণ্ডিত মস্তকে শিখা রাখ, গঙ্গামৃত্তিকায় কমনীয় কায় তিলক চিত্র কর, সন্ধ্যা তর্পণ করিতে থাক, আর স্নানার্দ্রগাত্র যুবতীর প্রতি লোললোচন সঞ্চালিত কর, তোমার ধর্ম্ম যাইবে না, তুমি বি-এ ব্রহ্মচারী হইয়া "বৎসতরীং মড়্‌মড়ায়তে" কর, বক্তৃতা কর, শাস্ত্রের সূক্ষ্মতত্ত্ব বিঘোষিত কর, নির্লিপ্ত ভাবে অট্টালিকায় বাস কর, নির্লিপ্ত ভাবে মহিলাকে সহচরী কর, রাজার্হ বহুমূল্য শয্যায় শয়ন কর, আর গেরুয়া পরিধান কর, তোমার ধর্ম্ম, যাইবে না। তুমি লেখাপড়ার ধার ধার না, জ্ঞানানন্দ বাবাজী হও, গ্রন্থ প্রচার কর, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাঁড়ে দিয়া হাঁড়ি মুচি ডোমকে ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝাও, মুসলমানকে দিয়াও যজ্ঞে আহুতি প্রদান করাও, চণ্ডালকে, স্ত্রীজাতিকেও প্রণব জপের উপদেশ প্রদান কর, তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না।

যে ব্রহ্ম দর্শন করিবার জন্য কঠোর তপস্যায় নিরত বাল্মিকীর উপরে উই ঢিপি হইয়া গেল, তুমি সেই ব্রহ্মদর্শন পাঁচ মিনিটে টাকা লইয়া হুস্ করিয়া করাইবে! তুমি কখনও স্কুলে বা টোলে পদার্পণ করিলে না, কিন্তু যোগবলে মেধাতিথি শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির মাথা খাইয়া মনু ও গীতাদি শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বাজার বসাইলে! তুমি ব্রাহ্মণ, ত্রিসন্ধ্যাকে পকেটে পূরিলে, আর কৃষিকার্য্য করিয়া রাজর্ষি জনকের মত রাজকোষ পূর্ণ করিতে লাগিলে, তাহাতে তোমার ধর্ম্ম ষোলকলায় বজায় থাকিবে।

তুমি সন্ন্যাসী সাজিয়া রাজা জমিদার ধনী উকিল প্রভৃতি গৃহস্থকে দীক্ষিত কর, আর গৃহস্থগণও যেন তেন প্রকারেণ ধর্ম্মচ্ছলে অধর্ম্মের প্রসার বাড়াইতে কুলগুরুকে সহস্রারে কুলুপ বদ্ধ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে দীক্ষিত হইয়া নবধর্ম্মে অনুরক্ত হইল, কপালে বিভূতি লাগাও, বাবুর্চির রান্নায় উদরদেবের পূজা কর, ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না।

তুমি এ পাশ ওপাশ করিয়া জ্ঞানী হইলে, তখন বেদশাস্ত্র কৃষকের গান, আর গায়ত্রী প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বক্তৃতায় হাততালি উপার্জ্জন করিলে, ধর্ম্ম রক্ষা হইল।

তুমি শূদ্র উচ্চ শিক্ষিত হইলে, পরম আস্তিক হিন্দুকুল-ধুরন্ধর হইয়া মন্ত্রাত্মক চণ্ডী পাঠ ও প্রণব উচ্চারণে ধর্ম্মের ঢাক বাজাইতে সুরু করিলে, আর মৃত হিন্দুধর্ম্ম বাঁচিয়া উঠিল।

যেরূপেই হউক, ধর্ম্মের ভিতরেও অধর্ম্মের ভেজাল না দিলে নিরেট ধর্ম্মে আর এখন কারও মন ওঠে না।

কেন এমন হইল, এ কাহার পরিণাম ?

তখন বেদব্যাস মুনি ঠাকুর দিশা না পাইয়া অমনি ভাগবতে এক কলম লিখিয়া বসিলেন।

"সর্ব্বং কাল কৃতং মন্যে।"

এ সকলই কালে করে, লোকের দোষ কি ? কলির লোক ত নব্য শিক্ষিত হইয়া নির্লিপ্তভাবে তত্ত্বজ্ঞানী "তৈলঙ্গ স্বামী বা পরমহংসদেব" হইয়া উঠিলেন, লোকের দোষ কি ? ও সব কালে করে, লোকে নয়, ধর্ম্মের সম্বন্ধে লোকই কাল, সুতরাং 'সর্ব্বং কাল কৃতং মন্যে' একথা ঠিকই হইল, এই ত আমার (বেদব্যাসের) মত, রাম ! রাম !! রাম !!!

নারীজাতির মহত্ত্ব।

জগতে স্ত্রী ও পুরুষ বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি। উভয়েই উভয়ের সাপেক্ষ। একের অভাবে অপরের অভাব এমন কি, অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ অবশ্যম্ভাবী। অতএব উভয়েই উভয়েরই সমতুল ধরা যাইতে পারে। কিন্তু এ জগতে সমতার মধ্যে বিষমতা দেখা বিচিত্র নহে। সেই নিমিত্ত আমরা স্ত্রী পুং জাতির সমতার মধ্যে বিষমতা দেখাইতে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ, স্ত্রীজাতির স্বভাব সরলতা ও নম্রতা স্পষ্টত স্থূলদৃষ্টিতেও তাহাদিগের বিশেষ গুণ বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। স্ত্রীজাতির পুংজাতির উপর নির্ভরতা এক প্রকার সকল সমাজের প্রথা বলিয়া গণ্য হইয়া গিয়াছে। অতএব কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, স্ত্রীজাতির নম্রতা ও স্বভাব সরলতা Social Convention অর্থাৎ সামাজিক আচার কর্ত্তৃক উৎপাদিত। নম্রতা না থাকিলে বা সরলতার অভাব হইলে জীব অপর জীবকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে পারে না। অতএব এই নম্রতা বা সরলতা স্ত্রীজাতির স্বভাবিক ধর্ম্ম না হইয়া গতানুগতিকক্রমে পূর্ব্বোক্ত চির প্রচলিত প্রথা স্ত্রীজাতির পুরুষজাতির উপর নির্ভরতার দ্বারা উৎপন্ন।

এইরূপে স্ত্রীজাতির অপরাপর গুণনিচয় পুরুষ জাতির সন্তোষ সাধনরূপ স্বার্থপর কারণের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। তাহা হইলে

স্ত্রীজাতির মহত্ত্বের কথা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে অতি স্বার্থপর জাতি বলিয়া গণ্য করিতে হয় ;—ইহার উপর যদি সেই পুরাতন শ্লোক আবৃত্তি করি,—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে,
ভর্ত্তা রক্ষিত যৌবনে।
পুত্রস্তু স্থবিরে ভাবে
ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥"

তবে স্ত্রীজীবনে জন্ম যৌবন ও জরাবস্থা পর্য্যন্ত একটী না একটী পুরুষের নিকট পারতন্ত্র্য স্বীকার করিতে হয়। যে যাহার পরতন্ত্র, স্বাভাবিক নিয়মানুরোধে তাহাকে প্রভু বা তাহার পক্ষে স্বতন্ত্র জনের সেবা করিতে হয়—কিন্তু বিশেষরূপে দেখিতে গেলে বুঝা উচিত যে, স্ত্রীজাতি কি এতই হীন যে, উহারা পরমনোরঞ্জন ভিন্ন অপর কোন প্রকার Feeling বা মানসিক শক্তির দ্বারা প্রণোদিত হয় না ?

জগতের যে জাতি শৌর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণশালী মনিষীগণের প্রসবিত্রী, সে জাতি কখনই পরমনোরঞ্জন বা নিজ স্বার্থসিদ্ধিরূপ নিকৃষ্ট আদর্শ অবলম্বন করিয়া চলিতে পারে না।

বিশ্বস্রষ্টার এমনি নিয়ম যে, সন্তান উৎপত্তিসহকারে স্নেহ, দয়া প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণ স্ত্রীহৃদয়ে আসিয়া যোগ দেয়। সন্তান ভূমিষ্ট হইলে মাতার পক্ষে পৃথিবী স্বর্গ হইয়া উঠে। সন্তানের লালন-পালন পিতা অপেক্ষা মাতার কত অধিক যত্নসাপেক্ষ, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। নবীন শিশুর যখন অসহায় নিরাশ্রয় অবস্থা, তখন তাহার অহোরাত্র মাতার সংসর্গে কাটিয়া যায়। সেই সময়ে জননী স্বয়ং বিধাতা পুরুষরূপিণী হইয়া নিজের ও অপরের অজ্ঞাতসারে স্বীয় স্তনদ্বয়ের ললাটে অপরিলক্ষ্য অক্ষরে তাহার জীবনের ঘটনাবলী লিখিয়া দেন। শৈশবে মাতৃদুগ্ধপান সহকারে নবীন শিশু মাতার গুণাগুণ পাইতে থাকে ও তাহা হইতেই অধিক পরিমাণে তাহার ভবিষ্য জীবনের ঘটনাবলী নির্ণীত হয়।

যে জাতির এতই ক্ষমতা, যে জাতি ভবিষ্যৎ মানববংশের উপর এতই আধিপত্য বিস্তার করে, যে জাতির গুণাগুণে জাতকের অদৃষ্টলিপি লিপিবদ্ধ হয়, সে জাতি যে মহীয়সী শক্তিসম্পন্না, ইহা অস্বীকার করা নিতান্তই দুঃসাধ্য। এই নিমিত্তই সভ্যসমাজে স্ত্রীজাতির সমাদর, এই নিমিত্তই আর্য্যঋষিগণ বলিয়াছেন ;—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।"

এই নিমিত্তই প্রাচীন ভারতে স্ত্রীজাতির এত আধিপত্য স্বীকৃত হইয়াছিল ও সেই জন্যই প্রাচীনভারত এত উন্নতিসাধন করিতে পারিয়াছিল, যাহার দোহাই দিয়া এখনও আমরা সভ্যজগতে মর্য্যাদা পাইতেছি কিন্তু সেকাল এখন গিয়াছে—সেকাল আর নাই, যে কালে ব্রহ্মবাদিনী গার্গী আত্রেয়ী প্রভৃতির গাথা ব্রহ্মপরায়ণ ঋষিদিগের সহিত সমস্বরে উচ্চারিত হইত। ভারতের স্বাধীনতা লোপের সহিত স্ত্রীজাতির সমাদরের লোপ হইয়া গিয়াছে। এমন কি, বলিতে পারা যায়, সেই আদর্শ হইতে স্খলিত হওয়াতেই ভারতের এখন এত দুর্দ্দশা। বহুশতাব্দীর পরাধীনতা সেই আদর্শ হইতে চ্যুত হইবার ফল এবং তন্নিবন্ধন আবার স্ত্রীজাতির পুরুষের নিকট অধঃপতন বর্ত্তমান ভারতকে অধো হইতে অধস্তন প্রদেশে লইয়া গিয়াছে।

কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীজাতিকে আধুনিক সভ্যতার খাতিরে পুরুষের সমকক্ষ করা উচিত নহে। স্ত্রীজাতির কার্য্যক্ষেত্র অপরদিকে ও পুরুষ জাতির অন্যদিকে রাখা চাই। একের অন্যটী সাপেক্ষ বটে, কিন্তু পরস্পর বিভিন্ন। নারীকে পুরুষের ন্যায় করা উচিত নয়, তাহা হইলে নারীর বিশেষত্ব নষ্ট করা হয়। এই নিমিত্ত কবি বলিয়াছেন ;—

"Could we make her as the man
Sweet love were slain,
Whose dearest bond is this,
Not like to like, but like in difference."

TENNYSON.

পুরুষ ভাবনা ভাবিবেন বটে, কিন্তু নারীর সে ভাবনা ভাবিবার অধিকার থাকা চাই। এইরূপ করিলে নারী ও পুরুষের সম্মিলন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

"Till atlast she set herself up to man,
Like perfect music set un to noble words.

আদর্শ নারীজীবনের লক্ষণ এই যে, সে কখনই পুরুষের দুঃখে দুঃখী বা সুখে সুখী না হইয়া থাকিতে পারে না। পুরুষের ভাবনা ভাবিবার তাহার স্বাভাবিক অধিকার। এই সম্বন্ধে সেক্ষপীয়রের আদর্শ রমণী ব্রুটসপত্নী পোরসিয়ার কথা উল্লেখযোগ্য। ব্রুটস তৎকালীন রাজনীতি

কূট তর্কান্বেষণে সীজরের প্রাণবধের সঙ্কল্প করিলেন। মন্ত্রণাকারীরা সদাসর্ব্বদাই তাঁহার নিকট আসিতেছে। তিনি নিজে চিন্তাকুল, সদাই বিমর্ষ, পোরসিয়া এসব লক্ষ্য করিতেছেন, কিন্তু কিছু বলিতেছেন না! একদিন গভীর নিশীথে ব্রুটস শয্যাগৃহ ত্যাগ করিয়া বাহিরের উদ্যানে আসিয়া উদ্বিগ্নমনে পাদসঞ্চারণ করিতেছেন। কতকগুলি মন্ত্রণাকারী সেই সময়ে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা ও কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া গেল, তথাপিও ব্রুটস গৃহে না ফিরিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া বাহিরে বেড়াইতে লাগিলেন। পোরসিয়া আর থাকিতে পারিলেন না—তিনি বাহিরে আসিয়া ব্রুটসের মানসিক উদ্বেগের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন ;—

Dear my lord, make me acquainted with your cause of grief.

কিন্তু ব্রুটস কোন কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। কেবলমাত্র বলিলেন যে, তাঁহার শরীর অসুস্থ আছে। পোরসিয়া ছাড়িবার লোক নহেন, তিনি ব্রুটসকে মৃদু মন্দ তিরস্কারে স্ত্রীর স্বামীর উপর কতদূর আধিপত্য আছে, তাহা দেখাইলেন ;—

"Within the bonds of marriage, tell me Brutus,
Is it excepted I should know no secrects,
That appertain to you? Am I yourself
But as it were, in sort or limitation,
To keep with you at meals, comfort your bed!
And talk to you sometimes?
Dwell I but in the suburbs
Of your good pleasure? If it be no more
Portia is Brutus' harlot not his wife."

স্ত্রীর স্বামীর মনোগত ভাব জানিবার স্বাভাবিক অধিকার। কেবল গৃহকর্ম্ম লইয়া দাসীবৃত্তি করিবার জন্য বিবাহিতা রমণী স্বামিগৃহে বাস করেন না। স্বামীর হৃদয়রাজ্যের পূর্ণ অধিকার তাঁহার থাকা চাই।

ব্রুটস এই কথা শুনিয়া হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন ;—

"You are my true and honourabble wife,
As dear to me as are the ruddy drops.
That visit my sad heart,"

মহান্ আবেগের মধ্যেও কেমন সুন্দররূপে ব্রুটসের হৃদয়ের কোমল ভাব প্রকাশ পাইল।

পুরুষ কর্ম্মক্ষেত্রের গোলমালে থাকায় অনেক সময়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইয়া যান, কিন্তু সাধ্বী স্ত্রী গন্তব্য পন্থায় সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখেন ও স্বামীর বিপথগামিতা দেখিবামাত্র বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন ও সেই চেষ্টায় ফলবতী হয়েন। স্বাধ্বী স্ত্রীর এই কর্ত্তব্যজ্ঞান এতই তীক্ষ্ণ যে, নিজের গভীর শোক দুঃখের মধ্যেও তিনি কখন জ্ঞানহারা হন না। ভারতের আর্য্যরমণীর ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। এই সদ্‌গুণ ছিল বলিয়া প্রাতঃকৃত্য করিবার কালে পঞ্চনারীর নামোচ্চারণের ব্যবস্থা আছে। কে না জানে,—

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারামন্দোদরী তথা,
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং।"

এই মন্ত্র প্রাতঃকালে উচ্চারণ করিতে হয়।

আমরা অদ্য পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীর মহত্বপরিচায়ক এক ঘটনা উল্লেখ করিয়া অদ্যকার প্রবন্ধ উপসংহার করিব। কুরুক্ষেত্র সমর ভীষণভাবে চলিতেছে। ছলে বলে ও কৌশলে শত্রু নিধন কৌরবের উদ্দেশ্য। মন্ত্রণা হইল,—'পাণ্ডবকে রজনীযোগে বধ করিতে হইবে।' অশ্বত্থামা সে ভার লইলেন, কিন্তু দৈবের নিয়ন্ত্রণে সে উদ্দেশ্য সফল না হইয়া পঞ্চপাণ্ডব-তনয়ের বধসাধন হইয়া গেল। দ্রৌপদী শোকে অধীরা হইলেন, নানা প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে পণ্ডবেরা সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সন্তান নাশে ম্রিয়মাণ না হইয়া বীরোচিত বাক্যে পুত্রহন্তার শাস্তিনির্দ্দেশ বাক্যে পাঞ্চালীকে সান্ত্বনাছলে বলিলেন ;—

তদা শুচস্তে প্রমৃজামি ভদ্রে
যদ্‌ব্রহ্মবন্ধোঃশির আততায়িনঃ।
গাণ্ডীবমুক্তৈর্বিশিখৈরুপাহরে
ত্বাক্রম্য যৎস্নাস্যসি দগ্ধপুত্রা ॥

বীরের বাক্যও যাহা, কার্য্যও তাহা ; অচিরে মহাবীর অর্জ্জুন রজ্জু

দ্বারা অশ্বত্থামাকে রণে আবদ্ধ করিয়া লইয়া পাঞ্চালী সমক্ষে আগমন করিলেন।

পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদী পুত্রহন্তা অশ্বত্থামাকে দেখিয়া ক্রোধের কথা দূরে থাকুক, নিজে আপনার শোক পর্য্যন্তও ক্ষণকালের নিমিত্ত বিস্মৃত হইলেন। তিনি প্রথমেই অশ্বত্থাকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন—

"তথাহৃতং পশুবৎ পাশবদ্ধম্
অবাঙ্মুখং কর্ম্মজুগুপ্সিতেন।
নিরীক্ষ্য কৃষ্ণাপকৃতং গুরোঃসুতং
বামস্বভাবা কৃপয়া ননাম চ ॥"

অতঃপর হৃদয়ের আবেগের ভরে গুরুপুত্রের বন্ধনরজ্জু তৎক্ষণাৎ মোচন করিতে বলিয়া অর্জ্জুনকে বুঝাইলেন যে, যাঁহার পিতার নিকট হইতে তাঁহারা অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছেন, সেই গুরুর পুত্র অশ্বত্থামা শত অপরাধী হইলেও তাঁহার নিগ্রহ তাঁহাদিগের হস্তে শোভা পায় না।

"উবাচ চাসহন্ত্যস্য বন্ধনানয়নং সতী।
মুচ্যতাং মুচ্যতামেষ ব্রাহ্মণোনিতরাংগুরুঃ
সরহস্যোধনুর্বেদঃ সবিসর্গোপসংযমঃ।
অস্ত্রগ্রামশ্চ ভবতা শিক্ষিতোযদনুগ্রহাৎ।
সএব ভগবান্ দ্রোণঃ প্রজারূপেণ বর্ত্ততে ॥

জ্ঞানমার্গের এই সকল যুক্তি দেখিয়া অবশেষে স্ত্রীহৃদয়ের কোমলতা দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন ;—

"মারোদীদস্য জননী গৌতমী পতিদেবতা
যথাহং মৃতবৎসার্ত্তা রোদিম্যশ্রুমুখীমুহুঃ।

প্রভো! আমি যেমন মৃতবৎসা হইয়া পুত্রশোকে কাতর হইয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ রোদন করিতেছি, ইহার জননী পতিব্রতা আচার্য্য-পত্নী সাধ্বী কৃপী রোদন করেন, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে।

কোথায় গেল পুত্র শোক, কোথায় গেল জিঘাংসা প্রবৃত্তি, দ্রৌপদী সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। নিজের দুঃখ অপরকে না ভুগিতে হয়, এই তাঁহার ইচ্ছা বলবতী হইল। অশ্বত্থামা সামান্য দণ্ডে মুক্তি পাইলেন। জগতে নারীহৃদয়ের "জয় জয়কার" ঘোষিত হইল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার ঠাকুর।

একপদ করি।

দিনের পরেতে দিন রাতি পর রাতি
কালের গবাক্ষ দিয়া করে যাতায়াত,
সাদা কাল যেন দুটি বিহঙ্গের জাতি
অশরিরী সবে কিন্তু নেহারে সাক্ষাৎ!
আসে যায়; দিয়া কিম্বা ল'য়ে যায় কিবা
খবর কি রাখ কিছু ভ্যাবা গঙ্গারাম?
না, সুধু নিয়তিস্রোতে গাত্র ভাসাইয়া,
বুঁদ হয়ে লভ সুখ নিদ্রার আরাম?
চক্ষু মুদে থাকা নয়! ও দুটি বিহঙ্গ
করমের রজ্জু যাহা প'ড়ে চারিদিকে,—
নিত্য এক পাক তাহে বাঁধে তব অঙ্গ
হেরিয়া পতিত তোমা বাসনার পাঁকে!
বুঝেছ কি গোবর্দ্ধন! একপদ করি,—
আগাইছ সুধু ঘোর অন্ধকার পুরি।

শ্রীরামচন্দ্র সেন।

গীত।

রাগিণী ইমন্—তাল একতালা।

ভজ তারে মন, করিয়ে যতন,
সৃজন পালন-লয়কারিণী।
ভজিলে তাহারে দুখ যাবে দূরে,
কর্‌বেন তোমায় কৃপা ত্রিতাপনাশিনী॥
নানারূপে তারা ব্যাপ্ত জগৎময়,
অতুল রূপিনীর তুলনা না হয়,
কখন পুরুষ কখন কামিনী, ব্রহ্মময়ী শ্যামা ব্রহ্ম সনাতনী॥
কভু শ্যামরূপে ভুলান গোপিনী,
কভু শ্যামারূপে মহেশ-মোহিনী;

কখন সাবিত্রী বেদপ্রসবিনী,
কভু কালীরূপা করালবদনী;—
কভু রামরূপ ধনু ল'য়ে করে,
কভু বুদ্ধরূপে অহিংসা প্রচারে;
কখন দ্বিভুজা কভু চতুর্ভুজা,
কভু দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী॥
কভু হংসাসনে হইয়া কুমারী,
কখন যুবতী গরুড় উপরি;
কভু বৃষাসনে বৃদ্ধরূপ ধরি,
কভু নিরাকারা প্রণবরূপিণী;—
কখন শ্মশানে কভু সিংহাসনে
কভু পতিদেহ দলিছে চরণে
কভু রাজরাণী কভু ভিখারিণী,
সূদন মানস কমলবাসিনী।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা।

অমৃত পুলিন।—শ্রীযুক্ত বাবু ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত (অমৃত পুলিন ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্যাস) আমাদের নিকট সমালোচনার্থ প্রেরিত হইয়াছে। দেখিলাম, পুস্তক ১৮৯৮ সালে মুদ্রিত হইয়াছিল। লেখক যদিও আমাদের নিকট অপরিচিত, কিন্তু "শৈলবালা" "কোহিনুর" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। লেখা দেখিয়া বেশ প্রতীতি হয় যে, লেখক নূতন নহেন। তাঁহার বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ক্ষমতা আছে। বর্ণনায়,—বিশেষতঃ নৈসর্গিক অবস্থার বর্ণনায় তিনি অনেক লেখক অপেক্ষা উচ্চ; এমন কি, স্থানে স্থানে কোন কোন লেখক অপেক্ষা নিম্ন স্থান পাইতে পারেন না। পুস্তক মোটের উপর মন্দ হয় নাই। কিন্তু আমরা তাঁহার ভাষা দুই এক স্থান উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"নীচে, অচলের চরণতলে, নীলসলিলা, তরঙ্গশীলা বেত্রাবতী প্রেমরঙ্গে, তরঙ্গভঙ্গে, প্রবাহিত হইতেছিল। বিশালকায়, তেজঃপুঞ্জ আরবালি, বীর-ধাত্রী রাজপুতানার বীরগৌরবের নিশ্চল প্রহরী, বীরদর্পে দাঁড়াইয়া,

জ্যোতির্ম্ময় রক্তিম মুকুটে উন্নত ললাট উজ্জ্বল করিয়া, সহস্ররশ্মির সহস্র বর্ণে বীরদেহ বিভাসিত করিয়া, তরঙ্গিণীর শীতল সলিলে চরণ প্রক্ষালন করিতেছিল। প্রেমমুগ্ধা, বীরপ্রণয়িনী তরঙ্গিণী সেই জ্যোতির্ম্ময়, সুন্দর কান্তি হৃদয়ে ধরিয়া, পুলকে অধীর হইয়া, মৃদু গীতি-নিনাদ সহকারে নৃত্য করিতেছিল। * * * *।”

“ইংরাজী ষোড়শ শতাব্দী হিন্দুর বীরগৌরব ক্রোড়ে লইয়া, কালতরঙ্গে, অতীতের অন্ধতামসে, বিলীন হইতেছে। যবনসৌভাগ্যের পূর্ণ অভ্যুদয়। আকবর শাহ ভারতের সিংহাসনে। রাজস্থানের পঙ্কজরবি রাণা প্রতাপ সিংহ অস্তমিত প্রায়! যবন সম্রাটের সঙ্গে, স্বজাতীয় কাপুরুষ দলের সঙ্গে, ভারতবর্ষের অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্টলিখনের সঙ্গে, সংগ্রাম করিয়া বীর প্রতাপ অবশেষে বাপ্পা রায়ের পবিত্র ভস্মে বিশ্রাম লাভ করিবার সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন। অন্ধকার অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া, যেন তপনদেব অস্তাচলের আশ্রয় লইয়া বিষাদে নয়ন মুদিত করিতেছেন! বীরবৃন্দের লীলানিকেতন রাজস্থান করাল কালদণ্ড প্রহারে নীরব, ম্রিয়মাণ! রাজপুত-শৌর্য্যের, ক্ষত্রিয়মহত্ত্বের রঙ্গভূমে যবনিকা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে! আরবলি গিরি আর ক্ষত্রিয়বীরের পদভরে কম্পিত হয় না! নিস্তব্ধ নিশীথে আর চম্বল-তরঙ্গে নিক্কোষিত অসির ঝন্‌ঝনা রব, বীরজননীর ললিত তান, প্রতিধ্বনিত হয় না! সেই অতুল স্ফূর্ত্তি, অসীম উৎসাহ আজ যবনের মোহমন্ত্রে সুষুপ্ত! * * * *

যুবতী জীবন।—শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

পুস্তকের নামের সহিত পুস্তকের আলোচ্য বিষয়গুলির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। গর্ভিনীর কর্ত্তব্য-পালন, আচার, সন্তান-সন্ততিগণের লালন-পালনের সুব্যবস্থা এবং কি কি উপায় অবলম্বন করিলে সন্তানের দেহ রোগমুক্ত, সবল সুস্থ বলিষ্ঠ হয়,—তাহা এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে সরল ভাষায় শাস্ত্রীয় প্রমাণে যথাযথ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।—গ্রন্থকার “পাক-প্রণালী” প্রণয়নে বঙ্গদেশের অন্তঃপুরবাসিনী গৃহলক্ষ্মীগণের যথেষ্ট ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন, স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে “যুবতী-জীবন” উৎকৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি; সামান্য লেখা পড়া জানা স্ত্রীলোকেরও বোধগম্য। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত।

ওঁ পূর্ণ পরমব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপায় নমঃ।

পরম কল্যাণ গীতা।

(যাহা সর্ব্বদুঃখমোচনকর্ত্রী ও পৃথিবীর ভার উদ্ধারকর্ত্রী)

মঙ্গলাচরণ।

সত্য শুদ্ধ চৈতন্যপূর্ণ পরমব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, যিনি নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্গুণ, নিরঞ্জন, অনীহ, অগাধ, অপার, নিষ্ক্রিয়, কূঠস্থ, নিরাধার, অব্যয়, সর্ব্বব্যাপী, অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বশব্দাতীত, অন্তর্যামী বিলক্ষণ, পরমগুরু, পরম আত্মা, জগৎ মাতাপিতা, সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলময়, যিনি আপন ইচ্ছায় নিরাকার হইতে সাকার ও সাকার হইতে নিরাকার বা কারণ হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, ত্রিগুণ আত্মা বিরাট জগৎ স্বরূপে বিস্তার হইয়া চরাচর, জীব, জন্তু, রাজা, প্রজা, স্ত্রী, পুরুষ, স্থাবর, জঙ্গম, প্রভৃতিরূপ সাজিয়াছেন, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ যাঁহার বিরাট রূপ, যাঁহা হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রূপ ভাসিয়া যাহাতে স্থিত রহিয়াছে এবং যাঁহাতে পুনর্ব্বার ইহা লয় পাইতেছে ও পাইয়া থাকে, যিনি বহুনামরূপ সাজিয়াও অনন্তকাল একই নামরূপে বিরাজমান আছেন, যাহাতে সকল প্রকার নাম উপাধি থাকা সত্বেও যিনি নাম উপাধি রহিত, যিনি সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় নির্ব্বিকার, নিশ্চল সচ্চিদানন্দ পূর্ণ জ্যোতিঃস্বরূপে একমাত্র বিরাজমান আছেন, যাঁহার সত্বা ব্যতিরেকে অন্য কোন সত্বা নাই; সেই পূর্ণ পরমব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ, মঙ্গলময় নারায়ণকে পূর্ণরূপে বারম্বার নমস্কার করি।

হে মনুষ্যগণ! আজ হইতে তোমরা মান, অপমান, জয়, পরাজয়, সামাজিক মিথ্যা, স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া সকল জীবসমূহকে আপনার আত্মা পরমাত্মা স্বরূপ বলিয়া চিনিতে চেষ্টা কর। পরস্পর মিলিত হইয়া সত্য স্বরূপ পরমাত্মার শরণাগত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা ও তাহার প্রিয়কার্য্য উত্তমরূপে বুঝিয়া পরস্পর জগতের হিতসাধন কর, এবং তাঁহার বিশালরাজ্যে

অবস্থিতি করিয়া তাঁহারই জয়ধ্বনি কর; তাহা হইলে তোমরা সকল প্রকার দুঃখ ও অমঙ্গল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পরমগুরু জগৎ মাতা পিতার অনুগ্রহে সর্ব্বদা পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারিবেক। আর আলস্য করিও না। আলস্য ত্যাগ করিয়া যত শীঘ্র পার, জগতের হিতার্থ সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হও। মঙ্গলময় নিজগুণে জগতের মঙ্গল বিধান করিবেন, তাঁহার জয়ধ্বনি করায় তাঁহার কোন লাভালাভ নাই, ইহাতে তোমাদেরই মঙ্গল, ও তাঁহার নাম স্মরণ করা হয়। বিচার পূর্ব্বক বুঝ, যদি আমি বা অপর কেহ তোমাদিগকে বলে যে, তোমাদের কর্ণ কাকে লইয়া গিয়াছে, সেই কথা শুনিয়া কর্ণে হস্ত না দিয়া, কাকের পিছনে দৌড়ান জ্ঞানবান্ জীবের উপযুক্ত নহে। যাহার বস্তু বোধ আছে, তাহার জ্ঞান আছে, যাহার বস্তু বোধ নাই, তাহার জ্ঞান নাই, যাহার জ্ঞান নাই, তাহার শান্তি নাই। বিচার পূর্ব্বক নিরাকার সাকার পরব্রহ্ম জোতিঃস্বরূপ গুরু মাতাপিতা আত্মার শরণাগত হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা উচিত।

শান্তি প্রার্থনা।

হে জগৎ মাতা, পিতা জ্যোতিঃস্বরূপ করুণানিধান, জগদীশ্বর জগৎ আত্মা! আপনার চির আশ্রিত পুত্র কন্যারূপ এই সকল রাজা, প্রজা, নর, নারী, বালক, বৃদ্ধ, চরাচর, জীব সমূহ যে নানা প্রকার দুঃখভোগ করিতেছে, ইহার কারণ কি? এবং কি করিলেই বা এই সকল বিষম সঙ্কট, ও দুঃখ নিবারণ হইবে? বেদশাস্ত্রে যে সকল সৎ অনুষ্ঠানের বিধান আছে, আপনার ঐ সকল আজ্ঞা প্রতিপালন না করিতেছে বলিয়াই কি এই সকল দুঃখভোগ? হে সঙ্কটমোচন! দয়াময়! যদ্যপি মনুষ্যগণ ঐ সকল অপরাধে কিংবা অন্য কোন প্রকার জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত অপরাধে অপরাধি হয় এবং আপনাতে উহাদিগের নিষ্ঠা নাও হয়, যদিও ইহারা মায়া প্রপঞ্চের সাজ সাজিয়া, আপন হিতাহিত বুঝিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলেও নিজগুণে আপনি কৃপা করিয়া উহাদিগের সকল অপরাধ ক্ষমা করুন এবং সর্ব্বসুখ ও পরমানন্দের পাত্র করিয়া লউন। হে দুঃখদমন! যদি আপনি ঔদাস্য করিয়া প্রেমার্দ্র হইয়া, কৃপাদৃষ্টি না করেন এবং

গুরু মাতা পিতারূপে করুণার্দ্র হইয়া পুত্র, কন্যা বোধে নিজগুণে যদি শান্তিবিধান না করেন ও ক্রোড়ে লইয়া আহার না দেন, তাহা হইলে আপনি ভিন্ন অগতির গতি আর কে আছে, যিনি এই সকল গতি হীন জীবের পরমানন্দ প্রাপ্তির সহায়তা করিবেন? কারণ আপনিই একমাত্র মঙ্গলময় নিরাকার, সাকার, পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান, জগৎ মাতা, পিতা, গুরু আত্মা, এই জন্য প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি ইহাদিগের সকল অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করিয়া, ঘোর অজ্ঞান অন্ধকার হইতে জ্ঞান জ্যোতিঃতে স্থিত করুন বা সত্য অভেদ জ্ঞান রূপ পরমানন্দ প্রদান করুন। উহা কেবল মাত্র আপনারই করুণা ও দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব হে নিরুপদ্রব, সচ্চিদানন্দ, শান্তিরস স্বরূপ, হে দীনবন্ধু দুঃখহারী, কল্যাণময়! এক্ষণে আপনি দয়ার্দ্র হইয়া সর্ব্বদুঃখের শান্তি ও সর্ব্বসুখের প্রাপ্তি বিধান করুন।

ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি!

ব্রহ্ম আভাষ।

যিনি একমাত্র সতঃপ্রকাশ শুদ্ধ চৈতন্য এবং যিনি জগতের আদি কারণ, আপন ইচ্ছায় কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল জগৎরূপে বিস্তার আছেন, যিনি আপন ইচ্ছায় স্থূল সূক্ষ্ম নানা নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া আপনাতে সঙ্কোচ করিয়া পুনরায় কারণরূপে বা অব্যক্তস্বরূপে স্থিত থাকেন এবং যিনি পৃথক পৃথক নামরূপ গুণ ক্রিয়া ভাবে বিস্তার হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র যিনি সর্ব্বকাল ও অবস্থাতে স্বরূপত যাহা তাহাই থাকেন, যাঁহাকে শাস্ত্রে বিরাট ব্রহ্ম ওঁকার নাম কল্পনায় সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞাননেত্র, চন্দ্রমা মন, আকাশ হৃদয় ও মস্তক, বায়ু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী, এবং পৃথিবী যাহার চরণ বলা যায়, যিনি আপন ইচ্ছায় বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশিত থাকিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, পালন ও লয় করিতেছেন, যিনি নিরাকার নির্গুণ ও সাকার সগুণ অখণ্ডাকারে পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন, ভগবান ইহার নাম পূর্ণপরব্রহ্ম বা ইহা হইতে জীবসমূহ উৎপত্তি, পালন, স্থিতি, মঙ্গলামঙ্গল প্রাপ্ত হইতেছে।

মঙ্গলকারী বিরাটব্রহ্ম বা ভগবান।

মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আছে যে, সহস্রশীর্ষং পুরুষং ও চন্দ্রমা মনসো জায়তে, সূর্য্যশ্চক্ষুজায়তে ইত্যাদি। অর্থাৎ ওঁকার বিরাট ব্রহ্মের অসংখ্য মস্তক অর্থাৎ জ্ঞাননেত্র, সূর্য্য নারায়ণ,—চন্দ্রমা মন, আকাশ মস্তক, বায়ু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ। এই মঙ্গলকারী বিরাটব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে শিবের অষ্ট-মূর্ত্তি বলে, ক্ষিতি মূর্ত্তায় নমঃ, জল মূর্ত্তায় নমঃ, অগ্নি মূর্ত্তায় নমঃ ইত্যাদি। অর্থৎ পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ, চন্দ্রমা তারাগণ সূর্য্য নারায়ণ—এই অষ্টমূর্ত্তিতে শিব প্রত্যক্ষ বিরাজমান, এই অষ্টমূর্ত্তিকে অষ্টম প্রকৃতি বলে, অষ্টবিভূতি বলে, অষ্টম সিদ্ধি বলে, ইহাকে অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা বলে, ইহাকে গ্রহরূপী জনার্দ্দন অর্থাৎ বিষ্ণু ভগবান্ বলে, ইহাকে অহংভাব বা ভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগ ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রে সপ্তবর্ত্ত বলিয়া বিভাগ করিয়াছেন। যথা,—সপ্ত ধাতু, সপ্ত দ্রব্য, সপ্তবস্তু, সপ্তঋষি। ব্যাকরণে সপ্তমী বিভক্তি, ব্রহ্ম গায়ত্রীতে সপ্তম ব্যহৃতি যথা,—ওঁ ভূ—ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ, ওঁ জন, ওঁ তপ, ওঁ সত্যং,—অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্য নারায়ণ, এই একাক্ষর ওঁকার প্রণব পরব্রহ্ম হইতে সপ্তভাগে বিভক্ত হইয়া, চরাচর স্ত্রীপুরুষ জীব সমূহের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠন বা উৎপন্ন বোধ হইতেছে। এই মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট—পরব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্তিকে শাস্ত্রে দেবতা দেবী বলে, যথা পৃথিবী দেবতা, জল দেবতা, অগ্নি দেবতা, বায়ু দেবতা, আকাশ দেবতা, চন্দ্রমা দেবতা ও সূর্য্য নারায়ণ দেবতা, ইত্যাদি। ইহা ছাড়া কোন দেবতা দেবী হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। তবে পুরাণ শাস্ত্রেতে ত্রিশকোটি দেবতার কেন নাম কল্পনা করিয়াছেন? ইহার সার অর্থ এই যে, এই মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট পরব্রহ্ম নিরাকার সাকার—পূর্ণরূপে বিরাজমান, ইহারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্তি বা দেবতা দেবী হইতে জীব সমূহের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়াদির গঠন হইয়াছে। এজীব সমূহ ইন্দ্রিয়াদিকে তেত্রিশকোটী—অর্থাৎ অসংখ্য দেবতা শাস্ত্রে বলে। এক এক ইন্দ্রিয়ের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। এক এক দেবতা দ্বারায় তোমাদের ভিতরে বাহিরে এক এক প্রকারে সমস্ত ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য সমাধা হইতেছে ও

হইবে। যথা,—কর্ণের দেবতা দৃক্‌পাল, অর্থাৎ আকাশ ইত্যাদি মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্তি বা দেবতা দেবী হইতে যে তোমাদের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠন হইয়াছে ও যাহার দ্বারায় যে কার্য্য হইতেছে, তাহা বিচার পূর্ব্বক প্রত্যক্ষ দেখ। যথা—পৃথিবী দেবতা হইতে অন্নাদি উৎপন্ন হইতেছে, জীব সমূহ প্রতিপালন হইতেছে ও তদ্দ্বারা জীবসমূহে অস্থি মাংস হইতেছে, যদি পৃথিবী দেবতা না থাকিতেন, তাহা হইলে জীব-সমূহের স্থূল শরীরই হইত না, অসম্ভব ও অন্নাদি অভাবে জীবসমূহ মৃত্যু-মুখে পতিত হইত ও জল দেবতা দ্বারা বৃষ্টি হইয়া অন্নাদি উৎপন্ন হইতেছে, এই জল জীব স্নান ও পান করিতেছেন, তাহা দ্বারা রক্ত ও বল ও নাড়ী হইতেছে। জল দেবতা না থাকিলে, অন্ন তৃণাদি সকলই শুষ্ক হইয়া যাইবে, জন্মিবে না এবং জীবসমূহে সময়ে জল না পাইয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। অগ্নি দেবতা অন্তরে জীব সমূহের ক্ষুধা পিপাসা আহার অন্ন পরিপাক ও বাক্য বলা ও সেই অগ্নি দ্বারা বাহিরে আলোক, রন্ধন, রেল, জাহাজ, তোপ বন্দুক প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য সমাধা হইতেছে, শরীরের মধ্যে অন্তরের অগ্নি মন্দ হইলে ডাক্তার কবিরাজগণ বলেন, তোমার অগ্নি মন্দ হইয়াছে, এই জন্য অন্ন পরিপাক হইতেছে না, আমি তেজস্কর পদার্থ দিতেছি, তাহা দ্বারা অগ্নি বৃদ্ধি হইবে, ও যখন হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠাণ্ডা হইতে থাকে, তখন ডাক্তার কবিরাজগণ বলেন, অগ্নি দ্বারা স্বেদ কর, যদি বাঁচিতে পার। একেবারে অগ্নি শরীর মধ্যে নির্ব্বাণ হইলে জীবের মৃত্যু হয়, প্রাণ বায়ু দেবতা যতক্ষণ থাকেন, ততক্ষণ জীবচেতন জীবিত থাকেন ও স্থূল শরীরও নষ্ট হয় না, বা পচে না। যেরূপ সরিষা তৈলে আচার থাকিলে পচে না, স্বীয় লীন ও প্রাণ বায়ু দেবতা শরীর হইতে বাহির হইলে মৃত্যু হয়—এবং স্থূল শরীর অল্পকালের মধ্যে পচিয়া ফুলিয়া উঠে। দক্ষিণ প্রাণ সূর্য্য নারায়ণ—ও বাম প্রাণ চন্দ্রমা জ্যোতিঃ। আকাশ দেবতা জীবসমূহের কর্ণদ্বারে শব্দ গ্রহণ করিতেছেন, শব্দগুণ আকাশ দেবতার কর্ণদ্বারে শব্দ-গুণ না থাকিলে, জীবসমূহ বধির হইত, ও কোন বিষয়ের শব্দজ্ঞান হইত না; ও মন চন্দ্রমা জ্যোতি দেবতা জীবসমূহের মন দ্বারা জীব বোধ করিতেছেন যে, ইহা আমার—উহা অপরের, এই সঙ্কল্প বিকল্প বা ভেদাভেদ দিবারাত্র প্রকাশ পাইতেছে। মন কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হইলে কোন ভাবই বুঝা যায় না, তুমিও তোমার মনে যখন জ্ঞানাতীত সুষুপ্তি

অবস্থায় থাক, তখন তোমার ইহা জ্ঞান থাকে না যে, অমুক সময়ে শুইয়াছি ও অমুক সময়ে জাগিব, এমন সৃষ্টি কখন দেখিয়াছি কি না ও আমি ও বা আমার মঙ্গলকারী ইষ্ট দেবতা আছেন বা নয়, কোন জ্ঞানই থাকে না, জ্ঞান বা মন কারণে লয় থাকেন, জ্ঞানের কার্য্য হয় না, যখন আপনি বা আপনার মন প্রকাশ বা জাগ্রত অবস্থা হন, তখন মনদ্বারা জ্ঞান হয় যে, আমি আছি ও আমার মঙ্গলকারী ইষ্ট দেবতা আছেন ইত্যাদি বোধ বা জ্ঞান হয়—ও সূর্য্য নারায়ণ দেবতা বা ওঁকার পুরুষমণ্ডলে সহস্রদলে বিন্দু চেতনরূপে বিরাজ করিয়া জীবসমূহ রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিতেছেন ও সত্য অসত্যের বিচার করিতেছেন ও জীব জ্যোতি ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতি এক অভেদ হইয়া নিরাকার কারণে স্থিত হইলে সুষুপ্তি জ্ঞানাতীত অবস্থা হয়। পুনশ্চ মস্তকে জ্যোতি প্রবল হইলে জীবসমূহ চেতন হইয়া রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন। এই কারণে সর্ব্ব দেব দেবী বা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপের ধ্যান ধারণা উপাসনা নমস্কার প্রণাম কেবল সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিতে বা জ্যোতির ধারণ করিবার বিধি আছে। প্রাতে ব্রহ্মারূপ, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপ, সায়ংকালে শিবরূপ। ও প্রাতে কালী-রূপ, মধ্যাহ্নে দুর্গারূপ, সায়ংকালে সরস্বতী রূপ, প্রাতে ঋক বেদমাতা, মধ্যাহ্নে যজুর্ব্বেদ মাতা, সায়ংকালে সাম বেদমাতা, চতুর্ব্বেদ মাতা—জীব সমূহের মস্তকে বিরাজ করিয়া জ্ঞান দ্বারা সমস্ত কার্য্য সমাধা করিতেছেন ও করাইতেছেন, জিহ্বা দ্বারে আস্বাদনরূপ বেদমাতা, নাসিকা দ্বারে যজুর্ব্বেদ মাতা প্রাণ বায়ু নেত্র দ্বারে সাম বেদমাতা, জ্যোতিস্বরূপ সূর্য্য নারায়ণ—অথবা বেদমাতা কর্ণদ্বারের আকাশরূপ চন্দ্রমা জ্যোতির। এই মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট পরব্রহ্ম চারি বেদমাতা জীবসমূহের মস্তকে বিরাজ করিয়া সমস্ত কার্য্য জ্ঞানরূপে সমাধা করিতেছেন, ইহাকে কেহ চিনিতে পারে না; ইনি নিজে দয়া করিয়া যাহাকে চিনিতে দেন, সেই ইহাঁকে বা আপনাকে চিনিতে পারেন, অর্থাৎ জীব যখন আপনাকে স্বয়ং কারণরূপ পরব্রহ্ম জানিবে, তখন স্বয়ং পরব্রহ্মরূপ ভিতরে ও বাহিরে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট পুরুষ পরব্রহ্মকে চিনিবে, এই মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ইনি জীব সমূহের গুরু মাতা পিতা আত্মা হইয়া জীবসমূহের উৎপত্তি, পালন, সংহার বা স্থিতি করেন। ইনি অনাদিকাল হইতে স্বতঃপ্রাণ

নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান—ইহা ব্যতীত জীবের মঙ্গলকারী দ্বিতীয় কেহ হয় নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই, ইহা সত্য ধ্রুব সত্য জানিবেন।

ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!!

এই কারণে হিন্দুশাস্ত্র বা সন্ধ্যা আহ্নিকে সমস্ত দেবদেবী ব্রহ্ম পরব্রহ্ম ইত্যাদি তেজোময় জ্যোতিস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণের ধারণা উপাসনা নমস্কার প্রণাম করিবার বিধি আছে। ইহা পণ্ডিত মাত্রেই জানেন, সদা সবিতৃ-মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তি নারায়ণ ইত্যাদি এখানে সারভাব এইরূপে গ্রহণ করিতে হয়। যদি পুত্র কন্যা আপনার মাতা পিতার ক্ষুদ্র নেত্রের সম্মুখে প্রেম ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার বা প্রণাম করে, তাহা হইলে মাতা পিতার স্থূল সূক্ষ্ম সমষ্টি শরীরকে নমস্কার করা হয় না, কেবল নেত্র মাত্র নমস্কার করা হয়, অথবা যখন মাতা পিতা প্রসন্ন হন, তখন কেবল যৎকিঞ্চিৎ নেত্রমাত্র প্রসন্ন হন, বা স্থূল সূক্ষ্ম সমষ্টিকারীর লইয়া প্রসন্ন হইয়া পুত্র কন্যার মঙ্গল চেষ্টাই করেন। কেবল নেত্রমাত্র নহে, স্থূল সূক্ষ্ম সমষ্টি শরীর লইয়া প্রসন্ন হইয়া পুত্র কন্যার মঙ্গল চেষ্টা করেন।

এইখানে গম্ভীর ও শান্তিচিত্তে বিচারপূর্ব্বক বুঝিবার প্রয়োজন আছে, মাতা পিতার স্থূল সূক্ষ্ম শরীর লইয়া বৃহৎ ও নেত্র লইয়া ক্ষুদ্র বোধ হয়, মাতা পিতা ঘরের মধ্যে আছেন, চতুর্দ্দিক বন্ধ আছে—পুত্র কন্যা গৃহের বাহির হইতে মাতা পিতার সমষ্টি শরীর দেখিতে পাইতেছে না, কেবল গবাক্ষ দিয়া নেত্রমাত্র দেখিতে পাইতেছেন—যদি পুত্র কন্যা মাতা পিতাকে নমস্কার প্রণাম বা মান্য বা অমান্য করে, তাহা হইলে মাতা পিতা প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হইবেন, কিন্তু কেবল নেত্রমাত্র প্রসন্ন, অপ্রসন্ন হইবেন বা স্থূল সূক্ষ্ম সমষ্টি শরীর লইয়া প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হইয়া পুত্র কন্যার মঙ্গলা-মঙ্গল ব্যবস্থা করিবেন না—সমষ্টি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া প্রসন্ন হইবেন। আর মাতা পিতার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ভিন্ন ভিন্ন নাম রাখিয়া নমস্কার করিতে হইবে না, যে হস্ত মাতা পিতাকে নমস্কার পদে মাতা পিতাকে নমস্কার ইত্যাদি। কারণ মাতা পিতার কত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, তাহার সীমা নাই, প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নাম রাখিয়া নমস্কার করিতে গেলে কত সময় ব্যর্থ যায়। সহজে মাতা পিতার নেত্রের সম্মুখে ভক্তি-পূর্ব্বক নমস্কার করিলে স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত শরীরকে নমস্কার করা হয়।

মাতা পিতা কে হন, ও পুত্র কন্যা কে হয়, পুত্র কন্যা স্ত্রীপুরুষ জীবসমূহ আর মাতাপিতারূপী নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ বিরাট ভগবান ইহার জ্ঞাননেত্র সুন্দ্রনারায়ণ চন্দ্রমা জ্যোতি মন ইত্যাদি—এই মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট ভগবান নেত্ররূপী জ্যোতিস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ উদয় অস্তে ভক্তিপূর্ব্বক স্ত্রীপুরুষ মাত্রেই নমস্কার প্রণাম উপাসনা করা উচিত, ইনি নিরাকার সাকার দেবদেবী চরাচর স্ত্রীপুরুষকে লইয়া পূর্ণরূপে বিরাজমান ও পূর্ণরূপে প্রসন্ন হইয়া জীবের সকল প্রকার অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গলবিধান করিবেন, ও ইহার কি উদ্দেশ্য ও প্রিয়কার্য্য বুঝিয়া ইহার শরণাগত হইয়া অন্ন ভিক্ষাপূর্ব্বক প্রিয়কার্য্য মনুষ্যমাত্রেরই সাধন করা উচিত।

বিনশ্বর, অবিনশ্বর অনুলোম, বিলোম জীব ও ঈশ্বররূপ বিষয়।

অনেক অজ্ঞানাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ বিনশ্বর, অবিনশ্বর, অনুলোম, বিলোম প্রভৃতির ভাব অবগত না হইয়া, জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃকে ও দৃশ্যমান পদার্থকে নশ্বর পদার্থ বোধ করিয়া থাকে; যদ্যপি দৃশ্যমান পদার্থ নশ্বর হন, তাহা হইলে অবতার, ঋষি মুনি, মহম্মদ, পেগম্বর, পীর, যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধদেব ইত্যাদি এবং জীব সকলেই নশ্বর। কারণ ইহারা সাকার হইয়া কার্য্য করিতেছেন এবং জীবগণ করিতেছে ও করিবেক। নিরাকার নির্গুণ, ব্রহ্মভাবে কোন কার্য্য হয় না। সৃষ্টি, পালন, লয় এবং বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণাদি পাঠ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি অনুভব করা প্রভৃতি সকল কার্য্যই সাকার ব্রহ্মার দ্বারায় হইয়া থাকে। কারণ গুণশক্তি বিশিষ্টের দ্বারা গুণশক্তির ব্যবহার বা অনুভব আদি ও উৎপত্তি, পোষণ লয় হইয়া থাকে। যদি সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম বিনাশশীল হন, তাহা হইলে তোমরা সকলেই বিনাশশীল, কারণ তোমরাও সাকাররূপে কার্য্য করিতেছ। অতএব এই সকল বিষয়ের সার ভাব বিচার পূর্ব্বক বুঝিতে চেষ্টা কর। স্বরূপ পক্ষে কেহ বিনাশশীল নহেন, কেবল ইচ্ছাময় আপন ইচ্ছানুসারে নিরাকার হইতে সাকার এবং সাকার হইতে নিরাকার প্রভৃতি রূপান্তর হন। (ক্রমশঃ)

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।)

১১শ বর্ষ। } ভাদ্র, ১৩০৯ সাল। { ২য় সংখ্যা।

রাজ্যাভিষেকে সস্ত্রীক যুবরাজ।

নান্দী।

স্বস্তিঃ শ্রীশ্রীনারায়ণ, সর্ব্ব শুভঙ্কর!
স্বস্তিঃ শ্রীত্রিশূলপাণি, ভব ভবেশ্বর!
স্বস্তিঃ শ্রীভুবনেশ্বরী, দুর্গা দুখহরা,
স্বস্তিঃ শ্রীকরালী কালী, বরাভয়করা!
স্বস্তিঃ শ্রীহেরম্বচন্দ্র, দেবগণপতি!
স্বস্তিঃ শ্রীশ্রীবাগীশ্বরী, দেবী সরস্বতী!
স্বস্তিঃ সর্ব্ব দেবদেবী, বিশ্বপ্রজাপতি!
সবাকার, পাদপদ্মে সহস্র প্রণতি॥

নেহার পাঠকবৃন্দ! চিত্রপটে আঁকা—
দুটী রূপ; রাজকুলে, নব শশী রাকা।
যুবরাজ, নবরাজ—দ্বিতীয় কুমার,
ফ্রেডারিক্ আল্‌বার্ট অভিধান যাঁর,
কর্ণবাল্, ইয়র্কের ডিউক খেতাবে,
ভূষিত কুমাররত্ন, মর্য্যাদা প্রভাবে।
ঊনবিংশ শতাব্দের পঞ্চষষ্টি সনে,
জুন মাসে, শুভদিনে, তৃতীয় গণনে,
আবির্ভূত ধরাধামে, ভাগ্যফল সেই,
বিলাতের, ভারতের, ভাবী রাজা এই॥

দক্ষিণেতে বিরাজিতা, চিত্র চিত্তহারী,
কুমারের পরিণীতা শ্রীমতী কুমারী—
ভিক্টোরিয়া টেক্ সেই, আখ্যাবিলাসিনী,
ভবিষ্যতে ভারতের মহারাণী ইনি ॥
কৃপা কর মহেশ্বর, প্রার্থনা আমার।
দীর্ঘজীবী হয়ে রোন্, কুমারীকুমার ॥
রাখুন বংশের মান, রাজ্যসুখভোগে।
থাকুন কুশলে সদা, বংশাবলী যোগে ॥
আমরাও প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করি,
সফল করুন বাঞ্ছা, বাঞ্ছাময় হরি ॥

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মানবকৃষ্ণ।

কোন দয়ালু ধনকুবেরের অনেকগুলি কৃতদাস ছিল; তন্মধ্যে মানবকৃষ্ণ নামক একজনের প্রতি বিশেষ প্রীত হইয়া তিনি তাহাকে স্বাধীনতা প্রদান পূর্ব্বক নানাবিধ মূল্যবান পণ্যদ্রব্যপূর্ণ একখানি অর্ণবযান সমর্পণ করতঃ বলিলেন, "বৎস! এই পোতবাহনে দূরদেশে বাণিজ্যার্থ গমন কর। এ সমস্ত তোমার সম্পত্তি জানিবে।" দাসত্ব বিমুক্ত মানবকৃষ্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে এরূপ বৈভবের অধিকারী হইয়া অতীব হৃষ্টচিত্তে সমুদ্রযাত্রা করিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ কয়েকদিন পরে ভয়ঙ্কর তুফান উঠিয়া মালবোঝাই জাহাজ নাবিকাদি সহ সাগরগর্ভে সমাহিত হইল। মানবকৃষ্ণ একাকী কোন প্রকারে জীবন রক্ষা করিয়া ক্ষুধিত ক্লান্ত উলঙ্গাবস্থায় এক দ্বীপে উপনীত হইলেন। তীরে বসিয়া নিজ দুর্দ্দশার চিন্তায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নানা-প্রকার বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, দূরস্থ নগর হইতে সমারোহের সহিত বিস্তর লোক তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এতদ্দর্শনে চমকিত হইয়া কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে দাঁড়াইয়া শুনিলেন, তাহারা সমস্বরে তাঁহাকে নৃপতি বলিয়া সম্বোধন করতঃ বহু সম্মানসূচক সুমিষ্ট সংগীত দ্বারা অভিবাদন ও অভ্যর্থনা করিতেছে। ক্রমে নিকটস্থ হইলে সকলে মিলিয়া

তুষ্ট আগন্তুক মানবকৃষ্ণকে একখানি উৎকৃষ্ট রথে বসাইয়া সুন্দর রাজোচিত বসন-ভূষণে সজ্জিত করিল। রাজধানীর তোরণে পঁহুছিলে প্রধান মন্ত্রী-প্রমুখ নাগরিকগণ যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর সমুচিত সম্ভাষণান্তে নবীন নরপতিকে রাজপ্রাসাদে লইয়া গিয়া সিংহাসনোপরি স্থাপন করতঃ মণিমুক্তা-খচিত মুকুট দ্বারা ভূষিত করিলেন। পরে যথাসময়ে অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হইলে মানবকৃষ্ণ বিধিব্যবস্থানুসারে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। পরন্তু তাঁহার মনে সময়ে সময়ে এরূপ সংশয় উপস্থিত হইতেছিল যেন, সমগ্র ব্যাপার স্বপ্ন ভিন্ন প্রকৃত নহে, তিনি ভয়ানক যাদুময় স্থানে দৈব কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া এরূপ ভেল্কি দেখিতেছেন মাত্র। এ প্রকার চিন্তায় সপ্তাহকাল অতিবাহিত হইলে সন্দেহের ভাবটা ক্রমে তিরোহিত হইল। বুঝিলেন, যাদু ভেল্কি কিছুই নয়, সত্য সত্যই তিনি একজন সম্পূর্ণ অজ্ঞাতকুলশীল বিপন্ন ব্যক্তি হইলেও রাজ্যের অধিকারী হইয়াছেন। তখন জনৈক অমাত্যকে একদিন গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বাস্তবিক আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি। এই রহস্য আমি কিছুতেই ভেদ করিতে না পারায় গুঢ় কথা জানিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। অতএব আমাকে বুঝাইয়া দাও, কেন তোমরা আমার ন্যায় একজন অপরিচিত পরদেশীকে রাজা করিলে, এবং আমি যে তোমাদের দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, ইহাই বা তোমরা পূর্ব্বে কি প্রকারে জানিলে?"

রাজার প্রশ্নের উত্তরে অমাত্য সমস্ত যথাযথ বর্ণনা করিতে লাগিলেন।—"এই দ্বীপস্থ ব্যক্তি সমূহকে নরদেহধারী দেখিতেছেন, কিন্তু আমরা বাস্তবিক আপনাদের ন্যায় মনুষ্যজাতিভুক্ত নহি, আমরা কিন্নরশ্রেণীর জীব, শাপভ্রষ্ট হইয়া এই দ্বীপে নিক্ষিপ্ত। আমাদের প্রতি ব্যবস্থা এই যে, আমরা একজন মানুষ কর্ত্তৃক শাসিত হইব। আপনি যেরূপে আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, প্রতি বৎসর এই সময়ে ঐ প্রকারে এক ব্যক্তি নরলোক হইতে প্রেরিত হন। পূর্ণ একবৎসর কাল আমরা তাঁহার অধীনে থাকিয়া নির্ব্বিশেষে তাঁহার সমস্ত আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি, পরে দ্বাদশমাসান্তে তাঁহাকে নগ্নাবস্থায় এক নৌকাযোগে সমুদ্রস্থ এক সুদূর মরুদ্বীপে ফেলিয়া আসি।"

নৃপতি।—সকল রাজাকে কি একই দ্বীপে প্রেরণ করা হয়, না প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্থানে নিক্ষিপ্ত হন?

অমাত্য।—যিনি যে প্রকারে সম্বৎসরকাল অতিবাহিত করেন, তিনি তদনুরূপ অবস্থাবিশিষ্ট দ্বীপে স্থান প্রাপ্ত হইয়া কালাতিপাত করিয়া থাকেন।

নৃপতি।—আমার পূর্ব্ববর্ত্তী নরপালগণকে কি তোমরা এ সকল বৃত্তান্ত জানাইয়া সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে উপদেশ দাও নাই?

অমাত্য।—মহারাজ! তাঁহারা সকলেই জানিতেন যে, সম্বৎসরান্তে, বাধ্য হইয়া রাজত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক জন্মের মত নির্ব্বাসিত হইতে হইবে; কিন্তু কেহই আপনার ন্যায় সবিশেষ অনুসন্ধান করেন নাই। তাঁহারা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া বাতুলের ন্যায় এক আমোদ হইতে অপর আমোদে গতায়াত করিতে করিতে দিন কাটাইয়া গিয়াছেন, সুতরাং সকলেরই প্রায় সমান দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। আমি চিরকাল এই কার্য্য করিতেছি, কাহাকেও সতর্ক করিতে ত্রুটি করি নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেহই আমার কথায় কাণ দেন নাই। সুমধুর কিন্নরসংগীতে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করতঃ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাসেই সমস্ত সময় ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। শেষদিনে সকলকেই হাত-পা আছড়াইয়া বিলাপ রোদন করিতে শুনিয়াছি, কিন্তু দিন থাকিতে কেহ সুব্যবস্থা করিতে যত্ন পান নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, যেন কোন মাদক দ্রব্যের বশীভূত হইয়া আচ্ছন্ন অবস্থায় তাঁহারা দ্বাদশ মাস অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

নৃপতি।—এ সকল শুনিয়া আমি বড়ই ব্যাকুল হইয়াছি। কিরূপ ব্যবস্থা করিলে উক্ত প্রকারের দুঃখ বিপদ এড়াইতে পারি, তাহার পরামর্শ দাও; ঠিক তদনুযায়ী কার্য্য করিতে ত্রুটি করিব না।

অমাত্য।—এবম্বিধ নির্ব্বাসনের ক্লেশ নিবারণের একমাত্র উপায় বিদ্যমান। যে নির্দ্দিষ্ট জনশূন্য দ্বীপে আপনাকে এই বৎসরান্তে যাইতে হইবে, এখন হইতে তাহাকে উর্ব্বরা ও জনাকীর্ণ করিতে চেষ্টা করুন। আপনি জানেন যে, রাজত্বকাল মধ্যে আপনার সকল প্রকার আজ্ঞা আমরা বিনা আপত্তিতে পালন করিব। একবৎসর কালের জন্য আপনি আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা, যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কোন বিষয়ে কেহ আপনাকে কোন প্রকারে বাধা দিতে পারে না। অতএব বৃথা বিলাসব্যসনাদি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারে চিত্তনিবেশ না করিয়া রাজ্যের সমস্ত প্রজা ও ধন-সম্পত্তি আপনার সম্পূর্ণ অধীনে থাকিতে থাকিতে রাজাজ্ঞা প্রচার দ্বারা উক্ত দ্বীপে লোকজন পাঠাইয়া তাহা সম্যকরূপে সুখের আগার করিয়া লউন।

সুন্দর সুসজ্জিত উপনিবেশ স্থাপিত হইলে যথাকালে আপনি তথায় উপনীত হইয়া কৃতজ্ঞ প্রজাগণ পরিবেষ্টিত হইয়া আনন্দে তথায় দিন যাপন করিতে পারিবেন।

মানবকৃষ্ণ কালব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রচার করিলেন এবং তদনুসারে বিস্তর নরনারী, বিপুল ধন ও প্রচুর খাদ্যসামগ্রী নির্দ্দিষ্ট দ্বীপে প্রেরিত হইল। ছয় মাসের মধ্যে তথায় ফল-পুষ্প-শস্যশোভিত অনেক গ্রাম এবং সুরম্য হর্ম্ম্যবর্ত্মাদি সজ্জিত বহু নগর স্থাপিত হইল।

যথাকালে মানবকৃষ্ণ নির্ব্বাসিত হইলে নূতন রাজ্যের প্রজাবৃন্দ সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করতঃ চিরকালের জন্য সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।

এই গল্পটী আমাদের প্রত্যেকের জীবনে খাটে কি না, পাঠক মিলাইয়া দেখুন। প্রায় মানবমাত্রেই জানিয়া শুনিয়া সংক্ষিপ্ত আয়ুঃকাল বৃথা আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া অবশেষে শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনে, হায় হায় করিতে করিতে বিদায়গ্রহণ করতঃ পরলোকে গিয়া বিপন্নাবস্থায় পতিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে মানবকৃষ্ণ বিরাজমান থাকিয়া সুমতি প্রদান করেন, সেই মানবকৃষ্ণ ক্ষণভঙ্গুর জীবনের ক্ষণস্থায়ী সুখের প্রতি মনোযোগ না দিয়া পারলৌকিক কল্যাণ-চিন্তায় নিযুক্ত থাকিয়া সংসার হইতে প্রয়াণকালে প্রফুল্লচিত্তে বিদায়গ্রহণ করত মৃত্যুর পরপারে চিরস্থায়ী সুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হন।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

দেশের অবস্থা।

(এখানে সবই আছে)

ব্যাঙ্গ গীতি।

এখানে, ভণ্ড আছে, ষণ্ড আছে, আছে পাষণ্ডের দল।
এখানে, রাজা আছে, প্রজা আছে, যেন গঙ্গার জল॥
এখানে, পুরুষ আছে, পরুষ আছে, আছে করুণ গান।
আছে নারী, ফুলের ঝারী, মল ঝম ঝম॥

আছে, দ্যাখন হাসি, দাঁতে মিসি, চুলে চাঁপাফুল।
পরে ধরে, পিরিত করে, মজালে দুকূল ॥
ছেড়ে, স্বচ্ছ সরসী, সতীর প্রেম, নবীন মেঘের জল।
এঁদো পুকুরে, প্রেম পাথারে, ঘুর্‌ছে বাবুর দল ॥
হেথায়, ঘোমটা আছে, খেম্‌টা আছে, আছে বিবিয়ানা।
নভেলধৃতা, ঝাঁটাহস্তা, দস্তুরী ষোল আনা ॥
ছেড়ে, ঢাকাই শাড়ী, কচতা পাড়ী, গাউন পরে সাধে।
এলায়ে বেণী, শতেক ধনী, ফুল গুঁজেছে তাতে ॥
গাউন পরা, বডি আঁটা, সেমিজ পরে গায়—
টেবিল চেয়ারে, মাইডিয়ারে, কিবা শোভা তায় ॥
এখানে, রাধাকুঞ্জে, মুঞ্জে মুঞ্জে, ফুটে পুঞ্জ পুঞ্জ ফুল।
কত পায়ে ধরা, শ্যামচোরা—তুলনা অতুল।
এখানে, যুবক আছে, সাধক আছে, আছে রসিক জন ॥
পেট ডালা, সন্ন্যাসীরা, মার্‌ছে গাঁজায় দম ॥
যোগী আছে, ভোগী আছে, আছে রোগীর দল।
ঊনপঞ্চাশ, রোগের বাস, নিত্য কোলাহল ॥
ঘটিরাম, ডেপুটী আছে, আছে বলদ পঞ্চানন।
ফেয়ার ওয়েলে, ওয়েল ফেয়ার জানে জগজ্জন ॥
হেথায়, মালতী ফুটে, গন্ধ ছুটে—কুন্দ, জ্বলে মরে।
সূর্য্যমুখী, স্ফুটনমুখী, শুকায় ধীরে ধীরে ॥
কত, ভ্রমর আছে, রোহিনী আছে, আছে গোবিন্দলাল ॥
শৈবলিনী, প্রতাপে মিলে, নাহি কোন জঞ্জাল ॥
হেথায়, আছে কবি, নব ছবি, নিতুই নব তান।
বঙ্কিম আছে, মাইকেল আছে, রসভরা প্রাণ ॥
পূর্ণিমাশেষে, হেমচন্দ্র, অস্তমিত হায়।
প্রতিপদে, নবীনচন্দ্র উজলে ধরায় ॥
হেথায়, আছে বাবু, কত কাবু, কত ভেকধারী।
ছাপ্‌মারা, বৈরাগীরা, কচ্ছে জারিজুরি ॥
কত ধর্ম্মের ঢোল, করিয়ে রোল, বাজ্‌ছে ঢিমিঢিমি।
কত জ্ঞানের বীণা, আনাগোণা, কচ্ছে দ্রিমি দ্রিমি ॥

কত আলোধারী, খৃষ্টপাদরী, চৌরঙ্গীর ধারে।
পথের মানুষ, আদরে ডেকে, ধর্ম্মে মজায় পরে ॥
কত, মুখে হরিবোল, ভাবে বিহ্বল, পাছে 'ফাউল' টেপা।
উইলসনের, শ্রীক্ষেত্রের, সেবক কত ক্ষেপা ॥
বেশ্যালয়ে, তান লয়ে, উঠে কত তান।
কত, বেসুরা বাজে বীণা, জগত কম্পবান ॥
গৃহে মা কাঁদে, ভাই কাঁদে, অন্নমাত্র নাই।
বেশ্যালয়ে, গোলাপ আতরে, মুখ ধোওয়া চাই ॥
এই সব জগৎ রঙ্গ, হৃদয় কম্প, হতভম্ব হই।
কত তরঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে, ভেসে চলে যাই ॥
গোলক ধাঁধার সবই ধাঁধা, আছে হেথায় বাঁধা।
কবি বলে, দেখে শুনে, হয়ে আছি গাধা ॥

শ্রীপঞ্চানন ঘোষ।

আমার প্রেম।

(১)

আমার এ প্রেম সখি বরিষার বাণ!
দুকূল প্লাবিয়া হায়, সর্ব্বস্ব লইয়া যায়,
বুকে দাগ পড়ে থাকে শুধু শূন্যপ্রাণ।
আমার এ প্রেম সখি বরিষার বাণ!

(২)

আমার এ প্রেমসখি অমা অন্ধকার!
নাহি কোথা আলোরেখা, নাহি কিছু যায় দেখা,
সতত পরাণে ধোঁকা—তীব্র আশঙ্কার।
আমার এ প্রেম সখি অমা-অন্ধকার!

(৩)

আমার এ প্রেম সখি আলেয়ার আলা!
আশার নাহিক শেষ, সকলি দেখিতে বেশ,
পায় পায় কিন্তু তার মরণের খেলা।
আমার এ প্রেম সখি আলেয়ার আলা!

(৪)

আমার এ প্রেম সখি দীপ্ত হুতাশন!
শত জিভ বার ক'রে
পুড়িয়া—পোড়ায় পরে,
চিরদিন তৃপ্তিহীন—স্বার্থপরায়ণ।
আমার এ প্রেমসখি দীপ্ত হুতাশন!

(৫)

আমার এ প্রেমসখি রাহু হুরমুখ!
অঙ্গহীন—আধা আধা, বুকভরা হিংসা ব্যথা,
আপনার কিছু নাই—বিধাতা বিমুখ।
পারেনা দেখিতে তাই অপরের সুখ!

(৬)

আমার এ প্রেমসখি কালবিষধর!
পরশে সর্ব্বাঙ্গে হায়, গরল সঞ্চার হয়,
প্রতি পলে মৃত্যু ভয়—শিহরে অন্তর।
আমার এ প্রেমসখি কাল বিষধর!

(৭)

আমার এ প্রেমসখি অদৃষ্ট কঠোর!
কভু না ছাড়িতে পারি, অথচ সহিতে নারি,
ঘুরিতেছে জন্ম ভোর সাথে সাথে মোর।
আমার এ প্রেমসখি অদৃষ্ট কঠোর!

(৮)

আমার এ প্রেম সখি দগধ-শ্মশান!
সর্ব্বস্ব পুড়িয়া গেছে, শুধু—শুধু পড়ে আছে,
শত চুম্ব আদরের—আদান-প্রদান—
স্তুপিত অঙ্গারবক্ষে কলঙ্ক-নিশান!

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরম কল্যাণ গীতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

মিথ্যা হইতে কখন সত্য সৃষ্টি হইতে পারে না, এবং সত্য কখন মিথ্যা হন না, মিথ্যা সর্ব্বকালে মিথ্যা, সত্য সর্ব্বাবস্থায় সকল কালেই সত্য এবং যদি কেহ বলে, মিথ্যা হইতে এই জগৎ প্রকাশমান, জগৎ অন্তর্গত জীব সমূহ মিথ্যা হইতে হইয়াছে, তাহা হইলে এ স্থানে বিচার পূর্ব্বক বুঝিয়া দেখ, তোমরা জীবসমূহ মিথ্যা হইতে হইয়াছ, তোমরা মিথ্যা, তোমাদের বিশ্বাস মিথ্যা, তোমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্ত মিথ্যা। যাঁহাকে বিশ্বাস কর যে, তোমার মঙ্গলকারী ঈশ্বর গড আল্লা ব্রহ্ম দেবদেবী, তাঁহারা আগেই মিথ্যা হইবেন। কারণ মিথ্যা হইতে সত্যের উপলব্ধি হয় না, সত্য হইতেই সত্যের উপলব্ধি হয়। যদি বল, তোমরা সত্য হইতে হইয়াছ, তাহা হইলে তোমরা সত্য, তোমাদের মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতাদি সত্য, এক সত্য ব্যতীত দুই নহেন ও সত্য হইতেই সমস্ত উৎপন্ন ও সকল প্রকার ভাব প্রকাশ হইতে পারে। একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণ পরব্রহ্মই চরাচর লইয়া অখণ্ডাকারে সত্যস্বরূপেই বিরাজমান আছেন। অবিনশ্বর সত্য বা স্থিত অবস্থাকে বলে এবং বিনশ্বর মিথ্যা বা অস্থিত অবস্থাকে বলে।

অনুলোম, বিলোম।

সত্যস্বরূপ নিরাকার পরব্রহ্মই কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল, জগতরূপে বিস্তারমান আছেন, স্থূল সূক্ষ্মে লয় হন, এবং সূক্ষ্ম কারণেই স্থিত হন। এই সাকার জগৎ দৃশ্যমান বস্তু, যাহা কারণ পরব্রহ্ম হইতে প্রকাশ হইয়াছেন। আপন ইচ্ছানুসারে সমস্ত নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া আপনাতে সঙ্কোচ করিয়া নিরাকার কারণেই স্থিত হইয়া থাকেন। এই জন্য অজ্ঞানবস্থাপন্ন মনুষ্যগণ এই দৃশ্যমান জগতকে মিথ্যা অলীক বোধ করিয়া থাকে কিন্তু ইহা মিথ্যা নহে। ইনি সত্য হইতে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি নামরূপে প্রকাশ হইয়া এক পূর্ণরূপে সত্যই আছেন, কি প্রকারে মিথ্যা হইবেন। অনন্ত শক্তি দ্বারা অনন্ত কার্য্য করিতেছেন বা করাইতেছেন। কেবল রূপান্তর মাত্র বোধ হন। যথা প্রত্যক্ষ দেখ, স্থূল বস্তু সকল, অগ্নি ব্রহ্মের সঙ্গ পাইয়া অগ্নিরূপ হন, অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া বায়ুরূপ হন। বায়ু নিষ্পন্ন হইয়া আকাশ রূপ হন। আকাশের শব্দগুণ নিষ্পন্ন হইয়া আকাশ মহা আকাশ হন।

মহা আকাশ হইতে অর্দ্ধমাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা বিন্দুরূপে এবং বিন্দু কারণ পরব্রহ্মরূপে স্থিত হন। ইহাকে শাস্ত্রে বিলোম বলিয়া থাকেন। পুনরায় নিরাকার পরব্রহ্ম ইচ্ছানুসারে বিন্দু স্বরূপে প্রকাশ হইয়া বিন্দু হইতে অর্দ্ধ মাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা হইতে মহাআকাশ, মহা আকাশ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল জমিয়া পৃথিবী (যেমন দুগ্ধ জমিয়া দধি) রূপে বিস্তার হইয়াছেন ও হইয়া থাকেন। এই প্রকার বিস্তার হওয়াকে শাস্ত্রে অনুলোম কহিয়া থাকেন। ভগবানের নাম রূপ মঙ্গলকারী বিরাট ভগবানের এই সকল স্থূল, সূক্ষ্ম, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষ জীবমাত্রের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর গঠন হইয়াছে। যথা পৃথিবী হইতে অস্থি, মাংস। জল হইতে রক্ত, রস, নাড়ী। অগ্নি হইতে ক্ষুধা লাগিতেছে ও আহার করিতেছে, অন্ন পরিপাক হইতেছে, ও বাক্য কহিতেছে। বায়ুর দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস, আকাশ হইতে শ্রবণাদি। মহাআকাশ হইতে সমস্ত ধারণ। অর্দ্ধমাত্রা চন্দ্রমা জ্যোতিঃ মন দ্বারা সমস্ত বুঝিতেছ এবং দিবা রাত্র সংকল্প ও বিকল্প উঠিতেছে। এবং সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ বিন্দু আমাদিগের মস্তকে ও বাহিরে প্রকাশ থাকায়, চেতন হইয়া তাঁহার বাহিরের প্রকাশগুণ দ্বারা নেত্রদ্বারে ব্রহ্মাণ্ডরূপ দর্শন করিতেছে, এবং অন্তর চেতনগুণ দ্বারা সৎ ও অসতের বিচার করিতেছ, ও চেতনরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া আমি আছি ইত্যাকার বোধ করিতেছ। যখন সূর্য্যনারায়ণ আপনার বাহ্য চেতন প্রকাশগুণ সঙ্কোচ করিয়া লন, তখন তোমরা অন্ধকার চক্ষে কোন বাহ্য বস্তুই দেখিতে পাও না। তথাপি চেতন থাকিয়া বোধ করিয়া থাক যে, আমি বর্ত্তমান আছি। যখন এই চেতনশক্তি মস্তকে নেত্রদ্বার হইতে সঙ্কোচ করিয়া কারণ ভাবে স্থিত করেন, তখন তোমাদের সুষুপ্তি অবস্থা হয়, জ্ঞানাতীত হওয়ায় তোমাদিগের কোন জ্ঞানের কার্য্য বা বোধাবোধ থাকে না। এমন কি, আপনার অস্তিত্বের সত্তা অনুভব করিতে পার না। যখন সূর্য্যনারায়ণ মস্তকে চেতনা শক্তি পুনঃ প্রকাশ করেন, তখন জাগ্রত জ্ঞানময় হইয়া সমস্ত কার্য্য বা বোধাবোধ কর।

নিরাকারে, পরমাত্মার কোন নাম বা উপাধি নাই। সাকার জগৎ স্বরূপে বিস্তার হইলে দৃশ্যমান সকল প্রকার নাম রূপই পরমাত্মার। জীব আত্মার অজ্ঞান অবস্থাতে যাহা কিছু নামরূপ ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যমান ভাসিতেছে,

যাহা জীব আত্মার রূপ জীব বোধ করিয়া থাকে, যে জড় অবিনশ্বর ও যখন জীবের অভেদ জ্ঞান হয়, তখন নিরাকার সাকার নাম রূপে যাহা কিছু একসত্য পরমাত্মারই ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ স্বত্ত্বেও চেতনময় অবিনশ্বরই প্রকাশরূপ ভাসেন। এই অবস্থায় জীবমুক্ত স্বরূপ এবং পরমাত্মার বা জীব আত্মার রূপান্তর বা উপাধিভেদে এই তিন অবস্থায় তিন রূপ। জাগ্রতরূপ সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ স্বরূপকে ও স্বপ্নাবস্থার রূপ চন্দ্রমা জ্যোতিঃকে এবং সুষুপ্তি বা নির্গুণ অবস্থার রূপ আকাশময় অন্ধকার ভাবকে জানিবেন। যখন তোমরা জীব আত্মা জ্যোতিঃ এবং সূর্য্য-নারায়ণ জ্যোতিঃ স্বরূপ এক অর্থাৎ অভেদ হইয়া নিরাকার নির্গুণ কারণে স্থিত হইয়া থাক, সে অবস্থায় কোন রূপ বা আমি বা তিনি বা দ্বৈত সংজ্ঞা থাকে না। এইরূপে বিনশ্বর, অবিনশ্বর, অনুলোম, বিলোম এবং সত্য মিথ্যা ও জীব জীবআত্মা, পরমাত্মার রূপের বিষয় বুঝিয়া লইবেন।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি নির্ণয়।

জীবাত্মাকে ব্যষ্টি অপূর্ণ এবং পরমাত্মাকে সমষ্টি পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান বলিবার ভাব অর্থ এইরূপ বুঝিবে যে, যেমন একটী বৃক্ষের দুই বা ততোধিক শাখা থাকিলে ঐ শাখাকে পৃথক্ বোধে ব্যষ্টি অপূর্ণ বলা যায়; এবং মূল, শাখা, প্রশাখা, পাতা, ফলফুলাদি ও মিষ্ট তিক্তাদি সমস্ত গুণ রূপ, নাম, উপাধি লইয়া বৃক্ষকে সমষ্টি পূর্ণ সর্ব্বশক্তিতা গুণবিশিষ্ট বৃক্ষ বলা যায়, সেই প্রকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের নানা নাম, রূপ, গুণ সমস্ত পূর্ণভাবে গ্রহণ না করিয়া, তাঁহার অংশ ভাবকে গ্রহণ করায়, জীবাত্মাকে ব্যষ্টি অন্যত অপূর্ণ বলে। এবং অনন্ত নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া, শক্তি ও নিরাকার, সাকার অখণ্ডাকার ভাব লইয়া ব্রহ্মকে পূর্ণ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব-শক্তিমান জানিবে। বস্তুতঃ স্বরূপে জীবাত্মা অপূর্ণ বা ব্যষ্টি নহেন। কারণ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাই জীবাত্মা রূপে বোধ হইতেছেন।

এই যে দৃশ্যমান জগৎ, সাকার ব্যষ্টি বলিয়া বোধ হইতেছে কিন্তু স্বরূপতঃ ইহা ব্যষ্টি নহেন। কারণ যদি এই সকল স্থূল বস্তু, অগ্নিতে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে উহা অগ্নি ব্রহ্মের সংশ্রবে অগ্নিরূপ হইয়া ক্রমে নিরাকার হইয়া যান। তখন আর তাহাতে ব্যষ্টি বা সমষ্টি কোন উপাধিই থাকে না। যদি এই সকল বস্তু পূর্ব্বে নিরাকার উপাধি রহিত না থাকিত, তাহা হইলে পরে উপাধি রহিত নিরাকার হইত না। সমস্ত জগৎ চরাচর লইয়া একমাত্র পূর্ণ পরব্রহ্মই বিরাজমান আছেন। তাহাতে ব্যষ্টি বা সমষ্টি কোন উপাধিই নাই, কেবলমাত্র গুণ, ক্রিয়ার প্রভেদ হেতু ব্যষ্টি বা সমষ্টি নাম কল্পনা করা হয়।

নিরাকার ব্রহ্ম সাকার কিরূপে হন।

অনেকেরই মনে হইতে পারে যে, নিরাকার ব্রহ্ম কি প্রকারে সাকার হইতে পারেন—এ বিষয় স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি, গম্ভীর রূপে ইহার সারভাব বুঝিয়া লইবে। যেমন, তোমাদিগের সুষুপ্তি অবস্থায় কোন প্রকার বোধাবোধ থাকে না এবং তোমরা জাগ্রত হইলে—সমস্ত গুণ ক্রিয়া শক্তি আদি প্রকাশ পায় এবং সমস্ত বোধাবোধ করিয়া থাক ও তোমাদিগের দ্বারা নানা প্রকার কার্য্য হয়, এই প্রকার নিরাকার পূর্ণ পরব্রহ্মই আপন ইচ্ছায় জগতরূপে বিস্তার হইয়া সর্ব্বশক্তিমানরূপে জগতের সমস্ত কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন। যেমন, তোমার জাগ্রত অবস্থার সমস্ত আশা, তৃষ্ণা, লোভ, মোহ, অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান ইত্যাদি গুণ ক্রিয়া তোমাতেই সঙ্কোচ বা লয় হওয়াকে তোমার সুষুপ্ত অবস্থা বলা হয়, সেই প্রকার এই সাকার জগৎ নাম রূপ সমস্ত ব্রহ্মেই লয় বা সঙ্কোচ হওয়াকে ব্রহ্মের নিরাকার ভাব বলা যায়। আরও যেমন, শূন্য আকাশে পীত, রক্ত, শুক্ল, হরীত প্রভৃতি বর্ণযুক্ত রামধনু সাকাররূপে প্রকাশ পায় এবং পুনরায় আকাশেই লয় পাইয়া থাকে, সেই প্রকার এই সাকার জগত ও নিরাকার হইতে প্রকাশ হইয়া নিরাকারে লয় হইয়া থাকে। স্বরূপে ব্রহ্মে নিরাকার বা সাকার সংজ্ঞা নাই। তিনি যাহা, তাহাই পূর্ণ

রূপে বিরাজমান আছেন। কেবল উপাধি ভেদে নিরাকার বা সাকার নাম কল্পনা করা হইয়াছে।

পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের নিরাকার ও সাকার ভাবের বিষয় অবগত না হইয়া অনেক অজ্ঞানাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, নিরাকার ব্রহ্মকে মানি, সাকার ব্রহ্মকে মানি না। এবং কেহ কেহ বলেন যে, সাকার ব্রহ্মকে মানি—নিরাকার ব্রহ্মকে মানি না। কিন্তু উহাদিগের বুঝা উচিত যে, যে পিতা সুষুপ্ত অবস্থায় সমস্ত নাম, রূপ রহিত বোধ হইতেছেন, সেই পিতাই জাগ্রত অবস্থায় নানা গুণ শক্তি দ্বারাই নানা প্রকার কার্য্য করিয়া থাকেন। যেমন, সুষুপ্ত অবস্থার পিতা—জাগ্রত অবস্থার পিতা হইতে বা জাগ্রত অবস্থার পিতা সুষুপ্ত অবস্থার পিতা হইতে ভিন্ন নহেন। যে পিতা সুষুপ্ত অবস্থায় থাকেন, সেই পিতাই জাগ্রত অবস্থায় কার্য্য করেন, অবস্থার পরিবর্ত্তন হেতু যেমন পিতা ভিন্ন ভিন্ন বা দুইটী হন না, পিতা একই থাকেন, সেই প্রকার নিরাকার ব্রহ্ম সাকার ব্রহ্ম হইতে বা সাকার ব্রহ্ম নিরাকার ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহেন। যে পূর্ণ পরব্রহ্ম নিরাকার নির্গুণ ভাবে আছেন, তিনিই এই সাকার বিরাট জগত-স্বরূপে বিস্তারমান আছেন। সাকার ও নিরাকার অবস্থা হেতু পূর্ণ পরব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন বা দুই নহেন।

ব্রহ্মের বহু রূপ ও তাহার কারণ বিষয়।

যদিও পরব্রহ্মে সর্ব্বদাই একই ভাব ও রূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তথাপি তিনি নানা প্রকার লীলার কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার জন্য নানা নাম গুণ ক্রিয়ার সহিত জগতরূপে বিস্তার হইয়া এক এক শক্তি দ্বারা এক এক রূপে এক এক প্রকার কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন। যেমন, একই জল রূপে এই জগতের তৃণ বৃক্ষাদি হইতে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদি উৎপন্ন ও পোষণ হইয়া থাকে; এবং একই অগ্নিতে যাবতীয় স্থূল পদার্থ নিক্ষেপ করিলে সমস্ত অগ্নিরূপ হইয়া নিরাকারে স্থিত হন।

অগ্নি ব্রহ্ম যে সমস্ত স্থূল পদার্থকে আপন রূপ করিয়া নিরাকার হন,

সেই জন্য যে অগ্নি ব্রহ্মে মর্য্যাদা এবং অপরাপর পদার্থের অমর্য্যাদা, কিম্বা জল দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ হওয়ায়, অগ্নি ব্রহ্মের অমর্য্যাদা ও জল ব্রহ্মের মর্য্যদা হয়, তাহা নহে। কারণ সমস্তই পূর্ণ পরব্রহ্মের রূপ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। যেমন, তোমরা এক এক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা এক এক কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাক, সেইরূপ পরমাত্মা ও পৃথিবী জল, অগ্নি, প্রভৃতি এক এক অঙ্গ অত্যঙ্গ দ্বারা জগতের এক এক কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন।

সর্ব্ব শক্তিমান্ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বহুরূপে লীলা করিবার ইচ্ছায় জগতরূপে বিস্তার হইয়া নানাপ্রকার সং সাজিয়াছেন। ইনি শীতল গুণ দ্বারা স্থূলাবস্থা, এবং অগ্নিরূপ দ্বারা সূক্ষ্ম করিয়া নিরাকার হন। যে রূপ দ্বারা যে কার্য্য নিষ্পন্ন করেন, সেই রূপ শক্তিদ্বারা সেই সেই কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; ইহাতে কোন রূপের মর্য্যাদা বা অমর্য্যাদা হয় না। কারণ সমস্তই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেরই রূপ ও শক্তি জানিবেন।

চেতন কি প্রকারে অচেতন বা জড় হন।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, চেতন পদার্থ, কি প্রকারে অচেতন বা জড় হন। এই বিষয়ের সার ভাব নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়া লইবেন। যেমন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অঙ্গুলির নখ রক্ত দ্বারা পোষিত হইয়া চেতন ভাবে শরীরের সহিত লিপ্ত থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ নখ চেতনরূপে তোমাদিগের সহিত সংলগ্ন থাকায় উহা কাটিলে তোমাদিগের কষ্ট অনুভব হয়। আর যখন উহা বৃদ্ধি পাইয়া তোমাদিগের চেতনভাব হইতে নিলিপ্ত হয়, তখন উহা কাটিলে তোমাদিগের কোন কষ্ট হয় না। এই অবস্থাকে নখের জড় অবস্থা বলা হয়। স্বরূপে চেতন অচেতন বা জড় শব্দ নাই, উহা যাহা তাহাই থাকে। অবস্থান্তরে রূপান্তর ভেদে চেতন ও জড় বলা যায়। আরও যেমন তোমরা জাগ্রত অবস্থায় সম্পূর্ণ চেতন ভাবে, স্বপ্ন অবস্থায় সামান্য চেতনভাবে এবং সুষুপ্তি অবস্থায় জড়ভাবে থাক। কিন্তু উক্ত তিন অবস্থাতে কিম্বা জ্ঞান, অজ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতি অবস্থাতে স্বরূপত তোমাদিগের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন বা বৈলক্ষণ্য হয় না।

সেই প্রকার পূর্ণ পরব্রহ্ম কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূলরূপে বিস্তার হওয়ায় রূপান্তর-ভেদে চেতন অচেতন বা জড় শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্বরূপে ইহাতে চেতন অচেতন বা জড় সংজ্ঞা নাই। ইনি যাঁহা তাঁহাই আছেন ও থাকেন।

ব্রহ্মের পঞ্চ তত্ত্ব ও বহু রূপ বিবরণ।

পৃথিবীতে, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, এই যে, পঞ্চতত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে, ইহা ভিন্ন ভিন্ন নহে। ইহা পরব্রহ্মেরই রূপ মাত্র।

বিচার করিয়া দেখ, একটী আতসী কাঁচ সূর্য্য নারায়ণের সম্মুখে ধরিয়া উহা হইতে অগ্নি প্রকাশ করিয়া পরে ঐ অগ্নি দ্বারা সহস্র সহস্র প্রদীপ জ্বালাও, তখন অগ্নিকে বহুবোধ হইবেক কিন্তু বাস্তবিক অগ্নি বহু নহেন, একই জ্যোতিঃ হইতে প্রকাশ হইয়া একই জ্যোতিঃস্বরূপ থাকেন। এবং একই জ্যোতিতে ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চতত্ত্ব বোধ হয়। কারণ, যদ্যপি একটী প্রদীপের শিখার উপর কোন পাত্র রাখা যায়, তাহা হইলে উহাতে যে কালি পড়ে, তাহা পৃথিবী তত্ত্ব জানিবে। এবং জ্যোতিতে যে চঞ্চলতা ও ঊর্দ্ধ-গামী গতি ধূম উঠায় উহাকে বায়ুতত্ত্ব এবং পাত্রে যে বিন্দু বিন্দু বাষ্প দেখা যায়, তাহা জলতত্ত্ব এবং প্রকাশের মধ্যে যে উষ্ণতা শক্তি তাহাকে অগ্নি তত্ত্ব, এবং যে খোলা স্থানে প্রকাশাদি রহিয়াছে, উহাকে আকাশ তত্ত্ব জানিবে। যখন ঐ অগ্নি নির্ব্বাণ হন, তখন এই সকল নাম রূপ, গুণ ক্রিয়া সমস্তই লয় হইয়া নির্ব্বিকারে ব্রহ্মভাবে স্থিত হন।

একই শুদ্ধ চৈতন্য, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই পঞ্চতত্ত্ব রূপে প্রকাশ হইয়া পরব্রহ্মরূপেই আছেন ও থাকিবেন।

বহির্মুখে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বহু বোধ হইতেছে, কিন্তু ইহা ভিন্ন ভিন্ন নহেন। একই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, কারণ, সূক্ষ্ম স্থূল, জগৎ চরাচর লইয়া পূর্ণভাবে বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপে বিরাজমান আছেন। যেমন, তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও নানা শক্তি বহির্মুখে ভিন্ন ভিন্ন বহুবোধ হইতেছে কিন্তু তুমি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্তি লইয়া একই পুরুষ বর্ত্তমান থাক, সেই প্রকার পরব্রহ্ম সমস্ত চরাচর লইয়া একমাত্র পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন।

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি।

অজ্ঞানাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ ব্রহ্ম শক্তিকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ পদার্থ বোধ করিয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ পদার্থ নহেন। যেমন, তুমি এবং তোমার শক্তি তোমা হইতে কোন পৃথক্ পদার্থ নহে, উহা যেমন তোমারই রূপ, গুণ স্বরূপ; কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি জাগ্রত থাক, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার আশা, তৃষ্ণা, লোভ, মোহ, ভয়, অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতি শক্তি বর্ত্তমান থাকে, এবং সুষুপ্ত অবস্থায় ঐ সকল শক্তি নির্গুণভাবে তোমাতেই লয় হয়। এবং পুনরায় তোমার জাগ্রত অবস্থায় তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল শক্তি প্রকাশ পায়। যদি তোমার শক্তি তোমারই রূপ না হইয়া পৃথক হইত, তাহা হইলে তোমার প্রকাশ সত্বায় সত্ববান না হইয়া সতঃপ্রকাশমান থাকিত। সেইরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার হইতে আপন ইচ্ছায় জগতরূপে বিস্তার হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সর্ব্বশক্তি প্রকাশ পান। এবং পুনরায় আপন ইচ্ছায় জগৎ নাম রূপ লয় করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বশক্তি ও সঙ্কোচ করিয়া কারণ রূপে স্থিত থাকেন। যদি এই সকল সর্ব্বশক্তি তাঁহা হইতে পৃথক হইত, তাহা হইলে তাঁহার প্রকাশের সহিত প্রকাশ এবং তাঁহার সত্বায় সর্ব্বশক্তির স্বসত্বা প্রকাশ পাইত না। ব্রহ্ম শক্তি পরব্রহ্ম হইতে পৃথক নহেন। যেমন তরবারির ধার তরবারি হইতে পৃথক নহে, তরবারি রূপই, কেবল কর্ত্তন কার্য্য সমাধা করা যায় বলিয়া উহাকে যেমন ধার বলা হয়। সেই প্রকার পরব্রহ্ম যে রজগুণ দ্বারা সৃষ্টি, সত্যগুণ দ্বারা পালন ও যে তমঃগুণ দ্বারা লয় করিয়া থাকেন, তাঁহারই নাম ব্রহ্মশক্তি। এই সকল শক্তিকে কেহ কেহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কালী, দুর্গা প্রভৃতি নাম কল্পনা করিয়াছে। রজগুণ দ্বারায় জগৎ সৃষ্টি করায় উহাকে ব্রহ্মা ও কালীমাতা সত্যগুণ দ্বারায় পালন করায় বিষ্ণু ভগবান্ বা দুর্গা দেবী মাতা এবং তমগুণ দ্বারা সমস্ত জগৎ নামরূপ আপনাতে লয় করিয়া কারণেতে স্থিত হওয়ায় পরব্রহ্মকে শিব বা সরস্বতী মাতা কল্পনা করে। যাহাকে শক্তি বলে, তাহাকে কোন কোন মতে প্রকৃতি বা মায়া বলে। কিন্তু শক্তি প্রকৃতি বা মায়া পরব্রহ্ম হইতে পৃথক কিছুই নহেন। পরব্রহ্মের স্বরূপ মাত্র। কেবল কার্য্য কারণ হেতু শক্তি নাম কল্পনা করা হয়। (ক্রমশঃ)

বাবু রামচন্দ্র দত্ত।

কলিকাতা সিমুলিয়ার সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশ-হিতৈষী বন্ধু, প্রশংসিত সুচিকিৎসক ডাক্তার রামচন্দ্র দত্তের নাম বোধ হয় এদেশের অনেকেই অবগত আছেন। অনেকেই জানেন, সংসারি হইয়াও রামবাবু একজন পরম ভক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, সুশিক্ষা, সত্যবাদীতা, পরহিতৈষীতা, অমায়িকতা, এবং ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিত্যকৃতজ্ঞতায় জগতবাসী মাত্রেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

উপরে যে প্রতিভাসিত চিত্রখানি দেখিতেছেন, উহাই প্রেমাস্পদ রামচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি। ১৭৭৩ শকের ১৪ই কার্ত্তিক, বুধবার শুক্লাষষ্ঠী তিথিতে কলিকাতার নারিকেল ডাঙ্গার বাটীতে রামচন্দ্র বাবু জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৮২০ শকের মাঘ মাসের চতুর্থদিবসে, মঙ্গলবাসরে, শুক্লাসপ্তমীতিথিতে রাত্রি ১০টা ৪৫ মিনিটের সময় তাঁহার ইহলোকলীলা সম্বরিত হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার ৪৭ বৎসর মাত্র বয়স হইয়াছিল। অবশ্যই অকাল মৃত্যু সন্দেহ নাই! তাঁহার বিয়োগে সুপরিচিত, অর্দ্ধ পরিচিত, কদাচিত পরিচিত সারজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও পরিতপ্ত হইয়াছেন! শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর বিষয়

সংসারে প্রবেশ করিয়া, বাবু রামচন্দ্র দত্ত যথেষ্ট মানও যথেষ্ট যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ভগবান প্রসাদে তাঁহার আয়ও প্রচুর হইয়াছিল; কিন্তু মাসান্তে তাঁহার হস্তে এক কপর্দ্দকও সঞ্চিত থাকিত না; ইন্দ্রজালের ন্যায় উড়িয়া যাইত, কোথায় যাইত, কি হইত, কেবল সংসার খরচ ছাড়া, বাকি জমা খরচ কেহই জানিতে পারিত না। বাস্তবিক নিত্যখরচ বাদে মাসিক সমস্ত টাকাই কেবল গরীবের উপকারে আর ভক্তির উৎসবে অতি সঙ্গোপনে ব্যয় হইয়া যাইত। দানধর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণ এবং যীশুখৃষ্টের উচ্চ উপদেশ পালিত হইত!

বিশেষ কোন আড়ম্বর ছিল না, অথচ সাধারণ সৎকার্য্যে রামচন্দ্র বাবুর দৃঢ় অনুরাগ ছিল। দরিদ্রকে অন্ন দান, বস্ত্র দান, আশ্রয় দান, এই তিন কার্য্যে তিনি বিশেষ অগ্রবান ছিলেন। পথের কাঙ্গালী ভিখারীকে তুষ্ট করিয়াই রামচন্দ্র বাবু তুষ্ট হন নাই, ভদ্রবংশের দরিদ্র মাতা পিতার সন্তানেরা অন্নবস্ত্রাভাবে অথবা বিদ্যা শিক্ষার ব্যয়াভাবে নিরুপায় হইলে যাহাতে তাহাদের মধ্যে সম্ভবমত গুটিকতক অনাথ বালকের আশ্রয় বিধান হয়, তৎকল্পে রামচন্দ্র বাবু দৃঢ় যত্নবান হইয়াছিলেন; সাধু সন্ন্যাসী পোষণ করিতেও তাঁহার প্রগাঢ় যত্ন ছিল। কাঁকুড়গাছীর যোগোদ্যানে ঐরূপ দশবারটি দরিদ্র ভদ্রসন্তান এবং চার পাঁচটি সন্ন্যাসী উত্তম আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া, প্রতি দিন রীতিমত আহার ও সেবা লাভ করিতেন। সন্ন্যাসীরা জ্ঞানী,—যোগোদ্যানে তাঁহারা বিদ্যা শিক্ষা করিতেন না,—তাঁহাদের কার্য্য ছিল ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচার করা, ন্যায়শাস্ত্রের তর্ক করা, মধ্যে মধ্যে আমোদ করিয়া ভক্তিরসের গান করা, এবং পুষ্পচন্দন দিয়া ভক্তিসহকারে ভগবান রামকৃষ্ণদেবের পূজা করা। বালকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিত, শিক্ষকের বেতন এবং আহারাদির সহিত বিদ্যাশিক্ষার সমস্ত ব্যয় রামচন্দ্র বাবুর অন্তরের ভক্তিখাতায় খরচ পড়িত। গৌরবের বিষয়, সেই আশ্রমটি আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। বালকেরাও বিদ্যাশিক্ষা পায়, সাধুসন্ন্যাসীরাও সেবা পান। আহারাদি অপরাপর বিষয়ের ব্যয়গুলি রামচন্দ্র বাবুর অপার্থিব নামটিকে দেবতুল্য স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

কাঁকুড়গাছীর যোগোদ্যানটি রামচন্দ্র বাবুর নিজের যত্ন প্রতিষ্ঠিত, সেই পিঠ স্থানে আর্য্য পরমহংস ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের সমাধি মন্দির আছে। পরিতাপের বিষয়, যাঁহার গুণাবলী বর্ণিত হইতেছে, সেই মহাপুরুষ রামচন্দ্র

বাবুও এত শীঘ্র সেই স্বপ্রতিষ্ঠিত যোগোদ্যানে প্রভুর মন্দিরের অনতিদূরে ধরণীগর্ভে শয়ন করিয়াছেন! রামবাবুর জীবন আর কিছুকাল—কিছু দীর্ঘকাল এ সংসারে ক্রীড়া করিলে অগণিত দরিদ্রের উপকার হইত। বিজ্ঞানে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার দীর্ঘজীবনে দেশে অনেক প্রকার উত্তম উত্তম সাধু অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইত, রামকৃষ্ণদেবের মহিমাও চির জাগরুক থাকিবার প্রচুর আশার উপযুক্ত স্থল থাকিত, তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সকল আশা বিলুপ্ত হইয়াছে।

কেবল দুঃখের কথা বলা উচিত নহে। ভক্তিই ব্রহ্ম,—ব্রহ্মই আনন্দ। রামবাবুর তুল্য ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষের চরিত্র প্রসঙ্গে আনন্দ থাকা অতি আবশ্যক। অতএব আনন্দের কথা বলি।

প্রতিবৎসর ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমীর দিবস যোগোদ্যানে মহা মহোৎসব হয়। সেই মহোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা সিমুলিয়া মধুরায়ের গলি (রামবাবুর বাটী) হইতে দলে দলে সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় নানাস্থান হইতে আসিয়া ভগবানের সুমধুর নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে যোগোদ্যানে যান, বহু লোক সেখানে সমবেত হয়, হরিনাম ও রামকৃষ্ণ নাম শ্রবণ করিয়া অভাবুক অভেদ্য হৃদয়ের লেকেরাও ভক্তিতত্ত্বের কিছু না কিছু দৈব ভাবের আস্বাদন পায়, শত শত ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত থাকেন। তাদৃশ সম্মিলনে দেশের মহত্তর উপকার আছে। সেই সঙ্গে আর একটি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়।

মহোৎসবে আহারের ব্যবস্থা অতি সুন্দর। ভক্তের বদনে এই আহারের নাম প্রসাদ। সহস্র সহস্র লোক পরিতোষরূপে ভোজন করিতে পারেন, সেই পরিমাণে খিচুড়ী প্রস্তুত করা হয়; খিচুড়ীর উপকরণ নিরামিষ,—ভোগে মৎস্য যায় না;—প্রসাদে মৎস্য হয় না;—পায়স হয়, দধি সন্দেশ হয়, প্রচুর আয়োজন। চিনির সরবত, লুচি, কচুরি, বোঁদিয়া সকল লোকের জলখাবার। সমারোহ ব্যাপার। প্রায় চারি সহস্র লোক একত্রিত হয়, তন্মধ্যে প্রায় দুই সহস্র লোক একসঙ্গে বসিয়া খিচুড়ী প্রসাদ ভক্ষণ করে। জাতিবিচার নাই উদ্যানে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়া একজন নাট্যকার বৈদিক ব্রাহ্মণ স্পষ্ট ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণাবধি আচণ্ডাল একত্র বসিয়া খিচুড়ী খাইল, কিছু দিন পরে হয়ত এই যোগোদ্যানের এক নূতন নাম হইবে, "নূতন শ্রীক্ষেত্র?"

ব্রাহ্মণ ঠাকুর বিদ্রূপ করুন আর যাই করুন, রাম বাবুর তুল্য ধর্ম্মনিষ্ঠ

সত্যপরায়ণ পরদুঃখকাতর উদার চরিত্র মহাপুরুষ এখনকার কালে আমরা অতি অল্পই দেখিতে পাই। তাঁহার সমস্ত সৎকার্য্যই সঙ্গোপনে সম্পাদিত হইত; জীবনের কার্য্যে তাঁহার কোন প্রকার আড়ম্বর ছিল না। সংসারের ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত পুরাণ শাস্ত্রে অনেক আছে; অধুনা ত্যাগ স্বীকারের কথাটা কেবল পুস্তকেই পাঠ করা যায়, বক্তৃতাতেই শ্রবণ করা যায়, কার্য্যের সহিত সম্পর্ক অল্প। বাবু রামচন্দ্র দত্ত ইহ জীবনে স্বার্থ-ত্যাগের উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। স্বয়ং সম্ভবমত ধনশালী ব্যক্তি হইয়াও তিনি কেবল পর উপকারে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্বস্ব দান করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গৃহবাসী সন্ন্যাসীর ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার তুল্য সাধু মহাত্মা ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়াও ইহসংসারে অমর হইয়া রহিয়াছেন,—স্বগৌরবে আমরা এ কথা অবশ্যই বলিব। তাঁহার পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণীও পুণ্যবান স্বামীর প্রকৃত অঙ্কলক্ষ্মী স্বরূপিণী ছিলেন, ইহাও সংসারের গৌরবের বিষয়। আহা! প্রায় তিন বৎসরমাত্র কাল বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সেই পতিব্রতা ধর্ম্মশীলা রমণী গত বৎসর ফাল্গুন মাসে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আহা! পতিবিয়োগের পর পতিপরায়ণা সাধ্বীসতী আর শয্যা হইতে উত্থান করেন নাই। পতিব্রতার ধর্ম্মপালন এইরূপ হইলে আর্য্যশাস্ত্রের মহিমা অধিকতর উজ্জ্বল হয়। রামবাবুর পুত্র সন্তান জন্মে নাই, চারিটী কন্যামাত্র। কনিষ্ঠা কন্যাটির বয়ঃক্রম এক্ষণে প্রায় সাত বৎসর; এই কন্যাটি ছয় বৎসরে মাতৃহীনা হইয়াছে!

চারিটি জীবতা কন্যা ব্যতীত রাম বাবুর আর কন্যা ছিল; তন্মধ্যে একটি যখন শৈশবে চতুর্থ বর্ষ বয়সে মারা যায়, রাম বাবুর পত্নী তখন সূতিকাগারে বদ্ধ ছিলেন; মেয়েটিকে মৃতাবস্থায় গৃহ হইতে বাহির করিবার অগ্রে রাম বাবু বিষণ্ণবদনে সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে গিয়া দণ্ডায়মান হন, তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার পত্নীও সেইখানে আসিয়া দাঁড়ান; পতিকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি এখানে কেন?"—রামবাবু বলেন, "মেয়েটি মারা গিয়াছে, যাঁহার বস্তু, তিনি লইয়াছেন, লইয়া যাইবার সময় পাছে তুমি রোদন কর, নিষেধ করিবার জন্য আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি। কাঁদিও না, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, ভগবানের ইচ্ছা,—শোক করা বৃথা।" পতিপ্রাণা নবপ্রসূতি অম্লান বদনে তখন কহিলেন, "কাঁদিব না, কেন কাঁদিব?—ঠাকুর চলিয়া গিয়াছেন, ঠাকুরকে হারাইয়া যখন আমরা

না কাঁদিয়া বুক বাঁধিয়া স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া রহিয়াছি, তখন একটা সামান্য মেয়ের শোকে আমি কাঁদিব, ইহাও কি সম্ভব বোধ হয়?"

পাঠক মহাশয়েরা দেখুন, দম্পতি-জীবনে কেমন উচ্চ প্রাণের সহিত উচ্চ প্রাণের মিলন! স্ত্রীলোক স্বভাবত মায়ার পুতলি, স্বামীর গুণে, অভ্যাস বশে এই বঙ্গীয়া কুলবধূটি ধর্ম্মজীবনে কেমন সহিষ্ণুতায় সেই অনিত্য মিথ্যা মায়ার পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন?

আর একটি কথা।—অনেকেই বলেন, ধর্ম্মশীল স্বর্গীয় রামচন্দ্র দত্ত মাতৃ-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জননী তুলসীমণি এই স্বার্থপর সংসারে মূর্ত্তিমতী দয়ার স্বরূপিণী ছিলেন। সংসারের সকল বিষয়েই তাঁহার অকপট দয়াধর্ম্মের উজ্জ্বল উজ্জ্বল প্রমাণ ছিল। দিবাভাগে পরিবারস্থ এবং অধীনস্থ সকলের আহারাদি সমাপ্ত হইলে সর্ব্বশেষে তিনি স্বয়ং আহার করিতেন। এক এক দিন এমনও ঘটিত যে, গৃহিণী আহার করিতে বসিতেছেন কিম্বা সবেমাত্র বসিয়াছেন, এমন সময় একজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইল; দেখিয়াই পুণ্যবতী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার খাওয়া হয়েছে বাছা?" অতিথি উত্তর করিল, "হয় নাই।" গৃহলক্ষ্মী তৎক্ষণাৎ নিজের ভোজনের আশা পরিত্যাগ করিয়া সেই অন্নব্যঞ্জনগুলি উপস্থিত অভুক্ত অতিথিকে প্রদান করিলেন, স্বয়ং উপবাসী রহিলেন। মাসের মধ্যে প্রায় ১০।১২ দিন এইরূপ ঘটনা হইত। রাম বাবু যথার্থই সেই মহৎ প্রকৃতির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

ইংরাজী ভাষা অধ্যয়নে রামচন্দ্র বাবুর অনেক সময় ব্যয়িত হইয়াছিল, চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোচনায় তিনি অধিক মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে মিলিটারী ছাত্রদের ব্যায়ামবিজ্ঞানের অধ্যাপক, এবং রাসায়নিক পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। দুই কার্য্যেই তিনি সবিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। ইংরাজী চর্চ্চায় এতদূর পরিলিপ্ত থাকিয়াও অসাধারণ অধ্যবসায় প্রভাবে ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়, আমাদের বঙ্গসাহিত্যে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় কাব্য সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অচলাভক্তি ছিল, কেবল তাহাই নহে, অসাধারণ শ্রমশীলতায়, অসাধারণ গবেষণায়, তত্ত্বানুসন্ধানে, অসাধারণ অনুরাগে তিনি আর্য্য শাস্ত্র রত্নাকর মন্থন করিয়া সনাতন আর্য্যধর্ম্মের নিগূঢ় তাৎপর্য্যামৃত সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

তাঁহার সম্পাদিত "তত্ত্বমঞ্জরী" নামিকা মাসিক পত্রিকায় তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবের গাঢ়তার বিশেষ পরিচয় দৃষ্ট হয়। তাঁহার লেখনীপ্রসূত গ্রন্থাবলী বঙ্গভাষার লালিত্য ও প্রাঞ্জলতায় সাহিত্য সংসারের সর্ব্বজন প্রশংসিত। অকালে তাঁহাকে হারাইয়া আমরা যার-পর-নাই, সন্তপ্ত হইয়াছি; চিন্তা করিলেই জ্ঞান হয়, যেন একটি পরম রত্নহারা হইয়াছি।

সতীধর্ম্ম। *

(সমালোচনা।)

বহুদিন পরে একখানি উচ্চ আদর্শপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ, সন্নীতি-পবিত্রতাময় ধর্ম্মগ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গ্রন্থের নাম—"সতী-ধর্ম্ম।" যিনি এই গ্রন্থের প্রণেতা,—তিনি একজন পরম ভাগবত, পরমজ্ঞানী, পরম প্রেমিক কবিকুল-ভূষণ। যোগ্যব্যক্তি যোগ্য বিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের অমৃতময়ী লেখনী হইতে এই অমৃতধারা নিঃসৃত হইয়াছে। এ সুধাপানে বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষ ধন্য হইবেন। বিশেষ মাননীয়া মহিলাকুল, এ গ্রন্থের উপদেশানুযায়ী জীবন-পথে অগ্রসর হইতে পারিলে, জীবন মধুময় ও সংসার আনন্দময় করিতে পারিবেন। সে আনন্দে কোনরূপ আবিলতা থাকিবে না,—পরন্তু তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন বিমলশান্তি, অহেতুকী ভক্তি, ও পরম প্রীতির অনির্ব্বচনীয় ভাব বিদ্যমান থাকিবে। সে আনন্দ কেমন, ভাবিবার বিষয়! সে আনন্দের প্রচারক যিনি, তিনিও যে সে লোক নন! "তারা" মায়ের সেবক ও সন্তান, ভগবৎ-ভাবে-নিমগ্ন, আদর্শ চরিত্র তারাকুমার কবিরত্ন নিজগুণে জন-সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া আসিতেছেন। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের এক বিভাগে তাঁহার স্থান সকলের উচ্চে!

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ভূরি ভূরি শ্লোকাবলী এবং কৃষ্ণভক্তিরসামৃত, তারামা, কবিসূক্তি, পদ্যমালা, নীতিমালা প্রভৃতি স্বরচিত সংস্কৃত গ্রন্থ

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা, মাশুল ✓০ আনা। কলিকাতা ২৫ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

সকলের তিনি অতি আশ্চর্য্য ক্ষমতার সহিত সরল ও সরস বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। সে পদ্যানুবাদ এমন মধুর ও মনোজ্ঞ যে, আপনা হইতে তাহা কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। ইস্তক হিতোপদেশ ও চাণক্য শ্লোক হইতে, তাঁহার কৃষ্ণভক্তিরসামৃত ও 'সতীধর্ম্ম' পর্য্যন্ত এই সুরে বাঁধা। সংস্কৃত শ্লোকের এমন অপূর্ব্ব পদ্যানুবাদ আমরা আর কুত্রাপি দেখি নাই। এই অনুবাদে এমন একটি কবিত্বময়ী ঝঙ্কার আছে, যাহা 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে' স্পর্শ করে,—প্রাণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়,—শান্ত—করুণাশ্রিত ভক্তিরসে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া চক্ষে জল আইসে। এই অংশে, ভগবদ্ভক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, বাঙ্গালা সাহিত্যের সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

সতীধর্ম্ম,—সংসারের সার ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া, গৃহীকে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিতে হয়। গ্রন্থকর্ত্তার ভাষাতেই বলি,—"সতী গৃহস্থাশ্রমের অধিদেবতা, মানবের চতুর্ব্বর্গের সহায়। সতীধর্ম্ম সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম। সংসারে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতামাত্রের কার্য্যবিধি সতীধর্ম্মের অন্তর্ভূত।"

যুগধর্ম্মের ফলে, ভারতের হিন্দু সন্তানকেও আজ সতীধর্ম্ম-মাহাত্ম্য শিক্ষা দিতে হইতেছে! সীতা-সাবিত্রীর দেশেও আজ আদর্শ-গৃহিণীর পথ,—গ্রন্থকারকে দেখাইয়া দিতে হইতেছে! না দেখাইয়া দিলে আর রক্ষা নাই বলিয়াই দেখাইয়া দিতে হইতেছে! পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের জাতীয় আদর্শ ক্ষীণ ও মলিন হইতেছে; আমাদের পুণ্যময় সংসার শ্মশান হইতে চলিয়াছে; আমাদের পুরুষ পরম্পরাগত সহানুভূতিশীল একান্নবর্ত্তী পরিবার উৎসন্নের পথে খর-স্রোতে অগ্রসর হইয়াছে; এ হেন দুর্দ্দিনে, এ শ্রেণীর ভূরি ভূরি গ্রন্থের একান্ত আবশ্যক আছে বৈ কি? কিন্তু কষ্ট ও আয়াস স্বীকার করিয়া, অর্থোপার্জ্জনের মায়া কাটাইয়া, পাঠকের রুচি ও প্রবৃত্তি উন্নত করিতে, অগ্রসর হয় কে? কাহার সে সৌভাগ্য ও সামর্থ্য আছে যে, দেশের ও দশের পানে চাহিয়া এ উচ্চ সাহিত্য ব্রতে, হিন্দুর এ জাতীয় আদর্শবাদ প্রচারে, মনোযোগী হন? বঙ্গের সুসন্তান,—শাস্ত্রদর্শী হিন্দুসন্তান পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন এ উচ্চভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া, আমরা পুলকিত ও আশ্বাসিত। তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপিত হউক,—আমাদের আশা পূর্ণ হউক,—মা সর্ব্বমঙ্গলার নিকট ইহাই কামনা।

আলোচ্য গ্রন্থখানির নাম "সতীধর্ম্ম" বটে, কিন্তু ইহাতে গার্হস্থ্য-আশ্রমের সকল উপদেশই সন্নিবেশিত হইয়াছে। বহুশাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া এ অমৃত কলস উত্থিত হইয়াছে। পণ্ডিত ও পুর-নারী সমান আগ্রহে এ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিবেন,—পাঠে প্রচুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন, হয়ত সৌভাগ্যক্রমে কেহ 'মানুষ' হইয়াও যাইতে পারিবেন,—কেহ বা জন্মার্জ্জিত সুকৃতিবলে আরো ঊর্দ্ধে—আরো উচ্চ লক্ষ্যে বৈরাগ্য-নির্ব্বাণের পথে উপনীত হইতে পারিবেন;—ত্রিতাপ-জ্বালা তাঁহাকে আর ভুগিতে হইবে না;—সংসারে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি নির্লিপ্তভাবে সকল কাজ করিতে পারিবেন;—সর্ব্বকার্য্যের মধ্যেই তিনি সেই সর্ব্বনিয়ন্তার শুভ ইচ্ছা ও সেই ভূমা পুরুষের বিচিত্র-লীলা দেখিয়া যাইতে পারিবেন—এ হেন গ্রন্থের যিনি সঙ্কলয়িতা ও প্রচারক, তাঁহাকে প্রণাম করি।

সতী-আখ্যা বড় উচ্চ আখ্যা। এত বড় উচ্চ আখ্যা রমণীতে আর নাই। স্বয়ং জগদম্বাও একদিন এই 'সতী' নাম ধারণ করিয়া জগতে সতী-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। স্বয়ং দেবদেব মহাদেবও একদিন এই সতীর আদর, সতীর সম্মান দেখাইবার জন্য উন্মত্ত ভৈরব বেশে, সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া, ত্রিভুবন ঘুরিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন! সেই শ্মশানচারী সদাশিব—প্রেমের মূর্ত্তিমান ঈশ্বর—বড় আদরে—বড় সোহাগে—বড় সম্মানে জগদম্বাকে ডাকিতেন—"সতী"। অন্য সম্বোধন বুঝি তাঁহার ভাল লাগিত না; অন্য সম্বোধনে বুঝি তিনি তেমন আনন্দ ও তৃপ্তি পাইতেন না,—তাই অর্দ্ধাঙ্গিনী পরমা প্রকৃতিকে আদর করিয়া ডাকিতেন, 'সতী'। এ হেন সতী নামেরও, এখন কেহ কেহ বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া বসেন। অতি ক্ষুদ্র অর্থে সেই বিরাট ও মহান ভাব বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করেন। তীক্ষ্ণদর্শী গ্রন্থকারের দৃষ্টি এ বিষয়েও এড়াইয়া যায় নাই। তিনি বলিতেছেন,—

"অনেকের এইরূপ বিশ্বাস যে, নারীগণ কেবল ব্যভিচার-দোষে দুষিত না হইয়া আর সকল দোষে দুষিত হইলেও, সতীত্বের হানি হয় না, পতি বিদ্বেষিণী সংসারের অশান্তিরূপিণী অথচ ব্যাভিচারদোষশূন্যা গৃহিণীরা, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া, নিজ নিজ সতীত্বের গৌরব করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সে বিশ্বাস যে ভ্রান্তিমূলক, তাহা এই সতীধর্ম্ম পড়িলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।"—কথাটি অতি সত্য।

তেরটি পদ্যময় প্রবন্ধে এই গ্রন্থের কলেবর পূর্ণ। সে তেরটি প্রবন্ধ

এই;—(১) দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার উক্তি; (২) নারদের প্রতি যমের উক্তি; (৩) সতীর পতিপ্রেম ও পুণ্যপ্রভাব; (৪) গৃহীর নিত্যকর্ম্ম; (৫) গৃহিণীর নিত্যকর্ম্ম; (৬) স্ত্রীপুরুষের প্রতি মনুর উপদেশ; (৭) দাম্পত্যই ত্রিবর্গের মূল; (৮) গার্হস্থ্য ধর্ম্ম,—হর-পার্ব্বতী-সংবাদ; (৯) সুমনা-শাণ্ডিলী সংবাদ; (১০) আদর্শ গৃহস্থাশ্রম; (১১) দম্পতীর বিশেষ কর্ত্তব্য ও সতী-মহিমা; (১২) সীতা ও অনসূয়া; (১৩) সতীমূর্ত্তি ধ্যান।

প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ শ্লোক সংহিতা, পুরাণ, তন্ত্র ও মহাভারত হইতে সংগৃহীত।' ইহা ব্যতীত গ্রন্থকারের স্বরচিত কতকগুলি শ্লোকও ইহাতে আছে।

ভক্ত তারাকুমার, এই 'সতীধর্ম্ম' গ্রন্থ, সংসারের প্রত্যক্ষ দেবতা,—তাঁহার স্বর্গীয় জনক-জননীর নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার পিতৃমাতৃভক্তি কত গভীর, কত আন্তরিকতা পূর্ণ, কত ভাবময়, তাহা নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটিতে উপলব্ধ হইবে;—

"পিতা মোর প্রেমময় বিষ্ণু-অবতার,
সতীধর্ম্মময়ী লক্ষ্মী জননী আমার;
উভয়েরে কোটি কোটি করি নমস্কার,
'সতী-ধর্ম্ম' পাদপদ্মে সঁপিনু দোঁহার।
জনক! জননি!—মোর ঈশ্বর!—ঈশ্বরি!
গেলে যবে সুরপুরী মোরে পরিহরি,
তদবধি এ নয়নে না শুকা'ল জল,
অন্তকালে পদতলে দিও মোরে স্থল।"

এই সরল সরস ও প্রাণস্পর্শী বঙ্গানুবাদ। ইহার মূল সংস্কৃত শ্লোকটিও এতদনুরূপ;—সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক, তাহা মূল গ্রন্থপাঠে উপলব্ধি করিবেন। বইখানি আকারে ক্ষুদ্র বটে; কিন্তু ইহার এক একটি পদ, এক একটি হীরার টুক্‌রা।

সতীর মহিমা ধ্যান করিয়া, ভক্ত ও ভাবুক গ্রন্থকার বলিতেছেন;—

(১)

"সতীর মহিমা কথা কি বলিব আর,
সদ্য পূত হয় ধরা পদ-রজে যার;

পতিব্রতা নারীরে যে করে নমস্কার,
ধন্য সেই নর, পাপ দূরে যায় তার।”

(২)

“ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি শক্তি আছে কত,
যোগী ঋষি সিদ্ধ আদি আছে শত শত ;
যিনিই যতই শক্তি করুন প্রসব,
সতীর প্রভাবে সবে মানে পরাভব।”

(৩)

“যে জন সতীর পতি সেই সাধু হয়,
সতীর তনয় যেই সে রয় নির্ভয় ;
সতী-পতি সতী-পুত্র ভয় নাহি জানে,
দেবতা যমেও তার কাছে হারি মানে।”

(৪)

“শত শত জন্ম যেই করে পুণ্যরাশি,
জনমে তাহারি গৃহে পতিব্রতা আসি ;
ধন্য মাতা যাঁর গর্ভে সতীর উদয়,
সতীর জনমদাতা জীবন্মুক্ত হয়।”

(৫)

“দশ দিক্ বায়ু আর আকাশমণ্ডল,
রসাতলে যদি কভু যায় এ সকল ;
তথাপি পতির প্রতি সতীর প্রণয়,
অটল অচলভাবে থাকিবে নিশ্চয়।”

ইহারই নাম সতী! এ সতী কি কেবল ব্যভিচারদোষহীনা হইলেই হয়? হিন্দু, সতী-নারীকে কত উচ্চ চক্ষে দেখেন, ইহাই তাহার প্রমাণ। পক্ষান্তরে ক্ষোভ এই, কোন কোন অতি বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্, অন্য জাতির আদর্শ দেখাইয়া ভারতে সতী-ধর্ম্মের প্রচার করেন! নারীর সম্মান, নারীর মর্য্যাদা লোককে শিক্ষা দেন!

গ্রন্থের ত্রয়োদশ প্রবন্ধটি, বঙ্গ-সাহিত্যের কোহিনুর স্বরূপ। এরূপ অপূর্ব্ব ভাবময়, কবিত্বময়, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মনোহর চিত্র,—বহুদিন আমরা দেখি নহি। সতী-মূর্ত্তির এমন অপূর্ব্ব ধ্যান, গান আমরা আর কোথাও

শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ধন্য তারাকুমার! ধন্য তোমার লিখন-ভঙ্গিমা! দেবতারা তোমার লেখনীতে পুষ্প চন্দন বর্ষণ করিয়াছেন,—আমরা আর তোমায় অধিক প্রশংসা কি করিব? তোমার লেখনী অমর হইয়াছে ;—বঙ্গসাহিত্যে তুমিও অমর হইয়াছ!

এক গৌরীর তিন মূর্ত্তি,—তপস্বিনী, অন্নপূর্ণা, গণেশ-জননী,—এই ত্রিমূর্ত্তি হৃদয়ে গভীরভাবে ধারণা করিয়া, ভক্তকবি কি অপূর্ব্ব ভাবপূর্ণ শব্দ সংযোগে চিত্রিত করিয়াছেন! পড়িলে অশ্রুপাত হয়,—অতি বড় পাষণ্ড ও নাস্তিকের প্রাণেও ক্ষণকালের জন্য ভগবদ্ভক্তির আবির্ভাব হয়। সেই—

“জটা ধ’রেছেন শিরে কটিতে মেখলা,
বল্কল, বিভূতি অঙ্গে, করে অক্ষমালা ;
চারি পাশে চারি অগ্নি জ্বলে নিরন্তর,
প্রচণ্ড নিদাঘ-সূর্য্য মস্তক উপর ;”—

এইরূপে আরম্ভ করিয়া, ভক্ত তারাকুমার ভক্তকবি দাশরথি রায়ের সেই “বসিলেন (মা) হেমবরণী, হেরম্বেরে ল’য়ে কোলে”—এই সম্মোহন স্বরসঙ্গীতে তাঁহার ধ্যান গান সমাপ্ত করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা সমস্ত উদ্ধৃত হইতে পারে না ; পরন্তু সবটা উদ্ধৃত না হইলে, সে রসও সকলকে বুঝান অসম্ভব ; সুতরাং পাঠককে মূলগ্রন্থ পড়িতে অনুরোধ করি।

ইহার পর সাবিত্রী মূর্ত্তি ধ্যান ;—সে মূর্ত্তি কেমন?—

“যমদণ্ড চূর্ণ করি’, বক্ষেতে পতিরে ধরি,
নিশীথে ভীষণ বন হ’তেছেন পার ;
গৌরিক বসন অঙ্গে, কুঠার করণ্ড সঙ্গে,
সূর্য্য হেন দেহ-প্রভা হরিছে আঁধার।”—

ইহার পর জগদারাধ্যা সীতামূর্ত্তি। প্রথম, অশোকবনে সীতা ;—

“হস্তেতে মস্তক রাখি’, মুদিয়া কমল-আঁখি,
রামের চরণ সদা করিছেন ধ্যান ;
কেঁদে কেঁদে দিবারাত্র, ফুলিয়াছে দুটী নেত্র,
অশ্রুজলে ভাসে গাত্র, নাহি বাহ্যজ্ঞান।”

দ্বিতীয়, সীতা অগ্নি মধ্যে ;—

"শত-অগ্নি-শিখা-মাঝে বিরাজেন সতী,
রক্ত-শতদল-বনে কমলা যেমতি ;
অনল শীতল ভাবে ছুঁইছে চরণ,
অগ্নির দেবতা বুঝি এ নারী রতন।"

তৃতীয়, সীতা সিংহাসনে ;—

"রামাঙ্গে মিলিত কায়, কি শোভা বলিব তায়,
নীল-জলধর-কোলে দামিনী যেমনি ;
অভিষিক্তা পতি-সনে, মণিময় সিংহাসনে,
শ্বেতছত্র শিরে ধরে ভরত আপনি।"

চতুর্থ, সীতা পাতালে ;—

"উঠিল ফণীন্দ্র-শীর্ষ ভেদিয়া ধরণী,
তদুপরি রত্নাসনে শ্রীরাম-রমণী ;
করযোড়ে একদৃষ্টে পতিপানে চান,
পতি-পদে মিশিয়াছে আত্মা মন প্রাণ ;
রঘুকুললক্ষ্মী ওই রসাতলে যায় !
হাহাকার করি' রাম পড়িছে ধরায় ;"—

সীতার এ ছায়া-চিত্র আমরা চুম্বকে দেখাইলাম মাত্র ; অপূর্ব্ব কাব্য-রসাস্বাদনে যাঁহার সাধ থাকে, তিনি মূল গ্রন্থ পড়ুন।

সীতার পর অরুন্ধতী। এ মূর্ত্তিও অতুলনীয়া !—

"হিমাচলে বশিষ্ঠের পুণ্য তপোবন,
দিব্য-তরু-সুশোভিত, প্রশান্ত, পাবন ;
যজ্ঞবেদী মাঝে তথা অশোকের তলে—
অরুন্ধতী তেজোময়ী সতীমূর্ত্তি জ্বলে।"

অতঃপর, পতিবিরহিণী—বিষ্ণুপ্রিয়া ;—

"গৃহ ছাড়ি' সন্ন্যাসী হইলা প্রাণেশ্বর,
তাঁহার পাদুকা বক্ষে ধরি' নিরন্তর,
সে পদ-কমল সতী ভাবে দিবানিশি,
তাতেই গিয়াছে আত্মা-মন-প্রাণ মিশি।"

এইরূপ, পর পর সতীমূর্ত্তির ধ্যানগুলি পাঠ করিতে করিতে আমরা রোমাঞ্চিত কলেবরে আবেশভরে চক্ষের জল ফেলিয়াছি, এবং তৎসঙ্গে ভক্ত গ্রন্থকারের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া, উদ্দেশে অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছি। "সতীধর্ম্ম" বঙ্গের গৃহে গৃহে পঠিত হউক ;—ইহার অমৃতময় শ্লোকাবলী সহস্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হউক ;—ইহাই আমাদের শেষ প্রার্থনা।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

লোকমাতা সরস্বতী দেবীর পূজা।

(মর্ত্ত্যলোকে প্রচার বৃত্তান্ত।)

একদিন মহর্ষি নারদ বল্লকী বাদন করিতে করিতে অখিলদেব শ্রীনারায়ণের গুণকীর্ত্তন করত শ্রীনারায়ণের সমীপে উপস্থিত হইয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—হে প্রভো! আমি আপনার অনুকম্পাতে শ্রীমুখ-নিঃসৃত পীযূষ-সম মধুর, পূর্ব্বতন সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়াছি। সম্প্রতি একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসিবার স্পৃহা আছে, তাহার জন্য অনুজ্ঞায় অনুগৃহীত করিলে, নিবেদন করিতে পারি। শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—বৎস নারদ, কি বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান জন্য জিজ্ঞাসিবার লিপ্সা আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া বল। ঋষিবর নারদ বলিলেন, হে বিশ্বগুরো! পঞ্চ প্রকৃতি দেবীর মধ্যে কোন্ দেবীর কে কি মন্ত্র দ্বারায় অর্চ্চনা করিয়াছেন, ও কোন্ দেবীর কি প্রকার স্তব করিয়াছেন, এবং কি প্রকারে কোন্ দেবীর পূজা মর্ত্ত্যলোকে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা আনুপূর্ব্বিক সম্পূর্ণ বিস্তৃতভাবে স্বতন্ত্র করিয়া বর্ণনা করুন। শ্রীনারায়ণ কহিলেন ;—হে দেবর্ষে! সৃষ্টি বিষয়ের মধ্যে-গণেশ-জননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী ইহাঁরাই পঞ্চ প্রকৃতির মূলাধার হইতেছেন। ইহা ত পূর্ব্ব হইতে বিশ্ববিদিত,—তখন তুমিও যে অবগত নহ, এমন নহে! ইহার অতিরিক্ত ইহাঁদের পর্য্যাসনা, অদ্ভুত প্রভাব, অপূর্ব্ব স্তোত্র ও পীযূষ সদৃশ সর্ব্বমঙ্গল-নিদান চরিত্র, বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রাদি সকল শাস্ত্রেই প্রসিদ্ধ। অতএব ইহাঁদের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। সম্প্রতি যিনি প্রকৃতির অংশ ও কলা হইতে

আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারই শুভ চরিত্রের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর।

কালী, বসুন্ধরা, গঙ্গা, ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডিকা, তুলসী, মনসা, নিদ্রা, স্বধা, স্বাহা ও দক্ষিণা, ইহাঁরা প্রকৃতির অংশ হইতেছেন। দুর্গা এবং রাধার বিস্তারিত উদার চরিত্র ক্রমানুসারে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। সম্প্রতি সরস্বতীর বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে মুনিবর! যে বীণাপাণীর প্রভাবে অজ্ঞানান্ধ মূঢ় পুরুষের হৃদয়াকাশও জ্ঞানালোকে প্রকাশ পাইয়া থাকে, একদিন সেই কামরূপিনী কামুকী দেবী সরস্বতী, রাধার জিহ্বাগ্র ভাগ হইতে আবির্ভূতা হইয়া, কামবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে পতি করিবার লিপ্সা করিলেন। তৎকাল সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তদাত্মিকা বলিয়া জানিয়া, লোকমাতা সরস্বতীকে সুনৃত বাক্য বলিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন;—হে পতিব্রতে! তুমি আমাকে পতি করিবার জন্য স্পৃহা করিয়াছ। কিন্তু আমাকে পতি করিলে, তোমার শুভদায়ক হইবে না। তুমি বৈকুণ্ঠধামে গমন কর, তথায় আমার অংশোৎপন্ন চতুর্ভুজ নারায়ণ যুবা, সুশ্রী ও সর্ব্বগুণান্বিত হইতেছেন; ও তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ আমার অঙ্গ জ্যোতির তুল্য এবং তিনি ঐশ্বরিক গুণে বিভূষিত, অতএব তিনি কামিনীগণের বাসনা বিলক্ষণরূপ জানিয়া থাকেন, ও বাসনা পূর্ণ করেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যের কথা আর কি বর্ণনা করিব,—তাঁহার অঙ্গে কোটী কোটী কামদেবের লাবণ্য ক্রীড়া করিতেছে। হে শুভে! তুমি যদি আমাকে পতি করিয়া আমার নিকট অবস্থান করিবার লালসা কর, তাহা হইলে, তোমার কোন প্রকারেই কল্যাণ সম্ভবপর হইবে না। যে হেতু আমার সমীপস্থ রাধা তোমার অপেক্ষা প্রবল শক্তিসম্পন্না—স্বয়ম্প্রধানা! যদি কোন ওজস্বী ব্যক্তি অপেক্ষা কোন ব্যক্তি অধিকতর বিক্রান্ত হয়, এবং ওজস্বী ব্যক্তি কোন অল্পতনুবিশিষ্ট মনুষ্যের প্রতি আক্রমণ করিয়া থাকে, সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া যদি এই অল্পতনু বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই বিক্রান্ত ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে,—তবে ঐ বিক্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। কিন্তু যদি ওজস্বী ব্যক্তির অপেক্ষা আশ্রয়দাতা দুর্ব্বল হয়, তবে স্বয়ং অসমর্থ হইয়া, আশ্রিত ব্যক্তিকে কি প্রকারে রক্ষা করিবে? আমিও রাধার নিকট সেইরূপ। যদিও আমি সর্ব্বেশ্বর এবং সর্ব্ব জীবের শাসনকর্ত্তা, কিন্তু রাধাকে শাসন

করিতে সমর্থ নহি। যে হেতু রাধার কি প্রভাব, কি রূপ, কি গুণ সর্ব্বাংশেই আমার তুল্য হইতেছে; এবং রাধা আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! রাধাকে পরিত্যাগ করিলে, আমার জীবন বিসর্জ্জন হইবে। অতএব কোন পুরুষ নিজের জীবন বিসর্জ্জন করিবার স্পৃহা করে কি? যদিও পুত্র সকলের আদরণীয় বটে, কিন্তু প্রাণের অধিক প্রিয়তম হইতে পারে কি? এ হেতু হে ভদ্রে! তুমি বৈকুণ্ঠধামে গমন কর—তথায় তুমি স্বীয় শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারিবে। তথায় বৈকুণ্ঠনাথকে পতি পাইয়া, চিরকাল সুখসম্ভোগ পূর্ব্বক বিহার করিতে পারিবে। যদিও ইন্দিরা তথায় বাস করিতেছেন সত্য, কিন্তু সেও তোমার সম প্রকৃতি—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যের বশীভূত নহেন ও রূপ, গুণ ইত্যাদি সর্ব্বাংশেই তোমারই সমকক্ষ নিশ্চিতই। অতএব তাঁহার সহিত পরমসুখে কাল অতিবাহিত করিতে পারিবে। বৈকুণ্ঠনাথ হরিও তোমাদের উভয়কে সমভাবে আদর করিবেন। বিশেষতঃ আমি বলিতেছি; প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে মাঘ মাসের যে শুক্লাপঞ্চমীর দিন বিদ্যারম্ভ হইয়া থাকে, ঐ দিবস মহামহোৎসবের সহিত কি মনুষ্যগণ, কি মনুগণ, কি দেবগণ, কি মুমুক্ষু মুনি, কি যোগী, কি নাগ, কি সিদ্ধ, কি গন্ধর্ব্ব, কি রাক্ষস, সকলেই যে পর্য্যন্ত মহা প্রলয় উপস্থিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষে কল্প হইতে কল্পান্তরেও ভক্তি সহকারে ষোড়শোপচারদ্বারা তোমার অর্চ্চনা করিবে। এবং সকলেই জিতেন্দ্রিয় ও সংযমী হইয়া, ঘটে—পটে—পুস্তকে তোমাকে আবাহন করিয়া যজুর্ব্বেদান্তর্গত কাণ্বশাখোক্ত বিধানে, ধ্যান ও স্তোত্র পাঠ করিয়া, তোমার অর্চ্চনা করিবে। তোমার কবচ ৮ আট প্রকার, ঐ আট প্রকার কবচ গন্ধদ্রব্য দ্বারা মৃদুত্বচ পত্রে (ভূর্জ্জ) লিখিয়া কণ্ঠদেশে অথবা দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিয়া, তোমার প্রতি ভক্তিমান্ হইবে। বিদ্বান্ পুরুষ মাত্রেই তোমার অর্চ্চনার সময় স্তবপাঠে রত হইবে। অখিল মাতা সরস্বতীর নিকট এই সমস্ত যথাবিধি সমাহিত করিয়া পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সরস্বতী দেবীর পূজার্চ্চনা করিলেন। এই দিবস অবধি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব তথা—অনন্তদেব, ধর্ম্ম, সনকাদি মুণীন্দ্রগণ, সমস্ত দেব, সমস্ত মুনি, সমস্ত রাজা, সমস্ত দানব সমাজে সরস্বতী দেবীর পূজার্চ্চনা আরম্ভ করিয়াছেন। হে বৎস! এই প্রকার অনন্তকাল দেবী সরস্বতীর পূজা স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিলোকে প্রচলিত হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র পড়্যা।

বঙ্গসাহিত্যে ত্রিকাল।

লোকান্তরগত ধার্ম্মিকবর বঙ্গবন্ধু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বঙ্গসমাজের 'একাল সেকাল' আলোচনায়, সংক্ষেপে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি শেষকালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজনারায়ণ বাবু আর্য্য-সমাজের কোন কোন অঙ্গ স্পর্শ করিয়া, ঘন ঘন আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, কাব্য সাহিত্যের অঙ্গ স্পর্শ করেন নাই।

ঐ পুস্তকখানি ব্যতীত আরও দুই এক স্থলে 'একাল সে কালের' বর্ণনা আমাদের অক্ষিগোচর হইয়াছে। আজকাল একখানি খবরের কাগজেও ধারাবাহিকরূপে একাল সেকালের আলোচনা বাহির হইতেছে। এমন শুভ অবসরে আমরাই বা কেন চুপ্ করিয়া থাকি ?

তবে হাঁ,—সকল অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিব না, সকল কথা বলিবার অবসর পাইব না, অদ্য কেবল একটি প্রধান অঙ্গ স্পর্শ করিয়া, একাল সেকালের বিচার আরম্ভ করিব। স্বদেশের কাব্য, আর বঙ্গভাষার সাহিত্য।

"জন্মভূমিতে" জন্মভূমির একাল সেকাল আলোচনায় আমোদ আছে বটে, কিন্তু সেরূপ আলোচনার শক্তি আমাদের নাই। ভাগ্যক্রমে শক্তির কৃপা হইলেও স্থানের অভাব হইবে। বর্ণনা, আলোচনা, নব নব ভাবের প্রবর্ত্তনা,—এ গুলির এক একটি এক একটি সমুদ্র বিশেষ; জন্মভূমি—তিন সমুদ্রের জলে ডুবিয়া যাইবে, সকল কথা বলিতে পারিবে না; সেই জন্য অদ্য আমাদের আলোচ্য হইতেছে,—কাব্য আর সাহিত্য।

প্রথম কথা এই যে, কোন্ সময় পর্য্যন্ত আমরা সেকাল বলিয়া ধরিয়া লইব, এবং কোন্ সময় হইতেই বা একাল বলিয়া গণনা করিব? রাজা রামমোহন রায়কে সে কালের দলে ফেলিয়া রাখিলে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্যারিচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ইত্যাকার সাহিত্য পূজকদিগের সময় হইতে একালের আরম্ভ, ইহাই বুঝিয়া লইতে হইবে কি না, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি না। ঐ লোকগুলিকেও সেকালের দলে রাখিয়া দিলে, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র এবং আরও দুই একটি প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবককেই একালের প্রথম শ্রেণীতে গণনা করিতে হয়। এখনকার উদ্ধত যুবকেরা অনেকেই গর্ব্ব

করিয়া, বুক মুখ ফুলাইয়া, যে ভাবে গরিমা প্রকাশ করেন, তাহাতে বোধ হয়, ঐ শ্রেণীর অগ্রগণ্য বন্ধুগুলিকেও তাঁহারা একালের লোক বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জিত হন। ভাবেই বুঝা হইল, নব্য নব্য সাহিত্যলেখকেরা এখন স্ব স্ব প্রধান।

এক্ষণে একটু বিচার আবশ্যক। নব যুবকেরা মনে করেন, বৎসর পঁচিশ ত্রিশের মধ্যে যাঁহাদের বয়ঃক্রম, কেবল তাঁহারাই এখন একালে সাহিত্যলেখকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তদূর্দ্ধ বয়সের লেখকেরা যে সকল রাশীকৃত পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহারা সে কালের লোক, এই হেতুবাদে তাঁহাদের প্রণীত পুস্তকগুলি কেবল কীটোদরে প্রবেশ করিবার যোগ্য।

কল্পনায় এ সকল কথা কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকের কথা। যাঁহাদের প্রণীত পুস্তক পাঠ করিয়া বিদ্যা হইয়াছে, তাঁহারা সে কালের লোক, তাঁহাদের লিখিত ভাষা অশুদ্ধ, তাঁহাদের প্রণীত পুস্তক অপাঠ্য, এই সকল কথা বলিয়া সেই সকল গুরুদেবের প্রতি ঐরূপ তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ করা অবশ্যই বালকের কার্য্য। যাঁহাদের জ্ঞান কম, তাঁহারা ভাবে, বালক অপেক্ষাও ছোট। মনে মনে কেহ কেহ ভাবে, হয় ত ইহারা বাতুল।

ভারতচন্দ্র রায়কে সেকালের অনেক দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া, গর্ব্বিত যুবকেরা কবিত্ব শিখিবার উপায় হারাইতেছেন। ঈশ্বর গুপ্তকেও তাঁহারা সেকালের দ্বিতীয় শ্রেণীর গহ্বরে ফেলিয়া রাখিলেন, বাঙ্গালা কাব্যামোদের একটি সুন্দর উপায়কে সেকালের ঘৃণিত দলে গণ্য করা হইল!

সেকালের লেখকের লেখা বলিয়া যাঁহাদের লেখাকে একালের অহঙ্কৃত বালকেরা ঘৃণা করিতেছেন, সত্য যদি তাঁহারা কেহ সেই সকল মান্য লেখকের অপেক্ষা উত্তম লিখিতে পারিতেন, তাহা হইলেও বেশী গৌরব কিছুই হইত না। অনেক লোকেই বলেন, এখনকার বাঙ্গালা লেখায় (কি গদ্যে কি পদ্যে) সার নাই, রস নাই, কবিতায় কাব্য মাধুর্য্য অতি অল্পই থাকে। এ সকল কথার অর্থ কি?—অর্থ আর কিছুই নহে, এখনকার নব লেখকেরা তাঁহাদের একালের মত নূতন ধরণে লিখিয়া যান, আকাঙ্ক্ষা বেশ থাকে, সমাপ্তি ঠিক হয় না। এই কারণেই উত্তম ভাষাটি,—মাজ্জিত ভাষাটি, ক্রমশঃ মাটী হইয়া

আসিতেছে। হে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্ধুগণ! যাঁহাদিগকে তোমরা সেকালের লোক বলিয়া উড়াইয়া দাও, ভক্তিভাবে তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য পূজা করিলে, তাঁহাদের প্রণীত সুমধুর নীতিপূর্ণ, সুললিত ভাষারঞ্জিত গ্রন্থগুলিকে আদর্শস্থলে গ্রহণ করিলে, বঙ্গভাষা নিশ্চয়ই অপরূপ মাধুরী ধারণ করে। উপেক্ষা করিলে, বহুদিন হইতে মহাপুরুষগণ দ্বারা ক্রমশঃ ক্রমশঃ যে সুন্দরী ভাষাটি অধিকতর মাধুর্য্যবতী—সৌন্দর্য্যবতী হইতেছে, সেই আদৃতা ভাষাটীর গৌরব ক্ষয় হইবে।

হে ভ্রাতৃগণ! এই ঘোরতর বিপ্লব সময়ে তোমরা যদি আপনাদের স্বেচ্ছাচারে—অহঙ্কারে প্রবীণের অবমাননা কর, অচিরাৎ উন্নতি প্রমুখী এই বঙ্গ ভাষাটি এককালে অধঃপাতে যাইবে, এইরূপ আশঙ্কা। নব শিক্ষিত ভ্রাতৃগণ! আমাদের এই আশঙ্কা দূর কর! মাতৃভাষার যদি লাবণ্য বৃদ্ধি করিবার সত্য অভিলাষ রাখ, বিজ্ঞের সেবা কর, কেশের পক্কতা অপক্কতা বিচার রাখিও না!

প্রাচীন তত্ত্বের শিক্ষাই সৎশিক্ষা। কত স্মরণাতীত কালের বিরচিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর দ্বারাই সংসারে আমরা ধর্ম্মভাব আর সংসার ভাব শিক্ষা পাইতেছি, নূতনের দ্বারা কিছুই উপকার পাইতেছি না। ইহা কেবল জনরবের রব নহে, বঙ্গসাহিত্য সংসারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া যাঁহারা পরিজ্ঞাত, তাঁহারাও কেহ কেহ প্রচলিত ভাষালিখন প্রণালীর পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারাও ভাবেন, এই প্রকার স্রোত অবাধে চলিলে ক্রমশই বঙ্গভাষা অধোগামিনী হইতে থাকিবে।

বঙ্গীয় কাব্যসংসারেও দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে। প্রাচীন প্রচীন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কবিগণের স্বহস্ত সম্পাদিত মধুর মধুর কাব্যগুলির চরণ কর্ত্তনেও কেহ কেহ অগ্রসর! প্রাচীন কবিগণের প্রতি এখনকার নব্য কবিগণের অনেকেরই ভক্তি নাই। এমন কি, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম, কবিকঙ্কণ এবং ভারতচন্দ্র রায় প্রভৃতি স্বভাব কবিগণের প্রতিও নব্যযুবকদলের অন্তরের ভাব বড় উচ্চ নয়! এখন যাঁহারা দুই একখানি কাব্য পুস্তক রচনা করিতেছেন, তাহা সমগ্র পাঠ করিলে বোধ হয়, কাব্যের অপমান করিবার জন্যই কবিগণের লেখনী ধারণ। দীর্ঘগ্রীবা বঙ্গকামিনীগণকে বঙ্গকবি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দরী বলিয়া যিনি বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন, তিনি যে ভবিষ্যতে গৃহ

মধ্যে সমুদ্র আনিতে পারিবেন না, কল্পনাসতীও তেমন কথা বলিতে পারেন না।

বঙ্গদেশে কবি এখন অনেকগুলি। এক একজন কবি স্বাধীন। তাঁহারা ইচ্ছামত কতকগুলি নূতন নূতন ছন্দে নূতন নূতন কবিতা রচনা করেন। শব্দগুলি কিম্বা কথাগুলি নিতান্ত মন্দ থাকে না, কিন্তু কোথায় যতি, কোথায় মিলন, কিছুই ঠিক পাওয়া যায় না; বর্ণ গণনাতেও মধ্যে মধ্যে বিস্তর বিপর্য্যয় ঘটে! ঐ তিনটির অভাব হইলে মিত্রাক্ষর কবিতা কদাচ সরস হয় না।

নূতন কবিরা বলেন, ও সকল কিছুর প্রতিই দৃষ্টি রাখিতে হইবে না, কেবল ভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিলেই কাব্য হইল। এই সকল লক্ষণ দর্শন করিয়া মনে হয়, কবিতা আর অধিক দিন বঙ্গভূমিতে ক্রীড়া করিবে না। শত বৎসরে কিংবা দুইশত বৎসর পরে শত করা দুই একটি প্রতিভা সংসারে অবতীর্ণ হইতে পারেন, প্রতিভাসম্পন্ন দেবানুগৃহীত পুরুষেরাই স্বভাবকবি হইয়া থাকেন; বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশে কয়জন স্বভাব কবি আছেন, বোধ করি কেহই তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না।

এমন হওয়া উচিত নহে। যাঁহারা আপনারা বুঝিবেন, অনুক্ষণ হৃদয় মাঝে কবিতালহরী খেলা করে, লেখনী মুখেও এক এক সময়ে বেশ বর্ণাবলী লিপিবদ্ধ হয়, তাঁহারা যদি সেই সময় প্রাচীন কবিগণের মধুর কাব্যগুলির ভাব পরিগ্রহ করিয়া নূতন কবিতা লিখিতে যত্ন করেন, অনেকটা উচ্চভাবে আসিতে পারিবেন, প্রাচীন কবির আদর্শে প্রকৃতি সতীকে মস্তকে রাখিয়া, কবি যদি ভাবপূর্ণ কবিতা লিখিতে পারেন, তথাপি নূতন ছন্দের অবতারণা উচিত হইবে না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার মাসিক "প্রভাকরে" অনেকগুলি নূতন নূতন ছন্দে নূতন রকম কবিতা লিখিয়াছিলেন, সে গুলি যেমন মধুর হইয়াছিল, এখনকার নব কবির মনঃকল্পিত নূতন ছন্দের কবিতা কদাচ তেমন মিষ্ট হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে সে চেষ্টা যাঁহারা করিবেন, প্রথানুগত কাব্যকে নষ্ট করিয়া তাঁহারাই কেবল উপহাসাস্পদ হইবেন মাত্র।

সাহিত্যক্ষেত্রে কোন্ কোন্ ব্যক্তি একালের শ্রেষ্ঠ লেখক, তাঁহাদের নাম বলিয়া দেন, এমন দুই একটি নিরপেক্ষ বিচারক অন্বেষণ করিতে

হয়। শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বঙ্গসিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্তকে সেকালের দলে নিক্ষেপ করিলে জীবিত শ্রেষ্ঠ লেখকের দলে আমরা কাহাকে কাহাকে গণনা করিব, নিঃসংশয়ে তাহা স্থির করিতে পারি না। দুই একখানি অসার সমাচার পত্রের দুই একজন অসার প্রিয় পাত্রকে বঙ্গসাহিত্যকাব্যের উচ্চ আসন প্রদান করিতে হইলে, কাব্য সাহিত্যের অপমান করা হয়। সমাচার পত্রে প্রশংসিত এক একজন একালের নবোদ্ভূত পণ্ডিতকে যদি পূর্ণ মাত্রায় "তান্ত্রিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক এবং কাব্যিক" উপাধি প্রদানে অলঙ্কৃত করিতে হয়, ক্ষেত্রফল দর্শন করিয়া বিজ্ঞ বিজ্ঞ বিচারকেরা বোধ হয় কদাচ তাহা পারিবেন না। নভেল নাটকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার আশায় একালের সাহিত্যবীরেরা খানকতক নভেল নাটক প্রসব করিয়াছেন, নভেল নাটক প্রণয়ন করা যত সহজ তাঁহারা মনে করেন, প্রকৃত সাহিত্য বন্ধুগণের বিবেচনায় নিশ্চয়ই তাহা তত কঠিন বিবেচিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ বর্ত্তমানকালে দেশের কাব্য সাহিত্যের অঙ্গরাগ সাধন করিতে হইলে, প্রাচীন পুরুষগণের এবং প্রাচীন প্রাণালীগুলির পন্থানুসরণ একান্তই আবশ্যক; দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকগণকে সুপথ দেখাইয়া দেওয়া সাধুলোকের কর্ত্তব্য। স্বদেশীয় কাব্যসাহিত্যের মুখ উজ্জল করিয়া আপনাদের মুখ উজ্জল করিতে যাঁহারা অভিলাষ রাখেন. অহঙ্কার পরিশূন্য হইয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণের সেবা করা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজন, ইহার অন্যথা হইলে কাব্যসাহিত্যের সৌন্দর্য্যহন্তা বলিয়া নিশ্চয়ই তাঁহারা সাহিত্য-সমাজে অভিযুক্ত হইবেন। দেশে যদি সাহিত্য সভা থাকে, সেই সভার সভ্যেরা সেই অভিযোগের বিচারক সভা যদি না থাকে, অবিলম্বে সেই প্রণালীর একটি পূর্ণাঙ্গ সভা সংস্থাপন করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যে ত্রিকাল, এই শিরোনাম দিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হইয়াছে। ত্রিকাল আমরা কিসে বুঝাইব, এইখানে তাহাই দেখিতে হইবে। পূর্ব্বে যাঁহারা সাহিত্য সংসারে সুলেখক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ কেহ ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কেহ কেহ আজিও জীবক্ষেত্রে মন্থরভাবে সঞ্চরণ করিতেছেন, নবীন বিচারে তাঁহারা সকলেই সেকালের দলে গণ্য। এটি হইল এক

প্রকার ভূতকালের কথা। ইহার পর বর্ত্তমান কাল। একালে যাঁহারা অল্প বয়সে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া সগর্ব্ব অভিমান করিতেছেন, তাঁহাদের আখ্যা একালের লেখক। এই একালের লেখকেরা সেকালের লেখকগণকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করেন। শীঘ্রই ভবিষ্যৎকাল আসিবে। বর্ত্তমান কালের লেখকেরা তখন আবার সেকালের দলে গণ্য হইবেন; আরও ভবিষ্যতে একাল সেকাল ক্রমশঃ বাড়িবে। ক্রমশঃ বঙ্গসাহিত্য কাব্যের কি দশা দাঁড়াইবে, ত্রিকালের চিন্তায় আমরা কেবল তাহাই ভাবিয়া অধীর হইতেছি। বারান্তরে আমরা এ বিষয়ের একটু বিশেষ আলোচনা করিব। শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

রাগিণী ইমন্ কল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

শ্যামাপদ সরোজেতে মজ মন মধুকর।
পিয়ে সুধা যাবে ক্ষুধা, হইবে চির-অমর॥
বিষয়-কেতকী-রসে, মজিয়া মোহের বশে
এত যে পাইছ দুখ তবু কি ঘোচে না ঘোর॥
শ্যামা নামের ঝঙ্কারে ওড় পা'র ধারে ধারে
অবিরত লোট মধুপান কর আর গান কর॥
সুদন বলে কুতূহলে, সহজে কি মধু মিলে?
থাকে না সংসার তৃষা পেলে যাহা একবার॥

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা।

অমৃতসাগর।—শ্রীমদ্ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী কৃত; শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী চৌধুরাণীর আনুকূল্যে প্রকাশিত।

সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থের প্রারম্ভেই স্বীয় নিবেদনে লিখিয়াছেন,—আসাম প্রদেশস্থ বগড়ী বাটীর তিন আনা অংশের জমীদার সত্যে নিষ্ঠাবতী—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী চৌধুরাণী—এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণের সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া সম্পাদককে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

আমরাও শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী চৌধুরাণীর নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম। শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী চৌধুরাণী জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য, ও জগতের হিতার্থ এরূপ অমূল্য নিধিস্বরূপ পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার সুশীলা নামের সার্থকতা দেখাইয়া ধন্য হইয়াছেন, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। ভরসা করি, এই দৃষ্টান্তে অন্যান্য অর্থশালিনী জমিদার বিধবাগণও ইহাঁর এই অলোক সামান্য উদারতার অনুসরণ করিয়া পরহিত ব্রতানুষ্ঠানে জগতে আনন্দবর্দ্ধন করিবেন। বহুদর্শী ও বহুতত্ত্বজ্ঞ পরহিতব্রত স্বামী-জীর ধীর ও গম্ভীর উপদেশ লহরী মুদ্রাঙ্কণেচ্ছু অন্যান্য সেবকবৃন্দকেও যে শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী চৌধুরাণী ঐরূপ মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিয়া অনুগৃহীত করিবেন, ইহাও আমাদের ভবিষ্যতে আশা রহিল। আমরা কায়মনোবাক্যে তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনায় নিযুক্ত রহিলাম। "অমৃতসাগর" রয়েল আটপেজী ৩৪৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, ইহা তিনভাগে বিভক্ত, পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও পরিশিষ্ট। প্রথমখণ্ডে পরমার্থ বিষয়, দ্বিতীয় খণ্ডে সংশয় নিবৃত্তি বিষয় (ঈশ্বর সাধন ও সিদ্ধি সম্বন্ধে), তৃতীয় খণ্ডে ব্যবহার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমাদের এই উপলব্ধি হইল যে, এ সামান্য পুস্তক নহে, কোন এক সম্প্রদায় বিশেষের জন্য রচিত হয় নাই, ইহা জগতের সর্ব্ব জীবের মঙ্গলের জন্য রচিত হইয়াছে। দূরদর্শী বহু-তত্ত্ববিৎ সাম্যবাদী স্বাধীনচেতা পরমহংসদেবের অন্তরোত্থিত সত্য-উপদেশ সমূহ স্বাধীনভাবে ও পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অদূরদর্শী সাম্প্রদায়িক লোক সকলের বিবেচনায় ইহার স্থানে স্থানে অবৈধ রুচিবিরুদ্ধ বা অনাবশ্যক বোধ হইতে পারে, কিন্তু যাঁহাদের জ্ঞানে স্ত্রীপুরুষের ভিন্নভাব নাই, ধর্ম্মজগতে এক ব্যতীত দ্বিতীয় হইতে পারে না, যাঁহাদের মনে আস্তিক, নাস্তিক, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন, প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী কেবল নামভেদ মাত্র, সেইরূপ উদারচেতাগণ জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় একীভূতত্ব ও পূর্ণত্ব উপলব্ধি করিয়া, বৈধ, অবৈধ, আবশ্যক, অনাবশ্যক ভেদাভেদ কিছুই দেখেন না। তাঁহাদের নিকট সকলই এক সত্য হইতে উত্থিত ও সকলই এক সত্যে স্থিত বা লয় প্রাপ্ত। এই পরিদৃশ্যমান পরিবর্ত্তনশীল জগতে যে সকল ভাব

অবশ্যম্ভাবী, যাহার প্রতিরোধ কিছুতেই হইবে না, দূরদর্শী স্বামীজী কেবল তৎতৎভাব নির্মুক্তকণ্ঠে ও স্বাধীনভাবে প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। আমাদের বিবেচনায় এই বৈচিত্রময় জগতে তাদৃশজনের নিকট হইতে সকল বিষয়ের উপদেশ পাইলে জগতের বিশেষ মঙ্গল হয়। "অমৃতসাগর" সে হিসাবে অতি ক্ষুদ্র পুস্তক ইহার কলেবর সহস্রগুণে বৃদ্ধি পাইলেও আমাদের জ্ঞান পিপাসা পূর্ণ হইত না। অখণ্ডৈক রসস্থিত অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও অপার আনন্দময় স্বামীজীর চরণে ভক্তি ও প্রীতি পূর্ব্বক পূর্ণরূপে আমরা বার বার প্রণাম করিলাম ও সাহিত্যানুরাগী সদ্গুণান্বিত সম্পাদক শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বাবুকে আমাদের এই অনুরোধ যে, তিনি যেন স্বামী মহোদয় প্রসাদলব্ধ সদুপদেশ সকল সময়ে সময়ে মুদ্রাঙ্কণ করত লোক সমক্ষে প্রচার করিয়া, জগতের মঙ্গল সাধন করেন, ইহাই প্রার্থনা।

রূপ-লহরী।—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ প্রণীত, মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। এই পুস্তকে সাতটি গল্প সন্নিবেশিত হইয়াছে। মালতী ও হাবী নামক দুইটি গল্প ব্যতীত সকল গুলিই ইতিপূর্ব্বে জন্ম-ভূমিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। জন্মভূমিতে প্রতিমাসে রূপলহরীর গল্পগুলি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, পাঠক পাঠিকার আগ্রহ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। সংবাদ পত্রাদি সম্পাদন কার্য্যে পাঁচকড়ি বাবুর গুণ অসাধারণ, একপক্ষে তিনি একজন প্রগাঢ় চিন্তাশীল ভাবুক, উৎকৃষ্ট সমালোচক, গভীর রাজনীতি সামাজিক সাহিত্য ও বাণিজ্যাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সুলেখক বলিয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া-ছেন,—অন্যপক্ষে রঙ্গরস রসিকতায়, শ্লেষব্যঙ্গ বিদ্রূপে ও বর্ত্তমান সামা-জিক পাপচিত্র অঙ্কিত করিয়া, পাকে প্রকারে সামাজিকগণকে ধিক্কার দিতে মুক্ত হস্ত।—ইতিমধ্যে তাঁহার "উমা" ও "রূপহলরী" দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে,—সামাজিক উপন্যাস ও গল্পলেখায়,—দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। গল্পের ভাষা ও লিখিবার ভঙ্গী তাঁহারই নিজস্ব; রূপ লহরীর প্রত্যেক গল্পে সংসারে মানব চরিত্রের "ফটোগ্রাফ" তুলিয়াছেন,—গল্পের ভাব প্রাচুর্য্য, রসমাধুর্য্য, অর্থ গাম্ভীর্য্য, সুশব্দ বিন্যাস চাতুর্য্য—পাঁচকড়ি বাবুর একাধারে এত গুণপণা থাকিলেও বাঙ্গালা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া আমরা তাঁহার শক্রবৃদ্ধি করিব না।

পাঁচকড়ি বাবু অকৃতজ্ঞ নহেন,—"রূপলহরী" পুস্তকখানি তাঁহার পুরাতন মনীব "বঙ্গবাসীর" একমাত্র সত্ত্বাধিকারী মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়েকে উৎসর্গ করিয়া মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন; উপযুক্ত পাত্রে "রূপ-লহরী" উৎসর্গ হইয়াছে দেখিয়া,—আমরা যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়াছি।

পঞ্চপুষ্প।—শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র; রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও ঐতিহাসিক গল্প রচনায় হরিসাধন বাবু সিদ্ধ হস্ত। বর্ত্তমান "পঞ্চপুষ্পে" তিনি তাঁহার যশঃ সৌরভ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। দিল্লীশ্বর আকবরের মহত্ত্ব, বাঙ্গালী জমিদার কন্যা প্রভাবতীর বাঙ্গালার তৎকালীন সুবাদার সাহসুজার নিকট হইতে স্বধর্ম্মরক্ষা;—স্বীয় কন্যার ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত স্বহস্তে অরি-সিংহের কন্যাবধ। দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় নিজে উপবাসী থাকিয়া ষোড়শ বর্ষীয় মাতৃবৎসল বালক বীর সিংহের উপকারী সুকন্যাকে খাদ্যদান, তজ্জন্য কারাবাস ইত্যাদি বিবরণ পাঠ করিতে করিতে শরীর লোমাঞ্চিত হয়, ও যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদে মগ্ন হইতে হয়। অতীত গৌরবই এখন আমাদের জাতীয় জীবনের একমাত্র সম্বল, আন্দোলনেও সুফল অনেক; এই পাঁচটি গল্পের মধ্যে কোন কোনটি ইতিপূর্ব্বে কোন মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে "পঞ্চপুষ্প" বাঙ্গালা সাহিত্যে সৌরভময় হইয়াছে।

গাথা।—(কবিতা পুস্তক) শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস প্রণীত, মূল্য ছয় আনা। সময় সময় প্রাণের উচ্ছ্বাসে ও কোন কোন ঘটনা উপলক্ষে কবি যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই পুস্তকাকারে গাথায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সকল কবিতাই পাঠ করিয়াছি; কবির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নাই।

অশ্রুবিন্দু।—শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, (মূল্যের উল্লেখ নাই, সম্ভবত বিনামূল্যে বিতরিত।) আজকাল কবিতার উচ্ছ্বাস চারিদিকে। "অশ্রুবিন্দু" পুত্রবিয়োগে পিতার শোকোচ্ছ্বাস, সেই জন্য হৃদয়গ্রন্থি শোক উচ্ছ্বাসময়ী হইয়াছে। এই অপার্থিব সংসারে এরূপ শোক উচ্ছ্বাস যত অল্প প্রকাশিত হয়, ততই মঙ্গল।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।)

১১শ বর্ষ। } আশ্বিন, ১৩০৯ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

দুর্গাপরাধক্ষমাপণ-স্তোত্রম্

(শঙ্করাচার্য্য-কৃতম্)

(১)

শিশৌ নাসীদ্ বাক্যং জননি তব মন্ত্রং প্রজপিতুং
কিশোরে বিদ্যায়াং বিষমবিষয়ে তিষ্ঠতি মনঃ।
ইদানীঞ্চেৎ ভীতো মহিষগলঘণ্টাঘনরবাৎ
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ॥

শৈশবে আমার বাক্-শক্তি না থাকায়,
জপিতে তোমার মন্ত্র না ছিল উপায়।
যে বিদ্যা লভিতে হ'লে কষ্ট অতিশয়,
তাহাতে ছিলাম রত যৌবন সময়।
মহিষের ঘণ্টারব শুনিয়া এখন,
যমভয়ে ভীত যদি হয় মোর মন,
নিরাশ্রয় মোরে যদি না রাখ এখনি,
কাহার আশ্রয় লব গণেশ-জননি!

(২)

হরিঃ শেতে শেষে নন্থ কমলজো নাভিকমলে
সমাধৌ সংলীনঃ পুরমথনদেবঃ প্রতিদিনম্।

ভবাৎ ভীতো মাতঃ পদকমলযুগ্মং তব বিনা
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ॥

অনন্ত-শয্যায় শুয়ে রন্ নারায়ণ,
নাভিপদ্মে ব্রহ্মা তাঁর করেন শয়ন।
ত্রিপুর-নিধন-কারী যিনি মহেশ্বর,
তিনিও সমাধি-মগ্ন রন্ নিরন্তর।
ভব-ভয়ে ভীত হ'য়ে পড়েছি এখন,
নাহি মোর গতি, বিনা তব শ্রীচরণ।
নিরাশ্রয় মোরে যদি না রাখ এখনি,
কাহার আশ্রয় লব গণেশ-জননি!

(৩)

পরিত্যক্তা দেবাঃ কঠিনতরসেবাকুলতয়া
ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমপনীতে তু বয়সি।
ইদানীং মে মাতস্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ॥

দেবতা-গণের সেবা কঠিন ব্যাপার,
তাই করিলাম আমি তাহা পরিহার।
কিছুতেই তাহে মন না হ'লো তৎপর,
কাটাইনু জীবনের পঁচাশী বৎসর।
এই বৃদ্ধকালে মোর ব্যথিত অন্তরে
কৃপা যদি নাহি কর বারেকের তরে,
কাহার আশ্রয় তবে লইব এখনি,
ব'লে দাও, শুনি মাগো গণেশ-জননি!

(৪)

ন মে বাক্যং যুক্তং ন হি যদনুরক্তং জপবিধৌ
ন পূজায়াং ধ্যানে ধরণিধরকন্যে মম মনঃ।

প্রসীদ ত্বং মাতর্গুণরহিতপুত্রেঽধিকদয়া
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ॥

পরম অজ্ঞান আমি,—আমার বচন
করিতে না পারে তব মহিমা কীর্ত্তন।
ধ্যান পূজা জপে তব পর্ব্বত-নন্দিনি!
কিছুতেই মোর মন না যায় জননি!
মোর প্রতি থাক দুর্গে! সুপ্রসন্ন হ'য়ে,
মাতার অধিক স্নেহ নির্গুণ তনয়ে।
নিরাশ্রয় মোরে যদি না রাখ এখনি,
কাহার আশ্রয় লব গণেশ-জননি!

(৫)

স্বয়ম্ভূস্ত্বৎপাদাম্বুজভজনকর্ত্তৈব জগতা-
মভূৎ কর্ত্তা ভর্ত্তা হরিরপি তথৈবাস্য জগতঃ।
সদা ভর্গী শম্ভুঃ পদকমলমেতাদৃশমৃতে
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ॥

তোমারি চরণ-পদ্ম সেবি সর্ব্বক্ষণ
সৃষ্টি করেছেন ব্রহ্মা এই ত্রিভুবন!
তোমারি চরণ-পদ্ম পূজি অনিবার
পালন করেন বিষ্ণু এই ত্রিসংসার!
তোমারি চরণপদ্ম পূজি অনুক্ষণ
সংহার করেন শিব এই ত্রিভুবন!
হেন পাদ-পদ্ম বিনা গণেশ-জননি!
কাহার আশ্রয় লব কহ মোরে শুনি!

(৬)

ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো
ন চাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ।

ন জানে মুদ্রাস্তে তদপি চ ন জানে বিলপনং
পরং জানে মাতস্ত্বদনুসরণং ক্লেশহরণম্ ॥

নাহি জানি মন্ত্র যন্ত্র, নাহি জানি ধ্যান,
নাহি জানি স্তুতি নুতি, না জানি আহ্বান,
কিরূপ তোমার মুদ্রা, না জানি কখন্,
না জানি কিরূপ মাগো! তব বিলপন।
যে জন আশ্রয় লয়, জননি! তোমার,
দুঃখ তুমি নাশ তার,—এই জানি সার!

(৭)

পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্তি সরলাঃ
পরং তেষাং মধ্যে বিরলতরলোঽহং তব সুতঃ।
মদীয়োঽয়ং ত্যাগঃ সমুচিতকৃতির্নো তব শিবে
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥

শত শত সাধু শিষ্ট সন্তান তোমার
এ সংসারে রহিয়াছে, সীমা নাহি তার।
তাহাদের মধ্যে আমি নাহি পাই স্থান,
এরূপ দুর্ম্মতি আমি, এরূপ অজ্ঞান!
যদিও করেছ তুমি মোরে পরিহার,
পরিহার কিন্তু মাগো! সাজে কি তোমার?
কুপুত্র হইবে পুত্র, অসম্ভব নয়,
কুমাতা হইবে মাতা, সম্ভব কি হয়?

(৮)

জগন্মাতর্মাতস্তব চরণসেবা ন রচিতা
ন বা দত্তং দেবি দ্রবিণমপি ভূয়স্তব ময়া।
তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥

জগৎ-জননি দুর্গে! জননি! আমার,
নাহি সেবিলাম কভু চরণ তোমার।
তোমার উদ্দেশে মাগো! আমি কদাচন
নাহি করিয়াছি বহু ধন বিতরণ।
তথাপি অতুল স্নেহ আমার উপর
প্রদর্শন করিতেছ তুমি নিরন্তর।
যতই করুক পুত্র মন্দ আচরণ,
মাতা তার না করেন কদাপি তেমন!

(৯)

বিধেরজ্ঞানেন দ্রবিণবিরহেণালসতয়া
বিধেয়াশক্যত্বাৎ তব চরণয়োর্বিচ্যুতিরভূৎ।
তদেতৎ ক্ষন্তব্যং জননি সকলোদ্ধারিণি শিবে
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥

বিহিত বিধানে পূজা না জানি তোমার,
না আছে অর্থের বল কিছুই আমার।
পরম অলস আমি সকল সময়,
কর্ত্তব্য কার্য্যেও মোর শক্তি নাহি রয়।
এই সব বিড়ম্বনা সর্ব্বদা আমার,
না পাইনু স্থান তাই চরণে তোমার।
তাই বলি ওমা দুর্গে উদ্ধার-কারিণি!
অপরাধ ক্ষমা কর আমার জননি!
সত্য বটে আছে বহু কুপুত্র ধরায়,
হায় রে কুমাতা কিন্তু কোথা দেখা যায়?

(১০)

চিতাভস্মালেপো গরলমশনং দিক্‌পটধরো
জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারী পশুপতিঃ।
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং
ভবানি ত্বৎপাণিগ্রহণপরিপাটীফলমিদম্ ॥

সর্ব্বাঙ্গে মড়ার ছাই মাখে সর্ব্বক্ষণ,
সর্ব্বদাই করিতেছে গরল ভক্ষণ,
কণ্ঠে সর্প জড়াইয়া করে কণ্ঠহার,
মাথায় ধরিয়া থাকে নিত্য জটাভার,
মড়ার মাথার খুলি ধ'রে আছে করে,
ভূত নাচাইয়া ঘুরে দুয়ারে দুয়ারে,
একে ত উলঙ্গ শিব, তায় পশুপতি,
তবু শিব ত্রিলোকের একমাত্র গতি!
ভাগ্যে শিব সনে তব বিবাহ হইল,
তাই ত শিবের এই সুফল ফলিল!

(১১)

ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা ন চ বিভববাঞ্ছাপি হৃদি মে
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ।
অতস্ত্বাং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ
মৃড়ানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবানীতি জপতঃ॥

নাহি মোর কিছুমাত্র মোক্ষের কামনা,
নাহি মোর কিছুমাত্র অর্থের বাসনা,
তত্ত্বজ্ঞান হেতু মোর নাহি অভিলাষ,
সুখলাভ হেতু মোর নাহিক প্রয়াস।
শিব শিব শিব শম্ভু শিবানী ভবানী
মৃড়ানী রুদ্রাণী দুর্গা উমা কাত্যায়নী,
করিতে করিতে এই নাম উচ্চারণ—
জন্ম যেন কেটে যায়,—প্রার্থনা এখন!

(১২)

নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ
কিং রুক্ষচিন্তনপরৈর্ন কৃতং বচোভিঃ।
শ্যামে ত্বমেব যদি কিঞ্চন ময্যনাথে
ধৎসে কৃপামুচিতমম্ব পরং তবৈব॥

নানা উপচারে মাগো! কভু একবার
যথাবিধি পূজা নাহি করিনু তোমার।
কুচিন্তা করিয়া পুনঃ কুবাক্য বলিয়া
কিবা পাপ না করিনু, দেখিনু বুঝিয়া।
নিবেদন করি দুর্গে! শুন একবার,
নিরাশ্রয় পুত্র আমি, জননি! তোমার।
মোরে যদি কিছু কৃপা কর এ সময়,
পরম উচিত তাহা, বলিব নিশ্চয়!

(১৩)

শ্বপাকো জল্পাকো ভবতি মধুপাকোপমগিরা
নিরাতঙ্কো রঙ্কো বিহরতি চিরং কোটিকনকৈঃ।
তবাপর্ণে কর্ণে বিশতি মনুবর্ণে ফলমিদং
জনঃ কো জানীতে জননি জপনীয়ে জপবিধৌ॥

জাতিতে চণ্ডাল মাগো! হয় যেই জন,
সেও মধুময় বাক্য কহে অগণন!
পরম দরিদ্র জন নিশ্চিন্ত হইয়া
সুখে থাকে রাশি রাশি সুবর্ণ লইয়া!
তোমার মন্ত্রের এক অক্ষর কেবল
কর্ণে যার যায়, তার এই সব ফল!
কিন্তু মাগো! তব মন্ত্র জপে যেই জন,
কি ফল তাহারে দাও, না জানি কখন!

(১৪)

আপৎসু মগ্নঃ স্মরণং ত্বদীয়ং
করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি।
নৈতৎ শঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ
ক্ষুধাতৃষার্ত্তা জননীং স্মরন্তি॥

করুণা-সাগর দুর্গে! তুমিই ধরায়,
তব নাম স্মরে যেই, তরাও তাহায়!
বিপৎ-সাগরে মাগো! হইয়া মগন
করিতেছি তব নাম সদাই স্মরণ।
যাহা কিছু বলিতেছি, সত্য সমুদয়,
শঠ বলি যেন মোরে না কর প্রত্যয়।
সন্তান ব্যাকুল হ'লে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়
অমনি স্মরণ করে তাহার মাতায়!

(১৫)

জগদম্ব বিচিত্রমত্র কিং
পরিপূর্ণা করুণাঽস্তি চেন্ময়ি।
অপরাধপরম্পরাবৃতং
নহি মাতা সমুপেক্ষতে সুতম্॥

অসীম করুণা তব জগৎ-জননি!
দেখাতেও পার মোরে, আশ্চর্য্য না গণি।
নানা দোষ করিলেও পুত্র নিরন্তর,
মাতা তার না করেন কভু অনাদর!

(১৬)

মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী ত্বৎসমা ন হি।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথা যোগ্যং তথা কুরু॥

আমার সমান নাই মহাপাপী জন,
পাপ-বিনাশিনী নাই তোমার মতন।
তাই বলি ওমা দুর্গে! এ সব বুঝিয়া
যাহা ইচ্ছা কর তুমি প্রসন্ন হইয়া!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উত্তটসাগর বি, এ

নীলকণ্ঠ স্তোত্রম্

(শঙ্করাচার্য্য-কৃতম্)

(১)

জটাজূটধারী স্ফুরদ্ব্যোমকেশঃ
শ্মশানপ্রচারী মহাভীমবেশঃ।
ললাটে বিরাজৎসুধারশ্মিখণ্ডঃ
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো নীলকণ্ঠ॥

মস্তকে ধারণ কর জটা দিবানিশি,
ঊর্দ্ধদিকে ছুটিতেছে তব কেশরাশি।
শ্মশানে বেড়াও তুমি সকল সময়,
দেখে তব সাজ সজ্জা প্রাণে হয় ভয়।
যে চন্দ্রের সুধা-রশ্মি হৃদয় জুড়ায়,
তার আধ খানি মাত্র রেখেছ মাথায়।
নিবেদন করি, ওহে নীলকণ্ঠ হর!
প্রসন্ন হও হে সদা আমার উপর।

(২)

মহাশঙ্খমালী করালত্রিশূলী
শিবাবক্ত্রপদ্মামৃতপ্রাশশালী।
ভুজঙ্গাবতংসস্ফুরচ্চারুগণ্ডঃ
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো নীলকণ্ঠ॥

মড়ার মাথার খুলি করহ ধারণ,
ত্রিশূল ধরিয়া করে থাক অনুক্ষণ।
দুর্গার বদন-পদ্ম-মধু-পানে রত,
ভুজঙ্গ-ভূষায় তব গণ্ড বিমণ্ডিত।
নিবেদন করি, ওহে নীলকণ্ঠ হর!
প্রসন্ন হও হে সদা আমার উপর।

(৩)

মহাকালরূপী চিতাভস্মধারী
কপালী চ চাপী মহাভীতিহারী।
শ্মশানাস্থিমালাকণচ্চারুকণ্ঠঃ
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো নীলকণ্ঠ ॥

মহাকাল-মূর্ত্তি তুমি ধরহ সদাই,
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া থাক শ্মশানের ছাই।
মড়ার মাথার খুলি, ধনুঃ করে ধর,
জীবের বিষম ভয় সব দূর কর।
মড়ার হাড়ের মালা ধারণ করায়
কি সুন্দর কণ্ঠে তব শব্দ শুনা যায়।
নিবেদন করি, ওহে নীলকণ্ঠ হর!
প্রসন্ন হও হে সদা আমার উপর।

(৪)

প্রভুঃ পঞ্চবক্ত্রো ভবানীকলত্রো
বিশালত্রিনেত্রো ভুজঙ্গাতপত্রঃ।
মহোগ্রপ্রতাপো ভয়ত্রাণশৌণ্ডঃ
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো নীলকণ্ঠ ॥

তুমিই ঈশ্বর, তুমি দেব পঞ্চানন,
কাত্যায়নী পত্নী তব প্রেম-নিকেতন।
বিশাল তিনটী নেত্র ধর নিরন্তর,
ভুজঙ্গের ছত্র ধর মাথার উপর।
প্রচণ্ড প্রতাপে তব ভীত হয় প্রাণ,
জীবগণে মহাভয় হ'তে কর ত্রাণ।
নিবেদন করি, ওহে নীলকণ্ঠ হর!
প্রসন্ন হও হে সদা আমার উপর।

(৫)

তুষারেন্দুকুন্দচ্ছবিভ্রাজমানো
মহাযোগপীঠাশ্রিতঃ সাবধানঃ।
ভবানীহৃতাঙ্গঃ সগঙ্গঃ প্রচণ্ডঃ
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো নীলকণ্ঠ ॥

চন্দ্র, কুন্দপুষ্প, পুনঃ তুষার সমান
তোমার শরীরে শুভ্র কান্তি বিদ্যমান।
মহাযোগাসনে তুমি হ'য়ে অবস্থিত
হইয়া একাগ্রচিত্ত যোগ কর কত।
ভবানী বামাঙ্গে তব, তুমি ভয়ঙ্কর,
গঙ্গাদেবী শিরে তব রন্ নিরন্তর।
নিবেদন করি ওহে নীলকণ্ঠ হর!
প্রসন্ন হও হে সদা আমার উপর।

(৬)

অনঙ্গাবঘাতী ভুজঙ্গোপবীতী
কৃপাবারিসিন্ধুঃ স্বভক্তস্য বন্ধুঃ।
গিরীশো মহেশঃ কৃতামিত্রদণ্ডঃ
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো নীলকণ্ঠ ॥

করিয়াছ মদনের জীবন বিনাশ,
ভুজঙ্গের যজ্ঞসূত্র পর বারমাস।
স্বভক্তের বন্ধু তুমি, করুণা-সাগর,
কৈলাশ-গিরির ওহে তুমি অধীশ্বর।
তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই এ সংসারে,
যে তোমার ভক্ত নয়, দণ্ড দাও তারে।
নিবেদন করি ওহে নীলকণ্ঠ হর!
প্রসন্ন হও হে সদা আমার উপর।

(৭)

বিভু র্দেবগৌরীপতির্বিশ্বনাথঃ
সুরাণামধীশঃ পরব্রহ্মবেষঃ।
বৃহদ্বাহুদণ্ডে স্ফুরচ্ছৈলদণ্ডঃ
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো নীলকণ্ঠ ॥

তুমি প্রভু, গৌরীনাথ, তুমি বিশ্বেশ্বর,
যাবতীয় দেবতার তুমি অধীশ্বর।
তুমিই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম-নিকেতন,
শোভে তব বাহুদণ্ড শৈলের মতন।
নিবেদন করি, ওহে নীলকণ্ঠ হর!
প্রসন্ন হও হে সদা আমার উপর।

(৮)

বরাভীতিদাতা জ্বলদ্বহ্নিনেত্রো
মহাশক্তিজানির্জ্জলচ্ছেতগাত্রঃ।
কটীদেশভাগে লসচ্চর্ম্মখণ্ডঃ
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো নীলকণ্ঠ ॥

কিবা বর, কি অভয়, দাও অবিরল,
নেত্র হ'তে ক্ষরে তব প্রবল অনল।
স্বয়ং শক্তিই হায় গৃহিণী তোমার,
রৌপ্য সম গাত্র তব শুভ্র অনিবার।
একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্ম করিয়া গ্রহণ
তাহাতেই হয় তব সুন্দর বসন।
নিবেদন করি, ওহে নীলকণ্ঠ হর!
প্রসন্ন হও হে সদা আমার উপর।

(৯)

ইমং নীলকণ্ঠস্তবং যে পঠন্তি
স্মরারেঃ পুরস্তাৎ দিবা বা নিশায়াম্।

বিচিত্রং কলত্রং যশঃ পুত্রমিত্রে
ধনং তে লভন্তে শিবস্থানমন্তে ॥

দিন হোগ্ রাত্রি হোগ্,—যে কোন সময়
শিবের সম্মুখে গিয়া হইয়া তন্ময়
নীলকণ্ঠ স্তব যদি কেহ পাঠ করে,
পুত্র-মিত্র-আদি তার হয় এ সংসারে।
পরলোকে সেই জন শিবত্বও পায়,
ইহার অন্যথা কভু না হয় ধরায়!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, কাব্যরত্ন উদ্ভট্টসাগর বি-এ

পাঁচীর প্রতিশোধ।

(১)

কাশীর বাঙ্গালীটোলায় সর্ব্বানন্দ মুখোপাধ্যায় কয়েক বৎসর অবধি পেন্সন লইয়া কাশীবাস করিতেছেন। তিনি মোটা মাহিনার চাকরি করিয়াছিলেন, এবং মাসিক তিন শত টাকা পেন্সন পাইতেন। সুতরাং তিনি প্রচুর নগদ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, ও কিছু ভূ-সম্পত্তিও ছিল। কিন্তু বাঙ্গালীসমাজে তাঁহার একটা অপবাদ ছিল যে, তিনি নিতান্ত কৃপণ। তাঁহার তৃতীয় পক্ষের ভার্য্যা শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী স্বামীর কৃপণতার জন্য নানা লোকের মুখে নানাকথা শুনিয়া ও অনেক দিন পতিনিন্দা সহ্য করিয়া অবশেষে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাঁহার পতির এ কলঙ্ক মোচন করিবেন। শারদীয়া পূজার তিন মাস পূর্ব্ব হইতেই তিনি স্বামীকে জেদ করিয়া ধরিলেন যে, সর্ব্বানন্দ বাবুর পৈতৃক বাটীতে, কোন্নগরে গিয়া, খুব জাঁক-জমকে দুর্গোৎসব করিতে হইবে। সর্ব্বানন্দ বাবু দুই একবার একটু ইতস্ততঃ করিয়াও, অনঙ্গমোহিনীর আবদারে সম্মত হইলেন, ও পূজার একমাস পূর্ব্বে সপরিবারে কাশীধাম হইতে রওনা হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নলিনীমোহন সম্প্রতি বি-এ পাশ করিয়া, একটী গবর্ণমেণ্ট আফিসে চাকরি পাইয়াছে। পূজার সময় তাহার চারদিন বই ছুটী নাই। অগত্যা নলিনীকে কাশীতে থাকিতে হইল। তাহার সঙ্গে একজন হিন্দুস্থানী পাচক ব্রাহ্মণ,

গোবর্দ্ধন নামে একজন বিহার অঞ্চল-বাসী খোট্টা চাকর ও অনঙ্গমোহিনীর বাঙ্গালী দাসী পাঁচী কাশীর বাটীতে রহিল। এইখানে পাঠককে পাঁচীর একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। আজ পাঁচ বৎসর হইল, অনঙ্গমোহিনী পাঁচীকে পছন্দ করিয়া পরিচারিকা রাখিয়াছেন। পাঁচীর বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর। যদি স্ত্রীলোকদিগের সমালোচনা ঠিক্ বলিয়া মানিতে হয়, তবে পাঁচীর রূপবর্ণনা সম্বন্ধে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, পাঁচী দেখিতে পাঁচ পাঁচী। পাঁচীর যখন পনর বৎসর বয়স, তখন তাহার পতি পরলোকে প্রস্থান করিয়াছিল। কিন্তু বিধবা হইয়াও পাঁচী পাড়ওয়ালা কাপড় পরিতে, পান খাইতে ও পুরুষমানুষের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করিতে ভালবাসে। কিন্তু তাহা হইলেও নারী-সমাজে পাঁচীর প্রতিপত্তি ছিল যে, পনর বৎসর বয়সের বিধবা হইয়াও, আজ পর্য্যন্ত এই পঁচিশ বৎসরের পূর্ণ যৌবনেও পাঁচী পঞ্চবাণের ধার ধারে না।

সে যাহা হউক, সর্ব্বানন্দবাবু সপরিবারে দেশে চলিয়া গেলে, পাঁচীর সময় কাটান বড়ই ভার হইয়া উঠিল। কিন্তু কি করে? মেড়ুয়া বামুন আর চাকরের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া, তাহাদিগকে নানা ছন্দোবন্ধে গালি দিয়া, খোট্টা জাতির পিতৃপুরুষকে প্রতিদিন প্রেতলোকে পাঠাইয়া, পাঁচী বহুকষ্টে দিন কাটাইতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে নলিনী বাবু আফিস হইতে ফিরিয়া আসিলে, পাঁচী জলখাবারের রেকাবি, বরফ দেওয়া জলের গেলাস ও পানের ডিবে হাতে লইয়া, নিজে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে, দোতালার ঘরে তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইত। কিন্তু নলিনী বাবুর একটা বড় দোষ ছিল। সে কাহারও সঙ্গে অধিক কথা কহিত না। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে তাহার মুখ হইতে কথা বাহির হইত না। তাহার বন্ধুগণ বলিত, "নলিনীর সাতেও হুঁ! পাঁচেও হুঁ!" নলিনীর এই মিতভাষিতা অন্যের পক্ষে যত না হউক, পাঁচীর বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল। সে মেড়ুয়াদ্বয়ের সঙ্গে সমস্ত দিনের কলহ ও গণ্ডগোলের পর, মনে কত আশা করিয়া নলিনী বাবুর নিকটে যাইত যে, দুটো বাঙ্‌লা কথা শুনিয়া, দুই চারিটা সরস কথা বলিয়া, কিছুক্ষণ গল্প করিয়া, প্রাণটা ঠাণ্ডা করিবে! সে নলিনী বাবুকে কত সংবাদ দিত, কত কথা জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু নলিনী "হাঁ" "হুঁ"তেই তাহার উত্তর দিত। বার বার এইরূপে উপেক্ষিতা হইয়া, শেষে একদিন পাঁচী বড়ই চটিয়া উঠিল। নলিনীর জলখাবার খাওয়া শেষ

হইলে, সে পানের ডিবা হইতে তাঁহার হাতে পান দিয়া বলিল, "বলি দাদা বাবু! একটী কথা তোমাকে বলি, মানুষের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে তোতা পাখীরও মুখ ফোটে!" নলিনী পূর্ব্বের মত মাথা হেঁট করিয়া বলিল, "হুঁ।"

পাঁচী অনেক কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিল, "লোকে যে বলে, তোমায় 'সাতেও হুঁ, পাঁচেও হু', তা বড় মিথ্যে নয়! আর যা হোক্, একটা কথা আমার বড় আশ্চর্য্যি মনে হয়। এই গ্যাল বছরে তোমার বিয়ে হয়েছে। কখনও না কখনও তোমাকে শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে! তা যখন শালী শালাজেরা তোমার সঙ্গে কথা কইতে আস্‌বে, তখন কি ক'রবে বল দিকি?"

নলিনী আবার বলিল, "হাঁ!"

এবার পাঁচী ধৈর্য্য হারাইল। সে বলিল, "কেবল হাঁ আর হুঁ! দূর কর ছাই, এমন জান্‌লে, আমিও বউঠাকরুণের সঙ্গে দেশে চলে যেতুম!"

সেই দিন অবধি পাঁচী আর নলিনী বাবুর নিকটে আসিত না। সে পাচক বামুনের হাত দিয়া জলখাবার প্রভৃতি পাঠাইয়া দিতে লাগিল। পাঁচী মনে মনে বলিল, "যেমন ক'রে পারি, এর একটা প্রতিশোধ দিতে হবে!"

(২)

রবিবার আজ নলিনীকে বাটী হইতে কোথাও যাইতে হয় নাই। সে আহারাদির পর উপরের সেই ঘরটীতে বসিয়াছিল, এমন সময়ে তাহার বন্ধু রমণীমোহন বসু তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। দু-জনে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। পাঁচী সিঁড়ির পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের কথা শুনিয়া বলিল, "তাইতো! আজ যে দেখ্‌চি খুব মুখ ফুটেছে।" কিছুক্ষণ পরে রমণী বাবু নীচে নামিয়া আসিলেন। পাঁচী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গো রমণী বাবু! তুমি যে বড় পূজোর ছুটীতে এবার দেশে যাওনি?"

রমণী বাবু বলিলেন, "আর সকলে গিয়েছে, কেবল আমি তোমার নলিনী বাবুর মত একলা পড়েছি!"

"কেন গো! তোমার না শুনেছি, এক মাসের ছুটী!"

"তা বটে! কিন্তু এবার বড় বিপদে প'ড়েছি। লাহোর থেকে আমার জাট্‌শ্বশুর পরিবারদের সঙ্গে নিয়ে কাশীতে আস্‌বেন। পাছে এখানে তাঁদের কোনও কষ্ট হয়, সেইজন্য বাবা আমাকে এখানেই থাক্‌তে বল্লেন।"

"তা বেশ হয়েছে! দিন কতক খুব আমোদ আহ্লাদে কাট্‌বে, তা তাঁরা কবে আস্‌বেন?"

"দু এক দিনের মধ্যেই আসবার কথা আছে। আস্‌বার আগে তাঁরা চিঠি লিখ্‌বেন। আজই বোধ হয় চিঠি আস্‌তে পারে।"

"তাঁরা তো তোমাদের বাড়ীতেই এসে থাক্‌বেন?"

"না! তাঁরা শিকরোলে আগে থেকেই একটা বাংলা ভাড়া ক'রে রেখেচেন।"

রমণী বাবু দেখিতে পাইলেন না, পাঁচীর মুখ হঠাৎ প্রফুল্ল হইল। তাহার ডাগর চক্ষু দুটী বিস্ফারিত হইল। রমণীবাবু চলিয়া গেলেন। পাঁচী দৌড়িয়া গিয়া গোবর্দ্ধনকে বলিল, "বলি হ্যাঁরে মেড়ুয়া মিন্‌সে? কর্ত্তা বাবু দেশে চ'লে যাওয়া অবধি তুইতো একটাও কাম করচিস্ না। কেবল ডালরুটির শ্রাদ্ধ ক'রচিস, আর মাথায় পগ্‌গ বেঁধে, স্ফূর্ত্তি করে ব্যাড়াচ্চিস! এখন একটা কাম তোকে বাত্‌লে দিই, কর্‌তে পারবি কিনা বল্?"

পাঁচী বাঙ্গালী, আবার তাহার উপর কর্ত্রীঠাকুরাণীর সখের চাকরাণী বলিয়া, হিন্দুস্থানী চাকরদিগের নিকট তাহার খুব মানসম্ভ্রম ছিল। গোবর্দ্ধন বলিল, "তা হাম্‌কো বোলনা পাঁচী দিদি! কোন্ কামটা কোরতে হোবে! হামি কি কাম কোর্‌তে নারাজ আছে?"

পাঁচী বলিল, "তবে শোন্। শীগ্‌গির ডাকখানায় যা। আর ডাক-বাবুকে জিজ্ঞাসা ক'রে, রমণী বাবুর নামে যত চিঠি আছে, আমাকে এনে দে। রমণীবাবু আমাকে ব'লে গেলেন, তাঁর চাকরের বোখার হয়েছে। তাই তোকে দু তিন দিন ডাকঘরে গিয়ে, তাঁর সব চিঠি এনে দিতে হবে।" গোবর্দ্ধন বলিল, "এতো থোড়া কাম। হামি এখনি ডাক-খানামে যাচ্চে।" পাঁচীর আদেশমত গোবর্দ্ধন ডাকঘরে রমণী বাবুর চিঠির তল্লাসে গেল। পাঁচী একাকিনী বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

(৩)

পরদিন বৈকালে পাঁচী একাকিনী শিক্‌রোলে গিয়া, দু একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া সংবাদ পাইল যে, আজ প্রভাতে লাহোর হইতে একজন বাবু সপরিবারে আসিয়াছেন, ও তাঁহারা বাগিচাওয়ালা বড় বাংলাটী ভাড়া লইয়াছেন। পাঁচী মুখে আঁচল দিয়া হাসিতে হাসিতে বাগিচাওয়ালা বাংলার গেটের নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। বাংলার ভিতর হইতে একটী বাঙ্গালী যুবতী তাহাকে দেখিতে

পাইয়া ভিতরে আসিতে ইঙ্গিত করিল। পাঁচী তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। প্রবাসে বাঙ্গালীর মেয়ে হঠাৎ অচেনা বাঙ্গালী দেখিলে, বিশেষতঃ বাঙ্গালী স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলে, যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায়! যুবতী পাঁচীকে বলিল, দাঁড়িয়ে রইলে যে? এইখানে বোস না!

"ওমা! সত্যি নাকি! এও বটতলায় থাকে! আমার ভগ্নীপতিও যে বটতলায় থাকে! তবে তাকে তুমি চেন তো?"

"কে তোমার ভগ্নীপতি, তা না বল্‌লে কি ক'রে ব'লব?"

"তার নাম রমণীমোহন বসু।"

"নরেশ বাবুর ছেলে রমণীবাবু? সে তো আমাদের এক বাড়ী বল্‌লেই হয়।"

"বটে! তা এতক্ষণ বল্‌তে নেই? সে যে আমার কাকা বাবুর মেয়ে মোক্ষদার বর! একটু বস, আমি মাকে ডেকে আনি। ও মা! একবার শীগ্‌গির এখানে এস! এই দেখ, কে একজন আমাদের মোক্ষদার বরের খবর নিয়ে এসেছে।"

মোক্ষদার বরের নিকট হইতে কে আসিয়াছে, এই সংবাদ তড়িৎ-বার্ত্তার মত সেই বৃহৎ বাংলার চারিদিকে নিমেষের মধ্যে রাষ্ট্র হইল। নিমেষের মধ্যে চারিদিক হইতে রমণীমণ্ডলী দৌড়িয়া আসিল। রান্নাঘর, গোসলখানা, শয়ন কক্ষ ও বারাণ্ডা হইতে, যে যেখানে ছিল, যুবতী, বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া ও বালিকা দ্রুতপদে আসিয়া পাঁচীকে বেষ্টন করিয়া, তাহাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিল।

"তা সে ভাল আছে তো গা?"

"সে তো জান্‌তে পেরেছে, আমরা এখানে এসেছি?"

"আমাদের সঙ্গে এখনও যে দেখা কর্‌তে এল'না? একবার এলে হয়, ভাল ক'রে তার গুমোরটা ভাঙ্‌বো।"

পাঁচী বলিল, "তা তোমরা মিছে কেন তাঁর দোষ দিচ্চ? তাঁকে ডাক্‌তে না পাঠালে, তিনি কেন আস্‌বেন?"

"ইস! তাঁকে আবার সাধ্যসাধনা ক'রে ডেকে আন্‌তে হবে। মোক্ষদা এখানে নেই কিনা, সেই জন্যে বুঝি?"

পাঁচী বলিল, "হাজার হোক নতুন জামাই! তিনি তো আর তোমাদিগকে চেনেন না।"

"না! চিন্‌বেন কেন? এখানে একবার এলে হয়, ভাল করে চিনিয়ে দিব! আমরা বিদেশে প'ড়ে আছি ব'লে বুঝি পর হ'য়ে গিয়েছি?"

একজন প্রৌঢ়া রমণী বলিলেন, "না বাছা! তুমি ও সব ছেলেমানুষদের কথা শোন কেন? তুমি একবার গিয়ে তাঁকে খবর দাও, আমরা আজ সকালে এখানে এসেছি। আমরা তো তাঁকে আগে থেকেই চিঠি পাঠিয়েছিলেম। একবার এসে আমাদের খবরটা নিলেই ভাল দেখাত। তা তুমি যাও বাছা! তাঁকে পাঠিয়ে দাও। আর তুমিও তাঁর সঙ্গে এস।"

"তবে আমি এখনি গিয়ে, তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্চি।"

প্রথম পরিচিতা যুবতী বলিল, "দেখিও, যেন তার আস্‌তে দেরি না হয়।"

পাঁচী চলিয়া গেল। রমণীগণ আনন্দে করতালি দিয়া হাসিতে লাগিল। আজ তাহাদের বড়ই আনন্দ, তাহারা মোক্ষদার বরকে দেখিবে ও তাহার সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিবে! পাঁচী কিছুদূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কি জানি, তোমাদের নতুন জামাই, যদি আমার কথায় না আসেন। আমার সঙ্গে একজন লোক পাঠিয়ে দিলে ভাল হয় না?"

প্রথম পরিচিতা যুবতী বলিল, তবে কেন দরোয়ানকে সঙ্গে দিয়ে একখানা গাড়ি করে সুধাকে পাঠিয়ে দাও না। কেমন রে সুধা! তোর মোক্ষদা দিদির বরকে ধোরে আন্‌তে পারবি?"

নবমবর্ষীয়া চঞ্চলা বালিকা সুধা সুধামাখা কথায় বলিল, "আমি আবার তাকে ধোরে আন্‌তে পারবো না দিদি? আমি এখনও ছেলেমানুষ নাকি?"

"আর যদি সে বলে, আমি যাবনা? তা হইলে কি কর্‌বি?"

সুধা উত্তর করিল, "তা হ'লে দু হাতে তার দুটো কান ধরে টেনে আন্‌ব।"

"তবে শীগ্‌গির আয়! তোকে গহনা আর ভাল কাপড় পরিয়ে দিই।"

পাঁচী জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের এখানে কতদিন থাকা হবে?

"পনর দিনের বেশী নয়! বাবা বলেন, দশদিনের মধ্যেই যেতে হবে।"

পাঁচী সুশোভিতা, সুন্দরী সুধাকে সঙ্গে লইয়া শকটারোহণে চলিল।

(৪)

নলিনী বাবুর বাটীর সম্মুখে গিয়া পাঁচী গাড়ী থামাইতে বলিল। নলিনীবাবু উপরের ঘরে বসিয়া Comedy of Errors পড়িতেছিলেন। পাঁচী সুধার হাত ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। নলিনীবাবু পাঁচীর সঙ্গে স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা বালিকাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি?

পাঁচী বলিল, ছি দাদা বাবু! তোমার এ কি রকম ব্যাভার বল দেখি? তোমার জাঠ্‌শ্বশুর আজ দুদিন থেকে শিক্‌রোলে পরিবারদের নিয়ে রয়েচেন! তোমার কি একবার তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে নেই? আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়াতে তাঁরা আমাকে কত লজ্জা দিলেন, তা আর কি বল্‌ব?

নলিনী বলিল, কই? আমি তো কিছুই শুনি নাই!

পাঁচী বলিল, "তা তুমি ঘরের কোনে একলা মুখ বুজিয়ে বসে থাকবে বইত নয়? কারুর তো খবর নাও না? তোমার কি একটু সাধ আহ্লাদ করতে ইচ্ছা হয় না? আহা, তোমার কত শালী শালাজ এসেছে। যেন চাঁদের হাট। তা এখন যাও, আর দেরি করিও না। তারা সব কি মনে কর্‌বে বল দেখি?

নলিনী কি করিবে, স্থির করিতে পারিল না। অনেকদিন পূর্ব্বে সে একবার শুনিয়াছিল, তাহার জাঠ্‌শ্বশুর বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কাশীতে আসিবেন। কিন্তু তারপর সে কথা আর শুনে নাই। হঠাৎ তিনি যে সপরিবারে চলিয়া আসিলেন, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। সে বলিল, আমি ত এর কিছুই জানি না।

পাঁচী একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া, মুখ ফিরাইয়া বলিল, না! আমি আর তোমার সঙ্গে বক্‌তে পারি না। তোমাকে বোঝান আমার সাধ্যি নয়! তবে ওগো বাছা সুধা! তুমি পার ত তোমার ভগ্নীপতিকে বুঝেসুজ্‌য়ে নিয়ে যাও।

সুধা নলিনীর হাত ধরিয়া বলিল, শীগ্‌গির চল বলচি! আমার সঙ্গে চালাকি খাট্‌বে না।

নলিনীর মনে হইল, তাইতো বিষম বিভ্রাট! একেতো অচেনা মেয়েমানুষের সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে তাহার সাহস হয় না, তাহাতে আবার দক্ষিণ আফ্রিকার সশস্ত্র, সমরকুশল বুয়ার সৈনিক-দলের মত বহুসংখ্যক শালী-শালাজের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে হইবে! কিন্তু কি করিবে? না গেলেও তো চলেনা! তাহারা কি মনে করিবে? লোকে কত নিন্দা করিবে! অগত্যা নলিনী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, তবে চল।

পাঁচী বলিল, "একটা কথা বল্‌তে ভুলে গিয়াছিলাম। আমার মাসীর বাড়ি থেকে আজ লোক এসেছে। আমার মাসীর বড় ব্যারাম। আমাকে আজ তাঁর কাছে যেতে হবে। পনর দিন পরে বউঠাক্‌রুণ এখানে ফিরে এলেই আমি আবার আস্‌বো।"

নলিনী বলিল, আচ্ছা!

সুধা নলিনী বাবুর সঙ্গে হাসিতে হাসিতে গাড়ীতে বসিল। শিকরোলে বাগিচাওয়ালা বাংলার গেটে গাড়ী থামিল। বাটীর পুরুষগণ সকলে নগর দর্শনে ও বায়ুসেবনে বাহির হইয়াছেন। সুতরাং মেয়েমহলে খুব গুলজার। সুধা নলিনীবাবুর হাত ধরিয়া একেবারে অন্তঃপুরে আসিয়া সানন্দে চীৎকার করিয়া বলিল, "ও মেজদিদি! বড় যে বলেছিলে, আমি ধরে আন্‌তে পার্‌বো না। এই দেখ্‌বে এস, মোক্ষদা দিদির বরকে কাণ ধোরে টেনে নিয়ে এসেছি।"

(৫)

মোক্ষদার বরের (জাঠ্‌তুতো) মেজো শালী তাহার সেজ্‌দাদার বউয়ের চুল বাঁধিয়া দিতেছিল, এমন সময়ে সুধার আওয়াজ তাহার কাণে গেল। সে বউয়ের আধবাঁধা খোঁপার উপরে সজোরে দুই তিনটা ঠোকর মারিয়া বরের দিকে ছুটিল। সেজো বউ এক হাতে খোঁপা ধরিয়া, আর এক হাতে ঘোম্‌টা টানিতে টানিতে দৌড়িল। বড় শালী রান্নাঘরের ধোঁয়ার ভিতর হইতে সজল নয়নে, আলুলায়িত কেশে, আলুথালু বেশে, বাহিরে দৌড়িয়া আসিলেন! কৃশাঙ্গী মেজ বউয়ের এক পায়ের আল্‌তা পরা শেষ হইয়াছিল, সবেমাত্র ডান পাটি বাড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে সুধার কথা শুনিতে পাইয়া দৌড়িয়া

বাহিরে আসিবামাত্র গোসলখানা হইতে ধাবমানা, আর্দ্রবসনা, স্থূলাঙ্গী সেজো খুড়ীর সঙ্গে, মেলট্রেনের সঙ্গে মালগাড়ীর বিষম কলিসনের মত, সজোরে ঠোকাঠুকি হইয়া গেল! বামীপিশি জামাইয়ের জলখাবারের জায়গা করিবার জন্য বারাণ্ডার ছাদের উপর ঝাঁট দিতেছিলেন, শুভসংবাদ শুনিবামাত্র, তিনি ক্ষিপ্রহস্তে ঝাঁটা ফেলিয়া দিয়া ছুটিলেন। বারাণ্ডার নীচে রাঙ্গা দিদি দাঁড়াইয়াছিলেন, শতমুখী সশব্দে, সজোরে তাঁহার ঘাড়ের উপর পড়িল। "কে লা! চোখের মাথা খেয়েচিস্ নাকি!" বলিয়া তিনিও ঘাড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে দৌড়িলেন। নিমেষ মধ্যে নলিনীবাবু দেখিলেন, যেমন সপ্তরথী অভিমন্যুকে ঘিরিয়াছিল, তাঁহারও সেই দশা ঘটিল। তারপর বাণের উপর বাণ বর্ষণ আরম্ভ হইল। "বলি ওহে নটবর! এখনও ছাচ্‌লাতলায় কেন? ঘরের ভিতর এস।"

"এস ভাই! তোমাকে কুঞ্জে নিয়ে যাই!"

"কুঞ্জ কাকে বলে, জানতো?"

"চল কালা কুঞ্জবনে, কাজ নেই আর অভিমানে!"

যেমন ক্ষুধার্ত্ত বাঘিনীর দল শীকার লইয়া ছুটিয়া যায়, রমণীগণ নলিনীবাবুকে ঘরের ভিতর টানিয়া লইয়া চলিল। একজন বলিল, "হ্যাঁ ভাই! তুমি বোবা নাকি?"

আর একজন বলিল, "ও ঠাকুর ঝি! তোমরা তো ঠাকুরজামাইকে কথা কইতে দেবে না! কি বল্‌চে শোন না আগে!"

হাঁ বেশ কথা! কি বল্‌চে নটবর! বল না?

আমরা এসেছি, তা জেনেও উনি এতক্ষণ মান করে কেন বসেছিলেন, আগে তাই জিজ্ঞাসা কর।

এমন সময়ে বাটীর গিন্নি আসিয়া সেইখানে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রমণীগণ একটু সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। গিন্নি বলিলেন, "বলি ওগো! আমরা কি কেউ নই! তোমরা কি একবার জামাইকে দেখ্‌তেও দেবেনা নাকি?"

পাঠকের প্রথম পরিচিতা, মোক্ষদার বরের মেজো শালী নলিনীর পৃষ্ঠে চিম্‌টি কাটিয়া চুপি চুপি বলিল, "জাঠশাশুড়ীকে প্রণাম করতে হয়, তাও জান না? কোথাকার ম্যাড়াটা!"

যুবতীর ইঙ্গিত মত নলিনীবাবু জাঠশাশুড়ীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। জাঠশাশুড়ী বলিলেন, "চিরজীবী হও বাবা! আমাদের যেমন মেয়ে, তেমনি সোণার চাঁদ বর হয়েছে। জামাইতো নয়, যেন কার্ত্তিক।"

"হ্যাঁ গো! অই যে গলার নীচে ময়ূর পুচ্ছ দেখা যাচ্চে।"

"তোমাদের ও সব ঠাট্টা রাখ বাছা! এখন জামাইকে একটু মিষ্টি মুখ কর্‌তে দাও। একটু জল খাও বাবা। আহা, মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে।"

লজ্জার খাতিরে নলিনীবাবু অগত্যা জলযোগে প্রবৃত্ত হইলেন। লজ্জার খাতিরে আঙ্গুর, বেদানা প্রভৃতি পঞ্জাবী সুখাদ্য ফল ভোজন করিয়া উদর পরিতৃপ্ত করিলেন। জাঠশাশুড়ী বলিলেন, "তবে বাছা! এখন আমি খাওয়া দাওয়ার উজ্জুগ করিগে। বড় বউ মা! দেখিও, যেন জামাই চলে না যায়। এখানেই খাওয়া দাওয়া কর্‌তে হবে।

(৬)

"আঃ, বাচা গেল। এখন এস ভাই! যে কথা হচ্ছিল, তাই হোক্। এখন বল, কি কথা বল্‌ছিলে?"

"আমরা এসেছি জেনেও, উনি এতক্ষণ মান করে কেন বসে ছিলেন? এতক্ষণে নলিনী বাবুরও মুখে কথা ফুটিল। বোধ হয় পাঞ্জাবের সুমিষ্ট আঙ্গুর বেদানার রসপানে তাহার মন হঠাৎ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আমি কি জান্‌তে পেরেছিলেম যে, আপনারা এখানে এসেছেন? এমন চাঁদের হাট দেখ্‌তে কার না সাধ হয়?"

"ওরে বোকা নয়রে! অই শোন্, কথা ফুটেছে।"

"ওলো! তা নয়! তোরা বুঝতে পারিস্ না। মোক্ষদা এখানে নেই কি না, আমরা যদি মোক্ষদাকে সঙ্গে আনতুম, তা হলে কেমন করে মান করে বসে থাক্‌ত, দেখা যেত।"

নলিনীর মনে হইল, মোক্ষদা কে? তাহার স্ত্রীর নাম ত মোক্ষদা নহে, সরলা। তবে ইহারা মোক্ষদা কাহাকে বলিতেছে?

যুবতী আবার বলিল, "আমরা লাহোর থেকে রওনা হবার আগে তোমাকে চিঠি লিখেছিলেম যে, ষ্টেশনে আমাদের সঙ্গে দেখা করিও। তা মোক্ষদা আমাদের সঙ্গে নেই বলেই তো আমরা পর হয়ে গেলুম।"

আবার নলিনী বাবুর মনে বিষম সন্দেহ হইল। একি! ইহারা লাহোর হইতে আসিয়াছে? তাহার জাঠশ্বশুর তো পাটনায় থাকেন। আবার প্রশ্ন হইল, "কি বল্‌ব? চুপ করে রইলে যে, আবার বোবা হয়ে গেলে নাকি?

নলিনীবাবু বলিল, "আমি তো চিঠি পাই নাই। চিঠি পেলে অবশ্যই ষ্টেশনে আপনাদের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তেম। তবে এখন আমি যাই।"

হাঁ, যাবে বই কি? কেমন লো! আমি যা বলেছি ঠিক কি না? মোক্ষদা আমাদের—

এমন সময়ে গাড়ীবারাণ্ডার নীচে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। একজন বলিল, "সুধা! দেখে আয় ত গাড়ীতে কে এল?" সুধা বাহিরে যাইবার পূর্ব্বেই তাহার ছোটদাদা বার বৎসরবয়স্ক সুরেন আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "ও মেজদিদি, একটা মজার কথা শোন। আমি ব্যাড়াতে গিয়েছিলেম, রাস্তায় মোক্ষদা দিদির বরের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাকে গাড়ী করে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। সে বল্লে, আমাদের চিঠি পায়নি।"

"তুই কি বলছিস্? তোর মোক্ষদা দিদির বর যে এই ঘরে বসে রয়েচে! দেখ্‌বি আয়।"

"বা! আমি আর যেন মোক্ষদা দিদির বরকে চিনিনা। সে বছর যখন তার বিয়ে হয়, আমি তো কল্‌কাতায় কাকাবাবুর কাছে ছিলুম। বাসর ঘরে আমিই তো সকলের আগে তার কাণ মলে দিয়েছিলুম। আমার দ্যাখাদেখি আর সকলে তার কাণ মল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে।"

"সে কোথায়?"

"অই যে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে রয়েচে। ডেকে আনি?"

"তবে তোর মোক্ষদা দিদির দুটো বর নাকি? অই দ্যাখ্, তবে অই ঘরে বসে রয়েছে ও কে?"

"ও কে, তা আমি কি জানি? আমি ডেকে আন্‌চি।"

সুরেন একজন যুবাপুরুষকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া বলিল—"দিদি! এই দেখ, মোক্ষদাদিদির বর। এস না রমণীবাবু! ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?"

নলিনী অবাক হইয়া দেখিল, রমণীবাবু! রমণীবাবু সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার বন্ধু নলিনী রমণীমণ্ডলীতে বেষ্টিত হইয়া ঘরের ভিতর বসিয়া।

রমণীবাবু জিজ্ঞাসা করিল, "কিহে নলিনী! এখানে বসে যে! নলিনী উঠিয়া রমণীবাবুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—"এরা কে বল দেখি?"

"আমার জাঠশ্বশুর আজ লাহোর থেকে এসেছেন, সুরেনের মুখে এই মাত্র শুন্‌লেম।"

রমণীগণ পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। বউগণ ঘোম্‌টা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। মোক্ষদার বরের বড় শালী বলিল—"কি বল্‌লে? ওর নাম কি?"

রমণীবাবু বলিল—"উনি আমার বন্ধু। ওর নাম নলিনীবাবু। কি জানি, কেমন করে এ ভুলটা হয়েছে?"

"ভুল বই কি? তাই জন্যে এতক্ষণ চোরের মতন চুপ ক'রে ব'সে ছিল? ও মা! একবার শীগ্‌গির এখানে এস। এ তোমার জামাই নয়, এ চোর!"

একজন বলিল, "দরোয়ানকে খবর দিয়ে চোরকে থানায় পাঠিয়ে দাও।"

আর একজন বলিল, "আমাদের কাণমলা খেয়ে এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল, এখন দেখ্‌বো, দরোয়ানের কাণমলা কেমন মিষ্টি লাগে!" মোক্ষদার বরের শালী শালাজ সকলে একসঙ্গে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিল। গিন্নিও আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। যেন পঞ্জাবের পঞ্চশাখার কলধ্বনির সঙ্গে সিন্ধু নদের গভীর কল্লোল মিশিল। কেহ দরোয়ানকে ডাকিতে গেল, কেহ ইট-পাটকেলের অনুসন্ধানে চলিল, কেহ বা শতমুখী খুঁজিতে গেল। মেজো বউ "বুলি" নামক বুলডগের শিকল খুলিয়া দিয়া, ঘোমটার ভিতর হইতে তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "হিস্! হিস্! লে বুলি! লে!" বুলি হুঙ্কার করিয়া নলিনী বাবুর নিকটে ধাবিত হইল। রমণী বাবু বলিল, "আপনারা ব্যস্ত হবেন না! এ ভুলটা কেমন্ ক'রে হয়েছে, আমি এখনি ফিরে এসে আপনাদিগকে খবর দিচ্চি।"

রমণীবাবু নলিনীকে বাহিরে লইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছিল, বল দেখি?"

নলিনীবাবু বলিল, "পাঁচী একটী ছোট মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে

আমাকে বল্‌লে, তোমার জাঠশ্বশুর এসেচেন। তাঁরা সব তোমাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছেন!"

রমণীবাবু বলিল, "তুমি এখন বাড়ী যাও। একটু পরেই আমি তোমার কাছে আস্‌চি! পাঁচীকে থাক্‌তে বলিও।"

পাঁচী বাহির হইতে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সকল ঘটনা দেখিতেছিল। সে মুখে আঁচল দিয়া হাসিতে হাসিতে পনর দিনের জন্য তাহার মাসীর বাড়ী চলিয়া গেল।

শ্রীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূজার চিঠি।

প্রবাসীপতির প্রতি সতী।

কলিকাতা। ৩০এ আশ্বিন, ১৩০৯ সাল।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু অনঙ্গমোহন মিত্র,

প্রাণপ্রিয়তমেষু।—

নিবেদন শ্রীচরণে করিতেছে দাসী।
ভুলেছ কি অধীনীরে হইয়ে প্রবাসী?
হৃদয় সর্ব্বস্ব ধন জীবিত ঈশ্বর।
তোমা বিনা এ হৃদয় শূন্য নিরন্তর?
মনে জ্ঞানে ধ্যানে নাথ জাগ্রতে স্বপনে।
নিরন্তর ইচ্ছে প্রাণ তব দরশনে॥
বৎসরেক হেরি নাই তব চন্দ্রানন,
বৎসরেক পূজি নাই তব শ্রীচরণ।
বৎসরেক শুনি নাই শ্রীমুখের বাণী,
কি ভাবে কোথায় আছ, কিছু নাহি জানি॥

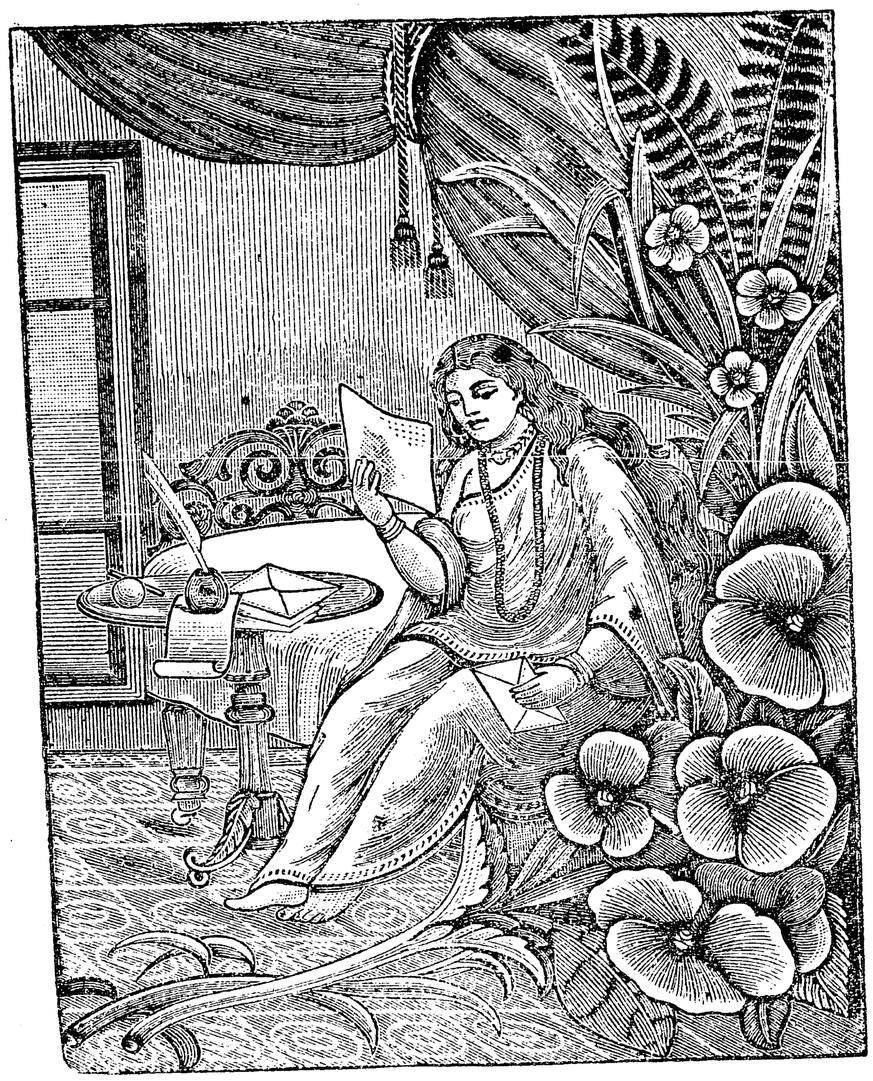

কে করিছে পদসেবা, কে তুষিছে মন,
প্রিয়ভাবে কে করিছে প্রিয়-সম্ভাষণ।
পিপাসায় কে দিতেছে সুশীতলবারি,
কর্পূর তাম্বূল করে দেয় কোন্ নারী।
ক্ষুধায় কে দেয় অন্ন বুঝিয়া সময়,
মুখ চেয়ে কোন্ বামা দাঁড়াইয়া রয়।
কে দিতেছে শয্যা পাতি আরামের তরে,
ঘামিলে কোমল তনু কে বাতাস করে।
ঘামে যবে মুখচন্দ্র শ্রমি অবিরাম,
কাতরে অঞ্চল দিয়ে কে মুছায় ঘাম।

বড় ভালবাস তুমি আতা আর ডাব,
আদরে কে দূর করে পুরায়ে অভাব।
মনের আবেশে যদি, নিদ্রা নাহি আসে,
নীরবে ডাকিতে ঘুমে কে বসিছে পাশে।
গায়ে হাত বুলায়ে সঞ্চারি বীজন,
কে করিছে প্রাণেশ্বর শান্তির আহ্বান?
কিছু নাহি জানে দাসী, ভাবে আর কাঁদে,
সহস্র প্রবোধে মনে, ধৈর্য্য নাহি বাঁধে।
নয়নের জলে মম বক্ষ যায় ভেসে,
দেখিতে না পাও তুমি থাক দূরদেশে।
জীবন-সঙ্গিনী নাই একাকী বিচর,
জানি না জীবিতেশ্বর কখন কি কর।
জীবন-সঙ্গিনী দাসী বিরহে তোমার,
মনে মনে দিবানিশি করে হাহাকার,
ভাল নাহি লাগে নাথ সুখের সংসার,
দিবানিশি অন্ধকার হেরি ঘর দ্বার।
চক্ষু আর কোন বস্তু হেরিতে চাহে না,
আমার মানস-পাখি সুস্বরে গাহে না।
হেমা, প্রভা মেয়ে দুটি মুখপানে চায়,
কাঁদিয়ে তোমার বার্ত্তা আমারে শুধায়।
কুশলে আছেন তিনি, এই কথা বলে,
কচিমুখে চুম্ব দিয়ে তুলে নেই কোলে।
বলি বটে, করি কোলে, কিন্তু প্রাণেশ্বর,
অবিরল নেত্রজল ঝরে ঝর ঝর।
এই সুখে আছি আমি তোমার সংসারে,
যেরূপে কাটাই কাল বলি আর কারে॥

পেয়েছি তোমার পত্র ছয় মাস আগে,
নিত্য নিত্য পড়ি তাহা হৃদয় সোহাগে।
একবার নহে নাথ দশবার পড়ি,
তোমার ও চারুরূপ মনোমাঝে গড়ি।

পাঁতির অক্ষরগুলি করি দরশন,
অশ্রুধারে ভিজাইয়ে করি হে চুম্বন।
আশা আসি আশা দেয় মন্ত্র দিয়া কাণে,
আশ্বাসে বাঁধিয়া বুক বেঁচে থাকি প্রাণে।
তদবধি আর পত্র এলো না তোমার,
ভেবে ভেবে নাহি পাই ভাবনার পার।
লিখেছিলে আসা হবে পূজার সময়,
সেই আশে মুগ্ধ হয়ে ছিল হে হৃদয়।
নিত্য নিত্য গণি দিন ঋতু মাস কয়,
পথপানে চেয়ে থাকি আশ্বাসে আশার।
আসিল আশ্বিন মাস শরৎ আসিল,
আমার তাপিত প্রাণ উল্লাসে ভাসিল।
শারদীয়া মহাপূজা আনন্দ বাসর,
তোমারে পাবার আশে প্রফুল্ল অন্তর।
আসিল ষষ্ঠীর নিশা দুর্গা অধিবাস,
আসিলে না তুমি, আমি ফেলিনু নিশ্বাস।
চাহিনু আকাশ পানে হতাশে গুমরী,
নিদয়া আমারে বুঝি হলেন শঙ্করী।
হেরিনু গগনপটে দীপি দীপি করি,
অগণন তারা-হার নবসাজ পরি।
দেখিলাম ভাবিলাম এই তারামালা,
চাঁদেরে আরতি করে লয়ে দীপমালা।
নীলপটে ক্ষীণচন্দ্র ক্ষীণ শোভা পায়,
মম হৃদি পূর্ণচন্দ্র রহিল কোথায়।
হৃদাকাশে দীপ্ত চাঁদ তুমি হে আমার,
আকাশের ক্ষুদ্র চাঁদে কহি বার বার।
প্রাণ কাঁদে প্রাণচাঁদে এনে দাও চাঁদ,
নতুবা এ প্রমোদার ঘটিবে প্রমাদ।
কতবার বলিলাম কত সাধিলাম,
চাঁদপানে কতক্ষণ চেয়ে রহিলাম।

ষষ্ঠীর নিষ্ঠুর চাঁদ দিল না উত্তর,
চুপি চুপি লুকাইল ক্ষুদ্র কলেবর।
অন্ধকার বিশ্বধাম, শূন্য জল স্থল,
কেবল নক্ষত্রগুলি হইল উজ্জ্বল।
আর কি করিবে দাসী নেত্রনীরে ভাসি,
তোমার শয়নাগারে প্রবেশিল আসি।
শূন্য গৃহ শূন্য প্রাণ শূন্য সমুদয়,
ভাব দেখি জীবিতেশ্বর, কিবা মনে হয়।
ঘুমাইনু ভাবিতেছ, হাসি আসে মুখে,
ঘুম কি আসিতে পারে হতাশের বুকে ?
জাগিলাম সারানিশি ব্যাকুলিত প্রাণ,
নেত্রনীরে ভিজাইয়ে দিনু উপাধান।
প্রভাতিল ষষ্ঠী নিশি, বঙ্গে শুভক্ষণ,
সপ্তমীর সূর্য্যদেব দিলা দরশন।
বাজিল মঙ্গল বাদ্য, মঙ্গলার গান,
প্রথম উৎসব নব পত্রিকার স্নান।
স্তব পূজা বলিদান হ'ল সমাপন,
আজি আসিবেন প্রভু তবু ভাবে মন।
সপ্তমী ফুরায়ে গেল অষ্টমীর ভোর,
জ্বলিল দ্বিগুণ তেজে চিতানল মোর।
অষ্টমী নবমী গেল, তবু ছিল আশা,
তথাপি তোমার আর না হইল আসা।
বিজয়া বিদায় হ'ল তবু আসিলে না,
দাসীরে দেখিতে বুঝি ভাল বাসিলে না।
ভুলে কি গিয়েছ প্রভু এ অধীনী জনে,
ভুলে যদি থাক তবে বাঁচিব কেমনে ?
কাঁদিয়ে কুমারী দুটি আমারে কাঁদায়,
বুঝাইয়ে প্রবোধিয়ে নাহি রাখা যায়।
জানি না কেমন আছ পর্ব্বত প্রবাসে,
অমঙ্গল ভাবনায় কাঁপি আমি ত্রাসে।

মা দুর্গার শ্রীচরণে মাগি এইবার,
যথা থাকো সুস্থদেহে থাকো প্রাণেশ্বর।
তব পদে অধীনীর শেষ নিবেদন,
কালীপূজা রজনীতে দিও দরশন।

পদাশ্রিতা ব্যাকুলিনী
শ্রীমতী লবঙ্গলতা দাসী।

সতীর প্রতি পতি।

দার্জ্জিলিং। ১২ই কার্ত্তিক, ১৩০৯।
(শ্রীঅনঙ্গমোহন মিত্রের বাটী।)

কল্যাণবতী শ্রীমতী লবঙ্গলতা দাসী প্রেমাস্পদেষু।—

প্রিয়তমে! অপরাধি হইয়াছি বটে,
বিধাতা হইলে বাম এই দশা ঘটে!
পাইয়াছি তব পত্র, পড়িয়াছি সব,
তিনবার পড়িয়াছি, থাকিয়া নীরব।
বিশ্বাস যদ্যপি কর, বলি তবে প্রিয়ে,
বহু অশ্রু ঝরিয়াছে দুটি চক্ষু দিয়ে।
আদরে লিপিরে তবু করেছি চুম্বন,
উদ্দেশে তোমার অংশ করেছি অর্পণ।
লিখিয়াছ যাহা যাহা সব সত্য কথা,
দুজনে সমান ভুগি মরমের ব্যথা।
দূষি বটে আমি সতী, তবু দূষি নই,
জান তুমি বিধুমুখী পরাধীন হই।
পরাধীনে কত কষ্ট, বুঝিতেই পার,
বঙ্গেতে সে কষ্ট নাই অজ্ঞাত কাহারো।
হ'ল না পূজার ছুটি কর্ত্তার ইচ্ছায়,
বল দেখি শশিমুখি, কি করি উপায়?

অক্ষম হয়েছি যেতে, তাহারি কারণে,
তাহে কোন অন্য ভাব ভেবো নাকো মনে।
শরীর কুশলে আছে, চিন্তা করিও না,
অমঙ্গল চিন্ত করি, ছায়া ধরিও না।
এইমাত্র অমঙ্গল নিত্য দেখা পাই,
মঙ্গলরূপিনী তুমি, তুমি কাছে নাই?
কাছে নাই বটে, কিন্তু জাগিতেছ মনে,
সদা হেরি বিধুমুখ হৃদয় দর্পণে॥
তোমার হাতের পত্র সুকোমল অতি,
তবে কেন সুকঠিন এবে মম প্রতি?
ব্যঙ্গ করে পত্র মোরে জিজ্ঞাসা করিছে,
এ প্রবাসে কোন্ বামা সেবা করিতেছে?

প্রেয়সি, শপথ করে বলিবারে পারি,
মাতৃসমজ্ঞান করি সংসারের নারী।
সেই দামোদর খুড়া সব কাজ করে,
দাসী কি পশিতে পারে তুমি শূন্য ঘরে ?
দুঃখেতে তোমার পত্র, বড় হাসায়েছে,
তোমারে ভুলেছি বলে লাঞ্ছনা দিয়েছে ?
লাঞ্ছনা মাথায় রাখি, কি প্রাণের ঈশ্বরি !
তোমারে ভুলেছি শুনে, আতঙ্কেতে মরি !
লক্ষ্মীরূপে দিবানিশি হৃদে জাগিতেছ,
প্রেমের বাতাস দিয়ে সেবা করিতেছ।
সেই মুখে অহরহঃ ভাসিতেছে মন,
কে ভুলিবে, তুমি কিরে ভুলিবার ধন ?
এইবার দুটি কথা শুভ সমাচার,
সুখের মিলনে সতি, দেরি নাহি আর।
পেয়েছি প্রভুর আজ্ঞা রহিয়াছি আশে;
দুই মাস ছুটি পাব নবেম্বর মাসে।
এবারে ত নবেম্বরে থাকিবে উৎসব,
সে উৎসবে মনোসাধ মিটাইব সব॥
হেমা প্রভা উভয়েরে করি আশীর্ব্বাদ,
মা দুর্গার প্রসাদেতে পূর্ণ হবে সাধ।
তুমি আর কি লইবে পূর্ণেন্দু বদন,
সর্ব্বস্ব দিয়াছি সঁপে জন্মের মতন।
কি আর আমার আছে, দিব কিবা ধন,
লহ এক প্রণয়ের দুরন্ত চুম্বন॥

একান্ত তোমারি
শ্রীঅনঙ্গমোহন মিত্র।

দেবীর মর্ত্ত্যে ভ্রমণ।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য।

এক্ষণে আর বর্ষার বৃষ্টি অনবরত বর্ষণ করে না, বর্ষাকাল শেষ হইয়াছে। শরৎকাল আসিয়াছে। বর্ষার ঘন ঘটাচ্ছন্ন-অন্ধকারময় গগনমণ্ডল মেঘ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, সুদূর অনন্তব্যাপী সুনীলাম্বর সুপবিত্রভাবে দিঙ্মণ্ডলোদ্ভাসিত হইয়াছে। তাণ্ডবতরঙ্গসংক্ষুব্ধ প্রচণ্ডাবর্ত্তময়ী কল্লোলিনী স্রোতস্বতী আর এখন সে বেগবতী উগ্রচণ্ডামূর্ত্তি পরিলক্ষিত হইতেছে না। প্রবল তটিনী বীচিমালা আর খরস্রোতে দুকূল ভাঙ্গিয়া মানুষের ক্ষতি করিতে প্রবাহিত হইতেছে না। শরৎ-সমাগমে সবই যেন গুরুগাম্ভীর্য্যভাবে মন্থরগতিতে প্রবাহিত হইতেছে। হাস্যময়ী প্রকৃতিদেবী জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিয়া, মনোরম পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া সমুজ্জ্বলভাবে বিরাজ করিতেছেন। নব-দূর্ব্বাদল-শ্যামলশস্যপূর্ণ ক্ষেত্র শ্বেতমেঘ-সমন্বিত নভোমণ্ডল সদ্যসুধাপরিস্নাত সুনির্ম্মল শরচ্চন্দ্র উপবন প্রস্ফুটিত কহ্লার মানব অন্তঃকরণ মুগ্ধ করিয়া পবিত্র আনন্দ প্রাণমনে আন্দোলিত করিতেছে। যদি তরঙ্গসঙ্কুল কলনাদিনীর শান্তমূর্ত্তি দেখিতে চাও, যদি হরিদ্বর্ণ শস্যশোভা দেখিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এই শরৎকালের দিকে দৃষ্টিপাত কর। যদি সুবিমল সুধাংশুদেবের বর্ষিত সুধা আস্বাদনে তৃপ্তিবোধ করিতে চাও, তাহা হইলে সুধাকরের স্নিগ্ধ রশ্মিতলে উপবেশন কর, প্রাণ মনে বিমল সুধারাশি বর্ষিত হইবে। শারদীয় প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য্যের সাদৃশ তুলনা বিরল। আহা মরি, এখন সকলই কমনীয়, সুস্থির, প্রশান্ত, সৌন্দর্য্যশালী ! বর্ষাকালের সেই দুঃখিনী মালিনা প্রকৃতিদেবী আজ লক্ষ্মী-স্বরূপিণী রাজরাজেশ্বরী হইয়াছেন; সেই সন্তাপিনী অশ্রুমুখীদেবী আজ স্নেহময়ী হাস্যে সহাস্য, পুণ্যময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। সুনির্ম্মল রূপসাগরে অঙ্গ ঢল ঢল করিতেছে, মার এই লাবণ্যময়ী মুর্ত্তি দেখিলে কার হৃদয় ও মনে না প্রেমভক্তি উদ্দীপিত হইবে ? কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তি না শারদীয় সৌন্দর্য্যের প্রভূত যশ গান গাহিবে ?

শারদীয় প্রকৃতির বিচিত্র-রচনা, ঈশ্বরের এ বিশ্বতোমুখী এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্যক্‌রূপে বর্ণনাতীত। মানব নশ্বর লেখনীর এরূপ শক্তি নাই, ভাষার এরূপ অক্ষর নাই, যাহাতে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায়। ইহা দৃষ্টির বিষয়, নয়নানন্দদায়ক, ঐ অনন্তব্যাপী সুনীল নভোমণ্ডল প্রকাশিত স্নিগ্ধ

রশ্মিজাল-জড়িত শত শত—সহস্র সহস্র—লক্ষ লক্ষ অপূর্ব্ব অভূতপূর্ব্ব নাক্ষত্রিক জগত-শোভা নিরীক্ষণ করি, আর বিশ্বপাতার বিশ্বতোমুখী অনন্ত কৌশল-পূর্ণ কারুণিকভাবে বিমোহিত হই।

আজ আশ্বিন মাস, বঙ্গের দুর্গোৎসব, সপ্তমীর শুভদিন, মাতৃপূজার মহোৎসব; আজ স্বয়ং জগজ্জননী ঘরে ঘরে পূজা গ্রহণ করিতেছেন। আজ ধর্ম্মপ্রাণ বঙ্গবাসী সম্বৎসরের বিবাদ-বিসম্বাদ ভঞ্জন করিতেছে, শোক তাপ ভুলিয়াছে; চির-দুঃখাভিভূত বঙ্গবাসীর মুখে আনন্দের জ্যোতি প্রতিভাত। তৃষিত-মৃগ যেন মরুদ্যান পাইয়াছে, মূক যেন বাক্‌শক্তি লাভ করিয়াছে; মাতৃভক্ত সন্তানগণ মনোসংযোগে পুলকিত অন্তরে মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া আদ্যাশক্তি দেবীর অধিষ্ঠানে অনুষ্ঠান-ক্ষেত্রে মাতৃভূমিকে সুচারু শিল্প-কার্য্য দ্বারা সুন্দররূপে সুসজ্জীভূত করিতেছে। সে সাজ ঠাট ঠমক সুদৃশ্য। বহু-দিনের পর দশভুজা প্রতিমার ভুবনমোহিনীমূর্ত্তি পূজামণ্ডপ সুবিস্তৃত চন্দ্রাতপ দেবীর আভায় আলোকিত করিতেছে। যে কোন মর্ম্মপীড়িত আজ দুর্গা-প্রতিমার প্রতি অনিমেষচক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছে, আর মনে মনে মাকে ডাকিতেছে, মাতৃচরণে বিলুণ্ঠিত হইয়া অনশনে কঙ্কালদেহের আরও বীভৎস ভাব ধারণ করিতেছে। দারিদ্রতা, আধিব্যাধি শোক তাপ প্রপীড়িত প্রভৃতি ব্যক্তিগণ কত মনের দুঃখ জানাইতেছে, কত দয়া, আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা চাহি-তেছে। সকলেই মার স্নেহময়ী মূর্ত্তি দর্শন পাইয়াছে, বঙ্গবাসী আজ মাতৃ-চরণে প্রাণোৎসর্গ করিয়া এই অনিত্যজীবন সার্থক করিতেছে। তাই তিন দিনের জন্য সকলে একত্রিত হইয়া আনন্দময়ী বিশ্বজননীর অভয়চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, মা চৈতন্যময়ী চৈতন্য দিন বলিয়া ভক্তিভরে মাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিবে, আর তাঁহার সমীপে গললগ্নিকৃতবাসে জবাবিল্ব পুষ্পাঞ্জলি দিবে।

শাস্ত্রে কথিত আছে, বিষ্ণুকর্ণমূলোদ্ভূত মধুকৈটভদৈত্যভয়ে দেবগণ দেবীর আরাধনা করিতেছিলেন, পরে দুর্দ্দমনীয় মহিষাসুর সংহারের জন্য, তৎপরে রক্তবীজ চণ্ড মণ্ড ও দুর্দ্দান্ত প্রচণ্ড শম্ভু নিশম্ভু বধের জন্য দেবীর আরাধনা করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। একদিন লোকরঞ্জন রামচন্দ্র লঙ্কা-পুরের রাবণবধের জন্য অকালে ব্রহ্মার আজ্ঞায় অসুরদলন করিবার জন্য অসুরদলনী মায়ের অকালে উদ্বোধন করিয়াছিলেন। হনুমান আনীত অষ্টো-ত্তর নীলপদ্ম অপহৃত হইলে, সেই নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম স্বীয় নীলপদ্মলোচন উন্মূলিত করিয়া প্রসন্নময়ী মাকে প্রসন্ন করিয়া পূজা করিতে উদ্যত হইয়া-

ছিলেন। আদ্যাশক্তির অপার মহিমাপ্রভাবে প্রভাবান্বিত রঘুবীর স্বীয় ভুজ-বলে বিপুল রক্ষকুল ধ্বংস করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালী কি সেই অতীতের স্মৃতিবিরহিত হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে? তাই চিন্ময়ীদেবীর মৃণ্ময়ীমূর্ত্তি রচনা করিয়া পূজা করে। সেই আর্য্যোচিত সদনুষ্ঠানকল্পে আর্য্য-ধর্ম্মের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে, বাঙ্গালী মাতৃরূপ কল্পিত করিয়া প্রগাঢ় প্রেম-ভক্তি-সমন্বিত হইয়া, ব্রহ্মময়ী ত্রিগুণমূর্ত্তিরূপা মূর্ত্তি সংগঠিত করিয়া সনাতনী পূজায় রত থাকে। ইহাতে যদি হিন্দুদিগের পৌত্তলিক অপবাদ ঘোষিত হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ ক্ষতির হ্রাস বৃদ্ধি কি?

প্রতিমা রচনা।

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাধিকরণে, দেশকালপাত্রভেদে দেবীপ্রতিমা সংগঠিত হইয়া থাকে। বঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে কৃষ্ণনগরে দেবীপ্রতিমা নির্ম্মাণ প্রণালীর উৎকর্ষ হয়। এক্ষণে কুলপ্রথা অনুসারে কোথাও দেবীমূর্ত্তি দশভুজা, কোথাও দেবীর অষ্টভুজা, কোথাও বা দেবীর চতুর্ভুজা, কোথাও বা দেবীর দ্বিভুজা-মূর্ত্তি সংগঠিত হয়; কখন নীল, কখন কাল, কখন রক্তবর্ণ ইত্যাদি বিভিন্ন আকারে রচিত হইয়া পূজা হইয়া থাকে। ইহা সম্যকরূপে বর্ণনা করিতে ক্ষুদ্র মানববুদ্ধি অসমর্থ, যেহেতু সাধকগণের মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মময়ীর নানা-মূর্ত্তিতে পূজা হইয়া থাকে। অসীম শাস্ত্রসমুদ্রে যাঁহার অন্ত নাই, সেই অনন্ত শক্তি-স্বরূপিণী ভুবনমোহিনী ভগবতীর অনন্তমূর্ত্তি বর্ণনা করা দুষ্কর। কিন্তু আজ সর্ব্বত্রই আদৃত পরিগৃহীত মহামায়ার দনুজদলনীমূর্ত্তি সিংহ-বাহিনী প্রতিমা ব্রহ্মমণ্ডলে প্রচলিত হইয়াছে, আজ সে বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দিব। দেবীর দক্ষিণপদ সিংহোপরি স্থাপিত—সিংহ অর্থে চিন্ময়ীর চৈতন্যযুক্ত শক্তি। বামপদ ঊর্দ্ধ করিয়া তদঙ্গুষ্ঠ মহিষোপরি রাখিয়াছেন। নিম্নে রত্নাসনে ছিন্ন মস্তক মহিষ পতিত, মহিষ বলিতে ক্রোধ আর মহিষ হইতে প্রকাশিত অসুরমূর্ত্তি শত্রু অর্থাৎ তমোরূপায় আসক্ত পাশবিক শক্তি।

আজ শাস্ত্রজ্ঞ ভক্তগণ চিন্ময়ী জগৎশক্তিবিধায়িনী মৃন্ময়ীমূর্ত্তিতে জগ-জ্জননীকে উপলব্ধি করিতেছে। চম্পকবরণী হেমাঙ্গিনী নবযৌবনসম্পন্না ঘনলাবণ্যময়ী বিবিধ অলঙ্কার-বিভূষিতা মনোহর স্নিগ্ধনয়নসম্পন্না পীনোন্নত পয়োধরা বঙ্কিম সুঠাম সমুত্থিতা মহিষাসুরমর্দ্দিনী দশহস্তে পরিবেষ্টিতা, তাঁহার

সমস্তই কল্যাণীরূপে বিরাজমানা। কি আনন্দ, তাই দেবী দশহস্ত বিস্তার পূর্ব্বক সন্তানগণকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, তাঁহার সেই অসীমশক্তি প্রকাশ পাইতেছে, আজ এই দশহস্তস্থিত, অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা জগজ্জননী স্বয়ং সর্ব্বপ্রকার দুর্গতি নাশ করিয়া দুর্গানামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। চৈতন্যময়ী এক অনির্ব্বচনীয় কৌশলজাল বিস্তার পূর্ব্বক জীবের মোহনাশ করিতেছেন।

নবযৌবনসম্পন্না বাঞ্ছাকল্পতরু অনন্ত সৌদামিনী প্রভাসম বদনমণ্ডলে চন্দ্র, সূর্য্য, হুতাশনস্বরূপ ত্রিনয়ন বিস্ফারিতা। দক্ষিণভাগে সিদ্ধিদাতা গণেশ ও বামভাগে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়, বামভাগে বাগ্‌বাদিনী সরস্বতী ও দক্ষিণে সম্পদদাত্রী লক্ষ্মীদেবী অবস্থিতা। গণপতির দক্ষিণভাগে নবপত্রিকা দুর্গাদেবী অর্থাৎ কলাবৌ, ইহা নববৃক্ষশাখা সংগঠিত হইয়া অপরাজিতা সূত্রে বেষ্টিত ও বস্ত্রাবৃত হয় বলিয়া নবপত্রিকা নামে অভিহিত হইয়াছে।

দুর্গোৎসবে ইহার পুরাণ শাস্ত্রে যে পূজাপদ্ধতি আছে। দেবীর চারিদিকে চণ্ডা প্রচণ্ডা উগ্রচণ্ডা চণ্ডনায়িকা প্রভৃতি অষ্টসঙ্গিনী ও তেত্রিশ কোটী দেবতাগণ একমনে পূজায় মগ্ন। বাঙ্গালী পৌত্তলিক, তাই এইভাবে দেবীপ্রতিমা রচনা করে। ইহাই রজোগুণময়ী মহিষমর্দ্দিনী দুর্গার প্রতিমামূর্ত্তি ভক্তসাধক এইরূপ হৃদয়কুঞ্জে ধ্যান ও ধারণা করিয়া পূজা করিয়া থাকে।

পূজাবিধি।

শরৎকালে শারদীয় দুর্গাপূজা, তাই নিদ্রামগ্ন দেবীকে বোধন (জাগ্রত) করিয়া আরাধনা করিবার শাস্ত্রাজ্ঞা আছে। রঘুবীর রামচন্দ্র সত্বরে দেবীকে পূজা করিতে মনস্থ করিয়া সফল মনোরথ হইয়াছিলেন। কুলপ্রথা অনুসারে কেহ বিল্ববৃক্ষমূলে দেবীর আমন্ত্রণাদি অধিবাস করিয়া থাকে। আর্য্যশাস্ত্রোক্ত ত্রিবিধ পূজাবিধি নিরূপিত হইয়াছে। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক পূজায় গুরু আদিষ্ট সাধক ভক্ত যতিস্বরূপ নির্ম্মল আত্মায় স্বয়ং পূজা করিয়া কৃতার্থজ্ঞান করেন। বলিদান, সামিষ, নৈবেদ্য, জপ, ষোড়শোপচার, পঞ্চোপচার বিরহিত অন্ন ব্যঞ্জন (রন্ধন উপচার) দ্বারা পূজাকে রাজসিক পূজা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মন্ত্রহীন দেবীর অর্চ্চনাকে তামসিক পূজানামে কথিত হয়। কুলপ্রথা অনুসারে দেবীর প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ঘট, পট পূজার পদ্ধতি

শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এরূপ পূজাতে যুগপৎ একই ফল লাভ হয়, তাহাও স্থির সিদ্ধান্ত। এই ত্রিবিধদেবী পূজা নিষ্ঠাবান লোকদিগকে আমরা ঈশ্বরপরায়ণ জ্ঞান করিয়া থাকি। ইহাতেই হিন্দুধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্ব প্রচারিত হইরাছে। হিন্দুধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য মুক্তি লাভ করা, তাই জনৈক সমাধিনামা বৈশ্য ঐ পূজা করিয়া অন্তে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। আর সুরথ রাজা রাজসিক পূজায় হৃত-রাজত্ব পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অষ্টমী ও নবমী পূজা কঠিন পূজা, বিশেষতঃ অষ্টমীর শেষভাগে ও নবমীর প্রারম্ভে অর্থাৎ (সন্ধিক্ষণে) সন্ধিপূজা নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়, এইরূপে বঙ্গবাসীর দুর্গাপূজাপদ্ধতি সর্ব্বত্রই প্রচারিত আছে।

প্রার্থনা।

মা চৈতন্য-স্বরূপিণি! মাকে নিকটে পাইয়া ভক্ত প্রার্থনা করিতেছেন, আর মনে মনে বলিতেছেন, "মা, তোমার পূজার দিনে একবার সন্তানের প্রতি কৃপা কটাক্ষপাত কর মা!" একবার করুণাদৃষ্টিতে ভারতের প্লেগ, ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষপীড়িত পুত্রের তৃষিতনয়নে নয়ন দিয়া অন্ধের অন্ধকার দূর কর মা! তোমার শ্রীমুখের একটীমাত্র কথা শুনিয়া প্রাণ শীতল করি। ওমা! তুমিত চৈতন্যরূপা, ওমা! তোমারই চৈতন্যে জীবের চৈতন্য সম্পাদন করে।

মা জগৎশক্তিরূপিণি! হৃতসর্ব্বস্ব সন্তানের বল, বুদ্ধি, সাধনা, সিদ্ধি, মঙ্গল, সম্পদ, শিব, অশিব সকলই তোমা ছাড়া নয়, সর্ব্বত্রই সকল বস্তুই তোমার করতলস্থ। এই যে মহাপ্রলয়, বিপদসঙ্কুল, দুঃখতরঙ্গ, শোকতাপের ঝঞ্ঝাবাত, দারিদ্র তরি আবর্ত্ত, রোগের যন্ত্রণা-প্রপীড়িত, তোমার সন্তানগণ মৃতবৎ হইয়াছে, তাহা কি আপনার কিছু অজ্ঞাত আছে? তাই বুঝি প্রবঞ্চনা করিয়াও মা সেই মঙ্গলনিধান শিবমূর্ত্তি তোমার ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়া নিজ মায়াশক্তি দেখাইতে নিম্নে স্থান লইয়াছেন। শিব যেখানেই থাকুন না কেন, সর্ব্বদা তোমার ভুবনমোহিনী রূপেই শিবের একমাত্র লক্ষ্য। তখন মা শিবের বাহ্যজ্ঞান ছিল, এখন শিব পাগলা ভোলা, তাই এইরূপে মর্ত্ত্যে পূজাগ্রহণ করিতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। এখন শিব সেই পূজার দিন ভুলে গিয়া কেবল স্থিরদৃষ্টিতে তোমার দিকে চাহিয়া আছেন। জীবের প্রতি শিবের কৃপাদৃষ্টি লোপ পাইয়াছে, সন্তানের এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মা! আর

তোমার এরূপ অবস্থায় থাকা ভাল দেখায় না, একবার করুণাদৃষ্টিতে তোমার সন্তানের প্রতি চাহিয়া দেখ দেখি? সেদিন আর এদিনে কত প্রভেদ। তাই শিব আর নিচের দিকে তাকান না! আর তুমিওত মায়াদৃষ্টি ছাড় না! তাই বুঝি আজ সর্ব্বশেষে মা তোমার সেই প্রলয়রূপিণী মূর্ত্তির বিকাশ মহাপ্রলয়!! ওমা, তোমার দয়া ত সকলের প্রতি সমান, তবে এত বাছাবাছি কেন মা! কুসন্তান বটে, কুমাতা ত নয়? তুমি মা সকলকে সমান চক্ষে না দেখ্‌লে, জগৎ জীবকে আর কে সমানচক্ষে দেখ্‌বে? তোমার সন্তানগণকে আজ তোমার পূজার দিনে তোমার মূলাধার স্থানেই হউক, আর শিব স্থানেই হউক, যেখানে তোমার ইচ্ছা, সেইখানে লইয়া যাও, তোমার সন্তানগণ আজ এই পৌত্তলিকতার ভিতর দিয়া তোমার মূলাধার শক্তি উপলব্ধি করে পরম তৃপ্তিলাভ করুন, কৃত কৃতার্থ হউন।

মা কুলকুণ্ডলিনি, দেখ দেখ! তোমার কৃপাদৃষ্টি অভাবে, এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভারতে থাকিয়া কত কষ্ট সহ্য করিয়া তোমার মুখাপেক্ষি হইয়াছি, তবুও তৃষিতের জল, ক্ষুধার অন্ন, পরনের বস্ত্র পাইতেছি না, অনশনে, অর্দ্ধাশনে দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়াছি। তথাপি মা আজ তোমার আগমনে সকলই ভুলিয়াছি, তোমার সেই যুগ্ম শ্রীপাদপদ্ম দর্শন পাইয়া সকল শোক তাপ ভুলিয়া আবার তোমার পূজা করিব; অশ্রুনীরে আবার তোমার অভিষেক করাইব, ভক্তি বিমলপুষ্পে আবার পূজা করিব। এস ভাই! শোকার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত বঙ্গবাসী, আমরা ভক্তিগদ্গদচিত্তে আজ মায়ের পূজা করি, আমরা সেই শিববাঞ্ছিত পরম রত্নলাভ করিয়াছি, এমন সুবর্ণসুযোগ আর হইবে না, আইস, মায়ের জগন্মোহন বাৎস্য প্রতিমা পূজা করি, আর হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া করুণাময়ী মাকে লক্ষ-কণ্ঠে সমস্বরে ডাকি, মা দয়াময়ি! আমাদের সকল যন্ত্রণা দূর করিবেন, আর আমরাও সুখশান্তি অনুভব করিতে পারিব।

এস শাক্ত, এস শৈব, এস গাণপত্য প্রভৃতি ভক্তগণ! আজ আমাদের সর্ব্বস্ব লইয়া মায়ের মোক্ষ মূলাধার পদে অর্পণ করিয়া নর নশ্বরতা অপনোদন করি, মুক্তি জন্য ভিক্ষা করিয়া বলি:—

শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোহস্তুতে॥

এস হে ভক্ত দর্শকমণ্ডলী! মায়ের রাঙ্গাচরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান

করিয়া ভক্তবিমল হৃদয়ে করযোড়ে অবিশ্রান্তে মা মা বলিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া, এস মহামায়ার সুশীতল পাদপদ্মে প্রণিপাত করি:—

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে॥

শ্রীরজনীকান্ত ভক্তিবিনোদ।

গান।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

কে বুঝিবে তব তত্ত্ব তত্ত্বময়ী তুমি তারা।
নানা রূপ প্রকাশিয়া (ওমা) নানা রূপে রাখ ধরা।
পিতৃরূপে প্রেরণ কর, মাতৃরূপে গর্ভে ধর,
আশারূপে ঘুর'য়ে বেড়াও (ওমা) নাশ কর হ'য়ে জ্বরা॥
ভোক্তারূপে ভোজন কর, অন্নরূপে পোষণ কর,
ধরারূপ ধরি গো মা জগৎ ধর পরাৎপরা;—
বায়ুরূপে রাখ প্রাণ, অহংরূপে রাখ জ্ঞান,
অনন্ত আকাশরূপে ধর চন্দ্র সূর্য্য তারা॥
তেজরূপে প্রকাশ কর, এই বিশ্ব চরাচর,
তমোরূপ প্রকাশিয়ে অন্ধকারে লুকাও ধরা;—
সুখরূপে তৃপ্ত কর, শোকরূপে কাঁদ্‌য়ে মার,
(আবার) জীবরূপে ভোগ করে আপনাতে হও আপনি হারা॥
সাকার হয়ে প্রকাশ হও, নিরাকারে লুক'য়ে যাও,
(তুমি) সগুণে নির্গুণা শ্যামা নিরূপমা নির্ব্বিকারা;—
বিশেষ্যে নও বিশেষিত, বিশেষণের অতীত,
ক্রিয়াতে সর্ব্ববিদিত, (ওমা) সর্ব্বনামে দাও মা ধরা॥
রজোগুণে সৃজন কর, সত্ত্বগুণে পালন কর,
তমোগুণে ধ্বংস কর করালাস্যা ভয়ঙ্করা;—
সূদন বলে মনরে ভ্রান্ত, অনন্ত যার না পান অন্ত,
তোমার করতে যাওয়া তার তদন্ত বামনের হয় চন্দ্রধরা॥

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী।

গৌরী—একতালা।

হে ব্যথা-দমন, শ্রীমধুসূদন,
ভব-ব্যথা হ'বে, ক'বে হে লয়।
জীবে ব্যথা পায়, তুমি দয়াময়,
কেমনে তা দেখ, হ'য়ে নিদয়।
কোটী কল্প ধ'রে, যুগ যুগান্তরে,
পেয়ে আসে ব্যথা, দেবাসুর নরে,
তোমার সৃজিত ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে,
কেবা বলো হরি, ব্যথা না সয়।
(আর) ব্যথা ব'লে ব্যথা, বিলাপের গাথা,
ধরা-বক্ষ ভেদি' উঠে যথা তথা,
কি করুণ স্বর! টলেও ভূধর,
(কেবল) তোমারি আসন অটল রয়।
তবুও তোমার নামটি 'দয়াল',
আছে হে বিদিত জীবে সর্ব্বকাল,
(তুমি) রাখ আর মার, তবুও কাঙাল,—
'কাঙালের হরি' ব'লে গাবে জয়।
তবে কেন হরি, ব্যথাহারী নামে,
কলঙ্ক রটাও, সাধ করি জ্ঞানে,
আঁধারে ডোবাও অজ্ঞান অধমে,—
কোলে টেনে লও, করুণাময়॥

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

সমালোচনা।

বিলাস ডালি।—কে, সি, দত্ত এণ্ড কোংর প্রস্তুত একটী সুদৃশ্য কাঠের বাক্সে ছয় প্রকার হিন্দুরমণীগণের আবশ্যকীয় বিলাসদ্রব্য পূর্ণ;—১৲ এক টাকা মূল্যে এতগুলি উপাদেয় মূল্যবান বিলাসদ্রব্য প্রদান করিয়া কে, সি, দত্ত কোম্পানী সকলের নিকট ধন্যবাদের পাত্র হইবেন সন্দেহ নাই।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।)

১১শ বর্ষ। } কার্ত্তিক, ১৩০৯ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা।

বিজয়া।

আনন্দময়ী মার আগমনেও আনন্দ,—আবার বিসর্জ্জনেও আনন্দ। এ আনন্দোৎসব সকলে উপভোগ করিতে অসমর্থ হইলেও, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু প্রাণ ভরিয়া মহানন্দে মহোৎসবে গাঢ় নিমগ্ন হইয়া প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিল। শত্রু মিত্র সম্মিলনের এমন শুভদিন আর নাই,—বিজয়ার প্রণাম নমস্কার আলিঙ্গন আশীর্ব্বাদে, ভক্তি প্রীতি স্নেহ সৌহার্দ্দের মধুর মূর্ত্তি, অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্য, হিন্দু সন্তানের মনোমন্দিরে বিকসিত হইয়াছিল। সপ্তমী, মহাষ্টমী, মহা নবমী এই তিন দিন যে কি মহানন্দে মহোৎসবে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা বিধর্ম্মী নাস্তিকেরাও উপলব্ধি করিয়া চমকিত হইয়াছিল। মা আনন্দময়ীর পূজায় বিল্ব-শাখাচ্ছেদ, নব পত্রিকা, পত্রিকা প্রবেশ ইত্যাদি কার্য্য সমাহিত করিয়া সপ্তমীকৃত্য যথাবিহিত পূজা আরম্ভ হইল। ষোড়শোপচারে ভগবতী লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিকেয় গণপতি মহিষাসুর প্রভৃতির পূজা সমাপনান্তে, আত্মবলি, বলিদান, আরতি, হোম, আহুতি, ভোগরাগাদি সমস্তই ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে সম্পূর্ণ। এদিকে মহাষ্টমী আগতা,—মহাষ্টমীর মহাস্নান, যথারীতি পূজা, আবরণ, দেবতা ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতির পূজা সমাপনে বলিদান হোম ভোগ যাগাদি কার্য্য সমস্তই সুসম্পাদিত হইল। দেখিতে দেখিতে মহাষ্টমী অবসিতপ্রায়া; নবমী তিথি প্রবৃত্ত প্রায়। এই সন্ধিক্ষণে, অষ্টমীর শেষ এক দণ্ড এবং নবমীর প্রথম এক দণ্ড,

এই দুই দণ্ড কাল মধ্যে মহামায়ার সন্ধিপূজা সমাপন করিতে হইবে। সকলেই ব্যতিব্যস্ত। জ্যোতির্ব্বিদগণ গ্রহ নক্ষত্রাদির সঞ্চারাদিনিরূপণে শুভ মুহূর্ত্ত স্থির করিতেছেন। বিশ্বস্ত ঘটিকা যন্ত্রের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ হইতেছে, কখন অষ্টমীর শেষ দণ্ড প্রবৃত্ত হয়। দেখিতে দেখিতে অষ্টমীর শেষ দণ্ড প্রবৃত্ত। অমনি ঋত্বিক্ সঙ্কল্প করিয়া মহামায়ার পূজা আরম্ভ করিলেন। এক দণ্ডের মধ্যে পূজা সমাপ্ত হইল। নবমীর প্রথম দণ্ড প্রবৃত্ত হইবামাত্রই বলিদানের উদ্যোগ হইল। সকলেই আশঙ্কিত, যেন অষ্টমী দণ্ডে বলিদান না হয়। কারণ শাস্ত্রকারগণ বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া গিয়াছেন যে, অষ্টমী দণ্ডে বলিদান হইলে বিশেষ অনিষ্ট হয়।—

"অষ্টম্যাং বলিদানেন পুত্রনাশো ভবেদ্ ধ্রুবং।"

ইতি দেবীপুরাণং।

অর্থাৎ অষ্টমীতে বলিদান করিলে জ্যেষ্ঠ পুত্র নাশ হয়। সুতরাং সকলেই মহা শঙ্কিত। সুনির্দ্দিষ্ট ঘটিকা যন্ত্রের সাহায্যে নবমী দণ্ড নিশ্চিত করিয়া সুলক্ষণ ছাগপশু দেবীর সমীপে নিবেদিত হইল। পশুচ্ছেদ ছিন্ন শীর্ষ নিবেদন, রুধির দানাদি কার্য্য যথারীতি সমাহিত হইলে, মহামায়ার ভোগরাগাদি এবং আরতিক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া সন্ধি পূজা কার্য্য সাঙ্গ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে মহা নবমী আগত। মহানবমীতে দেবীর মহাস্নান, যথারীতি পূজা; আবরণ দেবতাগণের অর্চ্চনা করিয়া হোম জপ প্রভৃতি কার্য্য সমস্তই সমাপন করা হইল। মহানবমীতে শাস্ত্রকারগণ প্রভূত বলিদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।—

"প্রভূত বলিদানঞ্চ নবম্যাং বিধিবচ্চরেৎ।"

কালিকা পুরাণং।

অর্থাৎ নবমীতে যথারীতি প্রভূত বলি প্রদান করিবে।

এই শাস্ত্রানুসারে যথাসাধ্য তিনটী পাঁচটী সাতটী, নয়টী অথবা ততোধিক ছাগ, মেষ, মহিষ, ইক্ষু কুষ্মাণ্ডাদি বলি প্রদান করিয়া ভোগরাগ, আরতিক্রিয়া সমাপনে মহানবমীকৃত্য শেষ করা হইল। শারদীয় দুর্গা মহাপূজার দক্ষিণান্ত কার্য্য।

আইস ভাই, সকলে মিলিত হইয়া অকপট ভক্তিভরে সরল প্রাণে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া মহামায়ার অভয় চরণপ্রান্তে প্রণাম করি।

এমন দিন আর হবে না। এ দিনে যার হৃদয়ে আনন্দোচ্ছ্বাস, ভক্তিবিকাশ, প্রেমাবির্ভাব না হইবে, সে কখনই মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারে না। সে ঘোর নাস্তিক, মহাবিধর্ম্মী, উৎকট নারকী। সে সকল লোকের কথা মনে করিলেও ঘোর প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। সংবৎসর সঞ্চিত আশা তিন দিনে সব ফুরাইল। এস, সকলে মিলিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অর্দ্ধোন্মীলিত নয়নে ভক্তিভরে গলদশ্রুনেত্রে সেই জগজ্জননীর চরণে প্রণাম করি; আর প্রাণ খুলিয়া বলি—

"সংবৎসরে ব্যতীতে তু পুনরাগমনায়চ।"

আশার ক্ষীণ আশ্বাস হিন্দুসন্তানের আজ একমাত্র অবলম্বন।

গোপ ও সদ্গোপ।

পৃথিবীতে যাঁহারা "হিন্দু" বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভক্ত। এই বিশাল বিশ্বের যে কোনও স্থানে হিন্দু পুরুষ বা হিন্দু স্ত্রীলোক বাস করুন না কেন, তাঁহাকে এই চারি বর্ণের মধ্যে কোনও একটি বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইতেই হইবে, যিনি এই বর্ণ চতুষ্টয়ের বহির্ভূত, তাঁহার হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার নাই। গুণ বা কর্ম্ম অথবা অন্য যে কোনও কারণেই বর্ণ বিভাগের সৃষ্টি হউক, তদ্বিষয়ের আলোচনা করিয়া সত্যাসত্যের নিষ্কাশন করা শাস্ত্রাভিজ্ঞ অক্ষদর্শী প্রাড়্‌বিবাকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে গণ্য হইলেও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দাও এবং হিন্দু সমাজ শরীরের অন্যতম অঙ্গ বলিয়া গৌরব কর, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাকে এই শাস্ত্রোক্ত চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে একটা বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইতেই হইবে। কিন্তু এই প্রাচীনতম ও প্রকাণ্ড হিন্দুসমাজ বহুসংখ্যক সম্প্রদায়ে বিভক্ত; এক একটি সম্প্রদায় এক একটী ক্ষুদ্র বা বৃহৎ জাতি বলিয়া বিখ্যাত। এবম্প্রকারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত, বৈদ্য, বেণে, কায়স্থ, সুবর্ণ বণিক, সদ্গোপ প্রভৃতি অসংখ্যাসংখ্য জাতির সৃষ্টি হইয়া হিন্দু সমাজকে সহস্র সহস্র অংশে বিভক্ত করিয়াছে। "নবধা কুল লক্ষণ" যুক্ত অতি উচ্চশ্রেণীয় মহিমান্বিত ব্রাহ্মণ সন্তান হইতে, সমাজের সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর

নীচশূদ্র পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষে অগণ্য জাতি আছে; একা বঙ্গদেশে—বাঙ্গালীর মাতৃভূমিতে—প্রায় সার্দ্ধৈক শত ভিন্ন ভিন্ন জাতি বর্ত্তমান। এই সকল জাতি যে কোনও উপাধিতে অভিহিত হউক, ইহারা সকলেই হিন্দু; কিন্তু ইহাদের প্রত্যেক জাতি হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন্ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত তাহা সহজে ঠিক করা যায় না। স্পষ্টতঃ বলিতে হইলে, একা ব্রাহ্মণ জাতি ভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের আর সকল জাতিরই বর্ণত্ব লইয়া বিষম তর্ক উপস্থিত হইতে পারে। তর্ক ও বাদানুবাদের উপকরণ সমূহ বর্ত্তমান আছে বলিয়া, আজি কালি যাহার যাহা মত, তিনি তাহাই অভিব্যক্ত করিতেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যাইতে পারে, বৈদ্যেরা কখনও বৈশ্য, কখনও ক্ষত্রিয় এবং কখনও বা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন; কায়স্থেরা কখনও ক্ষত্রিয় এবং কখনও বা শূদ্র বলিয়া স্বজাতির বর্ণনা করেন; আগুরী জাতি সুবিধামতে বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, শূদ্র এবং ব্রাহ্মণ এই চারি বর্ণেরই অন্তর্ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন; তেলি, তামুলী, সুবর্ণবর্ণিক ইহারাও, ইহাঁদের অনুকরণ করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই; এবং বলা বহুল্য যে, "যুগী" জাতি ইতিমধ্যেই উপবীত ধারণ করিয়া "ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচয় দিয়া জগতকে চমৎকৃত করিতেছে। এই বিষম উপদ্রবের সময়——এই অনৈসর্গিক ও অসাময়িক সমাজ বিপ্লবের সময়—হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বীগণের প্রত্যেক জাতির একটা বর্ণত্ব স্থির করিয়া উঠা কি ভাল নয়? জাতি-বিশেষের বর্ণত্ব স্থির করিতে হইলে, শাস্ত্র, যুক্তি, জনপ্রবাদ, মহাপুরুষদিগের বাক্যাবলী, জাতিগত আচার ব্যবস্থার প্রভৃতির অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহারা বর্ণভেদ বা জাতিভেদ মানেন না এবং ক্ষুধার্ত্ত সারমেয় শাবকের ন্যায় "যাহার তাহার" স্পৃষ্ট বা উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন, তাঁহাদের সহিত আমার তর্ক নাই, অথবা যাহারা শাস্ত্রবিরোধী এবং যাহাদের "ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্ট মন্দিরে," তাহাদের জন্যও এই প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। কিন্তু হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেই হিন্দু-শাস্ত্র মানিতে হইবে; কারণ মুসলমান যদি কোরাণ না মানে, খৃষ্টান যদি বাইবেল না মানে, আর হিন্দু যদি হিন্দুশাস্ত্র না মানে, তাহা হইলে সমাজ ও ধর্ম্ম বলিয়া জগতে কোন পদার্থের অস্তিত্বই সম্ভবে না। এই জন্যই শ্রীমন্মনুমহারাজা বলিয়াছেন—

প্রত্যক্ষঞ্চানুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
এবং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥
(১২ অঃ। ১০৫ শ্লো)

এইজন্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান কহিয়াছেন—

যঃ শাস্ত্রবিধি মুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কারকারতঃ
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতি
তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তু মিহার্হসি।
(১৬ অঃ। ২৩ শ্লোক)

যাহা হউক, ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রের কর্ম্ম যেমন অনুচিত, তেমনি শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরোধী এবং অকর্ত্তব্য; এই জন্যই প্রত্যেক জাতির বর্ণত্ব বিচার করা অত্যন্ত অবশ্য কর্ম্ম। ব্রাহ্মণের দ্বারাই এই বিচার হওয়া আবশ্যক, কারণ মনুর মতে "শাস্ত্রাভিজ্ঞ তপঃ প্রভাবশালী ব্রাহ্মণের বাক্য ব্রহ্মবাক্য মধ্যে গণ্য।"

আমি কয়েক বৎসর হইতে হিন্দুজাতির এই বর্ণত্ব লইয়া বিশেষরূপে আলোচনা করিতেছি। অতি অল্প দিবস অতীত হইল, বঙ্গদেশের কৈবর্ত্তজাতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া "মাহিষ্য সিদ্ধান্ত" নামে এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলাম। এক্ষণে গোপ ও সদ্গোপ জাতির বর্ণত্ব আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। "জন্মভূমি" পত্রে মধ্যে মধ্যে অবকাশমতে এইরূপ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। গোপ এবং সদ্গোপ জাতি সম্বন্ধে যতদূর আলোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের সংগ্রহ করা গিয়াছে, কিন্তু কতকগুলি কঠিন সমস্যার এখনও মীমাংসা করা হয় নাই। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর আবশ্যক। জন্মভূমি পত্রের গোপ অথবা সদ্গোপ জাতীয় কোনও পাঠক কিম্বা অন্য জাতীয় কোনও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যদি কৃপা করিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দেন, তাহা হইলে নিতান্ত বাধিত হইব। উত্তরদাতা মহাশয়গণ ইচ্ছা করিলে, পত্র দ্বারা আমার মুর্শিদাবাদের ঠিকানায় আমাকে যথাযথ জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইতে পারেন অথবা "জন্মভূমি" মাসিক পত্রে তাহা প্রকাশ করিতে পারেন। প্রশ্নগুলি এই—

১। গোপ ও সদ্গোপ জাতির মধ্যে পারস্পরিক কোনও সম্বন্ধ ছিল বা আছে কি না ?

২। সদ্গোপ শব্দের প্রথমে সৎ শব্দ ব্যবহারের কারণ কি ?

৩। পূর্ব্বে বঙ্গের অনেক স্থলে কায়স্থ ও বৈদ্যের পরস্পর বিবাহ হয় ; রাঢ় দেশে প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে অনেক গোপকন্যার সহিত সদ্গোপ যুবকের বিবাহ হইয়াছিল ; এইরূপ বিবাহ এখনও কোথাও বর্ত্তমান আছে কি না ? যদি থাকে, তাহা হইলে এই বিবাহের আপত্য কোন্ বর্ণভুক্ত হয় ?

৪। সদ্গোপ শব্দ প্রাচীন কোনও সংস্কৃত সংহিতা বা পুরাণে আছে কি না ? যদি না থাকে, তাহা হইলে এই শব্দের ব্যুৎপত্তি কি ?

৫। আমি সদ্গোপদিগকে বৈশ্য বলিয়া বিবেচনা করি, কিন্তু রাঢ়ী, বারেন্দ্র অথবা বৈদিক শ্রেণীর কোনও ব্রাহ্মণ এ পর্য্যন্ত সদ্গোপের পৌরহিত্য করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন কি না, তাহা জানিতে পারিলে বাধিত হইব।

৬। বঙ্গের কোনও কোনও স্থানে "পতিত ব্রাহ্মণের" দ্বারা সদ্গোপের ক্রিয়া কাণ্ডাদি সম্পন্ন হয় কেন ?

৭। বঙ্গের কোনও কোনও স্থানে, সদ্গোপের ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দলভুক্ত কেন ?

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।
মুর্শিদাবাদ।

শিবাখ্যা-কিঙ্কর।

আঁধার রজনী, নিশীথ সময়,
নাহি কোলাহল জগৎময়।
বন উপবন, প্রাসাদ ভবন,
হইয়াছে সব আঁধারে লয়॥
সুধীর সমীর, পাতাটী না নড়ে,
নিশাচর ঢরে শুয়ে যেমন।

প্রশান্ত প্রকৃতি, শান্ত স্রোতস্বিনী,
কি যেন বিষম ভাবে মগন॥
নিবিড় কানন, ঘন ঘটা ঘোর,
চমকি চমকি চপলা চায়।
ধরিয়া কানন, বেশ ভয়ঙ্কর,
থাকিয়া থাকিয়া মুখ দেখায়॥
নিতান্ত নীরব, ভীষণ সময়,
বসিয়া ধরম শিলার তলে।
করিছে রোদন, কাঁদে বন বনস্থলী,
দুখেতে তাহার পাষাণ গলে॥
লোহিত বদন, লোহিত লোচন,
লোহিত বসন ভিখারী বেশ।
পাপের পীড়নে, ত্যজিয়া নগর,
করেছেন দুখে বন প্রবেশ॥
দীঘাল নয়নে, চাহিয়া গগনে,
আঁখি ফাটি জ্যোতি তড়িৎপ্রায়।
চলিছে ছুটিয়া, কাঁপে তারা জ্যোতি,
চমকি চমকি নিবা'য়ে যায়॥
কি যেন ভীষণ, ভাবেতে মগন,
দুখমাখা মুখ মরিয়ে হায়।
থাকিয়া থাকিয়া, ঝরিছে নয়ন,
জলধর যেন গিরির গায়॥
কহিছে বিষাদে, মরি হায় হায়,
কে আছে এমন ধরণীতলে।
এমন ভীষণ, নিশীথ সময়ে,
কাঁদিছে বসিয়া শিলার তলে॥
বসুধা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
অতুল প্রভাব আছিল মোর।
হিংসা প্রলোভন, ঘোর ব্যভিচার,
হায়রে আমারে করেছে চোর॥

সকলের মূল, বসুধার পতি,
রাজা সুদর্শন এ বঙ্গ যার।
ক্ষত্রকুলকালী, বিনাশিল বঙ্গ,
কুকাজে বাড়ায়ে কলুষ ভার॥

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কত কাছাকাছি।

কত কাছাকাছি হায় তোমায় আমায়
তবু এত দূরে দূরে, যেন মনে হয়
যুগ যুগান্তর চলি সে পথের পার
পাইব না কোন মতে! অকূল পাথার
বিষম অজ্ঞানসিন্ধু! মুদিত নয়ন—
আঁধার পশ্চাতে যেন আঁধার ভীষণ!
একিরে ছলনা!—মায়া হাসিয়া হাসিয়া
তোমা ভুলাইতে চায়—কি খেলনা দিয়া!
বুড়া খোকা আত্মভ্রমে তাই ল'য়ে মজি—
বদ্ধ হই হায়! রাম উলটা সমঝি,
প্রলাপ খেয়ালে হেরি মরণের ছায়া—
নিজ অমরত্ব আর দাসত্ব ভুলিয়া,
—নিত্য যা' সম্বন্ধ প্রভু চরণে তোমার—
কি যাতনাবিষে শেষে করিগো চীৎকার!
কোথা সে আনন্দময় তব নিকেতন!
কোথা এই দুখমগ্ন মায়ার ভবন!
সত্ত্ব, রজ, তম গুণ তাহার বিকার,
তস্য বিকারেতে কিবা জগত মাঝার—
ফেলিয়া মথিয়া ফেলে! হই দিশাহারা,
তুমি যে পরাণ মাঝে—ভুলে হই সারা!

শ্রীরামচন্দ্র সেন।

পাশ্চাত্য জাতির ভারতাক্রমণ।

(২)

এ পর্য্যন্ত যে কয়জন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক পণ্ডিত ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, তাঁহাদিগের মধ্যে টড্ এবং এলফিন্‌ষ্টোন ব্যতীত বোধ হয়, কেহ ভারতবর্ষে পদার্পণ করা দূরে থাকুক, চিত্রপট ব্যতীত ভারতবাসীর মূর্ত্তি পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করেন নাই। আর আমাদেরও এরূপ দুর্দ্দশা যে, সেই সমস্ত ইতিহাসে আস্থা-স্থাপন-পূর্ব্বক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হয়। ইউরোপীয় ঐতিহাসিক প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্য্যালোচনা কর, দেখিতে পাইবে, ঐতিহাসিকেরা প্রথমাবধি ইউরোপকে সুসভ্য বলিয়া প্রকাশ এবং ইউরোপীয় জাতির শ্রেষ্ঠতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতেছেন; পক্ষান্তরে ভারতবর্ষকে নিতান্ত বর্ব্বর ও অসভ্যজাতিদিগের বাসভূমি একথা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতভূমি ঐশ্বর্য্যের আগার-স্বরূপা, কিন্তু ভারতবর্ষের অধিবাসীরা বড়ই অসভ্য—বড়ই নীচ—বড়ই দুর্দ্দান্ত—বড়ই নির্ব্বোধ। ঠিক যেন তাঁহারা বলিতে চান যে, ভারতভূমি ধনৈশ্বর্য্য-শালিনী হইলেও ভারতবাসীরা উহা ভোগ করিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তাঁহাদিগের ইতিহাস লিখিবার উদ্দেশ্যই যেন জগতের সমক্ষে ইউরোপকে শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রভূমি বলিয়া প্রতিপন্ন করা। কিন্তু ইহাতে আমাদিগেরও একটু উপকার হইয়াছে। আমরাও ইহা হইতে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসা, মহত্ত্ব প্রভৃতি গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি।

সে যাহা হউক, কোন্ সময় সেমিরেমিস ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই নির্ণয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, খ্রীষ্ট জন্মিবার প্রায় দুই হাজার দুই শত বৎসর পূর্ব্বে (২১৮২ বি, সি) আসিরিয়া রাজ্ঞীর আবির্ভাব হয়।

ইহার পর দেড় সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আর কোনও পাশ্চাত্য জাতির ভারতাক্রমণ সম্বন্ধে কোনও কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে ডেরায়স নামে পারস্যদেশে জনৈক নরপতির

পশ্চিম তীরে উপস্থিত হইলেন। প্রথমেই তিনি সিন্ধুনদী কোন্ স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া কোন্ সমুদ্রে পড়িয়াছে, তাহাই (Course) জানিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় সাইলক্স নামে এক ব্যক্তি নাবিকের কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ডেরায়স তাঁহার প্রতি তাঁহার অভিলাষিত কার্য্যের ভার অর্পণ করিলেন। সাইলক্স সিন্ধুনদী হইতে পোতারোহণ পূর্ব্বক সার্দ্ধ দুই বৎসর পরে মিশরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বে জল-পথে আর কেহ এতদূর ভ্রমণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং সাইলক্সের এই অদ্ভুত কার্য্যটা কতদূর বিস্ময়জনক হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। দুঃখের বিষয়, সাইলক্স কোন্ দেশীয় ছিলেন বা কোন্ পথে তিনি ভারতবর্ষ হইতে মিশরে গমন করিয়াছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ডেরায়স প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এবং কোন্ কোন্ রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, হেরোডোটস তৎসম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার ডেরায়সের ভারতবিজয়-বর্ণনা অনেকটা ঔপন্যাসিক ব্যাপার। এই ব্যাপারের সহিত ইতিহাসের সম্বন্ধ বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাপি হেরোডোটস যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বোধ হয়, ডেরায়স ভারতবর্ষের অতি অল্প পরিমাণ ভূখণ্ডে স্বীয় বিজয়কেতন উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডেরায়সের ভারতবিজয় সম্বন্ধে হেরোডোটস এই মাত্র লিখিয়াছেন যে, "Darias subdued the Indians." ডেরায়স ভারতবাসীদিগকে বশ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ডেরায়সের ভারতবর্ষ মুলতান, লাহোর এবং গুজরাটের অধিক বিস্তৃত ছিল না। আর কতকগুলি অসভ্য জাতির উপরও প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া, বোধ হয় মহাবীর ডেরায়স ভারত-বিজয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সকল স্থানের অধিবাসীরা কতদিন ডেরায়সের অধীনতাপাশে বদ্ধ ছিল, তাহাও বলা যায় না।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী।

জয়ন্তী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অজিত সিংহ, মারবার দেশে রাজত্ব করিতেন। ইনি প্রসিদ্ধ যশোবন্ত সিংহের পুত্র। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে তিনি আজ আজমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আরাবল্লী পর্ব্বতের পাদদেশে আপনার মহতী অনীকিনীসহ শিবির স্থাপিত করিলেন।

অজিত সিংহ রাজপুত, এই চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সেই তাঁহার হৃদয় সৌর্য্যে পরিপূরিত হইয়াছিল। তাঁহার সেই ঈষদারক্ত উন্নত ললাটদেশে, সেই সদা চঞ্চল আয়ত নয়ন-যুগলে—সেই শুভ্র সটান চিবুকে—সেই ঈষৎ গুম্ফযুক্ত গণ্ডদ্বয়ে—সেই বলিষ্ঠ গ্রীবাদেশে—সেই প্রশস্ত বক্ষঃস্থলে সর্ব্বদা অপূর্ব্ব সৌষ্যচ্ছটা বিকাশ পাইত। প্রতিভালোকে তাঁহার সেই সুকুমার দেহের মহিমা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সেই প্রতিভা ও সৌর্য্য লইয়া আজ কিশোর অজিত সিংহ আজমীর আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

তৎকালে সফি খাঁ দিল্লীশ্বরের অধীনে আজমীরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি এই সংবাদ অবগত হইয়া, অজয় দুর্গে থাকিয়া, শত্রুর গতি পরিবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিলেন।

দুর্গাদাস* নামে অজিতের এক সেনাপতি ছিলেন। বীরত্বে তিনি রাজস্থানের ইতিহাসে সুপরিচিত। অজিত সিংহের এই যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্বেই তিনি সফি খাঁকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এ সংবাদ দিল্লীতে বসিয়া বাদসাহ শুনিলেন। তিনি সফি খাঁকে সাহায্য করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

---

*. যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর অজিত সিংহের জন্ম হয়। অজিতের মাতা স্বামীর মৃত্যুকালে সাত মাস গর্ভবতী ছিলেন। অজিতের জন্ম হইলে অনেকে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিল। সেই সময় হইতে মহাবীর দুর্গাদাস তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন।

অজিতও এই শত্রুদলবৃদ্ধির কথা শুনিতে পাইলেন। তিনি রণ-পরাজয়ের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার বীর-হৃদয়ে ভয়ের উদ্রেক হইল না। তিনি আপন মন্ত্রী পদ্মরাওকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

মন্ত্রী আসিয়া দেখিলেন, যোধপুরাধিপতি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। অভিবাদন করিয়া তিনি বলিলেন,—"মহারাজের জয় হউক।"

অজিতের চমক ভাঙ্গিল। তিনি বলিলেন, "বস।" মন্ত্রী আবার "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া উপবেশন করিলেন।

অজিত বলিলেন,—"না। সে আশা আর নাই।"

মন্ত্রী।—কেন মহারাজ? আপনার অতুল বিক্রমের নিকট যবন সেনা পরাস্ত হইবে। পাপিষ্ঠ যবন, ঝরণায় স্খলিত শিলাখণ্ডবৎ রাজপুত পরাক্রমে ভাসিয়া যাইবে।

অজিত।—সে আশাও বা ঐরূপে ভাসিয়া যায়! শুনিয়াছি, বাদসাহ সফি খাঁকে সাহায্য করিবেন।

মন্ত্রী বিস্মিতভাবে বলিলেন, "সে কি?"

অজিত।—গোয়েন্দা আজ এ সংবাদ দিয়াছে।

মন্ত্রী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তাতেই বা ক্ষতি কি? আপনি কি মহাবীর দুর্গাদাসকে বিস্মৃত হইতেছেন?"

অজিত গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"একা দুর্গাদাস মোগলের কি করিবেন?" তার পর আবার ঈষৎ মৃদুস্বরে বলিলেন, "হায়! আজ যদি অনন্ত সিংহ থাকিতেন।"

মন্ত্রী মুখ বিকৃত করিলেন; বলিলেন, "সে ত বিশ্বাসঘাতক—আপন কুৎসিতা কন্যাকে রূপবতী কহিয়া মহারাজের সঙ্গে বিবাহ ঘটাইতেছিল। ভাগ্যে আমি সে কন্যা দেখিয়াছিলাম, তাই মহারাজ প্রতারিত হন নাই। ভাবিয়া দেখুন, সে থাকিলে আজ আরও আপনার কত সর্ব্বনাশ ঘটিত।"

অজিত।—না মন্ত্রী; এ সব কথা বিশ্বাস করিতে আমি ইচ্ছুক নই। অনন্ত সিংহের অপরাধ দুর্গাদাসও স্বীকার করেন না। কেবল তোমার নিকটেই তিনি অপরাধী। আজ তাঁহাকে পাইলে আমি সসাগরা পৃথিবীকে অবজ্ঞা করিতাম।

মন্ত্রী ঈষৎ বিরক্তি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "হইতে পারে। কিন্তু দুর্গাদাস আপনার যে উপকার করিয়াছে, সে তাহার শতাংশও করে নাই।"

অজিত।—সত্য বটে। মহাবীর দুর্গাদাস আমার প্রাণদাতা ও রাজ্য-দাতা। এ জন্য আজীবন তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। কিন্তু বোধ হয় তোমার কথার উপর নির্ভর করিয়া, যদি আমি সেই বৃদ্ধ সেনাপতিকে নির্ব্বাসিত না করিতাম, তবে কোন্ দিন এই মাতৃভূমি অধিকৃত হইত।

মন্ত্রী।—মহারাজ, আপনার উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম। আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। অবিশ্বাসী হইয়া আমি কার্য্য করিতে ঘৃণা বোধ করি;—আমাকে বিদায় দিন। অনন্ত সিংহকে আনাইয়া লউন।

অজিত।—রাগ করিও না মন্ত্রী। অনন্ত সিংহ আর এ পৃথিবীতে নাই। শুনিয়াছি, তাহার সেই অভাগিনী তনয়া এখন বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। সেই স্বর্গীয় বীরপুরুষের শোকাবেগেই এত কথা বলিলাম; রাগ করিও না।

অজিত সিংহের নয়নের কোলে দুই ফোঁটা অশ্রু আসিল। সেই অশ্রু-পূর্ণ নয়নে তিনি দেখিলেন না যে, মন্ত্রীর নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছিল।

কিয়ৎকাল পরে তিনি শান্ত হইয়া তাহাকে বলিলেন, "যাউক সে সব, এখন পরামর্শ শুন।"

মন্ত্রী।—কি করিবেন?

অজিত।—কল্য প্রত্যূষে দুর্গ আক্রমণ করিব।

মন্ত্রী।—যুদ্ধ করিবেন!

অজিত।—তবে কি? রাজপুতজাতি মরিতে ভয় পায় না।

মন্ত্রী।—আমিও তাই বলি,—সেই উত্তম।

তখন অজিত মন্ত্রীকে অন্যান্য উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন। কিন্তু তাহার ব্যবহার কেমন ভাল লাগিল না। সেই চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকের কোমল হৃদয়েও সন্দেহের ছায়া পড়িল। যে দিন মন্ত্রী সেই মহাবীর অনন্তসিংহের নির্ব্বাসন ঘটাইলেন, সেই দিন হইতেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি অজিতের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল। তিনি যতই তাহার বিষয় জানিতে লাগিলেন, ততই নূতন নূতন সন্দেহ আসিয়া হৃদয় ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

তখন রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর। শিবিরের চতুর্দ্দিকে রাঠোর সর্দ্দারগণ তখনও নৃত্য গীত করিতেছিল। অনেকে আবার ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল। আকাশে নক্ষত্রদল ফুটিয়া ফুটিয়া হাসিতেছিল।

অজিত সিংহ একটী বাতায়ন খুলিয়া, সেই নৈশসৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আকাশে তারকারাজির মৃদু হাসি—অদূরে ভীষণ ঘোর তমশারাশি—দেখিতে দেখিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ পশ্চাতে কাহার পদশব্দ হইল। তিনি ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন,—অপরূপ!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অজিত দেখিলেন, তাহার পশ্চাতে এক আশ্চর্য্য রূপসী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রমণীর বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর হইবে। এই কৈশোরেই অপরূপ রূপলাবণ্য তাহার দেহোপরি খেলিতেছিল। অঙ্গ স্ফুরিয়া এক উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ছুটিতেছিল। সেই গরিয়সী রমণীর সর্ব্বাঙ্গে কুসুম-হার শোভা পাইতেছিল। মস্তকোপরি যেথান হইতে কৃষ্ণ কুন্তলরাশি পৃষ্ঠদেশ দিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া নিতম্ব-স্পর্শ করিতেছিল—তথায় একছড়া বনফুলের তোড়া আঁটিয়াছিল। গলায়, হস্তে, স্কন্ধে, কর্ণে, ঐরূপ অসংখ্য মালা দুলিতেছিল। সুন্দর চম্পকাঙ্গুলিগুলিতে জুঁই ফুলের অঙ্গুরী শোভা পাইতেছিল। অজিত ভাবিলেন, "এই কি বনদেবী—কাননে শান্তিভঙ্গ হেতু আমায় কিছু বলিতে আসিয়াছেন?" প্রকাশ্যে বলিলেন, "তুমি কে—কেন আসিয়াছ?"

বালিকা উত্তর করিল না। নীরবে, অনিমেষ চক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

অজিত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "অজিত সিংহের নিকট তোমার কি প্রয়োজন, কেন এ নিশীথকালে এ স্থানে আসিয়াছ?"

বালিকা পূর্ব্ববৎ নীরব রহিল। তাহার দেহে ও নয়নদ্বয়ে কি এক চঞ্চলতা খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। এইরূপ ভাবে কিছুক্ষণ গত হইলে

অজিত দেখিলেন, বালিকা দ্বারের নিকট সরিয়া যাইতেছে। তিনি আবার বলিলেন, "কেন চলিয়া যাইতেছ?"

বরবর্ণিনী যবনিকার অন্তরালে যাইয়া দাঁড়াইল। অজিত সিংহ অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন, রমণী ইঙ্গিতে তাহাকে ডাকিতেছে। অজিত সিংহ বিস্মিতভাবে তাহার নিকট গেলেন। বালিকা কিছু না বলিয়া চলিতে লাগিল। অজিত সিংহ অনুসরণ করিলেন। বালিকা যাইতে যাইতে ক্রমে শিবির পার হইল। তখন অজিত সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমায় সকলের অলক্ষ্যে কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

বালিকা ফিরিয়া দাঁড়াইল। কতক্ষণ অজিতের মুখের প্রতি গম্ভীর ভাবে চাহিয়া বলিল, "আইস।"

বালিকা আবার চলিতে লাগিল।

অজিত সিংহ চিন্তিত হইলেন। এই নিশীথকালে এক অপরিচিতা বালিকার সঙ্গে একাকী শিবির পরিত্যাগ করা উচিত কিনা, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে তদবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, বালিকা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। অজিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাস কেন?"

বালিকা।—রাজস্থানের কোন নৃপতি বালিকার অনুসরণ করিতে যে ভয় পায়, তাহা জানিতাম না।

অজিত সিংহ লজ্জিত হইলেন। বলিলেন, "চল যাইতেছি।"

বালিকা অদূরে সেই অন্ধকারে তাহাকে লইয়া চলিল। কানন, উপত্যকা, পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। অজিত সিংহের মধ্যে মধ্যে সন্দেহ হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে আপনার অবিমৃষ্যকারিতার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কিছু ভীত হইলেন।

বালিকা অবিরামগতিতে চলিতে লাগিল। আরও অনেক দূর যাইয়া অজিত বলিলেন, "আর কতদূর?" বালিকা কোন উত্তর করিল না।

তাহাকে নিঃশব্দ দেখিয়া অজিত সিংহ বলিলেন, "আর আমি যাইতে পারিব না।" তিনি আবার দাঁড়াইলেন। তখন বালিকা বলিল, "অজিত, তুমি জাননা কোথায় আসিয়াছ। আমি তোমায় পরিত্যাগ

করিলে তুমি কখনই এখন একা শিবিরে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। তুমি আমার সঙ্গে না আসিলে আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।”

অজিত শিহরিয়া উঠিলেন। আবার নিঃশব্দে বালিকার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ সেই পর্ব্বতোপরি এক গিরিকন্দরের নিকট বালিকা অদৃশ্য হইল। অজিত রোমাঞ্চিত কলেবরে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

তখন তাহার মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। ভাবিলেন, ছি! ছি! কি অন্যায় করিয়াছি। এক বালিকার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া জীবন হারাইতে বসিয়াছি। এখন কি করিয়াই বা শিবিরে প্রত্যাগমন করি, কে পথ দেখাইবে? এই মাত্র যে পথ ধরিয়া আসিয়াছি, তাহাও ভালরূপ চিনিতে পারিতেছি না। ভাবিতে ভাবিতে তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। প্রতিপদে ব্যাঘ্র ভল্লুকের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। সেই আঁধার নিশির তমোরাশি দেখিয়া, মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। অসি কোষমুক্ত করিয়া তিনি এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। শ্রমবশতঃ তাহার নয়নপল্লবদ্বয় অলক্ষ্যে নিমীলিত হইয়া আসিল। মুহূর্ত্তের জন্য তিনি আপনার অবস্থা ভুলিতে ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ অদূরে কিসের এক শব্দে তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। তিনি চমকিত হইয়া কাণ পাতিলেন; কিন্তু আর কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না। তখন আবার চিন্তাস্রোত হৃদয় ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া বহিতে লাগিল। তিনি দাঁড়াইয়া আবার পথান্বেষণে ব্যাপৃত হইলেন। এমন সময় অদূরে অশ্বের হ্রেষা ধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। এই নির্জ্জন বনে অশ্বাগমের কারণ জানিতে তিনি উৎসুক হইলেন। সাহসে ভর করিয়া, সতর্ক ভাবে যে স্থান হইতে সে শব্দ আসিয়াছিল বলিয়া বোধ হইতেছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন। সম্মুখের গহ্বর পার হইয়া একটী ছোট প্রান্তর অতিক্রম করিলে অন্য একটী বৃহৎ গহ্বর দেখিতে পাইলেন। দূর হইতে সেই গহ্বর পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ কয়েকটী বস্তু দৃষ্ট হইল। তিনি তাহাদের সম্মুখীন হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইলেন। দেখিলেন, চারিটী সুসজ্জিত অশ্ব বৃক্ষে বাঁধা রহিয়াছে।

এই গভীর রাত্রিতে, এই বিজন কাননে, এই অশ্বগুলিকে কে

আনিল, ভাবিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু অবিলম্বে সন্দেহ ভঞ্জন হইল। কাহার মৃদুস্বর কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি গহ্বরতলে উঁকি মারিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, তন্মধ্যে একটী ক্ষুদ্র আলোক জ্বলিতেছে; আর তাহারই চারিধারে বসিয়া চারিজন লোক কি কথোপকথন করিতেছে।

এই তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে নিবিড় গিরিকন্দরে কাহারা বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য তিনি কৌতূহলী হইলেন। গহ্বরে প্রবেশ করিবেন কিনা, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ করিয়া পরিশেষে প্রবেশ করিতেই মনস্থ করিলেন। মুক্ত অসি হস্তে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। ঠিক এই সময় কোথা হইতে আবার সেই মায়াবিনী কুসুমশোভিতা বালিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া তাহাকে তথায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল।

অজিত সিংহ বলিলেন, “কেন প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেছ।” বালিকা আপনার ওষ্ঠোপরি অঙ্গুলি স্থাপন করিল। তাহার পর আবার হস্ত চালনা করিয়া গহ্বরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল, কিন্তু অজিত সিংহ তথাপি নামিতে লাগিলেন। তখন বালিকা দ্রুতপদে তাহার নিকট যাইয়া হস্ত ধরিয়া বলিল, “যাইও না।”

অজিত তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “তুমি মায়াবিনী,—তোমার কথা কেন শুনিব?” কিন্তু আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি আবার নামিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নামিতে নামিতে যখন তিনি স্পষ্ট সেই লোকদিগকে দেখিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সেই মন্ত্রী তিনজন মুসলমান সৈনিকের সহিত তথায় বসিয়া কি কথোপকথন করিতেছে। ইহাতে তিনি সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি আর নামিলেন না। একস্থানে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন।

শুনিলেন, একজন মুসলমান বলিতেছে—"সে জন্য চিন্তা কি? যুদ্ধে জয় হইলে দিল্লীশ্বর আপনাকে মারবারের অধীশ্বর করিবেন।"

মন্ত্রী একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তবু একটা সর্ত্ত থাকা ভাল।"

২য় মু। তাতেও আমরা রাজি আছি। কাল যুদ্ধের সময় আপনি উহা প্রাপ্ত হইবেন।

ম। আচ্ছা, আপনি সফি খাঁকে বলিবেন, আমি কল্য সমরক্ষেত্রে তাঁহার সহিত যোগ দিব, আর ভোরেই দুর্গাদাসকে বিষ খাওয়াইব।

১ম-মু। আপনাকে ধন্যবাদ।

এ পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়াই অজিত সিংহ ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার অন্তরে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি মুক্ত অসি দৃঢ় হস্তে ধারণ করিলেন। পাপিষ্ঠগুলিকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রতি-মুহূর্ত্তে সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ দেখিলেন, মুসল-মানগুলি মৃত্তিকাচুম্বিত দৃষ্টিতে কি একখানা কাগজ পাঠ করিতেছে। কিন্তু এত লঘুস্বরে উহা পড়িতেছে যে, কিছু বুঝা যাইতেছে না। সকলেরই মন ঐ কাগজখানায় আবদ্ধ ছিল, কিন্তু দুষ্ট মন্ত্রী তখনও চারিদিক চাহিতেছিল। যাহা হউক, অজিত ভাবিলেন, এই উত্তম সুযোগ।

এমন সময় উপর হইতে একটা ফুল আসিয়া তাঁহার শরীরে পতিত হইল। তিনি ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সেই নক্ষত্রালোকে দেখিলেন—বস্ত্রাঞ্চল নাড়িয়া কে যেন তাহাকে ফিরিয়া আসিতে বলিতেছে। কিন্তু অজিত সিংহ তাহার প্রতি আর ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। ভীষণ তুঙ্গভদ্রবৎ সেই লোক চতুষ্টয়ের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন;—মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার সেই শানিত তরবারি একজন যবনদেহে বিদ্ধ করিলেন। সে প্রাণত্যাগ করিল বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মন্ত্রী বড় সতর্ক ছিলেন। তিনি অজিত সিংহকে দেখিয়াই গহ্বরমুখে দৌড়িলেন। অজিত অবশিষ্ট শত্রুদ্বয়ের মস্তক কাটিবার সময় পাইলেন না—তাহারই পিছু পিছু ছুটিলেন।

মন্ত্রী দ্রুত গহ্বর ছাড়াইল। অজিতও গুহা পার হইয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। এমন সময় দেখিলেন যে, মন্ত্রী একটা ঘোড়ায় চড়িয়া বসিয়াছে। পর মুহূর্ত্তেই দেখিলেন, ঘোড়া তীরবৎ বেগে ছুটিয়াছে।

তিনিও একটী ঘোড়া লইতে গেলেন। কিন্তু আর ঘোড়া দেখিতে পাইলেন না।

তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। হঠাৎ আবার সেই বালিকা ফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মৃদুস্বরে বলিল, "শীঘ্র পলাও, শত্রু আসিতেছে।"

অজিত সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

বা। আমি যে হই—তোমার ভাল করিতেছি। শীঘ্র পালাও। আর ঘোড়া পাইবে না—পদব্রজে দৌড়াও।

অ। ঘোড়া কি হইল?

বা। আমি ছাড়িয়া দিয়াছি। যেটী মন্ত্রী লইয়া পলাইল, ওটা তোমার জন্য রাখিয়াছিলাম।

অ। বাকিগুলি ছাড়িয়া দিলে কেন?

বা শত্রু যাহতে ঘোড়া না পায়, তাই এ কাজ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম,—পদব্রজে তাহারা তোমার অনুসরণ করিতে পারিবে না। এই বলিয়াই বালিকা আবার আঁধারে কোথায় মিশিয়া গেল।

অজিত দেখিলেন, মন্ত্রীকে আর পাওয়া যাইবে না। আবার দুজন শত্রু পাছে আসিতেছে। তিনি ভাবিলেন, রাজপুতগৌরব কলঙ্কিত করিয়া শত্রুভয়ে পলাইব—ছি!

এমন সময় অরিদ্বয় আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। অজিত সিংহ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া ক্রোধভরে বলিলেন, "যবন, বীরত্ব পরিত্যাগ করিয়া এখন চোরের ন্যায় পরের সর্ব্বনাশ করিতেছিস্।"

একজন মুসলমান উত্তর করিল, "এখনই বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে।" সে ইহা বলিয়াই অস্ত্রক্ষেপ করিতে উদ্যত হইল।

অজিত সিংহ "উত্তম" বলিয়া অস্ত্র চালাইতে আরম্ভ করিলেন।

নিমিষ মধ্যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল। যবনদ্বয় চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকের প্রতাপে বিস্মিত হইল। দেখিতে দেখিতে অজিতের তরবারি একজন শত্রুর হস্তচ্ছেদ করিয়া ফেলিল। কিন্তু তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। দু এক স্থানে অস্ত্রের আঘাতও লাগিয়াছিল। ক্রমে হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় যবন ক্ষুধিত ব্যাঘ্রবৎ তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িল।

তখন অজিত সংজ্ঞা শূন্যভূমে পতিত। যবন এক টুক্‌রা রজ্জু দ্বারা তাঁহাকে বাঁধিল। তার পর কাঁধে ফেলিয়া লইয়া চলিল। হস্ত বিবর্জ্জিত যবন পাছু পাছু চলিল।

রাত্রি প্রভাতে অজিতের চৈতন্য হইল। তখন দেখিলেন, তিনি বিপক্ষ কর্ত্তৃক অজয় দুর্গে বন্দী হইয়াছেন। তাঁহার অন্তর শোকে দুঃখে ও ক্রোধে পীড়িত হইল। অভিমানে মরিয়া যাইতে চাহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যূষে রাজপুত শিবিরে, নৃপতিকক্ষে শাঁক বাজিয়া উঠিল। রাঠোরগণ রাজপুত গৌরবে উত্তেজিত হইয়া সশস্ত্র যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। সেনাপতি দুর্গাদাস রাজদর্শনে আগমন করিলেন।

সেখানে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে একান্ত আশ্চর্য্য হইলেন। দেখিলেন, সেখানে অজিত সিংহ নাই। তৎপরিবর্ত্তে এক দ্বাদশ বর্ষিয়া সুন্দরী দাঁড়াইয়া শাঁক বাজাইতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে ফুলরাশি শোভা পাইতেছে। মস্তকে, গলায়, বক্ষে, কোমরে, হস্তে সর্ব্বত্র ফুলরাশি। ফুলের উপর ফুল—অনন্ত ফুল। যেন চাঁদের গায় তারা ফুটিয়াছে। সে ফুলের আভায় বলিকার অঙ্গের হৈমকান্তি স্নিগ্ধ হইয়াও অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্যে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

দুর্গাদাস বিস্মিতভাবে বলিলেন, "মা, তুমি কে?"

বালিকা তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া মুখ হইতে শাঁক নামাইল। একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "আমি যে হই, আমার কথা শ্রবণ করুন।"

"অজিত সিংহ কাল রাত্রিতে বিপক্ষ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন।"

দুর্গাদাস চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "সে কি!" কোষ মধ্যে তাঁহার অসি ঈষৎ 'ঝন্ ঝন্' করিয়া উঠিল।

বালিকা হাসিয়া উঠিল। বলিল, "অমাত্যবর, অবলা রমণীর নিকট বীরত্ব প্রকাশ না করিয়া শীঘ্র শত্রু সম্মুখীন হউন।"

সেনাপতি অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "মহারাজ কোথায়?"

বা। বলিয়াছি ত বন্দী হইয়াছেন। এখন অজয় দুর্গে আছেন।

দুর্গা। অসম্ভব।

বা। অসম্ভব নহে। কুলাঙ্গার মন্ত্রীর চক্রান্তে তিনি ধৃত হইয়াছেন, বিশ্বাস না হয়, অনুসন্ধান করুন, দুজনের কাহাকেও পাইবেন না।

দুর্গাদাস দেখিলেন, বালিকা যে ভাবে কথা বলিতেছে, তাহাতে বিশ্বাস করিতে হয় বটে। কিন্তু তিনি একটা বালিকার উপর এত বিশ্বাস চাপাইতে চাহিলেন না। তখনই একজন লোককে ডাকিয়া আদেশ করিলেন—"তুমি শীঘ্র মন্ত্রীকে ডাকিয়া আন। আর মহারাজ কোথায় গিয়াছেন—অনুসন্ধান কর।" লোকটী আজ্ঞা পালন করিতে চলিয়া গেল। তিনি আবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রী কোথায় গিয়াছে?"

বা। সে বিপক্ষের আশ্রয় লইয়াছে।

সেনাপতি নিঃশব্দে কিয়ৎকাল কি চিন্তা করিলেন। তাঁহার বদনে ঈষৎ রক্তিমা লক্ষিত হইল। উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "বালিকে! তোমার কথা বিশ্বাসযোগ্য বটে। কারণ মন্ত্রী মহাশয়কে অনেক দিন হইতেই আমি কিছু সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছি।"

বা। সে নরাধম আপনাকে বিষ প্রয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল।

সেনাপতি রাগতঃস্বরে বলিলেন, "বটে! এত প্রতারণা!" তাঁহার নয়নের কোলে অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। তিনি আবার বলিলেন, "মা, তুমি কোন দেবী হইবে, তাই সব বুঝিতে পারিয়াছ। আমি এখনি পাপিষ্ঠের উপযুক্ত দণ্ড দিয়া আসিতেছি।"

দুর্গাদাস যাইতেছিলেন; বালিকা বাধা দিয়া বলিল, "আপনি কোথা যাইতেছেন? সে যে বিপক্ষাশ্রয়ে অজয় দুর্গে বাস করিতেছে। একা কোথায় যাইতেছেন।"

তিনি দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, তাই ভাল। অদ্য সমর-ক্ষেত্রে এ বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে।"

বা। বীরের উপযুক্ত কথা।

দুর্গ। না। তোমার ভুল হইয়াছে। যে দিন পাপিষ্ঠ অনন্ত সিংহকে নিরর্থক নির্ব্বাসিত করিয়াছিল, সে দিন হইতেই——

সেনাপতি দেখিলেন, জয়ন্তী ঈষৎ কাঁপিল। তিনি বলিতে লাগিলেন,

"সে দিন হইতেই আমি তাহাকে অবিশ্বাস করিয়া আসিতেছি। কিন্তু তথাপি তাহাকে কিছু বলি নাই। পাপীর শাস্তি বিধানই বীরের ধর্ম্ম। আমি বীর নহি!"

বালিকা জিজ্ঞাসা করিল, "অনন্ত সিংহ কেন নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন?"

দুর্গ। সে অনেক কথা। তিনি আপন কন্যাকে মহারাজের সহিত বিবাহ দিতে ছিলেন। আমি জানি, সে কন্যা সুন্দরী ছিল। কিন্তু মন্ত্রী রটনা করিল, "তাহা নহে—কন্যা বড়ই কুৎসিতা।" মহারাজ তখন একাদশ বর্ষের বালক—সে কথা বিশ্বাস না করিবেন কেন? তিনি ভাবিলেন যে, অনন্ত সিংহ তাঁহার সহিত প্রতারণা করিতেছে। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিলেন।

বা। বাস্তবিক্ তাঁহার কন্যা কি বড় কুৎসিতা ছিল?

দুর্গ। মিথ্যা—ও কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাঁহার কন্যা অপূর্ব্ব সুন্দরী ছিল।

এমন সময় সে স্থানে মন্ত্রীর অন্বেষণে প্রেরিত লোকটী আসিয়া বলিল, "মন্ত্রী মহাশয়কে দেখিতেছি না।" দুর্গাদাসের সে কথার আর বড় প্রয়োজন ছিল না। তিনি বলিলেন, "বেশ—চলিয়া যাও।" সে চলিয়া গেল।

তখন বালিকা বলিল, "সেনাপতি মহাশয়, আমার কর্ত্তব্য ফুরাইল। আমি চলিলাম।"

দুর্গ। মা! তুমি আমাদের মহৎ উপকার করিলে। কিন্তু মা, এখনও জানিতে পারিলাম না—"তুমি কে?"

বা। আমার নাম জয়ন্তী—ভিখারিণী মানবী।

দুর্গ। ভিখারিণী! না মা, ভিখারিণীতে ও রূপ শোভা পায় না—ও উজ্জ্বলতা থাকে না। তুমি মূর্ত্তিমতী শক্তি, আমাদিগকে রক্ষা করিতে আসিয়াছ। ও মহিমাময়ী মূরতি ভিখারীকুলে কোথায়?

বালিকা সে কথা লক্ষ্য না করিয়া বলিল, "আমি এখন চলিলাম। আপনি এখনিই শত্রু শিবির আক্রমণ করুন। বৃথা সময় নষ্ট কেন করিতেছেন। ঐ শুনুন, আপনার সেনাগণ বীরমদে কোলাহল করিতেছে। আমি চলিলাম। আর এক কথা বলিয়া যাইতেছি।

আজ তৃতীয় প্রহরের সময় অজয় দুর্গের পশ্চাতের একটী দ্বার খোলা থাকিবে। সেই সুযোগে দুর্গ জয় করিতে হইবে। অজিত সিংহকে আমিই উদ্ধার করিব।"

জয়ন্তী চলিয়া গেল। যতদূর চক্ষু যায়, দুর্গাদাস তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। অদূরে পর্ব্বতের গায় তাহার রূপরাশী মিশিয়া গেলে মনে মনে বলিলেন, "বুঝিয়াছি, ইনি রণদেবী, সন্তানের উপকারার্থে আসিয়াছিলেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পর্ব্বতের উপর কালিকার এক মন্দির ছিল। জয়ন্তী একডালা ফুল লইয়া তথায় প্রবেশ করিল। দেবীর চরণে সে সকল পুষ্প দিতে দিতে বলিল,—"কোথা মা জগদম্বে—ত্রিতাপহারিণী, চতুর্ব্বর্গফলদাত্রী দুর্গে—রণে দিগম্বরী, নৃমুণ্ডমালিনী, অসুরদলিনী চণ্ডিকে—সঙ্কটনাশিনী, মোক্ষপ্রদায়িনী, বিপদার্ণব-তরণী, পতিতোদ্ধারিণী অম্বিকে—কোথা মা চন্দ্রচূড়-বিনোদিনী, বিশ্ববিমোহিনী ক্ষেমঙ্করী—গিরীন্দ্রনন্দিনী, কৈলাস বিলাসিনী, নিশম্ভু-ঘাতিনী অপরাজিতে—কোথা মা তুমি, একবার সন্তানের পূজা গ্রহণ কর। দেখিও, যেন অভাগিনী বলিয়া ঘৃণা করিও না। তুমি ত সকলই জান মা! লোকে তোমাকে কত আদরে পূজা করে; কিন্তু আমি অভাগিনী—এ বনফুল ও অশ্রু ভিন্ন আর ত কিছুই নাই। বল মা, ইহাতেই তুমি সন্তুষ্ট হইবে?"

বলিতে বলিতে জয়ন্তীর চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। সেই অশ্রুপূর্ণ লোচনে সকল পুষ্পগুলি দেবীর চরণে অর্পণ করিয়া আবার বলিল, "সহায় হইও মা—আজ আমি যে গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি, তাহাতে সহায় হইও। তুমি শক্তি, শুনিয়াছি, তুমি ভক্তবৎসলা; তাই সাহস করিয়াছি—রক্ষা করিও।"

তার পর ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া জয়ন্তী মালা গাঁথিতে বসিল। অনেক মালা গাঁথিল—গাঁথিয়া গাঁথিয়া অঙ্গে পরিল।

এমন সময় নিম্নে ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল। জলদ গম্ভীর নিনাদে দিক্‌দিগন্ত পূর্ণ হইল।

জয়ন্তী মন্দির হইতে বাহির হইয়া দেখিল, নিম্নে রাজপুত ও যবনে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়াছে। কামানের ধূমে রণস্থল পরিপূর্ণ হইয়াছে। অস্ত্রের 'ঝন্ ঝন্' শব্দ কানে ঝাঁ ঝাঁ লাগিতেছে। চারিদিকে 'মার মার' শব্দ উত্থিত হইতেছে, রক্তে চারিদিক ভাসিয়া যাইতেছে।

অশ্রুপূর্ণ নয়নে জয়ন্তী আকাশের দিকে চাহিল। কাতরকণ্ঠে বলিল, "সন্তানে রক্ষা করিও মা।" সে কথা মার চরণে পৌছিল কি না জয়ন্তী তাহা বুঝিতে পারিল না। ধবল জলদ মালার স্তরে স্তরে যে সৌরকর জ্বলিতে ছিল, তাহাই সে দেখিতেছিল। নভোমণ্ডলের অনন্ত নীলিমা ভেদ করিয়া দৃষ্টি চালাইতে প্রয়াস পাইতেছিল। আর ভাবিতেছিল—এ অনন্ত নীলিমা সাগর ভেদ করিয়া মা কি আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন? কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিল না—স্থির করিবার অবসরও হইল না। পশ্চাতে কাহার পদধ্বনি শ্রুত হইল। সেই মুহূর্ত্তে কে এক যবন আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইল।

যবনের সর্ব্বাঙ্গ সৈনিকের বেশে আবৃত। সেই সকল বেশ ভূষণে নানা বহুমূল্য রত্ন শোভিত ছিল। মস্তকে উষ্ণীষ—প্রদোষ-কালীন শুভ্র নক্ষত্রবৎ তাহাতে একখণ্ড হীরক জ্বলিতেছিল। কর্ণে মুক্তার কুণ্ডল দুলিতেছিল। এই যবন যে একজন উচ্চদরের কর্ম্মচারী তাহা তাহাকে দেখিলেই বুঝা যাইত।

জয়ন্তী কহিল, "খাঁ সাহেব, এ সময় এ স্থানে কেন?"

আগন্তুকের নাম আবদুল খাঁ। সে বলিল, "সে কি জয়ন্তী? তোমার জন্য এ জীবন উৎসর্গ করিয়াছি—তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, এখানে আমি কেন?"

জ।—ছি, ছি! তুমি এত কাপুরুষ।

আ।—কেন সুন্দরি?

জ।—এ কি আমোদের সময়?

আ।—আমি আমোদ করিতে আসি নাই। যুদ্ধ করিতে করিতে তোমায় দেখিয়া এখানে আসিয়াছি। তুমি কেন এ সময়ে ঐ অতুল সৌন্দর্য্য রাশি লইয়া আমায় দেখা দিলে? কেন স্বর্গের ললনা হইয়া দাঁড়াইলে?

জ।—আবদুল!

আ।—কেন জয়ন্তী?

জ।—আমার কথা রাখ। এখন যুদ্ধে যাও। আজ শিবিরে দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

আ।—সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু সেখানে কি করিয়া প্রবেশ করিবে?

জ।—কেন?

আ।—দুর্গে অন্য লোকের প্রবেশের আদেশ নাই।

জ।—কেন নাই? তোমার আজ্ঞা থাকিলে না থাকিবে কেন? তুমিই ত দুর্গের একমাত্র কর্ত্তা।

আ।—সত্য কথা, কিন্তু সফি খাঁ জানিতে পারিলে প্রমাদ ঘটিবে।

জ।—না হয় গোপনে যাইব।

আবদুল খাঁ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আচ্ছা, পশ্চাতের গুপ্তদ্বার খোলা থাকিবে। কিন্তু সাবধান, আর কেহ যেন এ বিষয় না জানিতে পারে।"

জ।—আর কেহ জানিবে না। কেবলমাত্র একটী সখী সঙ্গে লইব। এ কাননে আমার এক বিশ্বাসিনী সঙ্গিনী মিলিয়াছে।

আ।—সর্ব্বনাশ! তা হইবে না। তুমি একা যাইবে।

জ।—আমি অবলা—একা কি করিয়া যাইব?

আ।—তুমি ত সর্ব্বদাই একাকিনী।

জ।—সে ত বনে। নির্জ্জনে কাহাকে ভয় করিব? দুর্গে ত প্রবেশ করিতে পারিব না।

আ।—আমি আসিয়া তোমায় লইয়া যাইব।

জয়ন্তী বিরক্তিপূর্ণস্বরে বলিল, "কেন? বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না?"

আ।—না। একটী পিপীলিকাকেও বিশ্বাস করিতে নাই।

জ।—উত্তম! চলিয়া যাও—আমি যাইতে চাহি না।

তখন আবদুলের চেতন হইল। ভাবিল, তাই ত! কিসে কি করিলাম! প্রকাশ্যে বলিল, "জয়ন্তি, ক্ষমা কর। যাহাতে আমার বিশেষ অধিকার নাই, তাহা হঠাৎ করিতে সাহস পাইতেছি না। এস, এই স্থানেই একটু বিশ্রাম করি।"

জয়ন্তীর মুখ রঞ্জিত হইল। ঈষৎ ঘৃণার সহিত বলিল, "ছি, ছি; কাপুরুষ! তুমি এখানে আমোদ করিতে আসিয়াছ? আর ঐ দেখ—তোমার সেনাগণ পশ্চাৎ হটিতেছে।

জয়ন্তী রণস্থলে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিল। আবদুল দেখিল, বাস্তবিকই যবনগণ হটিতেছে। সেনাপতিহারা হইয়া ইতস্ততঃ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। তখন আবদুল বলিল, "আর আমি থাকিতে পারিতেছি না। দুর্গেই সাক্ষাৎ করিও—সঙ্গী লইও।"

আবদুল দ্রুত চলিয়া গেল। জয়ন্তী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দেড় প্রহরের সময় অজয় দুর্গের একটী গুপ্ত দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া আবদুল খাঁ জয়ন্তীর অপেক্ষা করিতেছিল; মুহূর্ত্তান্তরে সতৃষ্ণ নয়নে এক একবার উঁকি মারিয়া পথপানে চাহিতেছিল। চাতক মেঘাশায় যেমন করিয়া আকাশের পানে চায়, তেমনি করিয়া চাহিতেছিল। কিন্তু তখনই আবার নিরাশ হৃদয়ে সেখান হইতে দৃষ্টি তুলিয়া লইয়া আকাশের দিকে, ঐ গৃহে যে একটা প্রদীপ মিটি মিটি জ্বলিতেছিল, তাহার দিকে, আর আপনার বেশভূষার দিকে চাহিতেছিল।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় অদূরে আঁধারে একটা কালমূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। আবদুল খাঁ তখন মাথার সিঁথিটা ভাল করিয়া দুরস্ত করিল, গামছা দিয়া মুখ মুছিয়া—সম্মুখে যে পান্‌দানে একটা সুসজ্জিত তাম্বুল শোভিতেছিল—তাহা মুখে পুরিল। কিন্তু কি আপদ!—যে কাল মূর্ত্তিটা আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, সে ত জয়ন্তী নয়!

আবদুল খাঁ দেখিল, তাহার মস্তক আবৃত করিয়া পদ পর্য্যন্ত একটা কাল পোষাক ঝুলিয়া পড়িয়াছে, কেবল দেখিবার জন্য চক্ষের নিকট দুটা ছিদ্র রহিয়াছে। সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

আগন্তুক কোন উত্তর করিল না। নিঃশব্দে তাহার হাতে একখানা কাগজ দিল। আবদুল দেখিল, একখানা চিঠি। প্রদীপের নিকট যাইয়া পাঠ করিতে লাগিল। লেখা ছিল;——

"প্রিয় আবদুল!"

"দুঃখের কথা কি বলিব, আজ আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না। অকস্মাৎ শিরঃপীড়ায় বড়ই কাতর হইয়াছি। সখীকে পাঠাইলাম। লোকে চিনিতে না পারে, তাই ওরূপ সাজাইয়াছি।

আমার জন্য তোমার যদি বিন্দুমাত্রও দয়া হয়—একবার আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাইবে।

"জয়ন্তী।"

পত্র পাইয়া আবদুলের চক্ষে জল আসিল। এমনও হয়? সাজিয়া গুজিয়া বসিয়া আছি প্রিয়াসম্ভাষণ করিতে—কৈ, আমি আসিতে পারিব না, আমি মরিতেছি। আবদুল অনেকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল। তার পর একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "তোমার নাম কি?"

আগন্তুক উত্তর করিল, "জয়া।"

আ।—তোমার সখীর খুব মাথা ধরিয়াছে—না?

জ।—হাঁ, খুব।

আ।—তিনি কোথায়?

জ।—কালিকার মন্দিরে।

আ।—তুমি ফিরিয়া যাও। বলিও, কাজের দায়িত্বে আমি যাইতে পারিলাম না। ঈশ্বর তাঁহাকে রক্ষা করিবেন।

জ।—আপনি না গেলে তিনি কখনই বাঁচিবেন না। আজ যখন আপনি তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসেন, তখন হইতে তাঁহার অসুখ হইয়াছে।

আ।—তিনিই ত আমাকে তাড়াইয়া দেন।

জ।—শুনিয়াছি, আপনার কার্য্যের গুরুত্ব না থাকিলে তিনি আজ আপনাকে আসিতে দিতেন না।

আবদুল হাতে স্বর্গ পাইল। আহ্লাদে তাহার শরীর নাচিতে লাগিল।—বদনে হাসির ফোয়ারা ছুটিল। বলিল, "কিন্তু উপায়?"

জ।—আপনার গমন ভিন্ন আর উপায় কি?

আ।—আমি কি করিয়া যাইব? দুর্গে সকলই নিদ্রিত। দ্বার কে বন্ধ করিবে? বিশেষ এ কথা আমি কর্ণান্তর করিতে ইচ্ছুক নই। শুনিলে বাদসাহ আমার মাথা কাটিবেন।

জ।—আপনি বড় বেরসিক দেখিতেছি!

আবদুল হাসিল। বলিল, "কেন?"

জ।—আপনি নিজের জীবনের জন্য প্রণয়ীর জীবন বধ করিতে প্রস্তুত!

আবদুল লজ্জিত হইল। বলিল, "তা—না—তা।"

জয়া বলিল, "তবে চলুন।"

আবদুল এবার বিপদে পড়িল। একদিকে কার্য্যের গুরুত্ব, অপর দিকে সুন্দরীর অনুরোধ! এই উভয় সমস্যায় পড়িয়া খাঁ সাহেব চিন্তা-সাগরে ভাসিতে লাগিল। জয়া বলিল, "কি করিবেন?"

আ।—দাঁড়াও—যাইব।

তার পর দেওয়ালে যে একখানি তরবারি ঝুলিতেছিল, তাহা হাতে লইয়া বলিল, "কিন্তু দ্বারটা খোলা রাখিয়া যাইতে ভরসা হইতেছে না, শত্রু নিকটে।"

জয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া বলিল, "এক কাজ করিতে পারেন। যদি বিশ্বাস হয়—চাবিটা আমায় দিন। আমি দ্বার বন্ধ করিয়া দুর্গে থাকিতেছি। আপনি না হয় একটু রাত্রি থাকিতে আসিয়া আমায় বাহির করিয়া দিবেন।"

আবদুল সাহ্লাদে বলিল, "সেই উত্তম! কিন্তু তুমি বড় ভীরু, পারিবে কি?"

জ।—আমাকে ভীরু কে বলে?

আ।—তোমার গলা ভয়ে কাঁপিতেছে। স্বর কেমন বিকৃত হইয়া গিয়াছে। স্বাভাবিক স্বর বাহির হইতেছে না।

জ।—তাতেই বা কি? আমি ত আর লড়াই করিব না। চাবি দিয়া দ্বার আঁটিয়া বসিয়া থাকিব মাত্র।

"আচ্ছা এই লও" বলিয়া আবদুল একতাড়া চাবি তাহার নিকট ফেলিয়া দিল।

জ।—এ কি! কোন্ চাবিটা?

আবদুল আবার তাড়াটা কুড়াইয়া একটা চাবি দেখাইয়া দিল।

তখন জয়া তাহাকে এক লম্বা সেলাম ঠুকিয়া দুর্গে প্রবেশ করিয়া দ্বার আঁটিল। কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া থাকিয়া আবার দ্বার খুলিল। দেখিল, আবদুল চলিয়া গিয়াছে। তখন সে বাহির হইল। কিছু দূরে যাইয়া মৃদু মধুর সিস্ দিতে লাগিল। তখন কোথা হইতে আঁধার কাটিয়া তিনটা লোক আসিয়া দাঁড়াইল। চারিজনে দুর্গে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সেই দিন রাত্রিকালে অজয়দুর্গের একটী প্রশস্ত ঘরে আমোদ চলিতেছিল। মুসলমান আমীর, বাদসা ও নবাবগণ যেরূপ আমোদপ্রিয় ছিলেন, সফি খাঁও সেইরূপ ছিলেন। গভীর নিশীথে তিনি অতুল আনন্দে মত্ত ছিলেন। সেই ঘরে শতাধিক উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলিতেছিল, লাল, নীল, সবুজ ঝাড়ে উজ্জ্বল-নক্ষত্রবৎ সেই সকল আলোক দীপ্তি পাইতেছিল। দেওয়াল সংলগ্ন ছবিগুলিতে সে আলোকচ্ছটা পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছিল এবং ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না।

সেই আলোতে—শতালঙ্কার ভূষিতা শত শত বামা নাচিতেছিল। তাহাদের পদে রজতনূপুর বড় মিঠে 'রুনু ঝুনু' বাজিতেছিল।

সেই তালে তালে অপূর্ব্ব নৃত্য—তালে তালে অপূর্ব্ব অঙ্গভঙ্গী! সেই অঙ্গ ভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে স্নিগ্ধোজ্জ্বল গৌরকান্তি ছুটিয়া প্রদীপালোকে স্ফুরিত হইতেছিল। বড় উজ্জ্বলে উজ্জ্বলে মিশিতেছিল। যে দিকে চাও, অপরূপ ঔজ্জ্বল্য! সফিখাঁর শিরোপরি উষ্ণীষ মধ্যে হীরকখণ্ড উজ্জ্বল জ্বলিতেছিল। বিলাসিনীগণের স্বর্ণালঙ্কার উজ্জ্বল হাসিতেছিল—উজ্জ্বল নাচিতেছিল—উজ্জ্বল মৃদু মন্দ বাজিতেছিল। উড়ানীর মধ্যে শত শত মুক্তরাশি স্ফুরিতেছিল। চিক্কণ-চিকুরজাল, কবরীবদ্ধ, কাহারও কবরীচ্যুত হইয়া, কাহারও বা অপাঙ্গে ঢাকিয়া উজ্জ্বল কৃষ্ণোরগবৎ শোভা পাইতেছিল। সুন্দরীগণের কান্তি শরতের জলদ-ধৌত প্রকৃতির কৌমুদী-বসন তুল্য উজ্জ্বল। ততোধিক উজ্জ্বল শোভিতেছিল তাহাদের নয়ন-জ্যোতিঃ। জ্যোতিমান চক্ষুগুলি বড় উজ্জ্বল, উঠিতেছিল—পড়িতেছিল—ঘুরিতেছিল—ফিরিতেছিল। সে ঔজ্জ্বল্যে পুরুষের মনে আগুন জ্বলে, নারী হৃদয়ে হিংসার উদ্রেক হয়।

কতক্ষণ পর রমণীগণ নৃত্য শেষ করিল। সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি ধীরে ধীরে উত্থিত হইল। ধীরে, ধীরে, ধীরে সে স্বর বিমান স্পর্শ করিল। সে সঙ্গে মধুর বীণা বাজিতে লাগিল। আবার সেই উজ্জ্বল নৃত্য—সেই উজ্জ্বলতার অভিনয়, সেই অঙ্গভঙ্গী, সেই কুটিল কটাক্ষ আরম্ভ হইল।

একটী কামিনী একটা কাচের গ্লাসে লালোদক ভরিয়া সফিখাঁর হস্তে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই কটাক্ষ!

সফি খাঁ উহা পান করিয়া কামিনীকে আলিঙ্গন করিলেন। বুঝি বর্ণিত কটাক্ষ-গুণে সফিখাঁর মনে আগুন জ্বলিয়াছিল। আবার বলিয়াছি, সে নয়ন-ভঙ্গীতে নারী-হৃদয়ে হিংসাস্রোত বহে—সেই শতবালা অমনি স্থির হইল। তাহারই মধ্যে একজন তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া, সফিখাঁর নিকটে যাইয়া, তাঁহার কাণে কাণে কি বলিল। অমনি সফিখাঁ রাগিয়া উঠিয়া সেই পূর্ব্ব বর্ণিতা কামিনীকে পদাঘাত করিলেন।

অমনি সকল রমণী হাসিয়া উঠিল। আবার সেই নৃত্য, গীত, বীণা-বাদন আরম্ভ হইল। যে রমণী পদাঘাত খাইয়াছিল, তাহার চক্ষে অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। সে পড়িতে পড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইল। কুন্দ দন্তে অধর চাপিয়া বলিল, "বহুৎ আচ্ছা।" তার পরই রাগে 'গর্ গর্' করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

সফি খাঁ তখন সুরাপ্রসাদে অন্ধ। তিনি তাহা দেখিলেন না। নর্ত্তকি সকল দেখিল। দেখিয়া দেখিয়া মৃদু হাসিল।

এক কটাক্ষে এত ঘটিল। পাঠিকা ঠাকুরাণী সাবধান হইবেন। এমন পোড়া কটাক্ষের আশ্রয় যেন কখনও লইবেন না।

সেই পদাঘাতে পীড়িতা রমণী বাহিরে আসিয়া চক্ষু মুছিল। তখন সে কাঁদিতেছিল। তাহার পর ধীরে ধীরে কোথায় চলিতে লাগিল। হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, "দাঁড়াও।"

রমণী ফিরিয়া চাহিল। যাহা দেখিল, তাহাতে একটু ভীতা হইল। দেখিল,—কে একজন কাল বস্ত্রাবৃত লোক তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। অনুভবে বোধ হইল, স্ত্রীলোক। রমণী বলিল, "তুমি কে ?"

লোকটা উত্তর করিল, "তোমার হিতাকাঙ্ক্ষিণী।"

"তোমার নাম কি ?"

"জয়া।"

রমণী ভাল করিয়া তাহাকে দেখিল, কিন্তু চিনিতে পারিল না। বলিল, "তুই কোথা হইতে এখানে আসিয়াছিস্ ?"

জ।—জেনে কি করিবে ?

র।—চোর হইলে মাথা কটিব।

জ।—আমি চুরি করিতে আসিয়াছি ?

র।—তবে কেন আসিয়াছিস্ ?

জ। তোমায় সাহায্য করিতে। তোমার যে বিপদ!

র। আমার আবার কি বিপদ ?

জ। এই যে নাতি খাইলে!

র। কি আপদ! এ সকল আবার দেখিয়াছ ?

জ। কেবল দেখি নাই, বিশেষ কিছু জানিয়াছি। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পাল।

পরম কল্যাণ গীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ব্রহ্মকলা বিবরণ।

শাস্ত্রে অগ্নি ব্রহ্ম দশ কলা, সূর্য্যনারায়ণ বার কলা, এবং চন্দ্রমা জ্যোতিঃ ষোল কলাবিশিষ্ট বলিয়া উক্ত আছে। উহার তাৎপর্য্য এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবাত্মা অজ্ঞান আচ্ছন্ন থাকিয়া দশ ইন্দ্রিয়তে আপন সত্তা বোধ করে, অর্থাৎ দেহাভিমানী জীব যখন কেবল মাত্র দশ ইন্দ্রিয়ই আমি, এই প্রকার বোধ করিয়া স্থূল দেহের প্রতি আসক্ত থাকে, তখন তাহাকে ভৌতিক অগ্নিরূপ জানিবে। ঐ অবস্থায় জীবের পরমার্থিক ভাব বুঝিবার সমর্থ থাকে না। আর যখন, পরমাত্মার কৃপায় বিবেক উপস্থিত হয়, তখন জীব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মন বুদ্ধিকে লইয়া বার কলায় প্রকাশ পান। ইহাকেই জ্ঞানরূপ সূর্য্যনারায়ণ ভাব জানিবে। এই অবস্থায় জীবের পারমার্থিক ভাব বুঝিবার সমর্থ জন্মে। যখন জীবের অজ্ঞান, জ্ঞান এই দুই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া বিজ্ঞান অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন জীবাত্মা মন দশ ইন্দ্রিয়, বিদ্যা, অবিদ্যা এবং বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারের সহিত ষোল কলায় পূর্ণ হয়। অর্থাৎ জীবাত্মা যখন আপনাকে সমস্ত জগৎ চরাচর লইয়া একমাত্র অদ্বিতীয় বোধ করেন; এই অবস্থাকে মনরূপ জীবাত্মা চন্দ্রমা জ্যোতির পূর্ণ ষোলকলা ভাব জানিবে। জীব এই স্বরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইলে উক্ত তিন প্রকার জ্যোতিকেই কলাবিহীন সর্ব্ব কলারূপ পরিপূর্ণ একমাত্র অখণ্ড ব্রহ্ম জ্যোতিঃ বোধ করিয়া থাকেন।

পূর্ণ পরব্রহ্মে কলা বা অকলা নাই। কলা শব্দের অর্থ অংশ বা

ভাগ। যেমন শরীরের মধ্যে এক এক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে এক এক অংশ বলে; সেই প্রকার বিরাট ব্রহ্ম জগৎরূপে বিস্তার হইয়া এক একরূপ শক্তি দ্বারা এক এক কার্য্য নিষ্পন্ন করায়, ঐ সকল এক এক শক্তি বা গুণকে এক এক কলা বলা হয়। যেমন, তোমার মস্তকে দুইটী চক্ষু, দুইটী কর্ণ, দুইটী নাসারন্ধ্র, একটী মুখ, সর্ব্বসমেত সাতটী কলা আছে; কিন্তু তুমি ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমষ্টি কলা লইয়া একই ব্যক্তি আছ। সেই প্রকার পূর্ণ পরব্রহ্ম সমষ্টি অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, শক্তি, গুণ, কলা লইয়া পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন।

যেমন তুমি একই ব্যক্তি, স্বপ্ন, জাগ্রত, সুষুপ্তি বা অজ্ঞান, জ্ঞান, বিদ্বান এই তিন অবস্থাতেই, একই পুরুষ বর্ত্তমান থাকিয়া ও অবস্থান্তরে, গুণ ভেদ হইয়া থাকে। যথা অজ্ঞান স্বপ্নাবস্থায় বাসনাযুক্ত হইয়া, দশ ইন্দ্রিয় রূপ দশ কলা থাক, জ্ঞান ও জাগ্রতাবস্থায়, বুদ্ধি বা বার কলা রূপ থাক, এবং সুষুপ্ত বা বিজ্ঞানাবস্থায় স্বরূপ ভাবে পূর্ণ ষোল কলায় থাক। কিন্তু অবস্থা ভেদ হেতু যেমন, তোমাতে স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ হয় না, তুমি একই পুরুষ, সকল অবস্থাতে বর্ত্তমান থাক। সেই প্রকার দশ, বার, ষোল প্রভৃতি শক্তিরূপ কলা ও অবস্থার প্রভেদ হেতু পরব্রহ্মে কোন প্রভেদ ভাব হয় না। তিনি যাহা, তাহাই সর্ব্বকালে পূর্ণরূপে একই মাত্র বিরাজমান থাকেন। যেমন তোমার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় একই কারণ যখন তোমার জাগ্রতাবস্থা থাকে, তখন স্বপ্ন বা সুষুপ্তি অবস্থা থাকে না, যখন স্বপ্নাবস্থা থাকে, তখন জাগ্রত ও সুষুপ্তি অবস্থা থাকে না। যখন সুষুপ্তিবস্থা হয়, তখন যেমন জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থা থাকে না। যদি এই সকল অবস্থারূপ যে শক্তি, তাহা যদি এক না হইয়া পৃথক্ পৃথক্ হইত, তাহা হইলে জাগ্রত অবস্থাতে স্বপ্ন বা সুষুপ্তি অবস্থাও প্রকাশ থাকিতে পারিত অর্থাৎ যদি ঐ সকল অবস্থা অন্তর্গত একই না হইত, তাহা হইলে দুইটী অবস্থা একত্রে ভিন্নরূপে প্রকাশ পাইত। কিন্তু অন্তর্গত ব্যক্তি ও শক্তি এক থাকায়, উহা এক সময়ে দুই প্রকার অবস্থারূপে প্রকাশ পায় না। সেই প্রকার কৃষ্ণপক্ষ, অন্ধকার এবং চন্দ্রমা, জ্যোৎস্না, সূর্য্যনারায়ণ, দিবস, রূপভেদে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইলেও অন্তর্গত ইহাঁ এক পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপের রূপ মাত্র। কারণ যখন গাঢ় অন্ধকার অমাবস্যা হয়, তখন

চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ, এবং যখন চন্দ্রমা জ্যোতিঃ প্রকাশ হন, তখন অন্ধকার ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ, এবং যখন সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ প্রকাশ থাকেন, তখন অন্ধকার ও চন্দ্রমা জ্যোতিঃ প্রকাশ থাকেন না। যদি একই না হইয়া পৃথক্ পৃথক্ হইতেন, তাহা হইলে সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ সত্বেও অন্ধকার বা চন্দ্রমা জ্যোৎস্না পৃথক্ভাবে থাকিত। কেবল কার্য্য কারণ হেতু পরমাত্মা এক একরূপে কার্য্য করিয়া থাকেন। স্বরূপত, তাঁহাতে অবস্থার পরিবর্ত্তন নাই। ইনি সর্ব্বকালে একই পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন।

ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা।

অনেকে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—ইহার সার ভাব অবগত না হইয়া, এই জগৎকে মিথ্যা অলীক বোধ করিয়া থাকে। কিন্তু জগৎ মিথ্যা অলীক নহেন, ইহা সত্য স্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম হইতে প্রকাশ হইয়া, তাঁহারই রূপে বিরাজমান আছেন। নচেৎ ইহা সত্যস্বরূপ হইতে হইয়া কি প্রকারে মিথ্যা হইবেন।

জগৎ মিথ্যা বলিবার কারণ এই যে, পরমাত্মা হইতে ভিন্ন যে জগৎ ভাবনা—উহা মিথ্যা। যেমন, সত্যরূপী পৃথিবী হইতে মৃত্তিকা লইয়া ইট, বাটী, সহর প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, উহাকে মিথ্যা বলা যায়, কারণ স্বরূপে দৃষ্টি করিলে ইট, বাটী, সহরাদি কোন কালেই হয় নাই, উহা মৃত্তিকা রূপই আছে। এই জন্য মৃত্তিকা ভাব ত্যাগ করিয়া সহর, বাটী আদি যে ভাবনা, উহা মিথ্যা। সেই প্রকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপই জগৎরূপে ভাসিতেছেন। ব্রহ্মদৃষ্টিতে জগৎ কোন কালেই নাই। এই জন্যই ব্রহ্মভাব হইতে জগৎ বলিয়া যে পৃথক্ ভাবনা, উহাকে মিথ্যা বলা হয়। নচেৎ জগৎ যে ব্রহ্মবস্তু তাহা মিথ্যা নহে। যেমন, গৃহ, সহরাদি ভগ্ন হইয়া মৃত্তিকার সহিত মৃত্তিকাই হইয়া যায়, সেই প্রকার এই জগৎ, চরাচর, স্ত্রী, পুরুষ, জীব, জন্তু আদি অন্তে পর-ব্রহ্মের সহিত পরব্রহ্মরূপই হইয়া যান। যেমন, সহরাদি মৃত্তিকারূপ বলিয়া মৃত্তিকায় মিশাইয়া যায়, ভিন্নরূপ হইলে মিশিতে পারিত না। সেই প্রকার জগৎ ব্রহ্মরূপ বলিয়াই, ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মের সহিত লয় পান। নচেৎ ব্রহ্মের সহিত লয় হইয়া ব্রহ্মরূপ হইত না। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-

স্বরূপে সত্য বা মিথ্যা কোন প্রকার উপাধি নাই। অবস্থান্তরে উপাধি-ভেদে চিরস্থায়ী ভাবকে সত্য এবং ক্ষণস্থায়ী ভাবকে মিথ্যা বলা যায়।

এই জন্য শ্রুতিতে আছে যে, "একমেবদ্বিতীয় ব্রহ্ম"।

ইহার সার অর্থ এই যে, একমাত্র ব্রহ্মই নিরাকার নির্গুণ। কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল, ত্রিগুণাত্মা, সাকার জগৎরূপে বিরাজমান আছেন। ইহাঁ ব্যতীত দ্বিতীয় কিছুই নাই।

আরও যেমন, "আত্মানাং যায়তে পুত্র"। ইহার অর্থ এই যে, পিতার আত্মাই পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। স্বরূপতঃ, পিতা ও পুত্র একই থাকেন। সেই প্রকার জগৎ চরাচর স্ত্রী পুরুষ তোমরা পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহ—পরব্রহ্ম রূপই।

পূর্ব্বাপর জন্ম বিচার।

সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ, পূর্ব্বাপর জন্মের বিষয় নানা প্রকার বোধ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ পুনর্জ্জন্ম আছে, আর কেহ কেহ বলেন যে, পুনর্জন্ম নাই। কিন্তু এই সকল বিষয়ের সার ভাব এই প্রকার বুঝিবেন, যেমন মৃত্তিকা হইতে গৃহাদি প্রস্তুত হইয়া মৃত্তিকারূপই থাকে, কেবলমাত্র উপাধি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয়, কিন্তু পুনরায় উহা ভগ্ন হইলে মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া মৃত্তিকারূপই হইয়া যায়; তখন উহাতে ভিন্ন উপাধি থাকে না, আর যখন ঐ মৃত্তিকা লইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করা হয়, তখন পুনরায় উহাতে ভিন্ন ভিন্ন উপাধি বোধ হইয়া থাকে। এই কারণে যে সকল লোক গুণ ক্রিয়াদি বিশিষ্ট গৃহাদির উপর লক্ষ্য করেন, তাঁহারা উহাকে রূপান্তর ভেদে জন্ম পুনর্জ্জন্ম বলিয়া থাকে, এবং যাহারা স্বরূপ মৃত্তিকার উপর দৃষ্টি রাখেন, তাঁহারা দেখেন যে, পূর্ব্বেও মৃত্তিকা ছিল, গৃহাদি নির্ম্মাণ অবস্থাতেও মৃত্তিকা আছে, পরেও মৃত্তিকা থাকিবেক। স্বরূপ মৃত্তিকাতে কোনকালে কোন প্রকার উপাধি নাই, উহা সকল অবস্থাতেই মৃত্তিকারূপই থাকে; এই প্রকার বোধ করিয়া কোন কোন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ কোন কালেই জন্ম নাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু জ্ঞানবান্ পুরুষের এই উভয় মতকেই স্বীকার করা উচিত। এই প্রকার মৃত্তিকারূপী পরব্রহ্ম ও গৃহ ঘটাদি রূপ জগতের বিষয় বুঝিয়া লইবে।

চারি প্রকার চৈতন্য বর্ণন।

অনেকের সংস্কার আছে যে, কারণ—চৈতন্য,—কূটস্থ চৈতন্য, ঈশ্বর চৈতন্য, ও জীব চৈতন্য, এই চারি প্রকার চৈতন্য আছে, কিন্তু বাস্তবিক চৈতন্য চারি প্রকার নহে। একই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চৈতন্য চারি প্রকার ভাবে প্রকাশ হইয়া থাকেন। যেমন, গুণ, ক্রিয়া, রূপ ভেদে একই জলের—জল, মেঘ, বরফ ও ফেন বুদবুদ এই চারি প্রকার উপাধি বা নাম রাখা গিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক জল, মেঘ, বরফ, ফেন, বুদবুদের কোন পার্থক্য নাই, সেই প্রকার জলরূপই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ চৈতন্যের রূপান্তর ভেদে চারি প্রকার নাম বা উপাধি কল্পনা করা হয়। যথা,—জীব যখন অজ্ঞানাবস্থাতে পারমার্থিক বিষয়ে অজ্ঞ থাকে, তখন তাহাতে জীব চৈতন্য, যখন সেই জীবের অজ্ঞানতা দূর হইয়া জ্ঞানরূপ আত্মবোধ প্রকাশ হয়, তখন তাহাতে ঈশ্বর চৈতন্য, যখন অজ্ঞান ও জ্ঞানাবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া বিজ্ঞান অবস্থা হয়, তখন তাহাতে কূটস্থ চৈতন্য, এবং যখন তিনি এই তিন অবস্থার অতীত হইয়া স্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন, তখন তাঁহাতে কারণ চৈতন্য বা পরব্রহ্ম সংজ্ঞা হয়। অবস্থান্তরে জীব সাকার ও নিরাকার হইয়া থাকেন। কারণ যদি জীব সাকার স্বগুণ না হন, তাহা হইলে কি প্রকারে সুখ দুঃখ অনুভব করিবেন; আর যদি জীব নিরাকার না হন, তাহা হইলে কি প্রকারে নিরাকার পরব্রহ্মে লীন হইবেন। বহির্ভাগে চৈতন্যকে চারি প্রকার বোধ হইতেছে, কিন্তু অন্তর মুখে ইনি উপাধি রহিত একমাত্র যাহা, তাহাই বিরাজমান আছেন।

রূপান্তর ভেদে ব্রহ্মের অনাদি ছয় নাম বর্ণন।

কথিত আছে—ঈশ্বর, অহঙ্কার, জীব, বুদ্ধি, মন ও কর্ম্ম এই ছয়টী অনাদি বস্তু। কিন্তু ইহা ছয়টী পৃথক্ পৃথক্ বস্তু নহে, একই পরমাত্মার ছয় প্রকার গুণের ছয় প্রকার নাম জানিবেক। যেমন, একই অগ্নিতে উষ্ণতা, প্রকাশ, শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ ও ধূম এই ছয়টী গুণ দেখা যায়,

ও ভিন্ন রূপ গুণ বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু অগ্নি সমস্ত গুণ লইয়া, একই মাত্র থাকিয়া উষ্ণতারূপে তাপ প্রদান; প্রকাশরূপে অন্ধকার লয় ও রূপ দর্শন; শুক্লবর্ণরূপে সাত্বিকী কর্ম্ম, রক্তবর্ণরূপে রাজসিক কর্ম্ম, পীতবর্ণ রূপে তামসিক কর্ম্ম, ধূম ও বাষ্পরূপে বর্ষণ করিয়া থাকেন। যেমন এই সকল পৃথক্ পৃথক্ রূপে কার্য্য করিয়াও অগ্নি সমস্ত লইয়া একই মাত্র থাকেন, সেই প্রকার অগ্নিরূপী পূর্ণ পরব্রহ্ম, উষ্ণতা শক্তিরূপ ঈশ্বর, গড্ আল্লাহের কার্য্য, অর্থাৎ সৃষ্টি পালন ও লয় কার্য্য; শুক্লবর্ণ রূপ অহঙ্কারের কার্য্য; রক্তবর্ণ রূপ বুদ্ধির কার্য্য, পীতবর্ণ রূপ মনের কার্য্য, এবং ধূমরূপ অজ্ঞান কর্ম্মের কার্য্য করিয়া ও সকল প্রকার ভাব লইয়া একমাত্র পূর্ণরূপে নির্লিপ্তভাবে বিরাজমান আছেন। কেবল স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ উপাধি ভেদে এই সকল নাম পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপের কল্পিত নাম জানিবে।

সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম।

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ইন্দ্রিয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মহৎতত্ত্ব, মহৎতত্ত্ব হইতে প্রকৃতি পুরুষ, প্রকৃতি পুরুষ হইতে পুরুষ চৈতন্য সূক্ষ্ম! ইহার ভাবার্থ এইরূপ বুঝিবে, যেমন একই অগ্নি হইতে বহির্গত ধূম ও প্রকাশাদির মধ্যে; ধূম অপেক্ষা প্রকাশ, প্রকাশ অপেক্ষা পীতবর্ণ, পীতবর্ণ অপেক্ষা রক্ত, রক্তবর্ণ অপেক্ষা শুক্লবর্ণ, শুক্লবর্ণ অপেক্ষা উষ্ণতাশক্তি সূক্ষ্ম। কিন্তু এই সকলের রূপ ও কারণ যেমন অগ্নিই, সেই প্রকার ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, মহৎতত্ত্ব, প্রকৃতি পুরুষ ও পুরুষ চৈতন্য সমস্তই পূর্ণ-পরব্রহ্ম ও উহারই রূপ মাত্র।

শাস্ত্রাদিতে ঋষি মুনিগণ কৌশল করিয়া অজ্ঞানাবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগকে বুঝাইবার জন্য নানা ভাবে নানা নাম কল্পনা করিয়াছেন। নচেৎ স্বরূপতঃ কোন প্রকার সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম ভেদ নাই। সমস্তই পূর্ণ পরব্রহ্মেরই রূপ মাত্র। [ক্রমশঃ]

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।)

১১শ বর্ষ। } অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ সাল। { ৫ম সংখ্যা।

মুকুন্দ-মালা

(কুলশেখর-রাজ-বিরচিতা)

(১)

কস্তূরীতিলকং ললাটফলকে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে নবমৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কণম্।
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুবিমলং কণ্ঠে চ মুক্তাবলীং
বিভ্রৎ স্ত্রীপরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপালচূড়ামণিঃ॥

কস্তূরী-তিলক যাঁর শোভা পায় ভালে,
কৌস্তুভ-রতন যাঁর শোভে বক্ষঃস্থলে,
নাসাগ্রে শোভিছে যাঁর মুকুতা নূতন,
করতলে বেণু যাঁর শোভে সর্ব্বক্ষণ,
সুন্দর কঙ্কণে যাঁর কর সুশোভিত,
যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হরি-চন্দনে চর্চ্চিত;
কণ্ঠে যাঁর মুক্তামালা শোভে অনুক্ষণ,
বেষ্টিয়া রহেন যাঁরে গোপাঙ্গনা-গণ,
যত ব্রজ-গোপালের যিনি চূড়ামণি,
জয় জয় জয় তাঁর দিবস-যামিনী!

(২)

আম্নায়াভ্যসনান্যরণ্যরুদিতং যজ্ঞব্রতান্যন্বহং
মেদশ্ছেদপদানি পূর্ত্তবিধয়ঃ সর্ব্বে হুতং ভস্মনি।
তীর্থানামবগাহনানি চ গজস্নানং বিনা যৎপদ-
দ্বন্দ্বাম্ভোরুহসংস্তুতিং বিজয়তে দেবঃ স নারায়ণঃ ॥

যাঁহার শ্রীপাদ-পদ্ম না করি স্মরণ
বেদপাঠ বোধ হয় অরণ্যে রোদন ;
যাঁর পদ না স্মরিলে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান
মেদ হেতু পশুবধে হয় অবসান ;
যাঁর পদ না চিন্তিলে খাত জলাশয়
ভস্মে ঘৃতাহুতি সম, হেন মনে লয় ;
যাঁর পদ না ভাবিলে পুণ্যতীর্থে স্নান
গজস্নান ব'লে মনে হয় অনুমান ;
যাঁর পদ-চিন্তা বিনা সব অকারণ,
জয় জয় জয় সেই দেব নারায়ণ !

(৩)

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽয়ং
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশী মুকুন্দঃ ॥

জয় জয় জয় দেব দেবকী-নন্দন !
জয় জয় যদু-বংশ-উজ্জ্বল-ভূষণ !
জয় জয় কোমলাঙ্গ নীরদ-বরণ !
জয় জয় নারায়ণ ভূভার-হরণ !

(৪)

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌষেয়বস্ত্রং
গোলোকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবক্ত্রম্।

পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনো মে ॥

যিনি গোলকের পতি, পুরুষ-প্রধান,
পীত কোষ-বস্ত্র যাঁর প্রিয় পরিধান,
সজল জলদ সম যাঁহার বরণ,
সর্ব্বদাই হাস্যময় যাঁহার বদন,
পূর্ণব্রহ্ম বলি যাঁরে চারি বেদে কয়,
যাঁহা হ'তে ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ কেহ নয়,
নন্দের নন্দন যিনি, যিনি রাধাপতি,
শ্রীকৃষ্ণ নামেতে যাঁর ত্রিজগতে খ্যাতি,
যিনি দেব নারায়ণ, কমল-নয়ন,
দিবানিশি চিন্ত তাঁরে, রে আমার মন !

(৫)

কৃষ্ণো রক্ষতু মাং জগত্রয়গুরুঃ কৃষ্ণং ভজে সন্ততং
কৃষ্ণেনামরশত্রবো বিনিহতাঃ কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ।
কৃষ্ণাদেব সমুত্থিতং জগদিদং কৃষ্ণস্য দাসোঽস্ম্যহং
কৃষ্ণে তিষ্ঠতি বিশ্বমেতদখিলং হে কৃষ্ণ মামুদ্ধর ॥

কৃষ্ণ ত্রিলোকের গুরু রাখুন আমায়,
কৃষ্ণকে ভজনা করি থাকিয়া ধরায়।
কৃষ্ণ দ্বারা দৈত্যগণ হইল নিহত,
কৃষ্ণে নমস্কার করি আমি অবিরত।
কৃষ্ণ হ'তে সমুদ্ভূত এই ত্রিভুবন,
কৃষ্ণের পরম দাস আমি সর্ব্বক্ষণ।
কৃষ্ণে অবস্থিত আছে এই ত্রিসংসার,
হে কৃষ্ণ ! তুমিই মোরে করহ উদ্ধার !

(৬)

কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংসকুঞ্জরকেশরী।
কালিন্দীকলকল্লোলকোলাহলকুতূহলী ॥

কল্লোলিনী কালিন্দীর কল কোলাহল
কুতূহলী করে কৃষ্ণে করি কল কল ;
কংস-কুঞ্জরের কৃষ্ণ কেশরী, কেবল
কল্যাণ করুন কৃষ্ণ কৈবল্য-কুশল !

(৭)

বন্দে মুকুন্দমরবিন্দদলায়তাক্ষং
কুন্দেন্দুশঙ্খদশনং শিশুগোপবেশম্ ।
ইন্দ্রাদিদেবগণবন্দিতপাদপীঠং
বৃন্দাবনালয়মহং বসুদেবসূনুম্ ॥

পদ্ম-পত্র-সম যাঁর বিশাল লোচন,
কুন্দ-ইন্দু-শঙ্খ-শুভ্র যাঁহার দশন,
যাঁর বেশভূষা গোপ-বালকের মত,
পাদপীঠ পূজে যাঁর ইন্দ্রাদি সতত,
যাঁর প্রিয় বাসস্থান বৃন্দাবন-ধাম,
নির্ব্বাণ-মুক্তির দাতা যিনি অবিরাম,
বসুদেব-সুত যাঁরে বলে ত্রিভুবন,
ভক্তিভরে ভজি আমি তাঁহার চরণ !

(৮)

শ্রীবল্লভেতি বরদেতি দয়াপরেতি
ভক্তিপ্রিয়েতি ভবলুণ্ঠনকোবিদেতি ।
নাথেতি নাগশয়নেতি জগন্নিবাসে-
ত্যাল্যপিনং প্রতিদিনং কুরু মাং মুকুন্দ ॥

হে শ্রীপতি ! হে বরদ ! ওহে দয়াপর !
ওহে ভক্তিপ্রিয় ! ভব-লুণ্ঠন-তৎপর !
হে নাথ ! জগদালয় ! অনন্ত-শয়ন !
এ নাম প্রত্যহ যেন করি উচ্চারণ !
তোমার নিকটে এই বর ভিক্ষা করি,
নির্ব্বাণ-মোক্ষের দাতা তুমিই ত হরি !

(৯)

রজসি নিপতিতানাং মোহজালাবৃতানাং
জননমরণদোলাদুর্গসংসর্গগানাম্ ।
শরণমশরণানামেক এবাতুরাণাং
কুশলপথনিযুক্তশ্চক্রপাণির্নরাণাম্ ॥

রজোমধ্যে যেই জন হ'য়েছে পতিত,
মোহ-জালে বদ্ধ আছে যে জন সতত ;
জন্ম-মৃত্যু দোলাতেই দুলিতে দুলিতে
যে জনের দিন গুলি কাটিল জগতে ;
যে জন কাতর হ'য়ে পড়েছে ধরায়,
এ সংসারে নাই যার কেহই সহায়,
তাহার উপায় এক আছে এই জানি,
সুপথ-দর্শক সেই দেব চক্রপাণি !

(১০)

অপরাধসহস্রসঙ্কুলং
পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে ।
অগতিং শরণাগতং হরে
কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু ॥

পড়িয়া রয়েছি ভীম ভবার্ণবে হায়,
সহস্র সহস্র দোষ ঘেরেছে আমায় ।
পার হইবার মোর গতি নাই আর,
হরি হে ! লইনু তাই আশ্রয় তোমার ।
তুমি শুধু এই কৃপা কর এ সময়,
তোমাতে আমাতে যেন ভেদ নাহি রয় !

(১১)

মা মে স্ত্রীত্বং মা চ মে স্যাৎ কুভাবো
মা মূর্খত্বং মা কুদেশেষু জন্ম ।

মিথ্যাদৃষ্টির্মা চ মে স্যাৎ কদাচিৎ
জাতৌ জাতৌ বিষ্ণুভক্তো ভবেয়ম্ ॥

নারী-জন্ম যেন মোর না হয় সংসারে,
কুভাব না থাকে যেন মনের ভিতরে,
মূর্খ হ'য়ে যেন মোর না কাটে জীবন,
কুদেশেও জন্ম যেন না লই কখন,
সংসারে থাকিয়া যেন নাস্তিক না রই,
জন্মে জন্মে যেন আমি বিষ্ণুভক্ত হই !

(১২)

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোমি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি ॥

কায় মন বাক্য কিংবা ইন্দ্রিয় দ্বারায়,
স্বভাবের বশে কিংবা বুদ্ধিতে আত্মায়,
যে যে কার্য্য করি আমি, সে সব এখন
দেবদেব নারায়ণে করিনু অর্পণ !

(১৩)

যৎ কৃতং যৎ করিষ্যামি তৎ সর্ব্বং ন ময়া কৃতম্।
ত্বয়া কৃতং তু ফলভাক্ ত্বমেব মধুসূদন ॥

যা করেছি, যা করিব, কর্ত্তা তুমি তার,
আমি করিয়াছি, হরি ! এ কথা অসার।
যা করাও, তাই করি যখন তখন,
কি দোষ আমার তায়, ওহে নারায়ণ !
তোমার কর্ম্মের ফল তুমিই ভুগিবে,
আমারে দোষের ভাগী কেন বা করিবে !

(১৪)

শ্রীগোবিন্দপদাম্ভোজমকরন্দঃ কিমদ্ভুতম্।
যৎপায়িনো ন মুহ্যন্তি মুহ্যন্তি যদপায়িনঃ ॥

হরির চরণ-পদ্মে যেই মধু রয়,
সে এক অপূর্ব্ব মধু, জানিও নিশ্চয় !
সে মধু যতই পান করুক যে জন,
কিছুতেই নেশা তার না হয় কখন্ !
কিন্তু সেই মধুপান কভু যে না করে,
বিষম দুরন্ত নেশা চেপে ধরে তারে !

(১৫)

মুকুন্দ মূর্দ্ধ্না প্রণিপত্য যাচে
ভবন্তমেকান্তমিয়ন্তমর্থম্।
অবিস্মৃতিস্ত্বচ্চরণারবিন্দে
ভবে ভবে মেঽস্তু তব প্রসাদাৎ ॥

তোমায় প্রণাম করি, ওহে নারায়ণ !
কৃপা করি, এই ভিক্ষা দাও হে এখন,—
জন্মে জন্মে এ সংসারে যত দিন রব,
কিছুতে না ভুলি যেন শ্রীচরণ তব !

(১৬)

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যে রামামৃদুতনুলতানন্দনে নাপি রন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্ ॥

শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ করিয়া সংহার
মোক্ষ হেতু নাহি বন্দি চরণ তোমার।
কুম্ভীপাক-নরকের ভীষণ-যন্ত্রণা-
ত্রাণ হেতু তব পদ না করি বন্দনা।

রম্য নারী-তনু-লতা-নন্দন-কাননে
কেলি হেতু নাহি বন্দি তোমার চরণে।
জন্মে জন্মে হৃদি রাখি তোমার চরণ
যেন আমি তারি চিন্তা করি অনুক্ষণ।
হরি হে! হয়েছে এই বাসনা প্রবল,
বন্দিতেছি তাই তব চরণ-যুগল!

(১৭)

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ ভাব্যং তদ্ ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥

ধর্ম্ম-কার্য্যে আস্থা নাই, আস্থা নাই ধনে,
কাম্য-বস্তু-সম্ভোগেও আস্থা নাই মনে।
পূর্ব্বজন্মে যে যে কর্ম্ম করেছি যখন,
সেইরূপ ফল মোর ফলুক্ এখন।
জন্মে জন্মে ভবে যদি আগমন করি,
ভক্তি যেন স্থির রয় তব পদে হরি!

(১৮)

দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো
নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্।
অবধীরিতশারদারবিন্দৌ
চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি ॥

স্বর্গের ভিতর কিংবা মর্ত্ত্যের ভিতর
কিংবা নরকেও যদি থাকি নিরন্তর,
মৃত্যুকালে যেন ওহে নরক-নাশন!
চরণ দুখানি তব করি হে স্মরণ।
কে বলে পদ্মের শোভা শরৎ-সময়?
তোমার চরণ সনে তুলনা না হয়!

(১৯)

কৃষ্ণ ত্বদীয়পদপঙ্কজপঞ্জরান্ত-
মদ্যৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥

যখন জীবন মোর যাইবে চলিয়া,
বায়ু পিত্ত কফ তিনে মিলিত হইয়া
কণ্ঠরোধ ক'রে দিবে আমার যখন,
কিরূপে স্মরিব হরি! তোমায় তখন?
তাই বলি মনোহংস মোর এ সময়
তব পাদ-পদ্মে গিয়া লউক আশ্রয়!

(২০)

চিন্তয়ামি হরিমেব সন্ততং
মন্দমন্দহসিতাননাম্বুজম্।
নন্দগোপতনয়ং পরাৎপরং
নারদাদিমুনিবৃন্দবন্দিতম্ ॥

মৃদু মন্দ হাস্য যাঁর বদন-কমলে,
যাঁরে নন্দ-গোপ-পুত্র সকলেই বলে;
ত্রিসংসার-মধ্যে যিনি পূজ্য পরাৎপর,
নারদাদি মুনিগণ হইয়া তৎপর
ভক্তিভরে করে সদা যাঁহার বন্দন,
সেই শ্রীহরির চিন্তা করি সর্ব্বক্ষণ!

(২১)

করচরণসরোজে কান্তিমন্নেত্রমীনে
শ্রমমুষি ভুজবীচিব্যাকুলে দুর্গমার্গে।
হরিসরসি বিগাহ্যাপীয় তেজোজলৌঘং
ভবমরুপরিখিন্নঃ খেদমদ্য ত্যজামি ॥

কর-পদ-পদ্ম সদা যথায় শোভিছে,
প্রফুল্ল-নয়ন-মৎস্য যথায় ঘুরিছে,
যথায় ডুবিলে শ্রম-দুঃখ হয় হত,
বাহু-তরঙ্গেই যাহা সদা আলোড়িত,
যথায় যাবার পথ সহজ ত নয়,
যাইতে হইলে পথে কষ্ট অতিশয়,—
সেই হরি-সরোবরে দেহ ডুবাইয়া
সুশীতল কান্তি-জল প্রাণ ভ'রে পিয়া
সংসার-মরুর তাপ আর না সহিব,
যত কিছু আছে তাপ, আজ ঘুচাইব !

(২২)

সরসিজনয়নে সশঙ্খচক্রে
মুরভিদি মা বিরমেহ চিত্ত রন্তুম্ ।
সুখকরমপরং ন জাতু জানে
হরিচরণস্মরণামৃতেন তুল্যম্ ॥

যিনি শঙ্খ-চক্র-ধর কমল-লোচন,
যিনি দুষ্ট মুর-দৈত্য-জীবন-নাশন,
তাঁহাতেই রত সদা থাক, ওরে মন !
এ সংসারে তাঁর মত কিছু নাই ধন।
হরির চরণ-চিন্তা-অমৃত-সমান
কোন্ সুখকর বস্তু রহে বিদ্যমান ?

(২৩)

মা ভৈর্মন্দমনো বিচিন্ত্য বহুধা যামীশ্চিরং যাতনা
নৈবামী প্রভবন্তি পাপরিপবঃ স্বামী ননু শ্রীধরঃ।
আলস্যং ব্যপনীয় ভক্তিসুলভং ত্বং ধ্যায় নারায়ণং
লোকস্য ব্যসনাপনোদনকরো দাসস্য কিং ন ক্ষমঃ ॥

উপদেশ শুন মোর রে অবোধ মন !
যম-যন্ত্রণার ভয় দাও বিসর্জ্জন।

প্রভুত্ব করিতে নারে পাপ-রিপু-গণ,
নারায়ণ আমাদের প্রভু সদা রন !
সহজে মিলেন যিনি, ভক্তি যদি রয়,
আলস্য ত্যজিয়া তাঁর লও রে আশ্রয়।
বিশ্বের বিপদ্ যিনি করেন ভঞ্জন,
তিনি কি দাসের প্রতি চুপ্ করে রন্ ?

(২৪)

ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং
সুতদুহিতৃকলত্রত্রাণভারার্দ্দিতানাম্।
বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং
ভবতি শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাম্ ॥

অগাধ-অপার এই সংসার-সাগর,
মগ্ন আছে যেই জন তাহার ভিতর ;
শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখ-রূপ-সমীরণ
বিতাড়িত করিতেছে যারে অনুক্ষণ ;
স্কন্ধে যার পুত্র-কন্যা-গৃহিণীর ভার,
বিষম বিষয়-জল চারিধারে যার ;
যে জন না জানে তায় কভু সন্তরণ,
একমাত্র ভরি তার দেব নারায়ণ !

(২৫)

ভবজলধিমগাধং দুস্তরং নিস্তরেয়ং
কথমহমিতি চেতো মাস্ম গাঃ কাতরত্বম্।
সরসিজদৃশি দেবে তাবকী ভক্তিরেকা
নরকভিদি নিষণ্ণা তারয়িষ্যত্যবশ্যম্ ॥

অপার অগাধ ঘোর এ ভব-সাগর
কিরূপে হইব পার, ব্যাকুল অন্তর,—
এইরূপ চিন্তা করি রে অবোধ মন !
কিছুমাত্র ভীত যেন না হও কখন।

কমল-লোচন যিনি নরক-নাশন,
তাঁর পদে ভক্তি যদি রাখ অনুক্ষণ,
সংসার-সাগর হ'তে তিনিই তোমায়
পারে লয়ে যাইবেন; ভয় কিবা তায় ?

(ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উত্তটসাগর বি-এ

সার জন উডবরণ।

হায়! মহানুভব বঙ্গেশ্বর সার জন উডবরণ আর ইহসংসারে নাই! ৪ঠা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার রাত্রি চতুর্থ ঘটিকার সময় আলিপুরস্থ বেল-ভেডিয়ার প্রাসাদে তিনি সংসার-লীলা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার তুল্য সদাশয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর আমরা অতি অল্পই দর্শন করিয়াছি। তিনি যেরূপ মধুর প্রকৃতি, মধুরভাষি, মহদাশয়, পরদুঃখকাতর এবং নিরপেক্ষ শাসনকর্ত্তা ছিলেন, রাজনীতিজ্ঞানেও তাঁহার তদনুরূপ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তা মেকেঞ্জি সাহেব অবসর গ্রহণ করিলে, তিনি বঙ্গ-তক্ত সুশোভিত করেন। সেই সময় অশ্রুতপূর্ব্ব নিদারুণ প্লেগরোগ কলিকাতা নগরে প্রবেশ করিয়াছিল; প্লেগের প্রতিকারার্থ মান্যবর মেকেঞ্জি সাহেব এই রাজধানীর মধ্যে যেরূপ কঠিন নিয়ম প্রচারিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ঘোরতর উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল। সেই দুর্দ্দিনের কথা কেহই বিস্মৃত হয় নাই, সুতরাং পুনঃ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; উৎপীড়নের উপদ্রবে এবং মান প্রাণ হারাইবার আতঙ্কে লক্ষ লক্ষ নগরবাসী ও প্রবাসী স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে নগরের বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানাস্থানে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়; প্লেগ-পরীক্ষার হুজুগে বিশেষ বিশেষ রেলওয়ে ষ্টেশনে নীরোগ নিরীহ স্ত্রীপুরুষ, বালক-বালিকাদিগের উপর যেরূপ অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত; চতুর্দ্দিকেই ভীষণ উপদ্রবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, বেলভেডিয়ারের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, দয়াময় সার জন উডবরণ সেই অনলে শান্তি সলিল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সন্দেহসূত্রে গৃহস্থ

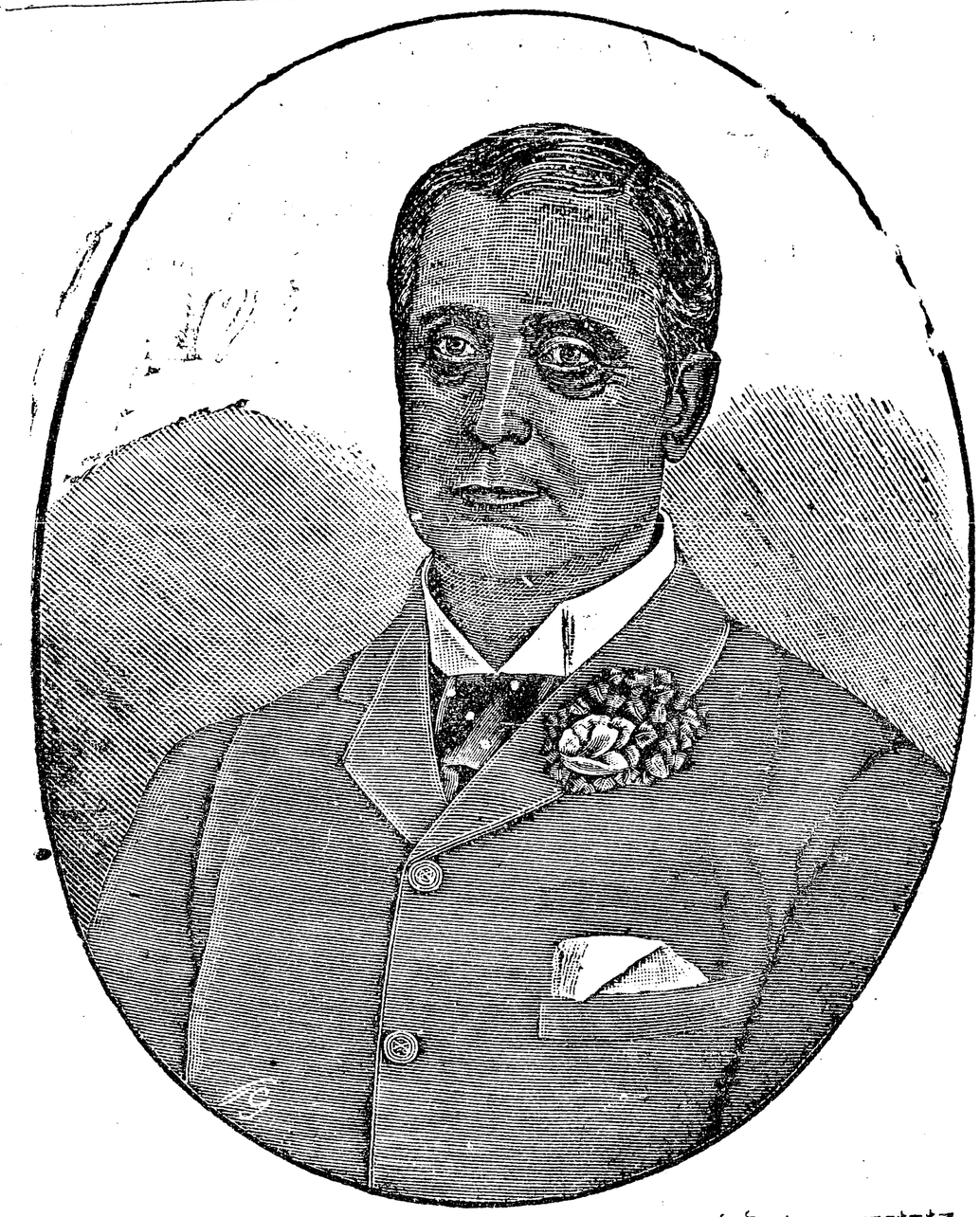

নরনারীগণকে ধরিয়া ধরিয়া প্লেগ হাঁসপাতালে পাঠাইবার অত্যাচার, সেই অত্যাচারের হস্ত হইতে গৃহস্থগণকে মুক্ত করিবার অভিলাষে তিনি পল্লিতে পল্লিতে ওয়ার্ড বিভাগে গৃহহাঁসপাতাল স্থাপনের অনুমতি দিয়াছিলেন; স্বয়ং ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গৃহস্থলোকের ঘরে ঘরে পরিভ্রমণ করিয়া স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টবচনে সকলকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক অভয়দান করিতেও ত্রুটি করেন নাই। সেই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনে মেকেঞ্জি সাহেব পদস্থ থাকিলে কিম্বা সার জন উডবরণ শান্তিছত্র ধারণ না করিলে লর্ড সাণ্ডার্সের শাসনাধীন বোম্বাই নগরের দুরবস্থার

ন্যায় কলিকাতানগরের দুর্দ্দশা হইত সন্দেহ নাই, সার জন উডবরণের আগমনে সে আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইয়াছিল, এ কথা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। সার জন উডবরণের অবলম্বিত প্লেগ প্রতীকার ব্যবস্থায় তাঁহার নাম বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা মহাশোকে হাহাকার ধ্বনি করিতেছে।

সার জন উডবরণের বিস্তর গুণ ছিল। রাজনীতি পরিচালনে তাঁহার নীতিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তৎব্যতীত তিনি এদেশের বিদ্যাশিক্ষার পরমবন্ধু ছিলেন, দেশীয় লোকের সহিত মিত্রভাবে ঘনিষ্টতা ও সদালাপ করিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট স্নেহ ছিল, এতদ্দেশীয় নিঃসম্বল সাহিত্যসেবিগণের জীবিকা বিধানের উদ্দেশে তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে যথাসম্ভব বৃত্তি নির্দ্ধারণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কতকগুলি লোক কলিকাতাস্থ এসিয়াটিক সোসাইটির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "রয়েল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া" নাম রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সোসাইটির বন্ধুগণের অনুরোধে সার জন উডবরণ সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া পুরাতন নাম বাহাল রাখিবার আজ্ঞা প্রচার করেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আরও অনেক মহৎ মহৎ কার্য্যের নিদর্শন রহিয়াছে। তাঁহার তুল্য প্রজারঞ্জক গবর্ণর এত শীঘ্র সংসার হইতে বিদায় হইয়া যাইবেন, স্বপ্নেও কেহ তাহা মনে ভাবেন নাই।

প্রায় বৎসরাবধি সার জন উডবরণ কঠিনতর উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট ভোগ করিতে ছিলেন, ক্রমে ক্রমে সেই রোগ রক্তাতিসারে পরিণত হয়, দার্জ্জিলিং শিখরের শীতল বায়ু সেবনে সে রোগের কিছুমাত্র উপশম হয় নাই। বিজ্ঞ বিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ দেন, পর্ব্বতবাসে এ রোগ আরাম হইবে না, সমুদ্রপথভ্রমণে প্রশমিত হইবার সম্ভাবনা আছে। তদনুসারে একপ্রকার মুমূর্ষ অবস্থাতেই তাঁহাকে দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায় আনয়ন করা হয়, এখান হইতে বাষ্পিও তরণীযোগে বঙ্গোপসাগরে প্রেরণ করা হইয়াছিল। আমাদের গঙ্গাসাগর তাঁহাকে আরাম করিতে পারিল না, সেই কাল রোগ কিছুতেই দমিত হইল না, সুতরাং সাগর হইতে ফিরাইয়া পুনরায়

তাঁহাকে বেলভেডিয়ার প্রাসাদে আনয়ন করা হইল। এইখানেই বঙ্গের সর্ব্বজন প্রিয় শাসনকর্ত্তা সর্ব্বজনকে কাঁদাইয়া জন্মের মত নয়ন মুদ্রিত করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার উদরে যকৃত স্থানে স্ফোটক হইয়াছিল, সে কথা কিন্তু সাধারণ্যে প্রকাশ নাই।

পরদিন শুক্রবার অপরাহ্ণ তৃতীয় ঘটিকার সময় মহাশোক সমারোহে মৃতদেহ বেলভেডিয়ার হইতে গড়ের মাঠ দিয়া পার্ক ষ্ট্রীট পার হইয়া লোয়ার সারকুলার রোডের নূতন সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়। সার্দ্ধ চতুর্থ ঘটিকার সময় সমাধিকার্য্য সমাহিত হইয়াছে।

লাটসাহেবের আদেশে শুক্রবার প্রাতঃকালে অতিরিক্ত গেজেটে ঘোষিত হয়, বেলভেডিয়ারে ও সমাধিক্ষেত্রে স্থানের অসঙ্কুলান বশতঃ টিকিট বিতরণের ব্যবস্থা করা হইবে, বহুলোককে আমন্ত্রণ করা হইবে না। এই আদেশ বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রতিপালিত হইয়াছিল, বেলা ২৷৷০টার সময় আমন্ত্রিত লোকেরা বেলভেডিয়ার উদ্যানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎব্যতীত সহস্র সহস্র ভদ্রলোক রাজভক্তি প্রদর্শনার্থ পার্কষ্ট্রীটের উভয় পার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া এই প্রজারঞ্জক গবর্ণরের সমাধিযাত্রা দর্শনে অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। উক্ত গেজেটে রিজলি সাহেবের স্বাক্ষরিত গবর্ণমেণ্ট ঘোষণায় লাটসাহেবের আরও এই হুকুম প্রচারিত হয় যে, প্রদেশীয় প্রাসাদে যেখানে যত রাজপতাকা আছে, শোক প্রকাশের নিদর্শন স্বরূপ সেই সকল পতাকার অর্দ্ধেক নামাইয়া দেওয়া হইবে, মিনিটে মিনিটে পঞ্চদশ তোপধ্বনি হইবে এবং রাজকীয় সিবিল মিলিটারী কর্ম্মচারিগণ চতুর্দ্দশ দিবস স্ব স্ব অঙ্গে শোকচিহ্ন ধারণ করিবেন। লর্ড কর্জ্জনের এই আজ্ঞাগুলিও দস্তুরমত প্রতিপালিত হইয়াছে।

সার জন উডবরণ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ১৯০২ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের শেষে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইল, মৃত্যুকালে ষষ্টিবৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম ডেভিড উডবরণ, তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে একজন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। সারজন উডবরণ ভারতবর্ষকে বড় ভাল বাসিতেন, ভারতের মাদ্রাজপ্রদেশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, ভারতকে তিনি জন্মভূমি বলিয়া জানিতেন, আপনাকেও ভারতবাসী বলিয়া শ্লাঘা করিতেন,

ভারতের মঙ্গলসাধনে ব্রতী থাকিয়া, ভারতেই দেহত্যাগ করিবেন, ইহাই তাঁহার কামনা ছিল, কামনা সফল হইয়াছে, বঙ্গরাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়া ন্যায় অনুসারে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে করিতে তাঁহার জীবনান্ত হইয়াছে, আর সাত মাস বাঁচিয়া থাকিলে নিয়মিত পঞ্চবর্ষ পরিপূর্ণ হইত। অসমাপ্তকার্য্যকালে বঙ্গের কোন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরই বঙ্গদেশে প্রাণত্যাগ করেন নাই, এই মহাত্মাই প্রথম। আপাততঃ মান্যবর বোর্ডিলন সাহেব তৎপদে প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। পতিবিয়োগের সপ্তাহ পরে শোক সন্তপ্তা বিধবা শ্রীমতী লেডি উডবরণ আপনার কুমারী কন্যার সহিত স্বদেশযাত্রা করিয়াছেন, তাঁহাদের পুত্র সন্তান জন্মে নাই, দুইটিমাত্র কন্যা, কাপ্তেন ম্যাকুয়েন সাহেবের সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যাটির বিবাহ হইয়াছে।

বিলাতে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দিয়া মিষ্টার উডবরণ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসিয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশের এসিষ্টেণ্ট মেজিষ্ট্রেট কালেক্টর হন, তৎপরে কানপুর, অযোধ্যা ও অন্যান্য বিবিধ রাজকার্য্যে যশোলাভ করিয়া তিনি মধ্যভারতের চিফকমিশনার হইয়াছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ভারতবর্ষিয় ব্যবস্থাপক সভার মেম্বর হন, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কম্পানিয়ান ষ্টার অব ইণ্ডিয়া (সি, এস, আই) উপাধি প্রাপ্ত হন, ১৮৯৭ অব্দে কে, সি এস, আই, (নাইট কমাণ্ড ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া) উপাধিলাভ করিয়া সার জন উডবরণ আখ্যা ধারণ করেন। সার আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জি সাহেব অবসর গ্রহণ করিলে ১৮৯৮ অব্দের এপ্রেল মাসে সার জন উডবরণ বঙ্গের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হইয়া বঙ্গ-তক্ত শোভিত করিয়াছিলেন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হইবার প্রায় বিংশতবৎসর পূর্ব্বে জেমস্ ওয়ার্কার সাহেবের কন্যা শ্রীমতী ইসাবেল্লার সহিত, তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

বঙ্গশাসনের চারিবৎসর পাঁচ মাসে বঙ্গের সাতকোটি লোক সার জন উডবরণের গুণাবলী পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমরা জগত পিতার নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার সংসারক্লিষ্ট আত্মা নিত্যধামে নিত্য শান্তি উপভোগ করুন।

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

দীনবন্ধু বাবু ও তাঁহার গ্রন্থাবলী। *

যে কয়জন মহাত্মার নাম বঙ্গসাহিত্যের সহিত স্থায়ী হইবে, যে মহাজনগুলিকে অনুগমন করিতে পারিলে, বাঙ্গালা-সাহিত্যের চরম উন্নতি ও পূর্ণ বিকাশের পথ পরিষ্কৃত হইবে, দীনবন্ধু সেই মহাত্মাদিগের—সেই মহাজনদিগের মধ্যে একজন। যে সময়ে ইংরাজিতে কৃতবিদ্য বাঙ্গালী বাঙ্গালা পুস্তক পড়িতে ঘৃণা বোধ করিতেন, বঙ্গভাষায় গ্রন্থ-লেখা হীন কাজ ভাবিতেন; প্রত্যুত যে সময়ে বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের উক্ত লজ্জাস্কর ভ্রমপ্রমাদ অপনোদন করিতে যে কয়জন মনীষি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং আশাতীত, কল্পনাতীত সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র, অমরকবি মধুসূদন এবং চিরজীবী নাটককার দীনবন্ধু তাঁহাদের অন্যতম। আমরা বাহুল্যভয়ে কিছুপরে আবির্ভূত কয়জন সমালোচক, প্রবন্ধকার ও কবির নাম করিলাম না; শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই নিকট তাঁহারা সুপরিচিত ও সম্মানিত। সে যাহা হউক, যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, দীনবন্ধুর নাম ততদিন অক্ষয় থাকিবে। তাঁহার "নীলদর্পণ" বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য মণি। "নীলদর্পণ" লিখিয়া তাঁহার 'দীনবন্ধু' নাম সার্থক হইয়াছে। "নীলদর্পণ নাটক" তাঁহার প্রথম গ্রন্থ; যদি এখানি তাঁহার প্রথম ও শেষ গ্রন্থ হইত, তাহা হইলেও তাঁহার নাম চিরদিন বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত হইত এবং তিনি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ নাটককার বলিয়া সম্মানিত ও পূজিত হইতেন। "নীলদর্পণ" নীলকরগণের অত্যাচারের সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন, সমুজ্জ্বল, জীবন্ত চিত্র; বঙ্গ-সাহিত্যে কোন চিত্রকর সত্যের এরূপ অকৃত্রিম, অবিকল চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন কি না জানি না। আজ ত চল্লিশ বৎসর হইতে চলিল, "নীলদর্পণ" লিখিত হইয়াছে, সেরূপ নরভুজঙ্গম, নরশার্দ্দূল নীলকর আর নাই, সে সময়ের প্রজা-কুলও বিলুপ্তপ্রায়; কিন্তু একখানি "নীলদর্পণ" লইয়া পড়িতে বসুন, যেন সেই সময়ের ঘটনা, সেই সব মনুষ্য প্রত্যক্ষীভূত হইবে, আপনি যেন সেই দানবিক অত্যাচারস্থলে সমুপস্থিত হইবেন। আজও অভিনয় দেখিতে গিয়া আপনার শোণিত সেইভাবে উষ্ণ হইবে, সেই দিনকার

* বান্ধব সমিতির বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

মত আপনার মর্ম্ম যেন ফাটিয়া যাইবে, আপনি যেন পরমাত্মীয়ের শোকে শোকাকুল হইয়া সেইরূপ আত্মহারা হইয়া পড়িবেন। ইহাই নীলদর্পণের মহত্ব, ইহাই তাহার বিশেষত্ব। নীলদর্পণের প্রতি বর্ণ, প্রতি তুলিকাপাত চিরনূতন, চিরনির্ম্মল, চিরস্ফুরিত। কিন্তু আরও যে কারণে ইহা বাঙ্গালীর অতুল সম্পত্তি, অদ্য তাহাই আমরা শ্রোতৃবর্গকে সংক্ষেপে বুঝাইব।

"নীলদর্পণ" খাঁটি বাঙ্গালীর জিনিষ; বঙ্গসংসারের অবিকল ফটো বা প্রতিকৃতি। সাবেক বাঙ্গালীর আদর্শ স্বভাব, বাঙ্গালীর প্রকৃতি, বাঙ্গালীর রুচি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম এই নাটকে যেরূপ সুন্দর, উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, কয়খানি বাঙ্গালা গ্রন্থে সেরূপ হইয়াছে? সুশিক্ষার কল্যাণে, আজকালের ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁইয়ের দিনে নবীনমাধব ও বিন্দুমাধবের সৌভাত্রের দৃষ্টান্ত কয়খানি বাঙ্গালা গ্রন্থে পাইবে? যে বঙ্গসংসার এখন জায়ে জায়ের হিংসা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ-গরলে জর্জ্জরিত হইতেছে, যাহাদের কলহাগ্নি শান্তি নিকেতন, সুখসদন বঙ্গগৃহকে ছারখার করিতেছে, সৈরিন্ধ্রী ও সরলতার দৃষ্টান্ত—সেই সাবেক বাঙ্গালীর গৃহচিত্র—বর্ত্তমান নাটক, নভেল ও কাব্যে দুর্লভ। সাবিত্রীর মত আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ মাতা, আদর্শ শাশুড়ীও বঙ্গ-সাহিত্যে বিরল; কিন্তু বঙ্গ-সংসারে সাবিত্রীর মত গৃহিণী ও মাতা বহুল থাকিলেও তাঁহার মত শাশুড়ী একান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। এককালে যে শাশুড়ীর নির্য্যাতনে শত শত পুত্রবধূকে নিশিদিন অশ্রুপাতে কালযাপন করিতে হইয়াছে, কত মর্ম্ম-ভেদী বাক্যবাণ, কত কঠোর, নির্ম্মম শ্লেষোক্তি কত অমানুষিক অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছে, অধিক কি, পতির আদর যত্নেও বঞ্চিত হইতে হইয়াছে, সাবিত্রী সে শ্রেণীর শাশুড়ী ছিলেন না; তাঁহার সুধাসম, সুমিষ্ট বচনে বধূদ্বয়ের হৃদয় নিরন্তর শান্তিরসে আপ্লুত থাকিত; জননীর নিকট কন্যা যেরূপ নির্ভয়ে, নিরাতঙ্কে, আশ্বস্তচিত্তে, নিঃসঙ্কোচে অবস্থান করে, বধূদ্বয় শাশুড়ীর নিকট সেইভাবে থাকিতেন। বঙ্গ-সাহিত্যে ও বঙ্গসংসারে প্রচুর দৃষ্টান্ত থাকিলেও সাবিত্রীর পতিপরায়ণতার ও পুত্রবৎসলতার উল্লেখ না করিলে আমাদের সমালোচনা অঙ্গহীন হইবে। এ বিষয়েও সেই অকৃত্রিম হিন্দুভাব। নীলকরদিগের সহিত বিবাদের সূত্রপাত হইতে, মকদ্দমার সময়, কারাগারে পতির আত্মহত্যা

সংবাদে, এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠপুত্রের অপঘাত মৃত্যুতে সাবিত্রীর উক্তি-গুলি, তাঁহার আচরণ এবং পরিশেষে তাঁহার অনশন ব্রত এবং উন্মাদ হওয়া সম্পূর্ণরূপে পতিপ্রাণা, স্নেহময়ী বঙ্গনারী-স্বভাবোচিত হইয়াছে। সাবিত্রীর পরিণাম কবির নাটকত্বের পরাকাষ্ঠা।

দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই, বোধ হয়, চিন্তা করিয়া থাকেন, যে আমাদের সাংসারিক কর্ত্তব্যজ্ঞান হ্রাস হইয়া দেশের প্রতি কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। মাতার প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা কমিয়া গিয়া, জন্মভূমির প্রতি জননীর ভাব বাড়িয়াছে; সহোদরের প্রতি স্নেহ-মমতার সাধ 'ভাই বঙ্গবাসী' 'ভাই ভারতবাসী' রবে মিটিতেছে। যাঁহারা গর্ভধারিণীকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে পারেন না, জন্মভূমির প্রতি তাঁহাদের ভক্তি ও অনুরাগ কতদূর আন্তরিক, কতটা স্বাভাবিক ও কতকাল স্থায়ী হইতে পারে, সূক্ষ্মদর্শীমাত্রেই তাহা দেখিতে পাইতেছেন। ভ্রাতায় ভ্রাতায় যাঁহাদের মিল নাই, স্বজাতির সহিত তাঁহাদের মিলন, তাঁহাদের একতার গভীরতা ও স্থায়িত্ব, নিত্যই নানা সভা, সমিতি ও সম্মিলনের উদয় ও বিলয়ে প্রত্যক্ষ হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে নবীনমাধব ও বিন্দুমাধবের ভ্রাতৃভাব ও মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত, সেই প্রবীণ পুত্রগণ কর্ত্তৃক মাতৃপদসেবা ও মাতৃপদরেণু ভক্ষণ কত শিক্ষাপ্রদ, কত মনোরম, কত আশাভরসাস্থল, তাহা বর্ণনা করা যায় না।

গোলক বসু সদাশয় কর্ত্তা ও জমীদারের আদর্শ; ধর্ম্মাচরণে, সদনুষ্ঠানে, সংসার-পালনে, প্রজাহিত-সাধনে—সর্ব্বরকমে তিনি আদর্শ ছিলেন; সর্ব্বাপেক্ষা আদর্শভাব তাঁহার সম্ভ্রমজ্ঞান ও আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানে। মকদ্দমা এখন আমাদের বিলাস সামগ্রী ও একটা মহা গৌরবের জিনিষ হইয়া পড়িতেছে; আমরা ক্রমে ক্রমে সম্ভ্রম ও আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান হারাইতেছি। গোলক বসুর কারাগারে অনাহার ও আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত এক্ষণে সে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান জাগাইয়া দিবে না কি? তার পর, তোরাপের কথা; এমন জমীদারভক্ত, এমন স্বার্থত্যাগী, নির্ভীক, সুচতুর প্রজা যদি আর দশজন থাকিত, আমাদের বিশ্বাস, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত স্বরপুরের নীলকরদিগের পৈশাচিক উৎপীড়ন নিবারিত হইত। মর্ম্ম-ভেদী ঘটনায় পরিপূর্ণ নীলদর্পণ নাটকে যদি কিছু আত্ম-সান্ত্বনার স্থল থাকে, তবে তোরাপের সাহায্যে নবীনমাধব কর্ত্তৃক ক্ষেত্রমণির সতীত্ব-

রক্ষা এবং নীলকরগণের আক্রমণের সময় নবীনমাধবের সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্তিকালে তোরাপ কৃত দন্তাঘাতে নীলকর উড সাহেবের নাসিকাকর্ত্তন।

যুগযুগান্তর পূর্ব্বে রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা সীতাদেবী সতীত্বরক্ষার যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, যুগধর্ম্মে, কালপ্রভাবে তাহার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিলেও মূলতঃ সে আদর্শ অক্ষুণ্ণ আছে। ভারতে জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধনী, নির্ধন, বড়লোক, ছোটলোক নির্বিশেষে সতীত্বের মূল্য কিরূপ বুঝেন, সতীত্বকে কি চক্ষে দেখেন, ক্ষেত্রমণি তাহার জলন্ত, জীবন্ত দৃষ্টান্ত। ৩য় অঙ্কের ৩য় গর্ভাঙ্ক হইতে আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"ময়রা পিসি, মোরে এমন কথা বলোনা, মুই পরাণ দিতি পার্‌বো, ধর্ম্ম দিতি পারবো না ; মোরে কেটে কুচি কুচি কর, পুড়িয়ে ফেল, ভেসিয়ে দাও, পুতে রাখ, মুই পরপুরুষ ছুঁতি পারবো না ; মোর ভাতার মনে কি ভাব্বে।"

যখন পদী ময়রাণী বলিল, "এ কথা কেউ জান্‌তে পার্‌বে না।" তদুত্তরে ক্ষেত্রমণি বলিল, "ভাতারই যেন জান্‌তি পার্‌লে না, ওপরের দেবতা তো জান্‌তি পারবে, দেবতার চকি ত ধূলো দিতি পারবো না। আমার প্রাণের ভিতর তো পাঁজার আগুন জল্‌বে। মোর স্বামী সতী ব লে যত ভালবাস্‌বে, তত মোর মন তো পুড়্‌তি থাক্‌বে।"

যখন ক্ষেত্রমণির নখাঘাতে হস্ত বিদারিত নীলকর পিশাচ রোগ-সাহেব বেত্রাঘাত করিতে গেল, তখন ক্ষেত্রমণি বলিল, "মোরে অ্যাক-বারে মেরে ফ্যাল্, মুই কিছু বল্‌বো না ; মোর বুকি একটা তেরোনালের খোঁচা মার্, মুই স্বগ্‌গে চলে যাই।"

সতীর কি তেজ! কি নির্ভীকতা! সতীত্বের জন্য অবলীলায় প্রাণবিসর্জ্জনে কি উন্মুখতা! সতীত্বরক্ষার জন্য আত্মহত্যায় বা অপঘাত মৃত্যুতেও পরকালে পরমগতিপ্রাপ্তি বিষয়ে কি অটল বিশ্বাস! ভ্রাতৃগণ, পরপুরুষস্পর্শ সম্বন্ধে আমাদের জাতীয় সংস্কারের সহিত ইদানী নানাভাবে যাহা দেখিতেছেন, তাহার তুলনা করুন ; কিন্তু ভীত হইবেন না ; এই সতীত্বভূমিতে যতই কুদৃষ্টান্ত ও কুপ্রভাব আমাদিগকে আক্রমণ করুক, কালে সে সমস্তই পরাস্ত হইবে।

আমরা সংক্ষেপে নীলদর্পণের প্রধান ব্যক্তিগুলির চরিত্রালোচনা করিলাম। বাহুল্যভয়ে রেবতী, রাইচরণ, আদুরী প্রভৃতি পল্লিগ্রামের সরল, মনোহর, চিত্রগুলির এবং উড, রোগ, গোপীনাথ প্রভৃতির লোমহর্ষণ চিত্র কয়টী সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিলাম না। এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে, অতুলনীয় শক্তিশালী চিত্রকরের কোন চিত্রই অতিরঞ্জিত হয় নাই। সাধুচরণের শুদ্ধভাষায় কথা কহা ব্যতীত কোন স্থলেই বিন্দুমাত্র অসঙ্গতি দোষ ঘটে নাই। নীলদর্পণের মত সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাটক বঙ্গ-সাহিত্যে অতি দুর্লভ। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, "নীলদর্পণে গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া "নীলদর্পণ" তাঁহার প্রণীত সকল নাটক অপেক্ষা শক্তিশালী।" অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন, "নীলদর্পণ" ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন তাঁহার উপজীবিকা সুপ্রীম কোর্টের চাকুরী ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; অনুবাদ প্রচারাপরাধে লং সাহেবের কারাগার হইয়াছিল ; এবং যাহা কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই, ইয়োরোপের নানা ভাষায় "নীলদর্পণ" অনূদিত হইয়াছিল।

"নবীন তপস্বিনী" নাটক দীনবন্ধুবাবুর ২য় গ্রন্থ। নীলদর্পণে আমরা তাঁহার চরিত্রের, তাঁহার শক্তির একদিক্ দেখিয়াছি ; "নবীন তপস্বিনী" হইতে বাকি সব গ্রন্থে আর একটী দিক্, আর এক শক্তি দেখিতে পাই। নীলদর্পণে আমরা তাঁহার করুণরস, তাঁহার সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় অনুভব করিয়াছি, অপর গ্রন্থগুলিতে তাঁহার হাস্য রস, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রীতির পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য করি। রসিকতায় দীনবন্ধু কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রধান শিষ্য ; এ বিষয়ে বঙ্কিমবাবু অপেক্ষা তাঁহার পদ উচ্চে। সে যাহা হউক, "নবীন তপস্বিনী" দুটি সামাজিক দোষের বিরুদ্ধে লিখিত ; একটী রাজা-রাজড়ার গৃহে একাধিক বিবাহ, অপরটি উচ্চপদস্থ অথবা ধনীজনের পরস্ত্রীলালসা। তাঁহার লেখনী শেষোক্ত দোষচিত্রণে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছে, প্রথমটীতে সেরূপ হয় নাই। জলধর, জগদম্বার রহস্যময় অভিনয় এবং মল্লিকা ও মালতীর অসাধারণ কৌশলে জলধরের কৌতুকময় শাসন দেখিবার জন্য আজও "নবীন তপস্বিনী" লোকের নিকট এত নূতন, এত প্রিয়। নাটকের নায়িকা কামিনী বা নবীন তপস্বিনী বাঙ্গালী-হৃদয় অধিকার

করিতে পারেন নাই। কারণ জিনিষটি আমাদের জাতীয় রুচি ও প্রকৃতির বহির্ভূত; নামে তপস্বী বিজয় সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। বঙ্কিমবাবু যে বলিয়াছেন, "ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্য পাঠের প্রভাবে দীনবন্ধুর এই ভ্রম ঘটিয়াছিল", কেবল তাহা নহে; প্রতিভাশালী ব্যক্তিরাও সর্ব্বদা কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন না। সে সময়ে বিলাতী রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহারের বাহ্য চাকচিক্যে যাঁহারা মোহিত হইয়াছিলেন, যাঁহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তদনুকরণ করিলে আমাদের পুনরভ্যুদয়ের পথ পরিষ্কার হইবে, দীনবন্ধুবাবু তাঁহাদের মধ্যে এক-জন। তাহারই কুফলে "নবীন তপস্বিনী"র বিজয়কামিনী, "লীলাবতী"র লীলাবতী ও ললিতমোহন এবং "কমলে-কামিনী"র শিখণ্ডিবাহন ও রণকল্যাণী। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, দীনবন্ধুবাবু যদি আরও কিছু-কাল জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সমসাময়িক অনেক মনস্বীর ন্যায় তাঁহারও মতের পরিবর্ত্তন ঘটিত; বিলাতী রীতি-নীতি অনুকরণের শোচনীয় পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার মত সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, সহানুভূতির আদর্শ মহাপুরুষ নিজ নাটকগুলির নায়ক-নায়িকাগণের চরিত্রের অনেক পরিবর্ত্তন করিতেন। বঙ্কিমবাবু যেমন "সাম্য" পুস্তক আর মুদ্রিত করিলেন না, তিনি সেই ভাবের কোন কার্য্য করিতেন। সে যাহা হউক, নবীন তপস্বিনীর বিদূষক মাধব অনেক বাঙ্গালা নাটকের বিদূষকের আদর্শ। জলধর যেমন পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুট চিত্র, মল্লিকা, বিদ্যাভূষণ ও জগদম্বা সেইরূপ। সুরমা চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে, কিন্তু নিখুঁত নহে। রাজা রমণীমোহন অপরিস্ফুট চিত্র বটে, কিন্তু তাঁহার দ্বিপত্নীত্বের বিষময় ফল অনেক দ্বিপত্নীককে শিক্ষা দিবে।

দীনবন্ধু বাবুর ৩য় গ্রন্থ প্রহসন—"বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো।" সমাজের সাময়িক প্রবল দোষ সংশোধনে প্রহসন সুতীক্ষ্ণবাণ এবং বিকৃত, নীচ আদর্শে পদস্খলন নিবারণেরও এমন তীব্র কষাঘাত আর নাই। শত বক্তৃতা, সহস্র উপদেশ ইহার শতাংশ ফলপ্রদ নহে। ঈশ্বরদত্ত শক্তি হাস্যরস দ্বারা সেই বাণ গঠিত। এ শক্তি বিদ্যাবলে ও অভ্যাসবলে অর্জ্জিত হয় না; জোর করিয়া রসিকতা কর্কশতার সহোদর। ঈশ্বরানু-গৃহীত দীনবন্ধুকে অনেক নাটক ও প্রহসনকার এইরূপে অনুকরণ করিতে গিয়া বালকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। দীনবন্ধুবাবুর মত সুভাব-

সিদ্ধ রসিকতা তাঁহার পরবর্ত্তী দুই তিনজন মাত্র প্রহসনকার ও নাটক-কারে পরিলক্ষিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, যে সময়ে "বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো" লিখিত হইয়াছিল, সে সময়ে ষাট বৎসরের বৃদ্ধও বিবাহের জন্য উন্মত্ত হইত। নানা কারণে এখন লোকের সে প্রবৃত্তি কমিয়াছে; দীনবন্ধুবাবুর প্রহসনও সে পক্ষে অল্প সহায়তা করে নাই। যেরূপ বুদ্ধি বিবেচনাহীন হইলে ওরূপ বৃদ্ধ বিবাহের জন্য পাগল হয়, রাজীবলোচন তাহাই ছিল; নহিলে ঘটকের সম্মুখে নিজ কন্যার সহিত অতটা নিষ্ঠুর ও ইতর ব্যবহার এবং বাসরঘরে কনের বেশে রতা নাপ্‌তের সেই সব দীর্ঘ দীর্ঘ কবিতা শুনিয়া, তাহাকে চিনিতে না পারা অত্যন্ত অস্বা-ভাবিক, সুতরাং অসম্ভব হইত। প্রহসনকার যে তুলিকায় রাজীব-লোচনকে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে তাহার পক্ষে ওরূপ নির্ম্মমতা, ওরূপ বিবেচনাশূন্যতা সম্পূর্ণরূপ সম্ভব ও স্বাভাবিক। কিন্তু রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ছেলেগুলোর বাসরঘরে পাকা ইয়ারকি দেওয়াটা কেন যে অস্বাভাবিক বলিয়াছেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। নীতিশিক্ষা-বর্জ্জিত ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহে ছেলেগুলা অল্পবয়সেই যে কত ইয়ার হয় এবং বাসরঘরে প্রৌঢ়াদের ইয়ারকি প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহারা যে কত ইয়ারকি শিখে, তাহা ত তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না।

"বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো"র রাজীবলোচন, পেঁচোর মা ও রতা নাপ্‌তের চিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত। রামমণি ও গৌরমণির চরিত্রও বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে; কিন্তু রামমণি ও গৌরমণির কথাপ্রসঙ্গে বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে গিয়া, গ্রন্থকার ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন। শাস্ত্রনিচয়ের প্রকৃত মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য উদ্ধার করিয়া, হিন্দু-জাতির ভিত্তিভূমি ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সকল দিক্ পর্য্যা-লোচনা করিয়া ইদানী বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে যে সকল প্রবন্ধ ও পুস্তক রচিত হইয়াছে, সে সকল পাঠ করিলে সকলের ভ্রম দূর হইবে। আমাদের আশঙ্কা হয়, যদি হিন্দুসমাজ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাব মত কার্য্য করিতেন, তবে এতদিনে "বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ি" লিখিতে আর এক দীনবন্ধুর প্রয়োজন হইত; অথবা সেই উদারচেতা, প্রকৃত সমাজ-হিতাকাঙ্ক্ষী জীবিত থাকিলে তিনিই সমাজের কলঙ্কমোচনে প্রাণপণ যত্ন করিতেন।

তাঁহার ৪র্থ গ্রন্থ ও প্রহসন—"সধবার একাদশী।" এখানি বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে বলিয়া, বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে বিশেষ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রচার করিতে বলিয়াছিলেন। পরম বন্ধুর অনুরোধ রক্ষার্থ পরে লিখিত "বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো" তিনি অগ্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু "সধবার একাদশী" প্রচারকালে তাহার কোনও পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। আমাদের বিশ্বাস, দুই কারণে পারেন নাই—একটী তাঁহার সঠিক অবিকল, অকৃত্রিম চিত্র প্রদর্শনের স্বভাব, ২য়টি তাঁহার স্পষ্ট বা খোলাখুলি রসিকতার অভ্যাস। ইংরাজীবিদ্যায় চরম উন্নতিলাভ করিয়া উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোক হইলেও সুরা মানুষকে কতটা অধঃপাতে লইয়া যাইতে পারে, তাহার পরিপূর্ণ চিত্র প্রদর্শনের জন্য দীনবন্ধুবাবু নিমচাঁদের কথাবার্ত্তায় ও রসিকতায় ঘোর অশ্লীলতা, বর্ব্বরতা, নীচতা এবং বিদ্যাগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া, উচ্চ নীচ হিতাহিত-জ্ঞানশূন্যতার ভাষার ও ব্যবহারের বিন্দুমাত্রও সংশোধন করিতে পারেন নাই। সমাজের তাৎকালিক অতুল ধনশালী, মদ্যপ, মূর্খ যুবক কেমন করিয়া সমাজকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য তিনি পিতা ও শ্বশুরের সম্মুখে অব্যক্তব্য, অশ্রাব্য, অতি নীচ, অতি হীন কথা অটলের মুখ দিয়া বাহির করাইয়াছেন। সরল, সহৃদয় দীনবন্ধু নিশ্চয় বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এই নিদারুণ আঘাত বা ক্রিয়ার দ্বারা প্রতি-আঘাত বা প্রতি-ক্রিয়া ঘটিবে; কারণ আতিশয্যই নিবৃত্তির প্রসূতি। কিন্তু নিদারুণ আঘাতের নিদারুণ পরিণাম ব্যতীত যে নিবৃত্তি ঘটে না, তাহা তিনি বোধ হয় লক্ষ্য করেন নাই। রসিকতার আকর ইহাও ভাবেন নাই, যে রসিকতা নির্জ্জনে বন্ধু বান্ধবের মধ্যে চলিতে পারে, সে রসিকতা সাধারণে প্রকাশ করা উচিত নহে। পিতা পুত্রে, মাতায় কন্যায়, ভাই ভগিনীতে একত্র যাহা পড়িতে বা দেখিতে পারিবেন না, তাহা সুশিক্ষা নহে, কুশিক্ষা; তাহার ফল শুভাপেক্ষা অশুভ অধিক। নিমচাঁদ ও অটলকে দেখিয়া ভুক্তভোগীরা যত না সংশোধিত হইয়াছে, অনেক দর্শকের নিমচাঁদ বা অটল হইবার প্রবৃত্তি তদপেক্ষা অধিক জন্মিয়াছে; কারণ যে আঘাতে প্রতি-আঘাত হয়, দীনবন্ধুবাবুর আঘাত সেরূপ গুরুতর হয় নাই। নিমচাঁদ বা অটলের হৃদয়ভেদী পরিণাম ত ঘটিল না; "যে মার খেয়েছি, অনেক ব্রাণ্ডী না খেলে

বেদনা যাবে না", অটলের এই কথা এবং নিমচাঁদের তদুত্তরে গা-সহা শ্লেষপূর্ণ কবিতা-উক্তি প্রমাণ করিতেছে, প্রহসনখানির যাহাতে আরম্ভ, তাহারই পুনর্বিকাশে যবনিকা পতন। এস্থলে রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় যে লিখিয়াছেন, "সমাজ প্রচলিত কোন দোষের সবিস্তর বর্ণন, সেই দোষ জন্য অনিষ্ট সঙ্ঘটন ও তৎপরে তদ্দোষাক্রান্ত ব্যক্তির অনুতাপ ও চরিত্র শোধন প্রভৃতি পরিহাসচ্ছলে বর্ণন করিয়া, সেই দোষের প্রতি সমাজের ঘৃণা উৎপাদন করাই বোধ হয়, প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য," তাহা সম্পূর্ণ সত্য। দীনবন্ধুবাবু দোষ দেখাইয়াছেন, কিন্তু অনুতাপ বা চরিত্র সংশোধনের চিত্র দেখান নাই। নিমচাঁদের অনুতাপ ক্ষণিক অনুতাপ মাত্র। যে মুহূর্ত্তে নিমচাঁদ রোদন করিয়া বলিতে লাগিল, "হা জগদীশ্বর! আমি কি অপরাধ করেছি, আমাকে অধর্ম্মাকর মদিরা হস্তে নিপাতিত কল্লে?" এবং যে মুহূর্ত্তে সে আক্ষেপ করিল, "কিন্তু সুধাংশুবদনী আমাকে একদিনও অবজ্ঞা করেন নাই, রূঢ় বাক্যও বলেন নাই, আমার জন্যে প্রাণেশ্বরী কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, আমার নিন্দা শুন্‌তে হয় ব'লে কারো কাছে যান না!" ইত্যাদি; সেই মুহূর্ত্তেই সে গোকুল বাবুর প্রতি আক্রোশ করিয়া বলিতেছে, "এর প্রতিশোধ দেবো, তবে ছাড়বো—তোমার সদর দরজা বন্ধ থাক্‌বে, তোমার অন্দরে ঢুক্‌বো, শালা মাগমুখো।" তার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। তথাপি ভাবুকগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন, কোন সামাজিক দোষের জন্য কতদূর অনিষ্ট সঙ্ঘটন হইতে পারে, তাহা দেখানো যদি প্রহসনের একটী উদ্দেশ্য হয়, সধবার একাদশীতে তাহার চূড়ান্ত দেখানো হইয়াছে। দেখানো হইয়াছে, সকল দোষের সংশোধন হয়, সুরাপায়ীর আর সংশোধন হয় না; গোকুল-বাবুর দৃষ্টান্ত দশসহস্রের মধ্যে একটী। সকল দোষে শিক্ষিত অশিক্ষিতে, ভদ্র অভদ্রে, ধনী নির্ধনে প্রভেদ আছে, কিন্তু নিমচাঁদ ও অটল প্রমাণ করিয়াছে, "মুড়ি মিছরির এক দর।" সমাজে বিদ্বান্ মাতাল ও মূর্খ মাতালে, ভদ্র মাতাল ও অভদ্র মাতালে, ধনী মাতাল ও নির্ধন মাতালে অনেক সময় আকাশ পাতাল প্রভেদ প্রত্যক্ষ হয়; কিন্তু প্রহসনকার মদের বিষম অপকারিতা, মদের দ্বারা দেশের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, দেখাইবার জন্য চরম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। "তুই তবে তোর মাগের

কাছে যা", অটলের এই কথার উত্তরে নিমচাঁদ মর্ম্মভেদী স্বরে বলিয়াছিল, Thou stickest a dagger in me. অটল কি গালাগালিই তুই দিলি।" মাতাল না হইলে সেই মুহূর্ত্ত হইতেই নিমচাঁদের জীবনের গতি অন্য দিকে প্রবাহিত হইত। নিমচাঁদ যে কার্য্য করিয়াছিল, এবং তাহার জন্য যে লাঞ্ছনাভোগ করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া অনেক সুশিক্ষিত মদ্যপ সংশোধিত হইবেন না কি? গোকুলবাবুর বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় পতিত নিমচাঁদকে দেখিয়া এবং বৈদিক ব্রাহ্মণের সহিত তাহার কুৎসিত আচরণ আলোচনা করিয়া, কৃতবিদ্য মাতাল লজ্জায়, ঘৃণায় অধোবদন হইবেন না কি?

অনেক যুবকের ইহকাল-পরকাল বিনাশের মূলে যে অতি-স্নেহময়ী জননী, প্রহসনে তাহা সুনিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। এইরূপ জননী বা অন্য গৃহিণীর ভালবাসার অত্যাচারে অনেক সংসার শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। দীনবন্ধুবাবুর সব চিত্রই ত স্বাভাবিক; তথাপি বলিতে হয়, সে লেখনী ব্যতীত অন্য কাহারও লেখনী হইতে অমন ঘটিরাম ডেপুটি, অমন রামমাণিক্য বাঙ্গাল বাহির হওয়া অসম্ভব।

এইবার তাঁহার "লীলাবতী" নাটকের কথা। নাটকখানি প্রধানতঃ কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে লিখিত। নাটকত্বে নীলদর্পণের পরেই লীলাবতীর স্থান হইলেও এখানিতে নাটককারের কবিত্ব ও হাস্যরসের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে; অথচ তাঁহার রসিকতায় যে দোষ, তাহা সকল নাটক ও প্রহসনাপেক্ষা ইহাতে অল্প। "লীলাবতী" নাটক হইলেও তাৎকালিক সামাজিক ইতিহাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমাজে তখন কৌলিন্য প্রথার কীদৃশ আদর ছিল, বংশমর্য্যাদা বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা কত উচ্চশিখরে উঠিয়াছিল, "লীলাবতী" তাহার ইতিহাস; অথবা পবিত্র কৌলিন্যপ্রথার অপব্যবহারে বঙ্গদেশের শোচনীয় অবস্থা বিমোচনের জন্য "লীলাবতী" নাটকের সৃষ্টি। এমন পাপ নাই, যাহা সে সময়ে কৌলিন্যপ্রথার নামে অনুষ্ঠিত হইত না; যে ভীষণ পাপরাশিতে বঙ্গভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই পাপরাশি বিধৌত করিতে বুঝি লীলাবতী-ভাগীরথীর অবতারণা হইয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস, সেই অবধি আর কেহ নদেরচাঁদের মত কুলীনপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করেন নাই; সে অন্ধতা ঘুচিয়া গিয়াছে; নামে কুলীন আর কেহ

দেখে না; গুণে কুলীন, প্রকৃত কুলীনের দিকে—মনুষ্যত্বের দিকে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু যে মনুষ্যত্ব বা পাশ-করা ছেলে কুলীনের স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাও ক্রমে পশুর আকার ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছে; কিন্তু এ প্রবন্ধে সে কথা অপ্রাসঙ্গিক। আর এক কারণে লীলাবতীকে সামাজিক ইতিহাস বলা যায়। কতক ব্রাহ্মণ জাতীর অধঃপতনে, কতক যুগধর্ম্মে, কতক খৃষ্টান মিশনরি ও প্রোফেসরদিগের কথায় কাকে কাণ লইয়া গিয়াছে, শুনিয়া কাকের পিছনে ছুটিয়া, তখনকার ইংরাজী শিক্ষিতগণের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস হইয়াছিল, হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিকতা, ইহা কুসংস্কারে ও কদাচারে পরিপূর্ণ। জ্ঞানধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইলে, তখন এক সম্প্রদায় তরুণ ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লইতেন। সেই চিত্র প্রদর্শনের জন্য লীলাবতী নাটকের দুশ্চরিত্র হেমচন্দ্রকে সংশোধন করিলেন, ব্রাহ্ম সিদ্ধেশ্বর ও ললিতমোহন। সে সময়ে চরিত্রহীন স্বামী হেমচন্দ্রের চরিত্র পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহার পতিপ্রাণা শারদাসুন্দরী ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক সকল অধ্যয়ন করাইতে কত আয়াস পাইয়াছিলেন। এখনকার মত তখন হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে রাশি রাশি বাঙ্গালা পুস্তক রচিত হয় নাই; তখনও সাহেবের মুখে প্রকাশিত হয় নাই, হিন্দুশাস্ত্র অনন্ত, অমূল্য রত্নের আকর; সাহেব বিবি তখনও জগৎময় ঘোষণা করেন নাই, হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিক ধর্ম্ম নহে, হিন্দু উপাসনাপ্রণালী প্রকৃত সাধনপ্রণালী; পাশ্চাত্য সুধীবৃন্দ তখনও গ্রন্থের পর গ্রন্থ লিখিয়া জানান নাই, হিন্দুশাস্ত্রে, হিন্দুদর্শনে যে নিগূঢ় তত্ত্বসমূহের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, সমগ্র ইয়োরোপের Theology ও Philosophyতে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। তাই দীনবন্ধুবাবুর নাটক, কাব্য ও প্রহসনের কতকগুলি ব্যক্তির ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্ম রীতিনীতির প্রতি অনুরাগ ও স্থলবিশেষে পক্ষপাতিতা দৃষ্ট হয়। ইহাতে কেহ যেন না মনে করেন, আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ বা নিন্দা করিতেছি। তখনকার সমাজের অবস্থা এবং তার পর সমাজের কি পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তদুল্লেখই আমাদের উদ্দেশ্য। সে যাহা হউক, প্রতিভাশালী কবি কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া, আমাদিগকে শারদাসুন্দরী ও রাজলক্ষ্মীর পার্শ্বে ক্ষীরোদবাসিনীকে দেখাইয়াছেন, সিদ্ধেশ্বর ও ললিতমোহনের সম্মুখে অরবিন্দ ও চাঁপাকে দেখিয়া আমরা মুগ্ধ

হইয়াছি। মহাদেব অনাথবন্ধুর পূজায় একনিষ্ঠা ও তন্মনা ক্ষীরোদবাসিনীর ভগবদ্ভক্তি, নিরুদ্দেশ পতির জন্য সর্ব্বসুখত্যাগিনী, নিয়ত পতির খড়ম বক্ষে ধারণ করিয়া, পতিধ্যানরতা ক্ষীরোদবাসিনীর নিকট শারদাসুন্দরী ও রাজলক্ষ্মীর মত সুন্দর চিত্রও নিষ্প্রভ হইয়াছে। নীলদর্পণের সাবিত্রীচরিত্র ব্যতীত তাঁহার গ্রন্থাবলীতে ক্ষীরোদবাসিনীর মত আদর্শ চরিত্র আর নাই। হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের যাহা বিশেষত্ব, দীনবন্ধুবাবুর সমগ্র গ্রন্থের তাহাই বিশেষত্ব। সতীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা, সতীর মহিমা কীর্ত্তন, সতীত্বই যে নারী চরিত্রের মেরুদণ্ড, তাহা তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে প্রকটিত হইয়াছে। অরবিন্দ এবং ক্ষত্রিয়ানীর কন্যা হইয়াও চাঁপা যে ধর্ম্মজ্ঞানের—যে নৈতিক বলের চিত্র দেখাইয়াছেন, তাহার নিকট বিশুদ্ধ চরিত্র ললিতমোহন ও সিদ্ধেশ্বরও সিন্ধুর নিকট কূপের সদৃশ। দীনবন্ধুবাবু লীলাবতী নাটকে বাঙ্গালীর চির সাধনার উপযোগী দুটি আদর্শ চিত্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সে দুটির একটী নিরুদ্দেশ পতির উদ্দেশে ক্ষীরোদবাসিনীর দ্বাদশ বার্ষিকী ব্রত, আর একটী অরবিন্দের গৃহত্যাগ। অধুনা বিলাতপ্রবাসী যুবকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; নিরুদ্দেশ যুবক যোগীর সংখ্যাও কম নহে। ইহাঁদের মধ্যে বিবাহিত যুবকগণের ভার্য্যাদিগের জীবনপ্রণালী কি পবিত্রভাবে অতিবাহিত করা উচিত, আমোদ-প্রমোদ বিলাস-বাসনা পরিহার করিয়া কি প্রকারে নিয়ত স্বামীর ধ্যানে—স্বামীর চিন্তায় থাকিতে হয়, ক্ষীরোদবাসিনী তাহার অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। এই অমূল্য দৃষ্টান্ত প্রোষিত ভর্ত্তৃকাকুলের হৃদয়ে নিশিদিন জাগরূক থাকা কর্ত্তব্য। তার পর, অরবিন্দের গৃহত্যাগের কথা। নিজ পত্নী ভ্রমে ভগিনী তুল্যা চাঁপাকে আলিঙ্গন করিয়া অরবিন্দ সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য বার বৎসরের মত গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। পুণ্যের সংসারেই এইরূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত সম্ভবে। সেই পুণ্যময় সংসারেই লক্ষ্মী বিরাজ করেন; সুখ, শান্তি, আনন্দে সেই সব সংসার নিত্য পরিপূর্ণ থাকে। আবার এমন সংসার আছে, যথায় অরবিন্দের অপেক্ষা সহস্রগুণে পাপাচরণ করিয়াও কেহ দ্বাদশ দিন বা দ্বাদশদণ্ডের জন্যও প্রায়শ্চিত্ত করেন না। কিন্তু ধর্ম্মের লৌহদণ্ড অতিক্রম করে কাহার সাধ্য? সেই সব সংসারেই নিয়ত শোক, নিয়ত

রোগ, নিয়ত পরিতাপ, নিয়ত হাহাকার। বাহ্য আনন্দ, উৎসব, ব্যসনে—বাহ্য সম্পদ গৌরবে বৃথা তথাকার বিকট রোগ-যন্ত্রণা, মর্ম্মন্তুদ বেদনা, হা হুতাশ লুকাইবার প্রয়াস হইয়া থাকে। আজ যেখানে লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন, অনুমান হইবে, কাল তাহা শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইবে। যেখানে বাহ্য সম্পদাদি কিছুই নাই, সেখানে যমের তাড়না আরও তীব্রতর বোধ হইবে। অরবিন্দ মহা শিক্ষা দিয়াছেন। বঙ্গ-সাহিত্যে অরবিন্দ অপূর্ব্ব সৃষ্টি। স্বর্গীয় ছবি!

ইহার পর তাঁহার "সুরধুনী কাব্য"। ইহার স্থানে স্থানে উচ্চাঙ্গের কবিত্ব থাকিলেও ইহার ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক মূল্যই অধিক। গোমুখী হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত যাবতীয় দেশ, নগরাদি এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বর্ণনায় ইহা পরিপূর্ণ। কাব্যকার মধ্যে মধ্যে যে পৌরাণিক গল্পগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গের কিরূপ লাগিয়াছে জানি না; তাঁহার কতকগুলি মতও অপ্রীতিকর। কিন্তু সুরধুনীকাব্যে করনালী নদী বা সতীগঙ্গার বর্ণনাকালে যে সতীকূল শিরোমণি শম্পার আখ্যায়িকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা একখানি অতি উৎকৃষ্ট নাটকের উপাদান। সতীর তেজ, সতীর অমানুষিক প্রভাব, সতীর প্রতি সাক্ষাৎ দেবানুগ্রহব্যঞ্জক, বিস্ময় ও আনন্দে যুগপৎ লোমাঞ্চকর ঘটনাপূর্ণ শম্পাচরিত্র অবলম্বনে নাটক লিখিয়া কোন প্রসিদ্ধ নাটকাকর বঙ্গভাষা অলঙ্কৃত করিবেন কি? আমাদের বিশ্বাস, যোগ্য হস্তে পড়িলে শম্পা নাটক এই সতীর দেশে বঙ্গভাষার সহিত স্থায়ী হইবে।

সুরধুনী কাব্যের পর তাঁহার "জামাইবারিক" প্রহসন রচিত হয়। ইহা ঘরজামাইদের দুরবস্থার এবং দুই সতীন কর্ত্তৃক পতি-লাঞ্ছনার অপূর্ব্ব চিত্রদ্বয়। ঘরজামাই হওয়া কি বিড়ম্বনা, কি হীনতা, ঘরজামাইকে নিত্য কত অপমান সহ্য করিতে হয়, জামাইবারিক তাহার অনুপম চিত্র। ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা দুই সতীনকে কতদূর আত্মহারা—কতদূর বাহ্যজ্ঞানশূন্যা করিতে পারে, আমরা বগলা ও বিন্দুবাসিনী চরিত্রে যাহা অনুভব করিয়াছি, বঙ্গ-সাহিত্যে আর কোথাও তাহা অনুভব করি নাই। আজও কলিকাতার বিশেষ বিশেষ পরিবারে এবং মফঃস্বলের কতকগুলি জমীদার গৃহে ঘরজামাই প্রথা প্রচলিত আছে; অবশ্য সেরূপ লাঞ্ছনা

কোথাও ঘটে না। কিন্তু প্রথাটি সম্পূর্ণরূপ হিন্দুসমাজনীতির বিরুদ্ধ। হিন্দুজীবনের যে প্রধান অংশ গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম, সে ধর্ম্মাচরণ প্রায়ই কন্যা বা জামাতা কাহারও ভাগ্যে ঘটে না; কর্ম্মের পথে, সুতরাং জ্ঞানলাভের পথে—সুখের পথে—আনন্দের পথে এই প্রথা বিশেষ কণ্টকস্বরূপ। জামাইবারিক হাস্য-রসের খনি, কুরীতির শ্লেষে ব্রহ্মাস্ত্র। গ্রন্থ শেষে কামিনী-চরিত্রের পরিবর্ত্তন এবং বগলা ও বিন্দুবাসিনীর পরিণাম দেখিয়া বড় আনন্দ হয়।

ইহার পর তাঁহার "দ্বাদশ কবিতা" ও "পদ্য সংগ্রহ"। ইংলণ্ডে পোপের কাব্য যে শ্রেণীর, এখানে দীনবন্ধুবাবুর কাব্য সেই শ্রেণীর। সেইরূপ মোলায়েম, মনোহর ও সহৃদয়তাপূর্ণ। প্রথম বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত, চলিত ভাষায় লিখিত, সরল, সহজ, সুমিষ্ট, তানলয়শুদ্ধ ছন্দে রচিত "প্রভাত" সম্বন্ধে কবিতা আজও অনেকের কণ্ঠস্থ আছে। তাঁহার "জামাই ষষ্ঠী" কবিতাদ্বয় ষষ্ঠীবাঁটার উজ্জ্বল, জীবন্ত, মনোরম চিত্র। বাঙ্গালী জীবন দিন দিন আনন্দহীন, বিশুষ্ক, নীরস হইতেছে দেখিয়া মনে হয়, জামাতাদিগকে লইয়া সে সময়ের মত আর তেমন আনন্দ কল্লোলধ্বনি হয় না, সে উল্লাস-তরঙ্গ উঠে না, সে স্ফূর্ত্তি প্রফুল্লতার হিল্লোল আর বহে না।

"কমলে-কামিনী" নাটক তাঁহার শেষ গ্রন্থ। যখন ইহা প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। "নবীন তপস্বিনী" ও কমলে-কামিনীর বিষয় একই, এক সপত্নী কর্ত্তৃক অন্য সপত্নী ও তৎপুত্রের জীবনহানির প্রয়াস। কিন্তু পাপের ফল কমলেকামিনীতে যত ফলানো হইয়াছে, এত নবীন তপস্বিনীতে হয় নাই। সময়াভাবে আমরা এ নাটকের বিশেষ আলোচনা করিতে পারিলাম না। এই শেষ গ্রন্থেও কবির কবিত্বের ও রসিকতার অপচয় হয় নাই; বক্কেশ্বরের অভিনয় দর্শনে হাসিয়া পেটে বেদনা ধরিয়া যায়।

আমি রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের গ্রন্থনিচয়ের যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিলাম; অনেক কথা আমার বলিতে বাকি রহিল; আশা করি, বৎসরে, বৎসরে অন্যান্য সমালোচকগণ সে সব গুণকীর্ত্তন করিবেন। এক্ষণে সেই মহাত্মার চরিত্র সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া আমি এই দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অগাধ পণ্ডিত হইয়া, এত

বড় লেখক হইয়া, এত বড় নাটককার হইয়া, অমন উচ্চপদে সমাসীন থাকিয়া, রাজা প্রজা উভয় কর্ত্তৃক আদৃত ও সম্মানিত হইয়া—অহঙ্কারের সব জিনিষ থাকিতেও তাঁহার লেশমাত্রও অহঙ্কার ছিল না। কর্ম্ম করিয়া যাঁহার কর্ম্মাভিমান থাকে না; কর্ম্ম করিলাম বলিয়া যাঁহার ভ্রুক্ষেপ-ভাবনা থাকে না, তিনিই কর্ম্মযোগী, তিনিই প্রকৃত মহাত্মা। অহঙ্কার ছাড়িলেই প্রায় ক্রোধের হাত এড়ানো যায় বটে, কিন্তু নিরহঙ্কার ব্যক্তিও সময়ে সময়ে বিসদৃশ আচরণ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধী হইয়া পড়েন। দয়া ও সহানুভূতি-পরিপূরিতমনা দীনবন্ধুতে ক্রোধরিপুরও ঐকান্তিক অভাব ছিল; সংসারীর পক্ষে, গৃহস্থের পক্ষে যাহা অসম্ভব, সেই মহাত্মায়, সেই মহাপুরুষে তাহা সম্ভব হইয়াছিল। বিস্ময়ের কথা! স্তম্ভিত হইবার কথা! যিনি যত নিরহঙ্কার, যিনি যত অক্রোধী, তিনি উত্তরোত্তর ততই অকপট, ততই স্নেহময় হইতে থাকেন; একেবারে নিরহঙ্কার এবং সম্পূর্ণরূপে ক্রোধশূন্য বলিয়া দীনবন্ধু সরলতার, অকপটতার, স্নেহের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। বন্ধুর পীড়ার আশঙ্কায় কেবল তাঁহার মত মহাপুরুষেরই মূর্চ্ছা হওয়া সম্ভব; এবং এরূপ মহাজনেরই দুরাচার, দুর্জ্জন, পাপাত্মার সহিত সহানুভূতি স্বাভাবিক। অহঙ্কার ক্রোধ কণামাত্রও থাকিলে, বিন্দুমাত্রও কুটিলতা, কপটতা থাকিলে, পাপাত্মার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে সঙ্কোচ হইত; কিন্তু সর্ব্ব আবর্জ্জনা বিধৌত অন্তঃকরণে, নির্ম্মল, নির্ম্মুক্ত চিত্তে কোন সঙ্কোচ থাকিতে পারে না, কোন প্রকার দ্বিধা স্থান পায় না। তাঁহার পরদুঃখকাতরতা, সর্ব্বতোমুখী প্রীতি, সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতি গুণেই মণিপুর হইতে গঞ্জাম পর্য্যন্ত, দার্জ্জিলিং হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত তিনি প্রায় সকলের ঐকান্তিক প্রীতি ও অনুরাগের পাত্র হইয়াছিলেন। এমন সর্ব্বলোক প্রিয় কখনও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। দীনবন্ধু তাঁহার লোকাতীত গুণনিচয়ের উপযুক্ত পুরস্কারও পাইয়াছিলেন; আনন্দময় তাঁহাকে নিজ আনন্দকণার অধিকারী করিয়াছিলেন! তিনি সদানন্দ ছিলেন। বহুপুণ্যে পুণ্যবান্ না হইলে, বড় ভাগ্যবান্ না হইলে, সদাই সহাস্যমুখ, সদাই প্রফুল্ল চিত্ত হইতে, নিজে সদাই আনন্দে বিভোর থাকিতে জগজ্জনকে আনন্দরসে নিমগ্ন রাখিতে পারা যায় না। অহঙ্কার, অভিমান গেল, ক্রোধ গেল, হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা কপটতা দূরে পলাইল, মায়া-

জাল অর্দ্ধেক ত কাটিয়া গেল; অজ্ঞান-তিমির অনেকটা ঘুচিল। যিনি এতগুলি রিপুজয়ী, সেই মহাত্মা, সেই মহাপুরুষ আমাদের পূজার যোগ্য। যে সদানন্দ দীনবন্ধুর আনন্দ ভাদ্রের ভরা গঙ্গার মত অবিরত থই থই করিত, যাঁহার অবিশ্রান্ত প্রফুল্লতা ও উল্লাসের তরঙ্গ কুলকিনারা ছাপাইয়া পড়িত, সেই শান্তির অধিকারী, সেই পরমসুখীর, আনন্দময়ের সেই কৃপাপাত্রের গুণকীর্ত্তন করিয়া, আজ আমার লেখনী পবিত্র হইল, আমি ধন্য হইলাম!

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত।

জয়ন্তী।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

রমণী আশ্চর্য্যভাবে তাহার দিকে কতক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার পর তাহাকে টানিয়া একটা নির্জ্জন ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, "বল্, কি জানিস্?"

জয়া বলিল, "তুমি যখন খাঁ সাহেবকে সুরা ঢালিয়া দিতেছিলে, তখন আর সকলে তোমাকে অপদস্থ করিবার জন্য যুক্তি করিল। নবাবের কানে কানে বলিল, "তুমি আবদুল খাঁর প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী।"

কথা শুনিয়া রমণী চুপ করিল। তাহার নয়ন হইতে দর দর করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। জয়ার কথা ভুলিয়া গেল। জয়া বলিল, "কাঁদিও না বোন। আমি তোমার সাহায্য করিব!"

রমণী যদি স্থির থাকিত, তবে বুঝিতে পারিত যে, আগন্তুক কাঁদিতেছিল। জয়ার মুখের কাপড় ভিজিতে ছিল। কিন্তু কালীর কৃপায় তাহার হৃদয় কঠিন হইয়াছিল। তাই সুস্থ হইয়া রমণীকে বলিল, "কাঁদিও না, এক কাজ কর, শীঘ্র কারাগারের চাবিটা আমায় দাও।"

রমণী চমকিয়া উঠিল। বলিল, "তুমি কে?"

জয়া। বলিয়াছি, সামান্যা স্ত্রীলোক।

রমণী। কারাগৃহের চাবি কেন চাহিতেছ?

জয়া। কাজ আছে।

রমণী। তা হইবে না। প্রভুর নিকট অবিশ্বাসিনী হইতে পারিব না।

জয়া। তবে আজন্ম এইরূপে কাঁদিবে।

রমণী। সেও ভাল।

জয়া। তুমি মূর্খ। তাই ওরূপ বলিতেছ।

রমণী। তুমি আমার প্রভুর কি অনিষ্ট করিতে আসিয়াছ?

জয়া। তোমার নিকট শপথ করিতেছি—তাহার কোন অনিষ্ট হইবে না; বরং তাহাকে লইয়া সুখী হইবে, চাবি আনিয়া দাও।

রমণী। সত্য বলিতেছ?

জয়া। সত্য।

রমণী। ঈশ্বর সাক্ষী?

জয়া। হাঁ।

তখন রমণী উঠিয়া গেল। তাহার সরল হৃদয়ে কিছুই অন্যায় বোধ হইল না। তাহার বিশ্বাস ছিল, সে কাহারও মন্দ করিতেছে না।

জয়া সেই ঘরে তাহার অপেক্ষায় রহিল। কতক্ষণ পরে ঐ রমণী আসিয়া তাহাকে তিনটা চাবি দিল। তখন জয়া তাহাকে বিদায় দিল। যাইবার সময় বলিল, "মনে রাখিও।"

সরলার হৃদয়ে এ প্রশ্ন উঠিল না যে, রমণী কেন চাবি চাহিতেছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সেই দিন রাত্রিতে অজিত সিংহ কারাগারে আবদ্ধ হইয়া ছটফট্ করিতেছিলেন। আপনাকে শত সহস্র ধিক্কার দিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন, "কেন বালিকার কথা শুনিলাম না? কেন মনের কথা মনে চাপিয়া ফিরিয়া আসিলাম না? আর ঐ বালিকাই বা কে? ঐ যে নব প্রস্ফুটিত নলিনীতুল্যা ললনা—অগাধ লাবণ্যে পরিপ্লুতা, নব জলধর-বক্ষে বিদ্যুদ্দাম সদৃশ চঞ্চলা, কখনও বা তরঙ্গশূন্য সাগর বক্ষ তুল্য গম্ভীরা; আপন ভারে আপনি নত, আপন ব্রতে আপনি রত, কে উনি?"

"এই কি বনদেবী? ছলনা করিয়া দেখা দিয়াছিলেন—দয়া করিয়া উপকার করিতে আসিয়াছিলেন? আমি মূঢ়, নতুবা কেন তাহার আদেশ অমান্য করিব।"

"আর এক কথা; যথার্থ, সেই বনদেবীকে দেখিয়া অবধি আমার মনের কিরূপ অবস্থা হইল, বুঝিতে পারি না, আমি তাহার অনুগামী না হইয়া পারিলাম না। সেই বনদেবীকে আর একটীবার দেখিতে পাইলে বোধ হয়—এ বিপদ হইতেও উদ্ধার পাইতাম।"

"শুনিয়াছি, আজ দুর্গাদাস ভারি যুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু কোন্ পক্ষের জয় হইল, কোন্ পক্ষের পরাজয় হইল, তাহাত কিছুই জানিতে পারিলাম না। পাচক-ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বেটা চুপ করিয়া চলিয়া গেল।"

"আমি ত বন্দী হইয়াছি। আক্ষেপ রহিল, মন্ত্রী বেটার মাথা ছোলাইতে পারিলাম না। উঃ! কি ভয়ানক শঠতা! লোভে পড়িয়া অনন্তসিংহকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। আমার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। আবার দুর্গাদাসকে বিষ-প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিল। ভাগ্যে দৈবানুগ্রহ লাভ করিয়াছিলাম—নতুবা পাপিষ্ঠ সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিত। হায়! আজ যদি অনন্ত সিংহ থাকিতেন, তাহা হইলে সাদরে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া ক্ষমা চাহিতাম, আবার তাহা—"

আর ভাবিতে পারিলেন না। সহসা কারাগৃহের দ্বার মৃদু শব্দে খুলিয়া গেল। কে মৃদুপদবিক্ষেপে সে ঘরে প্রবেশ করিল। ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল।

অজিত সিংহ গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

অতি কোমলকণ্ঠে উত্তর হইল, "আমি"।

অজিতের হৃদয়ে হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ খেলিল, তিনি সাহ্লাদে বলিলেন, "কে, বনদেবী?"

"আমি বনদেবী নহি। এখানে আর কে আছে?"

অজিত সিংহ বিমর্ষ হইলেন। বলিলেন, "আর কেহ নাই।"

তখন নবাগত ব্যক্তি আপন বস্ত্র মধ্য হইতে একটী চকমকি বাহির করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিল। সঙ্গে প্রদীপাধার ছিল, উহা ধরাইয়া দিল। তখন অজিত সিংহ দেখিলেন, কে এক ব্যক্তি আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চক্ষের নিকট কেবল দেখিবার জন্য দুটী ছিদ্র রহিয়াছে। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, "চিনিতে পারিলে?"

অজিত। কেমনে চিনিব? তুমি যে কাপড় মুড়িয়াছ!

তখন আগন্তুক গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিল। তাহাকে দেখিয়া অজিত সিংহ আনন্দে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সেই বনদেবী!"

আগন্তুক বলিল, "আমি বনদেবী নহি। আমার নাম জয়ন্তী।"

অজিত। আমি ভাবিলাম, তুমি বনদেবী। যাহা হউক, তোমার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়াই আমি তোমায় চিনিয়াছি, জয়ন্তি! তোমার বাড়ী কোথায়?"

জয়ন্তী। আমি বনবিহঙ্গিনী। আমার আবার বাড়ী কি?

অজিত। তুমি কেন আসিয়াছ?

জয়ন্তী। তোমাকে উদ্ধার করিব।

অজিত। আমায় মুক্ত করিলে তোমার কি? তুমি কেন আমার জন্য খাটিয়া মর।

জয়ন্তী। রাজপুতকন্যা রাজপুতের কষ্ট দেখিতে পারে না।

অজিত। যথার্থ তুমি রাজপুতকন্যা। তাহার পরিচয়—তোমার অতুল সাহস সর্ব্বত্র বিতরণ করিতেছে।

জয়ন্তী সে কথায় কর্ণপাত করিল না। ব্যগ্রভাবে বলিল, "চল, শীঘ্র বাহির হইয়া যাই। বিলম্বে অনিষ্ট ঘটিতে পারে।"

অজিত সিংহ সে কথা শুনিল না। তিনি তখন অন্যমনস্ক হইয়া—জয়ন্তীর রূপরাশি প্রাণ ভরিয়া দেখিতে ছিলেন। দেখিলেন, সুন্দরী বটে। কিন্তু এরূপ ত মানবের ঘরে হয় না। সেই চম্পকনিন্দিত বর্ণ; সেই বর্ষাকালীন ভরা স্রোতস্বিনী তুল্য অঙ্গের পূর্ণতা; সেই অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত গোলাপ-প্রসূনবৎ দেহকান্তি; সেই কৃষ্ণালুলাইত, আজানুলম্বিত কুন্তল-রাশি; সেই সফরীনিন্দিত নয়নদ্বয়; তদুপরি সেই অরাল, সূক্ষ্ম ভ্রূযুগ; সেই ঊর্দ্ধশ্বিনী গ্রীবা; সেই পীনোরঃ; সেই নয়নের মকর-কেতন-কলম্ব তুল্য কটাক্ষ; সেই সুকুমার নিতম্ব মানবের ঘরে দেখা যায় কি?

অজিত সিংহ অনিমেষ নয়নে সে রূপ দেখিতে লাগিলেন। জয়ন্তী তাঁহাকে বিমনা দর্শন করিয়া বলিল, "কি ভাবিতেছ? শীঘ্র বাহির হইয়া আইস।"

এমন সময় দুর্গের সম্মুখভাগে বিপুল গর্জ্জনে কয়েকটা তোপধ্বনি হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

অজিত সিংহ সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওদিকে কি হইতেছে।"

জয়ন্তী ব্যগ্রভাবে বলিল, "কি হইবে? রাজপুত দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে, শীঘ্র বাহির হইয়া আইস।"

অজিতসিংহ স্বীয় তরবারি কোষমুক্ত করিয়া বলিলেন, "চল, যাইতেছি।"

তখন উভয়ে কারাগৃহ হইতে বাহির হইল। দেখিল, সেনাগণ দুর্গের সম্মুখভাগে ছুটিয়াছে। কেহ বা সাজিতেছে; কেহ বা অসজ্জিত অবস্থায়ই যাহা সম্মুখে পাইতেছে, তাহা লইয়া লড়াই করিতে যাইতেছে। তাহারা প্রচ্ছন্নভাবে দুর্গের পশ্চাদ্দিকে চলিতে লাগিল—যতদূর সম্ভব লোকের দৃষ্টির অন্তর হইয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু অর্দ্ধপথ যাইতে না যাইতে কে আসিয়া তাহাদের হাত ধরিল। অজিত সিংহ দেখিলেন, এ সেই পাপিষ্ঠ পদ্মরাও।

মন্ত্রীকে দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তাহাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন, মন্ত্রী সরিয়া দাঁড়াইল। তার পর "কয়েদী ভাগিল" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল।

নিকট দিয়া কয়েকজন সৈনিক যুদ্ধে যাইতেছিল। তাহারা—তাহার চীৎকার শুনিয়া—জয়ন্তী ও অজিত সিংহকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। অজিত সিংহ দেখিলেন, ঘোর বিপদ। তিনি ব্যাকুলভাবে জয়ন্তীর দিকে চাহিলেন।

জয়ন্তী কথাটা বুঝিল। তাঁহার কাণে কাণে বলিল, "ছি! রাজপুত হইয়া এত ভীরু।" তার পর আপনার বক্ষঃস্থল হইতে কি একটা বাহির করিয়া বাজাইল। বংশীধ্বনি দুর্গের চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইল।

যবনগণ এ ধ্বনির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না করিতে কোথা হইতে অগণিত রাজপুত আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহারা অজিত সিংহকে দেখিতে পাইয়া—"জয় মহারাজ কি জয়"! বলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। দুর্গের সর্ব্বত্র সে শব্দ ধ্বনিত হইয়া যবনগণের মনে মহা-ভীতির সঞ্চার করিল। সেখানে যে কয়েকজন মুসলমান সৈনিক দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা মন্ত্রীকে লইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে পলায়ন করিল।

দুর্গের সম্মুখভাগে ভীষণ সমর চলিতে ছিল। সফি খাঁ স্বয়ং সসৈন্যে

রাজপুতগণের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে অনেক রাজপুত বিস্মিত হইল। সফি খাঁ আশা করিতেছিলেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই দুর্গ নিরাপদ করিতে পারিবেন। এমন সময় দুর্গ মধ্যে হঠাৎ ভীষণ রাজপুত জয়ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। মুহূর্ত্ত পরেই অবগত হইলেন, গড়ের ভিতর শত্রু ঢুকিয়াছে। তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। উৎসাহ, তেজ, শক্তি এককালে তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল। হতাশ হৃদয়ে তিনি দুর্গের দিকে ফিরিলেন। দেখিলেন, রাজপুতগণ গড়-মধ্যস্থ সৈন্যগণকে তাড়াইয়া প্রায় বাহিরে লইয়া আসিয়াছে।

তখন তিনি উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া জয়াশা পরিত্যাগ করিলেন। বুঝিতে পারিলেন, সে দুর্গ আর রক্ষা করা যাইবে না। এখন যুদ্ধ করিয়া সৈন্যক্ষয় বৃথা। তিনি পলায়নের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সেই সময় বাহিরের রাজপুতগণ একটু পশ্চাৎ হইয়া গেল। গড়ের মধ্যস্থ শত্রুগণ দ্বিগুণ বেগে আক্রমণ করিয়া সকল সৈন্য দুর্গের বাহির করিয়াছিল। এইরূপে দুর্গ অধিকার করিয়াই রাজপুতগণ দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া দিল; যেন যবনগণ আর দুর্গে প্রবেশ করিতে না পারে।

দুর্গ অধিকৃত হইল দেখিয়া, এদিকে বাহিরের রাজপুতগণ আবার ভীষণ ভাবে যবন সেনা আক্রমণ করিল। আবার ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আবার রক্তে মাটী ভিজিয়া গেল। এবার রাজপুতগণের প্রতাপ বিধর্ম্মীগণ সহ্য করিতে পারিল না। অধিকংশই পলায়ন করিতে লাগিল। নিরুপায় দেখিয়া সফি খাঁ দুর্গাদাসের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া এক দূত প্রেরণ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

দুর্গাদাসের সন্ধির ইচ্ছা ছিল না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যবন হারিয়াছে বলিয়া সন্ধি করিতে চাহিতেছে। তিনি সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া দূতকে ফিরাইয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় সেখানে জয়ন্তী উপস্থিত হইল।

তাহাকে দেখিয়া দুর্গাদাস স্নেহভরে কহিলেন, "মা,—তোমার আশীর্ব্বাদে আজ যুদ্ধে জয় হইল। শত্রুরা এখন সন্ধি করিতে চাহিতেছে।"

জয়ন্তী উত্তর করিল—"এ বিষয়ে আপনার কি অভিপ্রায় ?"

দুর্গাদাস সদর্পে বলিলেন—"পাপাত্মা যবনের সঙ্গে সন্ধি করিব না।"

জয়ন্তী অধোবদন হইল। দুর্গাদাস বলিলেন, "কি ভাবিতেছ মা !"

জয়ন্তী। ভাবিতেছি, সেটা কি ভাল।

দুর্গা। কেন ভাল হইবে না ?

জয়ন্তী। আমি বেগমের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, সফি খাঁর কোন অপকার করিব না।

দুর্গাদাস চিন্তা করিলেন। গভীর চিন্তার পর বলিলেন, "তাহাই হউক। সফি খাঁর সহিত সন্ধি করিব। কিন্তু এ বিষয়ে মহারাজ কি বলেন ?"

জয়ন্তী। এ বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ মত।

দুর্গা। ভাল। কিন্তু আরও এক কথা। মন্ত্রীকে ছাড়া হইবে না। সফি খাঁ যদি তাহাকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করেন, তবেই সন্ধি করিব।

জয়ন্তী। উত্তম।

তখন দুর্গাদাস দূতকে ডাকিয়া বলিলেন, "যদি সফি খাঁ পদ্মরাওকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করেন, তবেই সন্ধি হইবে। একথা তোমার প্রভুকে স্পষ্ট করিয়া বলিও।"

দূত চলিয়া গেলে জয়ন্তী দুর্গাদাসকে বলিল, "আমার আর একটী ভিক্ষা রাখিতে হইবে।" দুর্গাদাস সাগ্রহে বলিলেন, "সে কি মা ! তোমার আবার ভিক্ষা কেন ? বল, তুমি কি চাহিতেছ ?"

জয়ন্তী। মন্ত্রীকে কোনরূপ কষ্ট দেওয়া হইবে না।

দুর্গাদাস বিস্মিত হইলেন। জয়ন্তীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, প্রকৃত দয়াময়ী মূর্ত্তি ! সর্ব্বত্র করুণার উচ্ছ্বাস।

মনে মনে দুর্গাদাস আর একবার 'মা' বলিয়া ডাকিলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "মা, তোমার চরিত্র বুঝা ভার।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এখন আবদুল কোথায় ? আবদুল সেই মন্দিরের উদ্দেশে যাইতে যাইতে কত চিন্তা করিল। একবার ভাবিল, দুর্গটা ছাড়িয়া আসিয়া

ভাল করি নাই—কে জানে কি ঘটিতে পারে ? আবার ভাবিল, কেই বা জানিতে পারিবে ? আর আমি যে এই আসিলাম। কেবলমাত্র একটা চক্ষের দেখা দিয়া আসিব বৈ ত নয় ? নতুবা সে যে বাঁচিবে না।

"সে বাঁচিবে না" এই কথাটা ভাবিতে তাহার একটু হাসি আসিল। মনে হইল, আপনার রূপের কথা ! আপনার পদের ও সৌর্য্যের কথা !

এইরূপ কত চিন্তা করিতে করিতে আবদুল সেই কালিকাদেবীর মন্দির দেখিতে পাইল। আঁধারে ঐ মন্দিরের কল্পনা বড় ভীষণ। কিন্তু আবদুল সুখে চলিয়াছে—তাহার হৃদয়ে ভয়ের পরিবর্ত্তে আনন্দ উথলিয়া উঠিল। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রিয়া-সমাগম-জনিত সুখের আশায় মোহিত হইতে লাগিল। সে আশা বড় মধুর।

ক্রমে আবদুল মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল। চরণদ্বয় কাঁপিতে লাগিল।

আমাদের পাঠিকা ঠাকুরাণী যদি বাসর ঘরে প্রথমে স্বামী সম্ভাষণ করিতে ব্যস্ত হইয়া থাকেন, আর পাঠক যদি কখনও কলহান্তরিতাকে প্রেম সম্ভাষণ করিতে যাইয়া থাক, তবেই আবদুলের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আবদুল মনে মনে বলিতে লাগিল, "আসিলাম ত ! এখন পা যে চলিতে চায় না।"

কষ্টে আবদুল পা চালাইল। এমন সময় সেই বনপ্রদেশ কাঁপাইয়া 'দ্রুম' করিয়া একটা শব্দ হইল। সেই সঙ্গে আবদুল মাটিতে পড়িয়া গেল। মস্তক হইতে রুধির রাশি নির্গত হইতে লাগিল।

সেই সময়ে মন্দিরের ভিতর হইতে সশস্ত্র কয়েক জন রাজপুত বাহির হইল ! তাহাদিগকে দেখিয়া আবদুল চীৎকার করিয়া বলিল, "প্রতারণা" তার পরই অচৈতন্য হইয়া পড়িল।

রাজপুতদিগের মধ্যে একজন আসিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিল। অন্যান্য সকলকে বলিল, "বাঁধিয়া লও, মরিবে না।"

তখন সকলে তাহাকে বাঁধিয়া কাঁধে উঠাইয়া ধীরে ধীরে পর্ব্বত হইতে নামিতে লাগিল। [ক্রমশঃ]

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পাল।

সমালোচনা।

১। কহিনুর।—ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস, শ্রীযুক্ত ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, বসুপ্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ১৲ এক টাকা। ঔরঙ্গজেব যখন দিল্লীর সম্রাট, হিন্দুকুলের উচ্ছেদ সাধনে যখন তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প, সেই সময়ে উদয়পুরের রাণাবংশের এক পরিণয় সম্বন্ধ উপলক্ষে যেরূপ বিচিত্র বিচিত্র ঘটনা হইয়াছিল, তাহাই গল্পচ্ছলে এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। আরম্ভ রাজস্থানের এক আহিরীয়া উৎসব, মনুষ্যের সহিত বন্যপশুর যুদ্ধকে আহেরিয়া বলে। ঘটনাগুলি পাঠ করিয়া আমরা সন্তোষলাভ করিলাম, ভাষা বিশুদ্ধ হইয়াছে, স্ত্রী চরিত্র বর্ণনা অতি সুন্দর, বালক-বালিকার প্রণয় আদর্শ প্রণয়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আজকাল যেরূপ অনেক নাটক নভেলে ঠাকুর চণ্ডালী ভাষা দেখা যায়, কহিনুরে সে দোষ নাই; কিন্তু ইহার মধ্যে মধ্যে সমাসের ভাব ঘটার বিস্তর আধিক্য দৃষ্ট হইল, বঙ্গভাষায় এত বড় বড় সমাস বাহুল্য থাকিলে, সকল স্থলে ভাষার মিষ্টতা রক্ষণ হয় না। ব্যাকরণ অনভিজ্ঞ পাঠকগণের পাঠ করিবার ও অর্থ বুঝিবার অসুবিধা ঘটে, ননীবাবু এই কথাটি স্মরণ রাখিবেন। পুস্তকখানি উত্তম হইয়াছে, বস্তু বর্ণনা ও স্বভাব বর্ণনা হৃদয়গ্রাহিণী। মুসলমানের অধিকার হইতে কহিনুরমণি উদ্ধারের চেষ্টা, সেই কারণেই এই উপন্যাসের নাম "কহিনুর"।

২। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।—শ্রীযুক্ত ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মেডালিষ্ট। রোগের কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসা, এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমরা এক সঙ্গে পাঁচখানি পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। ওলাউঠা চিকিৎসা, মূল্য ৵০ দুই আনা; জ্বর চিকিৎসা, মূল্য ।০ চারি আনা; প্রমেহ চিকিৎসা, মূল্য চারি আনা; বহুমূত্র চিকিৎসা, মূল্য ৵০ দুই আনা; উপদংশ চিকিৎসা, মূল্য ।০ চারি আনা। এই সকল পুস্তক গৃহে রাখিলে গৃহস্থ লোকের প্রয়োজন মতে অনেক উপকারে আসিতে পারিবে।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।)

১১শ বর্ষ। } পৌষ, ১৩০৯ সাল। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

স্ব-জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যকতা ও উন্নতি। (১)

স্ব-জাতীয় উন্নতি ও অভ্যুত্থানের সহিত স্ব-জাতীয় সাহিত্যের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—এমনই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—যে, শেষোক্তের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহার উন্নতি-সাধন না করিতে পারিলে, প্রথমোক্তের উন্নতি-সাধন, এক-প্রকার অসম্ভব। আর, স্ব-জাতীয় উন্নতি ও স্ব-জাতীয় দুর্গতির দূরীকরণ-মানসে এই পুস্তকের রচয়িতা, যে সমস্ত কারণের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎ-সমুদায়, সাধারণতঃ, সু-যুক্তিপূর্ণ বলিয়া অনুমিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে অনেক চিকিৎসক, স্ব-জাতীয় দুর্গতি-রোগ-নিবারণ করিতে গিয়া, রোগের লক্ষণ দেখিয়া, রোগ-নিরূপণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং, কখন "বাল্য-বিবাহ-রোগ" কখন বা "বিধবা-বিবাহ"-রোগ (২) কখনও বা

---

(১) এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি, "সাবিত্রী-লাইব্রেরীর" অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অভিব্যক্ত।

এই পুস্তক-খানি ১০।১ নং মেছুয়াবাজার রোড্-স্থিত "বাল্মীকি যন্ত্রে" মুদ্রিত এবং শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৵০ (দুই) আনা মাত্র।

(২) বিধবা-বিবাহের প্রচলন না হইলে, উন্নতি হইবে না। কারণ, রমণীর দুঃখ-বিমোচন না হইলে, সাংসারিক দুঃখ বাড়িবে। আর, রমণী-জাতির উপর অবিচার হইলে, উন্নতি-পথে বাঁধা পড়িবে—এইরূপ অনেকের বিশ্বাস।

"স্ত্রী-শিক্ষা"-রোগ বলিয়া অনেকে, অনেক সামাজিক রোগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং তাঁহারা, সেই সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসায়ও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। "যেন তেন প্রকারেণ" একটা রোগ ধরিয়া লইয়া, চিকিৎসা করিলে, প্রকৃত রোগের তো কোন মতেই উপশম হয় না; প্রত্যুত, অন্যান্য নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হইয়া, ঐ রোগকে বিষম হইতে বিষমতর করিয়া তোলে। সম্প্রতি, দেবেন্দ্রনাথ বাবু, ঠিক্ রোগ নির্ণীত করিয়াছেন বলিয়া, আমাদের বিশ্বাস। তিনি এই রোগ-প্রশমনার্থ যে যে ঔষধাদির বা নিয়মাবলির ব্যবস্থা করিলেন, সেই মতে যদি রোগীর রোগ, চিকিৎসিত হয়, তাহা হইলে, বুঝি বা এই উৎকট রোগারোগ্য হইবার সম্ভাবনা। গ্রন্থ-কার এই রোগ-নিবারণ-সম্বন্ধে কি স্বদেশীয়—কি বিদেশীয়—অনেক বড় বড় চিকিৎসকের মতামত, উদ্ধৃত করিয়া, আপনার মত সমর্থিত করিয়াছেন।

স্ব-জাতীয় সাহিত্য দ্বারা আমাদের কত দূর উন্নতির সম্ভাবনা, এবং স্বজাতীয় সাহিত্য, না থাকিলে, সমাজের যে কিরূপ দুরবস্থা ঘটিয়া থাকে, দেবেন্দ্রনাথ বাবু, এই সমালোচ্য পুস্তকে তাহার ধারাবাহিক বিবরণ দিয়াছেন। যথা :—

প্রথম ও দ্বিতীয়।—"জাতীয় সাহিত্য, এক দিকে ব্যুৎপত্তি পথ-পরিষ্কারক;—অপরদিকে কৃতবিদ্যতার সঞ্চারক। জাতীয় সাহিত্যের অনুশীলন ব্যতীত কৃতবিদ্যতার উৎপত্তি অসম্ভব।"—(৬ পৃষ্ঠা)।

তৃতীয়।—"জাতীয় সাহিত্য, সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের চরিত্র ও জ্ঞানোন্নতি-কারক।"—(৮ পৃষ্ঠা।)

চতুর্থতঃ।—"জাতীয় সাহিত্যের সেবায় স্বকীয়ত্ব ও প্রতিভার বিকাশ হইয়া থাকে। ইংরাজীতে যাহার নাম—ওরিজিনালিটি (Originality), আমি বাঙ্গালায় তাহাকেই স্বকীয়ত্ব শব্দে আখ্যাত করিলাম।"—(১২পৃষ্ঠা)।

পঞ্চমতঃ।—"জাতীয় সাহিত্যের অভাবে সংস্কার ও আবিষ্কারের পথে অনেক অন্তরায়, উপস্থিত হইয়া থাকে।"—(১৩ পৃষ্ঠা)।

ষষ্ঠতঃ।—"জাতীয় সাহিত্য, জ্ঞানের উত্তরাধিকারিত্ব-সাধ্য।"—(১৭ পৃষ্ঠা)।

সপ্তমতঃ।—"জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় জ্ঞানের উদ্দীপক ও রক্ষক।"—(১৮ পৃষ্ঠা)।

অষ্টমতঃ।—"জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় গৌরবের উদ্দীপক।"—(২২পৃষ্ঠা।)

নবমতঃ।—"জাতীয় সাহিত্যের * * শেষ আবশ্যকতা, ধর্ম্মানুশীলনী বৃত্তির পোষণ ও প্রসারণ।—(২৩ পৃষ্ঠা)।

স্ব-জাতীয় সাহিত্যের অনুশীলন যে, একান্তই আবশ্যক,—মুখোপাধ্যায় বাবুর উপরি-উদ্ধৃত নয়টী আবশ্যকতাই, তাহার নিদর্শন। আত্মোন্নতি চাহিতে হইলে,—সাধারণের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল-কামনা করিতে হইলে, স্ব-জাতীয় গৌরব-বৃদ্ধি করিতে হইলে,—স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে বাসনা থাকিলে,—বক্তৃতা ছাড়িয়া, স্ব-জাতীয় সাহিত্যের অনুশীলন করাই, বিশেষ বিধেয়। কি ব্যক্তিগত উন্নতি, কি জাতিগত উন্নতি—উভয়ই, স্ব-জাতীয় সাহিত্যের উপর নির্ভর করিতেছে। দেবেন্দ্রনাথ বাবু, স্বীয় পুস্তক-মধ্যে তাহা, বিলক্ষণ বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

এখন আমাদের সমাজের কিরূপ অবস্থা! বিদেশীয় পরিচ্ছদে, সাজ-সজ্জায়, কেশ-বেশ-বিন্যাসে—বিদেশীয় আহার-সামগ্রীতে কিরূপ অনুরক্তি! "শেক্‌হাণ্ড" (Shake hand) এবং "গুড্ মর্ণিঙ্" (Good morning) অভ্যাগতের সহিত আত্মীয়তা করা, উপকারীকে "থ্যাঙ্ক ইউ" (Thank you) বলা, পিত্তল-কাঁসার বাসনের বিনিময়ে চীনে ও জাপানী বাসন ব্যবহার করায়, স্বজাতীয় ভাব ও স্বজাতীয় শিল্পের লোপ পাইতেছে। কাঁসারি ও তন্তুবায়ের অন্ন মারিয়া, আমরা এখন বিদেশীয় শিল্পের আনুকূল্য করিতেছি। আমাদের নিজ দেশের কিরূপ চাল্-চলন ছিল, গুরুজন-সমীপে কিরূপ শিষ্টাচার কিংবা বিনয়-নম্রতা ছিল, এবং তাহার পরিবর্ত্তে কিরূপ চাল্-চলন আজি-কালি সমাজ-মধ্যে স্থান পাইল, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলে, বিশেষ বিষণ্ণ হইয়া পড়ি না কি?—দশ দিক্ অন্ধকারময় দেখি না কি? সেই জন্যই আমরা দেবেন্দ্রনাথ বাবুর সহিত কণ্ঠ-স্বর মিশাইয়া বলি—"এই বিজাতীয় ভাব-প্রবাহ হইতে, আমাদের দেশ ও সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে—আমাদিগের মধ্যে জাতীয়তার উদ্বোধন ও আরাধনা আরম্ভ করিতে হইলে, আমাদিগের স্ব-জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা, যারপরনাই আবশ্যক" (৩)। বক্তৃতার বাঁধ দিয়া, এই প্রবল-স্রোতঃ ফিরাইতে পারা যাইবে না। এ বঙ্গদেশ, দিন দিন যেরূপ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, বৈদেশিক প্রথানুসারে পানাহার-সম্বন্ধে যেরূপ রুচি, বাড়িয়া যাইতছে, বৈদেশিক আস্‌বাব্,

(৩) ২২ পৃষ্ঠা।

বৈদেশিক ভাব ও বৈদেশিক রীতি, যেরূপ শনৈঃ শনৈঃ সমাজে—অধিকার বিস্তার করিতেছে, স্ব-জাতীয় সাহিত্যের আশ্রয় ব্যতীত আমাদের অব্যাহতি পাইবার দ্বিতীয় উপায় নাই।

"শিক্ষিত বাঙ্গালী, বাঙ্গালী-বন্ধুকে পত্র লিখিবেন,—তাহাতে ইংরাজি-ভাষা! পিতাকে পত্র লিখিতে হইবে, তাহাতেও ইংরাজি ভাষা! অধিক কি, সংসারে যাঁহাকে—তাঁহারা, অর্দ্ধাঙ্গিনী বা সহধর্ম্মিণী বলিয়া প্রচারিত করিয়া থাকেন, তাঁহাকে স্বীয় দুঃখ লিখিবার সময়েও ইংরাজি ভাষা!" (৪)

এ বিষয়ে আমরা দেবেন্দ্রনাথ বাবুর সহিত এক-মতাবলম্বী। ভিন্ন ভিন্ন জাতির পত্র লিখিবার প্রথা, বিভিন্ন প্রকার। সকল জাতির ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি, মনোবৃত্তি, সমান নয়। আমাদের দেশে পার্থিব দেবতা-সদৃশ জনক-জননীর প্রতি যেরূপ ভক্তি দেখাইয়া, পত্র লিখিবার প্রথা, প্রচলিত আছে, অন্য দেশে হয় তো সেরূপ নাই। সুতরাং অন্যদেশ-প্রচলিত প্রথানুসারে পত্র লিখিলে, আমাদের মনের তৃপ্তি হয় না। ইংরাজিতে মাই ডিয়ার্ ফাদার্, বা, ডিয়ার্ মাদার্ (My dear father; dear mother) লিখিলে, চলিতে পারে; কিন্তু, আমাদের দেশে ওরূপ পাঠ লিখিয়া সুসন্তানে, কখনও তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। "প্রণাম-শতকোটি নিবেদন" না লিখিলে, হিন্দু-সন্তানের পত্র, যেন অঙ্গ-হীন হইল বলিয়া, মনে করি। যে 'ইউ' (you) শব্দ, সর্ব্বজনে প্রযুক্ত হইতে পারে, গুরুজনে সেই 'ইউ' (you) শব্দের প্রয়োগ করিয়া, যেমন চিত্ত, পরিতৃপ্ত হয় না। সেই কারণে গুরুজন বা সহোদর, সন্তান ও বন্ধুগণকে স্ব-জাতীয় ভাষাতেই পত্র লেখা কর্ত্তব্য। আর, প্রণয়িনীকে ইংরাজিতে পত্র লেখা, খুব উচ্চ শ্রেণীতে হইতে পারে। এখনও সর্ব্ব-জন-সাধারণী প্রণালী, প্রচলিত হয় নাই। প্রণয়িনীকে যে স্ব-জাতীয় ভাষায় পত্র লেখা একান্ত বিধেয়, তাহা বলা, বাহুল্য-মাত্র। কেন না, স্ব-জাতীয় ভাষায় কিঞ্চিন্মাত্র রচনা করাও, তাঁহাদের পক্ষে দুরূহ হইয়া পড়ে।

দেবেন্দ্রনাথ বাবু, বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি-সাধনার্থে অনেকগুলি উপায় দেখাইয়াছেন। যথা,—

(৪) ২৭ পৃষ্ঠা।

'প্রথম।—আত্ম-কর্ত্তব্য-সংসিদ্ধি বা ব্যক্তিগত চেষ্টা। দ্বিতীয়।—বহু-ভাষার আলোচনা ও তাহার সার-সংগ্রহ। তৃতীয়।—সমালোচনা। চতুর্থ।—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় বাঙ্গালা-ভাষার অধ্যাপনা ও আলোচনা। পঞ্চম।—স্ব-জাতীয় সাহিত্যের নিমিত্ত, বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপন। ষষ্ঠ।—সাহিত্য-সেবায় রাজগণের এবং জমিদারদিগের সাহায্য দান।'

দেবেন্দ্রনাথ বাবু, যাহা যাহা বলিয়াছেন, বা যে যে মত প্রকাশিত করিয়াছেন—আমরা, তাঁহার তন্ময়ের বিরোধী নহি; সেইমত সমর্থিত করিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইলাম। তিনি, যে অনল জ্বালিয়াছেন,—সে অনল, নির্ব্বাপিত করিতে, আমাদের অভিলাষ নাই। বরং যাহাতে সে অনল, অধিকতর প্রজ্বলিত হয়, তাহার প্রয়াস পাইব। তিনি হয় তো কতকগুলি শুষ্ক কাষ্ঠ, কতকগুলি বা আর্দ্র কাষ্ঠ সংগৃহীত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ, আর্দ্রগুলিকে আপাততঃ, অপসারিত করিতে হইবে; পরে অগ্নিতে দিবার উপযোগী হইলে, ব্যবহৃত হইবে। এমন কি, অনল-শিখা যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য ব্যজন পর্য্যন্ত করিতে হইবে। তিনি যে উৎসাহানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন, যদি সর্ব্বত্র এরূপ অনল জ্বলিয়া উঠে, তবেই শুভফলের আশা।

"প্রথম।—আত্ম-কর্ত্তব্য বা ব্যক্তিগত চেষ্টা।" প্রথমতঃ, ব্যক্তিগত চেষ্টা হইলে, তবে তাহা, ক্রমে ক্রমে সমাজগত, পরে সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণী হইয়া স্ব-জাতীয় উন্নতির হেতু হইবে। ব্যক্তিগত চেষ্টা, সর্ব্বপ্রথমেই আবশ্যক। সুতরাং আমরা এই মতের সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।"

"দ্বিতীয়।—বহুভাষার আলোচনা ও তাহার সারসংগ্রহ।" এই সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতে হইলে, বহু ভাষার আলোচনা ও সার-সংগ্রহ করা আবশ্যক এ বিষয়-সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ, যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার্থকতা আছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে অনেক মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন। কোন্ মহাপুরুষের মস্তিষ্ক বিলোড়িত হইয়া, কি অমূল্য রত্ন, অগাধ-ভাষা-সাগরের অতল গর্ভে নিহিত আছে, কে বলিতে পারে? যেমন রত্নপ্রার্থী—পারস্যাদি-সাগরে মগ্ন হইয়া, রত্ন লাভ করিয়া থাকে, আমরাও, সেইরূপ ভাষা-সাগরে নিমগ্ন হইয়া, রত্ন সংগ্রহ করিব। বেদ বা পুরাণ, কোরাণ অথবা বাইবেল্, সকল সাগরেরই মন্থন, নিতান্ত আবশ্যক। কারণ, ধর্ম্ম-পুস্তক-মধ্যে বহুমূল্য নীতি-রত্ন পাইবার সম্ভাবনা। এই উপায়, যুক্তিপূর্ণ বলিয়া আমরা এ বিষয়ে পুস্তকের সহিত এক-মতাবলম্বী।

"তৃতীয়।—সমালোচনা"। এইটীর এখন বিশেষ অভাব। যত দিন "বঙ্গ-দর্শনাদি" ছিল,তত দিন পুস্তকাদির যথারীতি সমালোচনা হইত। "বঙ্গদর্শনের" অ-দর্শনের সহিত প্রকৃত সমালোচনা, একেবারে গিয়াছে বলিলেও, অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালা-ভাষায় যে সমস্ত নাটক, নভেল, কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদের দোষ ও কু-রীতি বিচার করিয়া রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়, যে এক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে অত্যল্প-সংখ্যক-মাত্র পুস্তকেরই সমালোচনা আছে। কিন্তু ডাউডেন্ ও কোল্‌রিজ্, জার্‌ভাইনাস্ প্রভৃতি সেক্ষপীয়রের পুস্তকাবলির সমালোচকদের মত এখন সমালোচক হওয়া আবশ্যক,—যাহারা সমস্ত পুস্তকের দোষ গুণ নির্ণয় করিতে পারে। কেন তেমন আদর্শ-চরিত্র নাই? "ইন্দিরায়" যে সময়ের ইতিবৃত্ত বিবৃত করিয়াছিল, সেই সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র, গ্রন্থ সমাপন করিতে পারিয়াছেন কি না? সেই সময়ের বর্ণনা করিতে করিতে, পরবর্ত্তী সময়ের কোন আভাস পড়িয়াছে কি না? রামায়ণের যে মূল অংশ লইয়া, সীতাহরণ, তাহার সহিত নাটকের কোথায়ও অন্যরূপ বিরোধ আছে কি না? যদি থাকে, তবে তাহা, ভাল হইয়াছে কি না? বঙ্কিমচন্দ্রের "প্রফুল্ল" ও গিরিশ-চন্দ্রের "প্রফুল্ল" এতদুভয় চরিত্রের কোন-রূপ সৌসাদৃশ্য আছে কি না? কোন্‌টীই বা আদর্শ-চরিত্র? এই রূপ প্রণালীতে সমালোচনা-গ্রন্থ বাহির না হইলে, বঙ্গ-সাহিত্যের প্রকৃত অভাব-মোচন হইবে না। এরূপ সমা-লোচনার সহিত নাটক বা নভেল্ না পড়িলে, বোধ হয়, নাটক-নভেলের প্রকৃত রসাস্বাদন হয় না। সেই জন্য এক এক খানি গ্রন্থের নায়ক-নায়িকা এবং অন্য অন্য পুরুষ বা স্ত্রী-চরিত্রের দোষ-গুণ-বিবরণ-সম্বলিত সমালোচনা প্রচারিত হওয়া, একান্তই আবশ্যক। আর, এই সমালোচনে প্রবৃত্ত হইলে, প্রকৃত সমালোচনাকে, কিরূপ আদর্শকে অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা তিনি বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন।

"চতুর্থ উপায়।—বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় বাঙ্গালা-ভাষার অধ্যাপনা ও আলোচনা।"

"এখন বাঙ্গালা-ভাষায় এত অধিক ও এমন উচ্চাঙ্গের পুস্তক নাই যে, তৎসমুদায় এফ্. এ, বি. এ, এম্. এ, পরীক্ষার পাঠ্য-পুস্তক-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। যে কাদম্বরী বি. এ, এবং এম্. এ, পরীক্ষার্থীর বিষম দুরূহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থী বালক, তাহা পাঠ করিয়া,

হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। যে রঘুবংশ বা ভট্টিকাব্য—এফ, এ পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক, তাহার বঙ্গানুবাদ, বোধ করি, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর বালক-দিগকে ব্যাখ্যা করিতে দিলে, তাহারা, তাহাদের বিশদ ব্যাখ্যা করিতে পারে। অগ্রে এমন এমন পুস্তক, বাঙ্গালা-ভাষায় লিখিত হউক, যাহা পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। "ফল্ অব্ দি রোমান্ এম্‌পায়ারের" ন্যায় যদি "ফল্ অব্ দি মোগল্ এম্‌পায়ার্" অথবা হিন্দু-সাম্রাজ্যের পতন-সংক্রান্ত ওরূপ বৃহদাকার পুস্তক বাহির হইলেই, যথার্থ মঙ্গল। তদ্ব্যতীত অর্থনীতির ন্যায় অন্যান্য অনেকানেক পুস্তক প্রণয়ন করা, অত্যন্তই উচিত। যদি কোন লোক, সঞ্জীবন মন্ত্রে দীক্ষিত "নবজীবনের" নবজীবন দান করেন, অথবা বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত "বান্ধব" প্রচার করেন, অথবা "বঙ্গ-দর্শনের" পুনর্দর্শন ঘটে, তবে বাঙ্গালা-ভাষার পরিপাটী বা অনেকটা অভাব মোচিত হইতে পারে। তদ্ভিন্ন গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্ বিচার, প্রাণিবৃত্তান্ত প্রভৃতি-বিষয়ক পুস্তকেরও প্রকাশ হওয়া প্রার্থনীয়। পুস্তক বিশেষের অনুবাদ দ্বারাই হউক, বা ইংরাজি, জর্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষার পুস্তক পড়িয়া, তাহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিয়া পুস্তক-সঙ্কলনই হউক, যে কোন উপায়েই হউক, নানারূপ জটিল-বিষয়-সম্বন্ধে পুস্তক প্রণীত হইলে, উচ্চ শিক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, গ্রন্থ-সমালোচনাও, অতীব প্রয়োজনীয়। সেটীও, উচ্চ শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ। সেক্ষপীয়রের একখানি নাটক পড়িতে হইলে, তিন মাস লাগে; কিন্তু পোনের দিনে বোধ হয়, পাঁচ খানা নাটক এক এক বার পড়া যাইতে পারে। তাই বলি, আমাদের বাঙ্গালা-সাহিত্য-ভাণ্ডারে এখনও ভাল ভাল পুস্তক, এত হয় নাই, যাহাতে উচ্চ শিক্ষায় এখন বাঙ্গালা চলিতে পারে।

পঞ্চম।—স্ব-জাতীয় সাহিত্যের নিমিত্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়-স্থাপনা।

যখন নর্ম্যাল্ স্কুল্ রহিয়াছে, এবং তাহাতে ত্রিবার্ষিক পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে, তখন নর্ম্যাল্ স্কুল্‌ই, স্ব-জাতীয় সাহিত্যের বিশ্ব-বিদ্যালয়-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। এক্ষণে ত্রিবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, অনেকেই, বঙ্গবিদ্যালয়ে শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। নর্ম্যাল্ স্কুলের বিদ্যা, সেই বিদ্যামন্দিরে রাখিয়া, তাঁহারা সরস্বতীর সহিত একরূপ ফারখৎ করেন। কেবল সংসারিক ব্যয়-সংকুলানের জন্য তাঁহারা লেখা-

পড়ার ফিরি করিয়া বেড়ান। আজি কালি বি-এ, এম-এ, পাশ করিয়াও যেমন শিক্ষা হয়, নর্ম্ম্যাল্ স্কুলের শিক্ষা, সেই অল্প-পাতেই, সমাহিত হইয়া থাকে। আত্মোৎকর্ষ-হেতু একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন করিতে পারিলে, এমন কি, ছাত্রাবস্থা অতিক্রান্ত করিয়া, সাংসারিক অবস্থাতে সেই অদম্য-অধ্যবসায়-সহকারে পড়িতে পারিলে, তবে নিজের উন্নতি, তবেই বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি। তাই বলি, যখন "নর্ম্ম্যাল্ স্কুল্" আছে, তখন স্ব-জাতীয় সাহিত্যের নিমিত্ত অন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা কি? তবে আবশ্যক-মত সংস্কার করা চলিতে পারে।

ষষ্ঠ।—সাহিত্য-সেবায় রাজ-গণের ও জমীদারদিগের সাহায্যদান। এটীর অত্যন্ত আবশ্যকতা। ইহারাই উপর স্ব-জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি, অনেকটা নির্ভর করে। ধনবানের সন্তানগণ, বিলাসিতায় যে টাকা নষ্ট করে, তাহার অর্দ্ধেক টাকা, স্ব-জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি-কল্পে দান করিলে, স্ব-জাতীয় ভাষা যে, কত দূর উন্নতি লাভ করিতে পারে, তাহা বলা যায় না। রাজাদের বা জমীদারগণের সাহায্য বিনা এ-দেশের লোকেরা, যদি স্বয়ং স্ব-জাতীয় ভাষার উদ্ধারের নিমিত্ত যত্নবান্ হন, তাহা হইলে সুফলের আশা করা যায়। এখানে আমরা শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্-এ, বি-এল্, মহাশয়ের (৫) নামোল্লেখ না করিয়া, নীরব থাকিতে পারি না। রাজা, জমীদার কিংবা সম্ভ্রান্ত ধনিপুত্র, উত্তম-রূপ বিদ্যা শিক্ষা পুরঃসর, নানা দেশের নানারূপ পুস্তক ক্রয় করিয়া, যদি হীরেন্দ্রনাথের মত স্ব-জাতীয় ভাষার অনুশীলনে রত হন, তবে সুফলের আশা করা যায়। দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত লোকে, লেখা পড়া শিখিয়া, সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিবারই জন্য ব্যস্ত। তাহারা দিন রাত্রি খাটিয়া কেবল জননীরই দুঃখ মোচন করিতে পারে না, তবে জন্মভূমি ভাষার মুখ চাহিবে কখন? অন্ততঃ, যদি ধনি-বৃন্দ, জমীদার-বর্গ বা রাজারা, নানারূপ পুস্তক ক্রয় পূর্ব্বক লাইব্রেরী করেন, তবে মেধাবী প্রতিবাসীরা, তৎস্থানে গিয়া স্ব-জাতীয় সাহিত্যানুশীলন করিতে পারেন। এই উপায়ে সাহিত্যের উন্নতি হইতে পারিবে বলিয়া, আমরা ইহার অনুমোদন করিতেছি।

(৫) রাজা শ্রীযুক্ত পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়, এম-এ; বি-এল; সি-আই-ই; রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ; বি-এল প্রভৃতির নামও, উল্লেখের উপযুক্ত।

দেবেন্দ্রনাথ বাবু, যে কয়েকটী উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন আমরা তিনটী উপায়ের নির্দ্দেশ করিতেছি। সেই উপায়-ত্রয় অবলম্বন করিয়া, কার্য্য করিলে, বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। সে উপায়ের নাম—'রুচি-পরিবর্ত্তন'। যত দিন না আমাদের রুচি-পরিবর্ত্তন হইবে, তত দিন শুভ ফলের ততটা আশা করা যায় না। কত ছাত্র, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে কত ইংরাজি নভেল পড়িয়াছেন! তাঁহারা, লিটন্, ডিস্‌রেলি, স্কট্ প্রভৃতির গ্রন্থের নামোল্লেখ করিতে পারেন; কিন্তু অক্ষয়কুমার বাবুর বা ঈশ্বরচন্দ্রের প্রণীত কি কি পুস্তক, তাহা বলিতে পারেন না। "মিষ্ট্রী অব্ দি কোর্ট অব্ লণ্ডনের" হিস্‌টরি (ইতিহাস) বলিতে পারেন,—রাই-হাউস্-প্লট্ কথাচ্ছলে বলিয়া দিতে পারেন; কিন্তু "মুদ্রা-রাক্ষস" বা "নাগানন্দের" মূলবিষয় বলিতে অসমর্থ। হামিয়া কে, হেলেনার সহিত লাইসাণ্ডারের কি-রূপ প্রণয়, কিংবা ওথেলো এবং ডেস্‌ডেমোনার প্রণয়ের গভীরতার পরিমাণ করিতে পারেন, কিন্তু 'মহাশ্বেতা'-ই বা কে, আর 'পুণ্ডরীক'-ই বা কে—এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেই, অনেকে নীরব হইবেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, অনেকেই, বলিবেন যে—রুচিই, ইহার প্রধান কারণ। যখন প্রবেশিকা এবং এক-এ, বা বি-এ, পরীক্ষার পূর্ব্বে ছাত্রগণ, এই সকল ইংরাজি-গ্রন্থ-পাঠ করিতে পারে, তখন বাঙ্গালা-পুস্তক পাঠ করিতে সময় পাইবেন না কেন?

রমেশচন্দ্র বাবু, যেরূপ ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইংরাজিতে লিখিয়াছেন, যদি তদপেক্ষা একখানি সুবৃহৎ ইতিবৃত্ত, বাঙ্গালায় প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে, বাঙ্গালা-ভাষার বাস্তবিক বিশেষ উপকার হইত। তাঁহার রুচি, সে বিষয়ে ছিল না বলিয়া, ভারতবর্ষের ইতিহাস, তিনি, বাঙ্গালা-ভাষায় লিখেন নাই। যদি প্রসন্নকুমার বাবু, ইংরাজি ও বাঙ্গালা উভয় ভাষা মিলাইয়া, একখানি "ন্যায়দর্শন" বাঙ্গালা-ভাষায় রচনা করিতেন, তাহা হইলে, তাহা, সাহিত্য-ভাণ্ডারের একখানি রত্ন হইত; কিন্তু এখন শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের সে রুচি নাই। আর্‌নণ্ডের রোমের ইতিহাস (History of Rome), মেকলে বা ফ্রুডের ইংলণ্ডের ইতিহাস অনুবাদ করিতে,কয় জনের প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে? এখন আমাদের স্ব-জাতীয় প্রবৃত্তির স্রোতঃ ফেরে নাই। এই স্রোতঃ, যে দিন ফিরিবে, সেই দিন হইতে স্ব-জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি হইবে,—এই প্রকার আশা হয়।

পূর্ব্বে রাজ-সভায়, এমন কি, বড় বড় জমীদারের নিকেতনেও সভা-পণ্ডিত থাকিতেন। লোকে, সেই সভা-পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত-কবিতা এবং নীতি-কথা শ্রবণ করিতেন। সেই সভা-পণ্ডিতের স্বকৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, সময়ে সময়ে পুরস্কার প্রদত্ত হইত। এখন সভা-পণ্ডিতের পরিবর্ত্তে সহচরগণ, শনৈশ্চর-গ্রহের মত কু-ফল দিয়া থাকে। নানারূপ বিলাস-দ্রব্যের পরিচয়, কোন্ থিয়েটারে কোন্ বিষয়ের অভিনয় হয়,—কোন্ দোকানের জামার ছাঁট-কাট্ অবিকল বিলাতী ধরণ ইত্যাদি-রূপ সংবাদ আনিয়া, তাহারা, ধনীর কর্ণকুহরে ধ্বনিত করে। বিদ্যার আলোচনার সেখানে সম্ভাবনা কোথায়? দ্যূতক্রীড়া, পানামোদ প্রভৃতি দ্বারা অনেক সময় অতিবাহিত হয়। আবার কখনও হয় তো সেতারের কান মলিয়া, তাহারা, দুই একটী গৎ বাজাইতে আরম্ভ করে। এখানে কাহার যেন মনে না হয়, আমরা সঙ্গীতবিদ্যাকে নিন্দা করিতেছি। যে অন্ন, জীবনধারণের প্রধান নিদান,—অতি-ভোজন করিলে, তাহাতেই পীড়া জন্মে। যে দিন, ধনীর সন্তান, বিলাসোপকরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া, স্ব-জাতীয় ভাষার অনুশীলন করিবেন এবং তদনুশীলনে সহায়তা করিবেন, সেই দিন হইতে, আমাদের স্ব-জাতীয় ভাষার উন্নতি হইবার আশা। প্রবৃত্তি, না ফিরিলে, সে আশার প্রত্যাশা কৈ? ধনীর সন্তান রবীন্দ্রনাথ বাবুর ন্যায় সকলেই, যে দিন বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা করিবেন, সেই দিন হইতেই উন্নতির সূত্রপাত হইবে।

আরও একটা অসুবিধার কথা, বলা আবশ্যক। তাহাও বলিতে বাধ্য হইলাম। উচ্চ শিক্ষায় বাঙ্গালা, প্রবর্ত্তিত হইলে, সংস্কৃত শিক্ষা, লোপ পাইবে। অন্ততঃ, শিক্ষার স্রোতঃ, মৃদু মন্দ গতিতে প্রবাহিত হইবে। যাহারা, সংস্কৃতের আবৃত্তিতে অশক্ত,—ব্যাকরণ-ভয়ে ভীত এবং সমাস বলিতেও, একেবারে রুদ্ধবাক্,—তাহারা বাঙ্গালা-সাহিত্য পাইলে, সংস্কৃত পড়িবে না। একেই তো ইতিহাস বা গণিত লইলে, সংস্কৃত লইতে হয় না। তাহার উপর, আবার বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রবর্ত্তনা! তাহা হইলে, সংস্কৃত-শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত হইবে। তাই, আমাদের বিবেচনায়, বাঙ্গালা-ভাষাকে আপাততঃ, উচ্চশ্রেণীর পাঠ্য করা, বিশেষ যুক্তি-সঙ্গত নয়! যদি রুচি, পরিবর্ত্তিত হয়,—অনেকেই, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং অলঙ্কার-শাস্ত্রের আলোচনা করে, তবেই সুফলের আশা।

"পর-পন্থানুসরণের ইচ্ছাও, আধুনিক কবি-সমাজে যার পর নাই বলবতী। যদি কোন কবি, "কেন লিখিলাম" বলিয়া কোন কবিতা রচনা করেন, তাহা হইলেই, আর একজন, "কেন লিখিলাম না?" বলিয়া, অমনই এক কবিতা রচনা করিবেন। তদ্দণ্ডেই তৃতীয় সু-কবি, "ধনি! কেন লিখিলাম না" নাম্নী তৃতীয়-কবিতা রচনা করিতে বসিবেন।" (৬)

এরূপ পর-পন্থানুসরণ, পূর্ব্বে ছিল না। যে দিন "বঙ্গদর্শনের" বেত্রাঘাত করিবার শক্তি গিয়াছে, যে দিন হইতে "বঙ্গদর্শনের" সমালোচনের ভয়, গ্রন্থকারের অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই দিন হইতে এই পর-পন্থানুসরণ বাড়িতেছে। প্রকৃত সমালোচনের পুনরারম্ভ না হইলে, এ রোগের উপশম হইবে না। আমরা, পরপন্থানুসরণকে নিন্দার বিষয় বলিয়া, ধরিতাম না—যদি এ বিষয় লইয়া, ভিন্ন ভিন্ন কবি, ভিন্ন ভিন্ন রূপে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন। এক জন কবি, যে কবিতাকে 'কালাপেড়ে কাপড়' পরাইয়া, বাহির করিলেন,—অমনই যদি আর এক জন ঢাকাই,—তৃতীয় কবি, "বোম্বাই" বা "বারাণসী" পরাইয়া, বাহির করিতে পারেন, তবেই তো গুণপনা। নতুবা, এক জন, যদি "রেলীর" যে নম্বরের 'কালাপেড়ে' পরাইলেন,—আর এক জন, সেই নম্বরেরই "লালপেড়ে" পরাইলেন! এরূপ করায়, বাস্তবিকই কুৎসিত দেখায়। ইংরাজিতে এক হার্‌মিট (Hermit)-শীর্ষক তিনটী কবিতা আছে। একের সহিত আর একটীর সাদৃশ্য নাই; অথচ প্রত্যেকেই যথেষ্ট গুণপনা। এরূপ গুণপনা থাকিলে, পর-পন্থানুসরণ, দোষের না হইয়া যশের কারণ হইবার কথা।

দেবেন্দ্রনাথ বাবু, যাহা বলিয়াছেন,—তাহাতে আমাদের বলিবার বেশী নাই। তাঁহার ভাষা, বেশ সরল—অথচ সুখপাঠ্য। মুদ্রাঙ্কণ-কালে তিনি, পুস্তক-খানিকে নির্ভুল করিবার প্রয়াসী হইয়া, বিশেষ যত্ন-সহকারে কার্য্য করিয়াছিলেন; সুতরাং তাহার সু-ফলও ফলিয়াছে। পুস্তকখানি, বাঙ্গালী-মাত্রেরই এক বার অন্ততঃ পাঠ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। আর পুস্তকের মূল্য ৵০ (দুই) আনা নির্দ্ধারিত করা, যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে।

দেখিয়া অত্যন্তই আনন্দিত হইলাম,—"কলিকাতা-বিশ্ব-বিদ্যালয়"-

(৬) ৬০ পৃষ্ঠা।

নির্ব্বাচিত ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের পাঠ্য "জেনারেল এসেম্‌ব্লি কালেজের প্রফেসর্ শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্, বাবু মহোদয়ের সঙ্কলিত "সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত" পুস্তক-খানি, আদ্যোপান্ত আমাদের স্ব-জাতীয় ভাবে পরিপূর্ণ। পুস্তকে ব্রাহ্মণগণের প্রতি অতিমাত্র সু-বিচারের ভূরি ভূরি নিদর্শন, একাধিক স্থলে, বিলক্ষণই দেদীপ্যমান। গ্রন্থটী, বিষয়াংশে যাদৃশ মনোরম—গ্রন্থান্তর্গত ভাষাও, তদনুরূপ প্রাঞ্জল ও সরল, মধুর ও মনোহর। এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের (Elphinstone's History of India) ভারতেতিবৃত্তের পর, এমন সদ্ভাব-মূলক, সুন্দর-সন্দর্ভ-পূর্ণ গ্রন্থ, অদ্যাবধি আমাদের নেত্র-গোচর হয় নাই। মুখোপাধ্যায় বাবু মহোদয়ের নিকট আমরা, এজন্য অশেষরূপে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ। আর, এক জনের নিকটও আমাদের অশেষ প্রকারে বিশেষ কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিতে বাকী আছে। সেই নামটী—বঙ্গ-বিখ্যাত ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডি-এল; এফ্-আর-এ-এস ইত্যাদি। যেহেতু, ডাক্তার সু-পণ্ডিত মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের প্রযত্নেই ঐ সুন্দর সন্দর্ভ পাঠ্য হইল।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

প্রেয়সী আমার ?

(১)

সত্য কি সত্য কি প্রিয়ে ত্যজেছ আমায় !
সত্য কি গিয়াছ তুমি কাঁদায়ে সবায় !
সত্য কি ভুলেছ তব স্নেহরত্নদ্বয়ে !
সত্য কি প্রস্থিতা তুমি ত্রিদিব আলয়ে !

(২)

সত্য যদি প্রিয়ে তুমি ত্যজিলে আমায়,
কেন তবে শূন্য প্রাণে রহিব ধরায় !
কে আর বাসিবে ভাল ভাবি আপনার,
বিপদে বন্ধুর সম কে বুঝাবে আর !

(৩)

কেমনে খুলিলে প্রিয়ে প্রণয়ের ফাঁস !
কেমনে ছিঁড়িলে প্রিয়ে মায়া-মোহ-পাশ ?
প্রমিলা ঊর্ম্মিলা তব করিছে রোদন,
এস প্রিয়ে ! কোলে করে করহে সান্ত্বন

(৪)

যদ্যপি কহিত কেহ অপ্রিয় বচন,
ক্ষোভে রোষে হ'ত তব বিষাদিত মন।
কে আর তাদের এবে করিবে যতন,
এস প্রিয়ে কোলে কর আদরের ধন !

(৫)

মনে করি ভুলে যাই ও চারুবদন,
ভুলিতে কি পারি যাতে বাঁধা প্রাণ মন !
স্মৃতি প্রীতি মনে প্রাণে গাঁথা চিরদিন,
কালে লীন না হইলে কিসে হবে লীন ?

(৬)

মনে কি পড়ে প্রেয়সী কৈশোর কাহিনী,
বহিত হৃদয়ে যবে প্রেম-প্রবাহিনী—
খেলিয়া শৈশব খেলা ফিরিতে যখন,
দৈবযোগে কত দিন হ'ত দরশন।

(৭)

আঁখিতে মিলিলে আঁখি লাজেতে তখন,
চকিতা হরিণী সম ফিরাতে নয়ন।
হাসিয়া ত্বরিত পদে করিতে পয়ান,
মনে হলে সে নয়ন ফেটে যায় প্রাণ !

(৮)

সুখে ছিলে কিছুদিন সংসার-বিপিনে,
দুদিনের সুখ প্রিয়ে গিয়াছে দুদিনে।
আর না করিব প্রেম প্রতিজ্ঞা আমার,
পার্থিব প্রণয়-সুখ সব ফক্কিকার।

(৯)

বিসর্জ্জিয়া মায়ামোহে নশ্বর সংসারে—
গুরুদত্ত কার্য্য যদি পারি করিবারে,
তবে সে পাইব প্রেম, অনন্ত অক্ষয়—
পার্থিব বন্ধন সব হইবে বিলয়।

(১০)

পাইব যে দিনে নিত্য প্রেম শান্তিজল,
সেই দিন দেহ প্রাণ হবে সুশীতল।
আর না বাচিব আমি পার্থিব প্রণয়,
অনিত্য জীবনে কভু প্রণয় না হয়।

(১১)

অনিত্য সংসার এই মায়ার বিকার—
কেহ কারু নয় জানি সকলি অসার,
সার মাত্র বিভু-প্রেম ক্ষয় নাহি যার,
সুখে দুঃখে সমভাবে আনন্দ অপার।

(১২)

জ্ঞানদীপ দূরে রাখি, অজ্ঞান আঁধারে,
কতই কেঁদেছি আমি হারায়ে তোমারে!
বিফল ক্রন্দন জানি, মিথ্যা এ সংসার,
সকলেরই ওই পথ বুঝিয়াছি সার।

(১৩)

আশা ছিল মনে মনে ও চারুবদন,
শেষ দেখা দেখে লব জনম মতন।
প্রতিবাদী পিতা তব সেই অবসরে,
সে সাধ ফুরায়ে গেছে জনমের তরে।

(১৪)

এস প্রিয়ে! লয়ে চল দেখাইয়া পথ,
অচিরে করহ প্রিয়ে পূর্ণ মনোরথ।
সহিতে পারি না তব বিরহ বেদন,
যাব তথা তুমি যথা করেছ গমন।

(১৫)

পবিত্র মধুর প্রেমে, সতীত্ব ভূষণে,
সরলতা রত্ন দিয়া গাঁথিয়া যতনে।
সাজাইয়া ছিল ধাতা হৃদয় তোমার,
হায় হায়! কোথা গেলে প্রেয়সী আমায়!

(১৬)

পাপী আমি, তাই ভাবি কি গতি আমার,
ব'লে দাও প্রাণপ্রিয়ে উপায় তাহার।
ভুগেছি অনেক ভোগ, আর সাধ নাই,
সাধ শুধু তব সনে মিলিবারে যাই!

(১৭)

জানি আমি এ সংসার মোহিত মায়ায়,
জানি আমি এ প্রণয় জলবিম্বপ্রায়।
এ প্রণয়ে সুখ নাই, দুঃখ অবিরাম,
প্রেমের পরম গুরু প্রভু আত্মারাম।

(১৮)

বুঝায়ে বলিও প্রিয়ে বিভু আত্মারামে,
মতি গতি থাকে সেই নিত্যানন্দ নামে।
প্রেমানন্দে মাতি যেন প্রেমানন্দ গানে,
পান করি শান্তিসুধা, শান্তি পাই প্রাণে।

(১৯)

বিদায়! বিদায়! না না, সে কথা কেমন,
মনে রেখ পতিব্রতা পতির বচন।
দিব্যগতি লাভ হ'ক তোমার আত্মার,
শান্তিধামে লভ শান্তি প্রেয়সী আমার!

(২০)

যে পথে গিয়াছ তুমি ছাড়িয়া আমায়,
আগু পাছু সকলেই সেই পথে যায়।
আমিও তোমার সনে মিলিব আবার,
স্বস্তি স্বস্তি, সুখে থাক প্রেয়সী আমার!

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ন-আনন্দ।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শম্ভুনাথ বাবু রবিগঞ্জের মধ্যে একজন বেশ জানিত লোক, কারণ তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ী। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার দখল কতখানি, সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত ;—ছোট লোক ও নিম্নজাতীয় মূর্খ অর্থশালী ব্যক্তিগণ তাঁহার ইংরাজী ছাঁটের কোট পেণ্টুলান, ঘড়ির চেন প্রভৃতি দেখিয়া, শম্ভু-বাবুকে বিদ্বান ও বিজ্ঞ ডাক্তার বলিয়া মান্য করিতে ত্রুটি করে না, তাহাদের বিশ্বাস, অত চটকের ভিতর খাশা মাল থাকারই সম্ভাবনা। শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা পারতপক্ষে তাঁহাকে ডাকেন না, আবার স্কুলের অজাতশ্মশ্রু বালকবৃন্দ তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা প্রচার করিয়া বেড়ায়; কেহ কেহ এমন পর্য্যন্ত বলে যে, জনক দুহিতার দেহের আবির্ভাব এবং উহার ডাক্তারী জীবনের আরম্ভ প্রায় একই প্রকার। এ কারণ তাহারা প্রকাশ্য-ভাবে উহাঁকে ভুঁইফোড় ডাক্তার বলিতে কুণ্ঠিত হয় না। কোথা হইতে তাহারা এরূপ সংবাদও সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে যে, উনি নন্দনগরে দুই তিনটা শেলাইয়ের কল বসাইয়া দর্জীর দোকান খুলিয়াছিলেন ; তাহাতে কিছু লোকসান দেওয়ার পর, রামপুরের খয়রাতী হাঁসপাতালে কয়েক মাস কম্পাউণ্ডারী কাজ করিয়াছিলেন ; তদনন্তর মাণিকদহে গিয়া এলোপ্যা-থিক চিকিৎসা আরম্ভ করেন ; তাহাতে তত সুবিধা না দেখিয়া, কিষণগড়ে গিয়া হোমিওপ্যাথিক ব্যবসায়ের দোকান পাতেন। বাস্তবিক চিকিৎসা ব্যবসায় ও চিকিৎসা বিজ্ঞান দুইটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি অন্য কোন কাজের যোগ্য নন বলিয়া সাব্যস্ত, তিনি অধমতারণ হোমিওপ্যাথিক বাক্সের আশ্রয় গ্রহণ করত দুটাকা রোজগার করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিয়া থাকেন। যে বাঁচিবার—সে বাঁচে, যে মরিবার—সে মরে, মধ্যে হইতে চিকিৎসক ভায়ার কপালে যশ ও অপযশ লাভ ;—সুপড়তা হইলে আরাম হইবার রোগীগুলির মধ্যে অনেকে তাঁহার হাতে আসিয়া পড়ে, কুপড়্তা হইলে যত খারাপ রোগী ভাগ্যে জুটিয়া থাকে। সুধু চিকিৎসাক্ষেত্রে কেন?—সংসারের সর্ব্বত্রই পড়্তার খেলা। অনেকে বলেন, দুনিয়া একটী পাশা খেলার আড্ডা, এখানে বিদ্যা-

বুদ্ধির দাম পাওয়া যায় না, যাহার দান যেমন পড়িতেছে, সে সেই ভাবে চলিতেছে ; যাহার পড়্তা ভাল, তাহার ক্রমাগত পোয়া-বারো, আর যাহার বদ্ পড়তা, সে বেচারির হাতে পাঁচ-দুই-সাতের বেশী আর পড়ে না। কোন কোন খেলওয়াড় বলেন, ফেলিবার কারদানীতে দান পড়ে, আমরা কিন্তু দেখিয়াছি, আনাড়ীর হাতেই বড় বড় দান বাহির হইয়া থাকে। যাহা হউক, শম্ভুবাবুর পড়্তাটা নেহাৎ খারাপ ছিল না, তবে এ কথাও না বলিলে চলে না যে, কখনো কোন উৎকট পীড়ায় তাঁহাকে প্রতিপত্তি লাভ করিতে দেখা বা শুনা যায় নাই। কাজেই বিশ্বাস করিতে হইবে, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিফলে তাঁহার ধনভাগ্যটা নিতান্ত দুর্ব্বল নহে।

আজ শম্ভু বাবুর একমাত্র কন্যা চপলার বিবাহ। তজ্জন্য বাড়ির কর্ত্তা হইতে চাকর চাকরাণী পর্য্যন্ত কাহারও তিলার্দ্ধ বিশ্রাম করিবার অবকাশ নাই। কর্ত্তা মহাশয় নানাবিধ প্রয়োজনে একবার বাহির, একবার ভিতর করিতেছেন। তাঁহার প্রৌঢ়া গৃহিণী মেনকা একে স্থূলতনু বশতঃ এক প্রকার অথর্ব্ব, তাহার উপর বিপুল পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া আর নড়িতে পারেন না, কাজেই একখানি মাদুর পাতিয়া, তদুপরি দেহ বিস্তার করতঃ নাক ডাকাইয়া, নিদ্রা সম্ভোগ করিতেছেন। উকীল সূর্য্যকান্ত বাবুর স্ত্রী হৈমবতী অন্তঃপুরে নিমন্ত্রিতাগণের অভ্যর্থনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি আগন্তুক ভদ্রমহিলাগণকে সাদর সম্ভাষণে প্রীত করিয়া যথোপযুক্ত স্থানে বসাইতে ব্যস্ত। তাঁহার কন্যা সরলা সকলকে সুগন্ধী-দ্রব্য ও পুষ্পাদি দ্বারা সম্মানিত করিতেছেন।

নিমন্ত্রিতাগণ ক্রমে আপনাপন সমবয়স্কা বাছিয়া লইয়া এক এক দলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান আশ্রয় করিলেন। ঐ সকল দলে আবার অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মজলিস্ বসিল ; কারণ যাঁহাদের কর্ত্তারা বেশী টাকা রোজগার করেন, তাঁহারা গরিব কেরাণী প্রভৃতির পরিবারের সঙ্গে কি প্রকারে মিশিবেন? বরং কোন দিন নূতন কোন প্রাকৃতিক নিয়মে জলে তেলে মিশিতে পারে, কিন্তু এ পৃথিবী ধনী দরিদ্রে সম্মিলন কোন কালেই সম্ভব হইবার নহে। টাকার গরম বাবুদের অপেক্ষা বাবুনীদের বড় কম নয়। উচ্চ শ্রেণীর এক মজলিসে জনৈক ডিপুটী-গৃহিণী সগর্ব্বে গল্প করিতেছেন,—"আমরা যখন তাজপুর মহকুমায় ছিলাম, সেখানকার কোন উকীলের বাড়ী হইতে আমার নিকট যাত্রা শুনিতে যাইবার নিমন্ত্রণ আইসে। আমি

শুনিবামাত্র নিমন্ত্রণ ফিরাইয়া দিলাম, বলিলাম, "মাগো! আমি সেখানে গিয়া মোক্তার কেরাণী প্রভৃতির বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে একত্রে কি প্রকারে বসিব! কেমন ভাই! ঠিক করিয়াছিলাম কি না?"

অমনি মুন্সেফবাবুর স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন,—বটেই ত, তাদের স্পর্দ্ধাও ত কম নয়! নিম্ন শ্রেণীর দলগুলিতে কেবলই দুঃখের কাহিনী, ছেলে পিলে লইয়া দারুণ অনাটন, সংসারে তিলমাত্র সুখ নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

উক্ত প্রকারে কিছুক্ষণ সময় ক্ষেপনান্তে একদল যুবতী একরাশি পান লইয়া সাজিতে বসিলেন। তাহার সঙ্গে মৃদুমন্দভাবে হাস্যামোদ চলিতে লাগিল, মাঝে মাঝে দুই একটা গানের সুরও শুনা গেল। কতকগুলি রমণী চপলাকে সাজাইতে নিযুক্ত হইলেন। কেহ কেহ বা মাছ তরকারি কুটিতে বসিলেন। কেহ আল্‌পনা, কেহ বাসর সজ্জা, কেহ ভাঁড়ার প্রভৃতির ভার লইয়া মজলিস্ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। বাকী নিষ্কর্ম্মাগুলি তাল পাকাইয়া নিজের নিজের প্রতিষ্ঠা এবং শাশুড়ী ননদ প্রভৃতির নিন্দা লইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এই প্রকার নানাবিধ কার্য্যে অকার্য্যে দিন প্রায় শেষ হইয়া আসিল। সন্ধ্যা সমাগমে ক্ষুদ্র বৃহৎ দীপাবলীতে শম্ভুবাবুর বাটী ইন্দ্রপুরী তুল্য শোভাময় হইল। বর-সভায় ক্রমে ক্রমে নিমন্ত্রিত পুরুষগণ আসিয়া সমবেত হইলেন। তথায় পান তামাক ও নানাবিধ সাময়িক গল্পের শ্রাদ্ধ চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নানা সাজে সজ্জিত বরযাত্রীগণ সমভিব্যাহারে ইংরাজী বাদ্যের সুর-তান-লয়ের হিল্লোল মধ্যে শিবিকারোহণে বর আসিয়া সভার শোভাবর্দ্ধন করতঃ যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন। তখন সকলের একমাত্র লক্ষ্য আগত বর ভায়া, বাহির ও ভিতরের সবাই তাঁহাকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব।

বর-সভায় উভয় পক্ষীয় বালকগণের নানাবিধ প্রশ্নোত্তর ও কথা কাটাকাটির মধ্যে একটী গ্রাম্যবালক প্রত্যুৎপন্নমতির পরিচয় দ্বারা সকলকে খুব হাসাইয়াছিল। বালকটীর নাম নীরোদ। বাগ্বাজারের বোস্‌পাড়ার কয়েকটী দুরন্ত বালক বরপক্ষে উপস্থিত ছিল; তন্মধ্যে বরেন্দ্র নামক ছোক্‌রা প্রচণ্ড বখাট। নীরোদ একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া আছে দেখিয়া, বরেন তাহাকে আক্রমণ করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি হে ভাই?"

নীরোদ। আমার নাম শ্রীনীরোদনাথ রায়।

বরেন্দ্র। নিবাস?

নীরোদ। হরিপাল।

বরেন্দ্র। (স্বদলস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া) দেখ, ছোক্‌রা কি আহাম্মক! কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি এত বড় বড় জায়গা থাকিতে নিবাস বলিল কি না, হরিপাল, যাহার নাম কেহ কখন শুনে নাই।

নীরোদ। (কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া অতি বিনীত ভাবে) মহাশয়ের নাম?

বরেন্দ্র। শ্রীবরেন্দ্রনাথ দাস বসু।

নীরোদ। পিতার নাম?

বরেন্দ্র। ৺ খেলারাম দাস বসু।

নীরোদ। মহাশয়! ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, হীরালাল শীল, শ্যামাচরণ মল্লিক, খেলাৎ ঘোষ প্রভৃতি ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সর্ব্বজনপরিচিত নাম থাকিতে খেলারাম নামটা কি ভাল শুনায়?

এইবার কন্যাপক্ষীয় বালকগণ স্বদলের জয় দেখিয়া বাহবা দিয়া হাসিয়া উঠিল। উভয় পক্ষের অনেক যুবা, বৃদ্ধকেও নীরদের তীক্ষ্ণবুদ্ধির বিশেষ প্রশংসা করিতে হইল।

পরে যথাসময়ে শুভলগ্নে কন্যা সম্প্রদানান্তে বাসরগৃহে কুল-ললনাগণ যে সকল লীলা করিলেন, তাহার বর্ণনা দ্বারা সুরুচিসম্পন্ন পাঠক-পাঠিকার চিত্তে বিপর্য্যয় আনিতে ইচ্ছা করি না। সংক্ষেপে এইমাত্র বক্তব্য যে, বাসর আমাদের দেশের একটা প্রাচীন অনুষ্ঠান হইলেও বর্ত্তমান যুগে যেন একটু ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ইহার কারণ আধুনিক রমণীগণের শাণিত প্রখর নবেল-পড়া পাকা বুদ্ধি। ওরূপ বুদ্ধি ভাল দিকে নিযুক্ত হইলে যেমন শুভফল প্রদান করতঃ সকলের চিত্ত হরণ করে, মন্দদিকে ধাবিত হইলে তেমনি বিষময় ফল প্রসব দ্বারা সমাজে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করিয়া থাকে। অন্তঃপুরনিবদ্ধা অবলাগণকে সময়ে সময়ে এ প্রকারের অবকাশ দিবার পক্ষ সমর্থনকারী মহোদয়গণ এবম্বিধ যুক্তি দেখাইতে পারেন যে, সব দিক বন্ধ করিয়া চাপ দিলে নৈসর্গিক নিয়মে ফাটিয়া বাহির হইবার সম্ভাবনা; তাই একদিকে একটু ছিদ্র রাখিয়া চলা

নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু এস্থলে আর একটী নৈসর্গিক নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখাও কর্ত্তব্য। প্রকৃতির ইহাও একটী দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম যে, সদ্বৎসর পিঞ্জরাবদ্ধ রাখিয়া, একদিন ছুটি দিলে প্রতিক্রিয়াফলে একটা বিভ্রাট অনিবার্য্য। বাসর ঐরূপ প্রতিক্রিয়া-প্রসূত স্বেচ্ছাচারিতার একটী প্রশস্ত লীলাক্ষেত্র, ওখানে অনেক সময় বিষম অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে। বাঁধা গোরু হঠাৎ রজ্জুমুক্ত হইলে যে প্রকার উদ্দাম নৃত্য করিতে করিতে চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায়, বাসরে কি তাহাই ঘটে না? অবশ্য সর্ব্বত্রই যে সমান ভাবে অত্যাচার হইয়া থাকে, ইহা বলা যায় না; উত্তমাধম মধ্যম সকল বিষয়েই দেখা যায়। [ক্রমশঃ]

শ্রীমতী সেন গৃহিণী।

"মাহিষ্য" শব্দ।

(প্রথম প্রস্তাব)

বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার তীব্রাদপি তীব্র আলোক বিকীর্ণ হইবার পূর্ব্বে অথবা ইউরোপীয় ভাষা, সাহিত্য বা বিজ্ঞান আলোচনার পথ প্রশস্ত হইবার পূর্ব্বে, বাঙ্গালী জাতি, রাজনৈতিক, সামাজিক কিম্বা ঐতিহাসিক আন্দোলনে প্রকৃষ্টরূপে প্রবৃত্ত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান সময়ে আমরা যাহাকে "আন্দোলন" বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকি, সার্দ্ধ দুইশতবর্ষকাল পূর্ব্বে এরূপ আন্দোলন এ দেশে ছিল না বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বৃটিস শাসনের অগ্রবর্ত্তী কালে সময়ে সময়ে যে প্রকারের আন্দোলনে বঙ্গদেশবাসী জনগণের চিত্ত আকৃষ্ট হইত, তাহার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য এখনকার কালের আন্দোলন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। সে সময়ে যদি কেহ অভক্ষ্য ভক্ষণ, অপাত্রে গমন, চিরাগত সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে কথোপকথন কিম্বা অশাস্ত্রীয় ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিত, তাহা হইলে পল্লীগ্রামবাসী লোকেরা তাহাকে "পতিত" বা "সমাজচ্যুত" করিবার জন্য যে আন্দোলনের সৃষ্টি করিত, তাহা "দলাদলি" নামে প্রখ্যাত হইয়া স্থান বিশেষে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিত; তৎসাময়িক আন্দোলনের প্রভাব বা উত্তেজনা বহুদূর দেশ পর্য্যন্ত প্রকীর্ণ বা প্রসারিত হইতে পারিত না।

এখনও এতাদৃশ আন্দোলন একেবারে বন্ধ হইয়া যায় নাই বটে, কিন্তু বর্ত্তমান কালেও এইরূপ "দলাদলি" সীমাবদ্ধ ভাবেই অবস্থান করিয়া থাকে। বিদ্যোৎসাহী বিদেশীয় বিজ্ঞবরদিগের কর্ত্তৃক ভারতের পুরাতত্ত্ব আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে, এতদ্দেশীয় শিক্ষিত পুরুষবৃন্দ স্বদেশ ও স্বজাতির প্রাচীন মহিমা ও প্রাচীন গৌরব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া, প্রত্নতত্ত্বের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে শিক্ষা করেন। ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি বর্ণাশ্রমী যাবতীয় ব্যক্তিবৃন্দ স্ব স্ব জাতির প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন জন্য উৎসাহী হইয়া, জাতি তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। এই প্রকার আলোচনা ও আন্দোলনের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান পথ-প্রদর্শকের নাম রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, কে, সি, এস, আই। কলিকাতা শোভাবাজারের রাজবংশধুরন্ধর রাজা রাধাকান্ত দেবের পূর্ব্বে এতাদৃশ বিশিষ্ট আন্দোলন বঙ্গদেশে আর কখন হয় নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ইনি কায়স্থ জাতিকে "ক্ষত্রিয়" এবং "উপবীত গ্রহণের উপযুক্ত" বলিয়া প্রতিপন্ন করতঃ এক প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করেন। যদিও ঐ আন্দোলন-কর্ত্তা সম্পূর্ণরূপে কৃতকারীতা লাভ করিতে পারেন নাই, তথাপি ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, এবম্প্রকার জাতি তত্ত্বের আলোচনা ও আন্দোলনের পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক তিনি যে জাতীয় মহত্ত্বের প্রখর হুতাশন প্রজ্জ্বলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার উষ্ণত্ব ও উদ্দীপনা অন্যান্য জাতির হৃদয়কে আকৃষ্ট এবং সমাজের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ না করিয়া থাকিতে পারে নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাজাবাহাদুরের প্রজ্জ্বলিত আন্দোলনাগ্নি নির্ব্বাপিত না হইতে হইতে, এতদ্দেশীয় "যুগী" নামক দরিদ্র, অশিক্ষিত ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী জাতি বিশেষ, পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে নানাস্থানে সমবেত হইয়া, এক অসাধারণ আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল, ঐ আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গে বঙ্গের সমগ্র যুগী জাতি আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে স্বজাতীয় ব্যক্তিবৃন্দকে "যোগভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ (যোগী) বলিয়া প্রতিপন্ন করতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উপবীত ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; ইহাদেরও আন্দোলন জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী এবং আকাশে সরোবর খননের ন্যায় নিষ্ফল হইয়াছিল বটে, কিন্তু এরূপ আন্দোলনে প্রত্নতত্ত্বালোচনার পথ ক্রমশঃ প্রশস্ত হইয়া উঠে, ইহা নিশ্চয় কথা!

যুগী জাতির পরে, বঙ্গদেশবাসী হালিক কৈবর্ত্তেরা স্বজাতির বৈশ্যত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য এক আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। রাজসাহী জেলা হইতে সর্ব্ব প্রথমে এই আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। কৈবর্ত্তকুল তাহাদের এই প্রথম সাময়িক অন্দোলনে কৃতকারিতা লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া, ভগ্নহৃদয়ে আন্দোলনের হুতাশন কুণ্ডে নিরাশার শীতল সলিল প্রক্ষেপ করিয়া, বহ্নিকে নির্ব্বাণ করিয়াছেন। এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে সকল ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সোম প্রকাশের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পণ্ডিত দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম নেতা ছিলেন। আমিও এক সময় পণ্ডিত দ্বারিকানাথের সহিত প্রবলতর রূপে যোগ দিয়া, কৈবর্ত্তকুলের বৈশ্যত্ব প্রতিপাদক বিষয় সম্বন্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, যতদিন পর্য্যন্ত আমার মনোমধ্যে এইরূপ ধারণা ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত আমি বঙ্গের কৈবর্ত্তদিগকে বৈশ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে স্বীকৃত হই নাই, কিন্তু নানা শাস্ত্রের আলোচনা, নানা প্রকারের অনুসন্ধান এবং কৈবর্ত্ত জাতির ইতিবৃত্ত আদ্যন্ত পাঠ করিয়া, "হালিক কৈবর্ত্ত"কুলকে যখন বৈশ্য বলিয়া স্থির করিলাম, তখন হইতে আমি সত্যের প্রচার এবং পূর্ব্ব ভ্রমের অপনোদন করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। বাঙ্গালার কৈবর্ত্তেরা হালিক ও জালিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, তন্মধ্যে জালিক কৈবর্ত্তেরা অনার্য্য এবং শূদ্র, কিন্তু হালিক কৈবর্ত্তেরা ধর্ম্মতঃ আর্য্য, জন্মতঃ বৈশ্য এবং কর্ম্মত মাহিষ্য; ইহারা বৈশ্যবর্ণ বলিয়া ইহাদের জল আচরণীয় এবং শাস্ত্রতঃ শুদ্ধ।

কয়েক বৎসর হইতে আমি বঙ্গদেশের হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী জনগণের জাতি-তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, গোপ, সদ্গোপ, উগ্র ক্ষত্রিয়, তিলী, তামলী, সুবর্ণ বণিক, গন্ধ বণিক প্রভৃতি জাতির প্রাচীন ও আধুনিক ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে করিতে এতদ্দেশের হিন্দুসমাজ সংগঠনের ইতিহাস এবং সমাজ সংস্করণের উপায় বিষয়ে সুন্দররূপে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। যাহা হউক, বঙ্গদেশের হালিক কৈবর্ত্তদিগের বৈশ্যত্ব এবং "মাহিষ্য" উপাধি ধারণের সারত্ব প্রতিপন্ন করিয়া, সম্প্রতি "মাহিষ্যসিদ্ধান্ত" নামে আমি যে ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করিয়াছিলাম, বহু সংখ্যক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজি ও বাঙ্গালা সংবাদ পত্র এবং মাসিক পত্রে, আমার অনুকূল মতে, এই পুস্তকের আশাতীত সমালোচনা পাঠ

করিয়া, বিশেষতঃ "মাহিষ্য সিদ্ধান্তের" আদ্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে বহুল সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রলোক আমাকে "মাহিষ্য" শব্দ সম্বন্ধে কয়েক প্রকার কৌতুকাবহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। এই সকল ভূরি ভূরি পত্রের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিতে হইলে, লেখকের বৃহস্পতি মুনির ন্যায় দীর্ঘজীবন লাভ করা আবশ্যক। আমি সাহিত্য সম্বন্ধীয় নানা প্রকার কার্য্যে সদত নিযুক্ত থাকি, সুতরাং প্রশ্নকর্ত্তা মহাশয়দিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে উত্তর দিবার অবকাশ না পাইয়া, "জন্মভূমি" নাম্নী প্রখ্যাতা মাসিক পত্রিকায় এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। প্রশ্নকর্ত্তা মহাশয়দিগের প্রধান প্রশ্ন এই;—

"মাহিষ্য" শব্দ বৈশ্যত্ব প্রতিপাদক হইতে পারে; হালিক কৈবর্ত্তেরাও বৈশ্য হইতে পারেন; কিন্তু হালিক কৈবর্ত্তগণ বৈশ্য এবং মাহিষ্যগণ বৈশ্য বলিয়া, আর্য্য কৈবর্ত্তেরা মাহিষ্য হইবে কেন? মাহিষ্য জাতি কি স্বতন্ত্র বৈশ্য জাতি নহে? প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে কোথাও কি হালিক কৈবর্ত্ত-কুলকে মাহিষ্য লেখা হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে হালিক কৈবর্ত্তের পক্ষে মাহিষ্য উপাধি গ্রহণ করা অথবা মাহিষ্য জাতি ও কৈবর্ত্ত জাতিকে এক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা অন্যায় নহে কি? হালিক কৈবর্ত্তের অপর নাম যে মাহিষ্য, তাহার প্রমাণ কোথায়?" ইত্যাদি।

ইহার উত্তরে প্রথমেই বলিয়া রাখা উচিত, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে এবং সংস্কৃত সাহিত্যে অসংখ্য স্থানে কৈবর্ত্ত এবং মাহিষ্য এই উভয় শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। বঙ্গের হালিক কৈবর্ত্তেরা যে মাহিষ্য অর্থাৎ মাহিষ্য জাতি যে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে কৈবর্ত্ত জাতির নামান্তর মাত্র, তাহারও প্রকৃষ্ট প্রমাণের অভাব নাই। প্রথম প্রমাণ এই;—

"শব্দকল্পদ্রুম" নামক জগদ্বিখ্যাত সংস্কৃতাভিধানে পণ্ডিত কমলাকর ভট্টের "বর্ণাশ্রম বিচার সিন্ধু" নামধেয় প্রাচীন গ্রন্থ হইতে, মাহিষ্য জাতির জীবিকা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

ব্যবসায়ঃ শিল্পকর্ম্মঃ তজ্জীবন মুদাহৃতং।
লিপীনাং দেশজাতানাং লেখনং স সমাচরেৎ॥

কমলাকর ভট্ট তাঁহার বর্ণাশ্রম বিচার সিন্ধু গ্রন্থে মাহিষ্য জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—

"ক্ষত্রাদ্বৈশ্যায়াং মাহিষ্যা"।

কমলাকর ভট্ট অমর-কোষ প্রণেতার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। অমরকোষ-কার মাহিষ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

"ক্ষত্রিয়া বৈশ্যায়াং জাতঃ।"

(অমর-কোষ)

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অমরকোষ নামক সুপ্রসিদ্ধ অভিধান সর্ব্ব-প্রথমে ইউরোপের জর্ম্মনী ভাষায় আচার্য্য বুলহর্ কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। অনেক ভাষার অনেক শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া পণ্ডিত প্রবর কুলহর্ সাহেব অমর কোষের ব্যাখ্যা (Coumentary) সমাপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি "মাহিষ্য" শব্দের ব্যাখ্যায় সুস্পষ্ট ভাবে লিখিয়াছেন,—"বঙ্গদেশের উচ্চ শ্রেণীর আর্য্য (হালিক) কৈবর্ত্তের এবং প্রাচীন মাহিষ্য জাতি একই বর্ণভুক্ত, গৌড়দেশে মাহিষ্য শব্দ অপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু আর্য্য কৈবর্ত্তেরাই প্রাচীন মাহিষ্যের বংশধর।" বুল্হর সাহেবের এই কথা যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহারা বলেন ক এবং খ উভয়ে বৈশ্যবর্ণভুক্ত হইলেও, ক এবং খ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি, তাঁহাদের ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, পৃথিবীর সর্ব্ব পুরাতন বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রেও কৈবর্ত্ত শব্দের উল্লেখ আছে। ("মাহিষ্যসিদ্ধান্ত" পুস্তকে কৈবর্ত্ত জাতির উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে বিচার দেখুন।) কৈবর্ত্ত এবং মাহিষ্য এতদুভয় শব্দই অতি প্রাচীন। বল্লাল সেনের সময় হইতে মাহিষ্য শব্দ নানা কারণে অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে "মাহিষ্য জাতি" নামক প্রাচীন জাতি বিশেষের অপ্রচলন থাকিলেও কৈবর্ত্ত জাতির উৎপত্তি, বংশ, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি দ্বারা বুল্হর্ সাহেবের সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ সমীচীন বলিয়া বিশ্বাস করা যায়। শ্রীমৎ মনু মহারাজার জগদ্বিখ্যাত সংহিতাখানি পাঠ করিয়া দেখিলে ইহার অনুকূলে আরও গুরুতর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনু মহারাজা লিখিয়াছেন ;—

"প্রচ্ছন্না বা প্রকাশ্যা বা বেদিতব্যা সকর্ম্মভিঃ।"

(মনু সংহিতা। ১০অ। ৪০ শ্লোক)

অর্থাৎ, প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন জাতি কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞেয়। এস্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, প্রচ্ছন্ন মাহিষ্য জাতির কৈবর্ত্তেরাই প্রকাশ্য বংশধর।

দ্বিতীয় প্রমাণ।—রাঢ় দেশে (অর্থাৎ বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর,

বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে) দুইশত অথবা ততোধিক বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণাধ্যাপকদিগের স্বহস্ত লিখিত জন্মকোষ্ঠি সমূহে কৈবর্ত্তদিগকে মাহিষ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সে সময়কার বহু সংখ্যক হালিক কৈবর্ত্তের কোষ্ঠিতে সুস্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে,—

"অমুক পরগণার, অমুক মৌজার, শ্রীমান্ অমুক (শরচ্চন্দ্র দাস) মাহিষ্যের প্রথম পুত্র শ্রীমান্ অমুক (বিনোদ বিহারী দাস) মাহিষ্যের জন্মকোষ্ঠি" ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুতরাং অতি প্রাচীনকাল হইতে হালিক কৈবর্ত্তগণ মাহিষ্য বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তমোলুক, ময়না, তুর্কা প্রভৃতি অতি প্রাচীন হালিক কৈবর্ত্ত-রাজবংশে এখনও বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অশৌচ প্রভৃতি মাহিষ্যজনোচিত হইয়া থাকে। ছোটনাগপুর অঞ্চলে অতি পুরাতন কাল হইতে মাহিষ্য শব্দ প্রচলিত আছে, ইহা তথায় কৈবর্ত্তদিগের প্রতিশব্দ। সপ্তভূম অঞ্চলে কৈবর্ত্তবংশ মাহিষ্যবংশ বলিয়া প্রখ্যাত। [ক্রমশঃ]

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

জয়ন্তী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বলা বাহুল্য, যবনের সহিত রাজপুতের সন্ধি হইল। সফিখাঁ পদ্মরাওকে দুর্গাদাসের করে সমর্পণ করিলেন। জয়ন্তী তাহাকে লইয়া গিয়া, এক তোড়া সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া বলিল, "মন্ত্রী মহাশয়, সকল বিস্মৃত হউন। আমিও সকল ভুলিব। এখন এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন। আমার পরিচয় জানিলে রাজপুত আপনার অনিষ্ট করিবে।"

এরূপ ব্যবহারে অন্যে কি করিত জানি না, কিন্তু মন্ত্রী আপনাকে ঘোরতর অপমানিত জ্ঞান করিল। মৌনভাবে সে স্থান হইতে বিদায় হইয়া আবার সফিখাঁর নিকট গমন করিল। এবার সফি খাঁ তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিলেন। ক্রোধ-বিকম্পিত স্বরে বলিলেন, "পাপিষ্ঠ, তোর জন্য

একবার যুদ্ধে প্রাণ হারাইতে ছিলাম, আবার তুই আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছিস্?”

মন্ত্রী জয়ন্তীর নিকট ক্ষমা পাইয়াছিল, কিন্তু যে খল, ঈশ্বর তাহাকে ক্ষমা করেন না। মন্ত্রী ক্ষমা পাইল না।

জয়ন্তী আবদুলকেও বিদায় করিল। আবদুল দিল্লী চলিয়া গেল।

তারপর জয়ন্তী আপনার পরিচয় দিল। সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়া শুনিতে লাগিল। জয়ন্তী বলিল;—

“আপনারা দেখিতেছেন, আমি বনবাসিনী কিন্তু একদিন আমি বনবাসিনী ছিলাম না। সম্ভ্রান্ত রাজপুতের আদরিণী কন্যা ছিলাম। মারবারের রাণী হইব বলিয়া অহঙ্কার করিতাম।”

কথা শুনিয়া শ্রোতৃবর্ণ চমকিয়া উঠিল। সকলেই তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না।

জয়ন্তী বলিতে লাগিল, “বোধ হয় আমি রাণী হইতাম। কিন্তু এক পাপিষ্ঠ ইহাতে বাদ সাধিল। ঐ যে কুলাঙ্গার মন্ত্রী আপনাদের সর্ব্বনাশ করিতেছিল—যে বীরবর দুর্গাদাসকে বিষ প্রয়োগ করিতে চাহিয়া ছিল, মহারাজের সর্ব্বনাশ করিতেছিল—সেই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। অনর্থক পিতার নামে দোষ বর্ত্তাইয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। আমি রাজরাণী না হইয়া বনবাসিনী হইয়াছি।”

জয়ন্তীর কথা শুনিয়া—সকলে সন্দিহান হইল। মনে কি একটা সন্দেহ আসিল। আরও শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠা বাড়িল।

অজিত সিংহের মনে বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। মনে সন্দেহ বাড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আশা বাড়িতে লাগিল। ভাবিলেন, “অজিত সিংহের কি এত সৌভাগ্য হইবে যে, তুমি মারবারের রাণী হইবে?”

আবার নিরাশায় হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি দ্রুত যাইয়া জয়ন্তীর হাতে ধরিয়া বলিলেন, “জয়ন্তী, তুমি বনবাসিনী নহ। মারবারের রাজসিংহাসনও তোমার উপযুক্ত নহে। তুমি স্বর্গীয় বালা—বৈজয়ন্তীধামই তোমার উপযুক্ত আবাস, শীঘ্র বল তুমি কে?”

তখন জয়ন্তীর চক্ষে জল বহিল। অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিল, “মহারাজ, আমি স্বর্গীয় অনন্ত সিংহের একমাত্র হতভাগিনী কন্যা। পিতৃশত্রুর শাস্তি বিধানার্থ আপনার শরণ লইয়াছিলাম।”

যাহা শুনিবার বাকি ছিল, তাহা শুনা হইল। তখন সেই রাজপুতগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। দুর্গাদাস সস্নেহে জয়ন্তীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বলিতে হইবে কি, জয়ন্তী মারবারের রাণী হইল?

সমাপ্ত।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পাল।

কাহার অর্থ—সার্থক?

(কে—সুধন্য?)

পরিধান জীর্ণ বস্ত্র মলিন বদন,
জ্বলিছে জঠরানল ঝরিছে নয়ন,
অনাহারে রোগে দুখে জীর্ণ কলেবর
মর্ম্মভেদী সূক্ষ্ম স্বরে ভিক্ষায় কাতর,
হেন অন্ধ খঞ্জগণ করে যে পালন,
তাহারি প্রকৃত অর্থ ধন্য সেই জন। ১।
পরিগত পরিজন অনাথ পীড়ায়
আকুল পরাণে ভাসে নয়ন-ধারায়,
অবিরত শয্যাগত একাকী ভবনে
ভাবিছে সত্বর মৃত্যু হইবে কেমনে,
হেন জন নেত্রনীর করে যে মোচন
তাহারি যথার্থ অর্থ ধন্য সেই জন। ২।
অকালে শৈশবকালে পিতামাতা যার
কঠিন কালের বশে ত্যজিল সংসার,
ভ্রাতা নাই বন্ধু নাই করিতে যতন
সহায় সম্পদহীন বিষণ্ণ বদন,
কাতর নয়নদ্বয় তৈলহীনশির
অতি রুগ্ন অন্ন বিনা দুর্ব্বল শরীর।
হেন শিশু পুত্রবৎ করে যে পালন
তাহারি সার্থক অর্থ ধন্য সেইজন। ৩।
উপযুক্ত পুত্র মাত্র করিয়া সহায়
দরিদ্রা জননী ভুলি দুঃখ সমুদায়,

আছিল যাহার মুখ করি নিরীক্ষণ
সঞ্চিত ধনের পাশে কৃপণা যেমন,
হা ধিক বলিতে কথা বিদরে হৃদয়
যবে কাল হেন পুত্র তার কাড়ি লয়,
যে পারে হইতে তার সন্তান যেমন
তাহারি যথার্থ অর্থ ধন্য সেইজন। ৪।
অকালেতে কাল বাহু হইয়া প্রকাশ
নয়নের চাঁদ যার করেছে গরাস,
চাতকী রমণী চাহি পতি সুধাকর
সংসার গগনে হেরে তম ঘোরতর,
আঁধারে বিরলে বসি ভাবে দিবা নিশি
আর কি উদিবে তার সুখময় শশী।
হেঁটমুখে ক্রোড়স্থিত শিশুর বদন
নিরখি নয়ন জলে ভিজায় বসন,
সহায় সম্পদহীন তিনকুলে তার
নাহি হেন জন যাহে বলিবে আমার,
যে পারে হইতে তার সোদর যেমন
তাহারই যথার্থ অর্থ ধন্য সেইজন। ৫।
অধীরা সুশীলা বালা সংসার-কাননে
দ্বাবানল-সম দগ্ধ অদৃষ্ট-পীড়নে,
আকুল কাতর প্রাণে ভাবে নিরন্তর
কোথা' যা'ব কে পূরাবে তাহার উদর,
বিবর্ণ শরীর কান্তি মলিন বদন
ঊষা-কোলে শশিকলা মলিনা যেমন।
অকূল সাগরে ভগ্ন-তরণীর প্রায়
শোক তাপ ভয়ে যার দিনরাতি যায়,
যে পারে হইতে তার পিতার মতন
সার্থক তাহার(ই) অর্থ ধন্য সেই জন। ৬।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

লর্ড কিচেনার।

উপরে যাঁহার মূর্ত্তি দেওয়া হইল, তাঁহার নাম লর্ড কিচেনার। এই ভাগ্যবান্ পুরুষ ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়া গত নবেম্বর মাসে ভারতে আগমন করিয়াছেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বর্ম্মিংহাম নগরে ইহাঁর জন্ম হয়, ইহাঁর বয়ঃক্রম এক্ষণে ৫৩ বৎসর, ইহাঁর পিতার নাম লেপ্টনেণ্ট কর্ণেল কিচেনার।

মাননীয় কিচেনার প্রথমে ইঞ্জিনিয়ারী পরীক্ষা দিয়া, কিছুদিন জরিপী কার্য্যে ও স্থপতি কার্য্যে প্রতিপত্তি লাভ করেন। সামরিক বিদ্যায় তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় আফ্রিকাখণ্ডে। সুদানের যুদ্ধে শান্তি স্থাপন করিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের প্রশংসাভাজন হন। এই সময় তিনি পুরস্কার লাভ করিয়া স্বর্গীয়া মহারাণীর একজন এডিকং হইয়াছিলেন। অতঃপর দক্ষিণ আফ্রেরিকার বুয়ার যুদ্ধের সূত্রপাত। সমরবিশারদ্' কতিপয় বৃটিশ সেনাপতির পতন ও পরাভবের পর লর্ড রবার্টের সহকারী হইয়া বীরবর কিচেনার ট্রান্সভাল যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহুকষ্টের পর বুয়ার যুদ্ধের ভীমানল নির্ব্বাপিত হইলে সেনাপতি কিচেনার লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লর্ড কিচেনার বুয়ার যুদ্ধে যে প্রকার বীরত্ব দেখাইয়াছেন, দেশবিদেশীয় সংবাদপত্র পাঠকেরা তাহা বোধ হয়, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত আছেন।

বিলাতের লোকেরা বলিতেছেন, লর্ড কিচেনার বুয়ারদিগের প্রতি কিছুমাত্র দুর্ব্ব্যবহার করেন নাই, ঘোরতর বৈরী হইয়াও দুর্জ্জয় বুয়ারেরা তাঁহার ব্যবহারের প্রশংসা করিয়াছে, এখনও করিতেছে। ইহা লর্ড কিচেনারের ক্ষমতার ও ভাগ্যের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। বুয়ার সমারানলে শান্তিসলিল বর্ষিত হইবার পর, দশমুখে, শতমুখে, সহস্র মুখে এই বীর-পুরুষের বিপুল সুখ্যাতিবাক্য বিঘোষিত হইতেছে। লোকে এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "বুয়ার রণবিজয়ী লর্ড কিচেনারের এত গুণের পুরস্কার কি হইল? পুরস্কার উত্তম হইয়াছে। রাজকোষ হইতে ৭৷৷০ সাড়ে সাত লক্ষ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়া তিনি ভারতবর্ষের মহামান্য কমাণ্ডার-ইনচিপ্ (সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি) হইয়া আসিয়াছেন। আমরা তাঁহার পদগৌরবের সুসমাচারে আনন্দিত হইয়াছি।

ভারতের এখন চারিদিকে শান্তি বিরাজ করিতেছে। করিতেছে বটে, তথাপি বিবিধ বৈদেশিক সমরে বিশেষত সীমান্ত বিভ্রাটে ভারতের প্রধান সেনাপতিকে আদৌ বিব্রত থাকিতে হয় না, অভিজ্ঞ লোকমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, এমন কথা কখনই আমরা বলিতে পারি না। ভারতের প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব অনেক। অনেক বৈদেশীক সংগ্রামে ভারতবর্ষের গাত্রে আঘাত লাগে। লর্ড কিচেনার যদি আপন দায়িত্ব পালন করিয়া সেই সকল আঘাত হইতে ভারতকে মুক্ত রাখিয়া ভারতে শান্তি স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের বাসকীও সহস্রবদনে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

অভিষেকোৎসবে!

(১)

আজি এ ভারত কেনরে আবার,
ভুলিয়ে যাতনা দৈন্য হাহাকার,
এলোকেশ কত বিনাইয়া তার,
গাত্র-ধূলি কত মুছিয়া বা আর,
এ হেন ধরণে উঠেছে বসি?
পতি-সোহাগিনী ললনা যেমন,
পতির বিরহে কাঁদে অনুক্ষণ,
স্বপনে ভাবিয়া পতি সম্মিলন,
ভুলে যায় যত পূরব বেদন,
ফুল্ল হয় তার বদন-শশী!

(২)

মহারাণী মায়ে হারায়ে ভারত,
অনাথার সম ছিল মৃতবৎ,
ভগিনী ব্রিটন করিবে বরণ,
প্রিন্স এলবার্টে তাই হৃষ্টমন,
ভারত(ও) আপনি বরিবে হায়!
তাই জয়পুর, আদি মারবার,
বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গালা বিহার,
মেতেছে এ হেন আমোদ উৎসবে,
পূরেছে পণব ভেরী-বাদ্যরবে,
সুখের তরঙ্গ উথলি যায়!

(৩)

ছিলে মার ক্রোড়ে আছিলে কুমার,
জানিতে না কভু কি যে গুরুভার
রাজত্ব বিশাল, দায়িত্ব তাহার,
কিবা যে সে সুখ স্বচ্ছন্দ প্রজার,
শিরে তুমি সবি ধরেছ এবে;
ভারতের কহিনূর সনে আর,
দুঃখের বারতা ধর শিরে তার,
দুঃখিনী বলিয়া যেন অবজ্ঞায়
ঠেলো না রাজন! তুমি তারে পায়,
রত্নপ্রসূ তারে জানিত সবে!

(৪)

দুরন্ত বুয়র মাথা নোয়াইল,
শত্রুদল তব বিষাদে ডুবিল,
মেঘ-মুক্ত-রবি সম তেজ তব
দহিল যতেক শত্রুদল সব,
"ব্রিটনের জয়" ঘোষিল ধরা!
এবে কর যত প্রজারে পালন,
জাতি-বর্ণ-ভেদ হয়ে বিস্মরণ,
সন্তান তাহারা আত্মবলি দিয়ে,
পিতা তুমি, হিত তোমার সাধিয়ে
এ রাজ্য পোষণ করিবে তারা।

(৫)

এসেছিলে যবে, বহুদিন গত,
আনন্দ উৎসব দেখেছিলে কত,
এবে অন্নকষ্ট, দারিদ্র্য, হাহাকার,
সোণার ভারতে দেছে ছারেখার
অনশনে প্রজা মরিল কত!
রাজরাজেশ্বর অবনির পতি,
তুমি না দেখিলে কে দূরে দুর্গতি,
অন্ন বিনা মরে পুত্র পরিবার,
কোষপূর্ণ তবু করিছে তোমার,
রাজভক্ত কোথা এদের মত!

(৬)

অভাব যেমন নাহি পরেশের,
তবু পূজা তিনি লন মানবের,
নাহিক অভাব তোমার(ও) রাজন,
এ দু'কথা তবু করিও গ্রহণ
দীন ব্রাহ্মণের আশীষ বাণি;
রাজা-রাণী দোঁহে সুখে রাজ্য কর,
মাতৃসম যশঃ রাখ ধরা'পর,
গাউক সকলে এ ভুবনময়,
"জয় মহারাজ, ব্রিটনের জয়,
"জয় ভারতের—রাজার রাণি!

শ্রীহরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

চৈতন্য ভাগবত।

সমালোচনা।

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত, কালিকাযন্ত্রে মুদ্রিত, সিমুলিয়া ১১ নং মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমন্দির হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। চৈতন্যাব্দ ৪১৪। মূল্য তিন টাকা। ছাপা ও কাগজ প্রভৃতি সমস্তই উত্তম।

মহাকবি বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্যমঙ্গল নাম দিয়া এই ভক্তি গ্রন্থখানি প্রথমে প্রচার করেন, পরিশেষে শ্রীবৃন্দাবনের মহান্ত মহাশয়েরা ইহার নূতন আখ্যা দিয়াছেন—চৈতন্য-ভাগবত। এতদ্দেশে চৈতন্য ভাগবতের বহু সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে। প্রাচীন ভক্তগণের মুখে শুনা যায়, প্রায় সমস্ত সংস্করণেই মূল গ্রন্থের প্রকৃতির অনেক বিকৃতি ঘটিয়াছে। আমাদের পরম পূজ্যপাদ প্রভু শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বহুযত্নে, বহুশ্রমে, বহুব্যয়ে নানাস্থান হইতে হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া, এই বিশুদ্ধ নব সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অসংখ্য সংস্করণ অপেক্ষা এই সংস্করণটি সর্ব্বাংশে বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট হইয়াছে, এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

চৈতন্য ভাগবত একখানি মহাকাব্য; ইহাতে মহাকবি বৃন্দাবন দাসের বিশেষ পাণ্ডিত্য, কবিত্ব এবং উদারভক্তির পরিচয় আছে। ধারাবাহিক নকলে নকলে নানাস্থানে অনেক ভাবান্তর ও পাঠান্তর হইয়া পড়িয়াছে। পূজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয় এই নবসংস্করণে পাঠান্তর, অনুবাদ, উদ্ধৃত শ্লোকাবলির টীকা, স্থান পরিচয়, প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দসমূহের বিশেষ বিশেষ অর্থ, দুরূহ পদাবলির ব্যাখা ও তাৎপর্য্য এবং আদি গ্রন্থকর্ত্তা কবিবরের জীবনী প্রভৃতি সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই সংস্করণের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একখানি পরিশিষ্ট খণ্ড আছে। পরিশিষ্ট খণ্ডে শ্লোকাবলির ব্যাখ্যা, প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দের অভিধান, ভৌগলিক বিবরণ, সম্পাদকের বক্তব্য এবং আর কতকগুলি জ্ঞাতব্যবিষয় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। পরিশিষ্ট খণ্ডেই কবিবর বৃন্দাবন দাসের জীবনী আছে।

এই সংস্করণ পাঠ করিয়া ভক্তবৃন্দ ভক্তিবিষয়ক বিস্তর জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। চৈতন্য ভাগবতে কি আছে, জানিবার কৌতূহলে যাঁহারা ইহা

পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগেরও সবিশেষ প্রীতিলাভ হইবে সন্দেহ নাই। সম্পাদক মহাশয়ের বক্তব্য মধ্যে লক্ষিত হইল, মূলকাব্যে কিঞ্চিৎ অভাব আছে। বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শিষ্য; নিতাইচাঁদের প্রতি তাঁহার অবিচলা ভক্তি ছিল, সুতরাং চৈতন্যমঙ্গলে প্রগাঢ় ভক্তিভাবে নিত্যানন্দের মহিমাকীর্ত্তন করিতে করিতে গ্রন্থখানি বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ে; অতএব তাহাতে চৈতন্যদেবের শেষ লীলাংশ বর্ণিত হইবার স্থান সংকুলান হয় নাই। অভাবটি সামান্য বলিয়া মনে করা যায় না; কিন্তু অনেকগুলি বৈষ্ণবের বিশ্বাস, চৈতন্যচরিতামৃতে সে অভাবের পূরণ হইয়াছে। যাহাই হউক, এই নব সংস্করণ প্রচারে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসেবাসংরত পূজ্যপাদ প্রভু অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শ্রম, যত্ন ও অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। যোগ্যহস্তে যোগ্য কার্য্যের ভার সমর্পিত হইলে যে নিশ্চয়ই শুভ ফল হয়, শ্রীচৈতন্য ভাগবতের এই সংস্করণ তদ্বিষয়ের এক উত্তম নিদর্শন। এই সংস্করণটি টাকী নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারীবংশীয় বিদ্যানুরাগী ধর্ম্মশীল সুপণ্ডিত বদান্যবর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল, মহাশয়ের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

রাগিণী ঝিঝিট-খাম্বাজ, তাল মধ্যমান।

যা তোমার মনে আছে তাই কর গো মা তারা।
তবু না ছাড়িব পদ জেন মনে ভব-দারা॥
মা, যদি সন্তানে মারে,
তবে কে রাখিবে তারে?
(কিন্তু) ছেলে কি তবু 'মা'-বোল্ ছাড়ে,
সে যে মা মা রবে হয় মা সারা॥
তারে যদি দূরে ফেলে,
তবু সে চায় উঠ্‌তে কোলে;
"নেইআঁকড়া" ছেলে হ'লে (সে) মা ব'লে হয় আপন-হারা॥
যতই ঠেলে ফেল্‌বে তুমি,
ততই কসে ধর্‌ব আমি;
দেখ্‌বে কেমন ছাওয়াল 'সূদন' গলাবে প্রাণ পাষাণ-পারা॥

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী।

কুর্জ্জন-মহিলাষ্টকম্

(দিল্লী-রাজসূয়োপলক্ষে)

(১)

কৃতান্তকরকান্তারক্লেশবিশ্লেষকারিণী।
কামং করোতু কল্যাণীং কালী কুর্জ্জনকামিনীম্॥

(২)

ইন্দ্রপ্রস্থেঽতিপুণ্যেঽমরবরমহিতে সূর্য্যজাপূরপূতে
বঙ্গৈরঙ্গৈঃ কলিঙ্গৈঃ কতিভিরনুগতে রাজসূয়াখ্যযজ্ঞে।
ধীরো ধর্ম্মাত্মজঃ শ্রীকুরজননৃপতিঃ কেশবঃ শ্রীকনাটো
বীরাধারা সুধীরা কুরজনমহিষী শ্রীমতী যাজ্ঞসেনী॥

(৩)

দেবীরত্নং হিমগিরিসুতা শঙ্করো দেবরত্নং
স্রোতোরত্নং ত্রিদশতটিনী বেদগীর্বাক্যরত্নম্।
বিদ্যারত্নং সরসকবিতা ভারতং কাব্যরত্নং
রামারত্নং কুরজনবধূঃ কুর্জ্জনো লাটরত্নম্॥

(৪)

এতস্মিন্ ক্ষিতিমণ্ডলে দরগদাশ্লিষ্টো হি বিষ্ণুঃ স্বয়ং
ব্রহ্মা বেদনয়ান্বিতঃ পশুপতিঃ শূলী বিষাদী সদা।
অগ্নিঃ কৃষ্ণপথোঽহিরাট্ পবনভুক্ চন্দ্রশ্চ দোষাকরঃ
কো বাস্তে ভুবনে য গচ্ছতি পরং সাম্যং হি পত্যুস্তব॥

(৫)

বৈদ্যং ব্যাধিযুতো জনো ধনিজনং দারিদ্র্যদুষ্টো যথা
খাদ্যঞ্চ ক্ষুধিতো হিমাম্বু তৃষিতশ্ছায়াতরুং রৌদ্রভাক্।
আধ্যার্ত্তঃ পিতরং বিয়োগবিধুরো বৎসো যথা মাতরং
শ্রীলাটঞ্চ তথা স্মরন্তি ভবতীং দুর্ভিক্ষজুষ্টা জনাঃ॥

(৬)

ইন্দ্রস্যেব শচিঃ স্মরস্য চ রতিঃ কাত্যায়নী শূলিনঃ
স্বাহাঽগ্নেরিব কেশবস্য কমলা চ্ছায়েব সূর্য্যস্য চ।
শীতাংশোরিব রোহিণী চ সততং হে লাটসীমন্তিনি
সংসারে সকলং ভজস্ব কুশলং ভর্ত্তুঃ প্রিয়ে জাগ্রতী॥

(৭)

মিত্রাণাং প্রিয়বর্দ্ধিনী ভব সদা নৈদাঘনীরং যথা
শত্রূণাং ভয়বর্দ্ধিনী ভব সদা নৈদাঘরৌদ্রং যথা।
দুঃখং তে প্রলয়ং প্রযাতু পরমং নৈদাঘরাত্রির্যথা
আয়ুস্তে চ বিবর্দ্ধতাং প্রতিদিনং নৈদাঘঘস্রো যথা॥

(৮)

বহুবিধগুণধামা স্বর্ণবর্ণাভিরামা
বিগতনিখিলতামা যোষিতামগ্র্যবামা।
নৃপকুরজনরামা পুণ্যভাক্ মেরিনামা
ভবতু সফলকামা ভারতাভীষ্টসামা॥

বি-এ কাব্যরত্নোদ্ভটসাগরোপাধিকস্য শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে দাসস্য।

দিল্লীর দরবার।

ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিবসে (১লা জানুয়ারী, ১৯০৩ খৃঃ—১৩০৯ সালের ১৬ই পৌষে) দিল্লীতে মহা-দরবার হইয়াছিল। সম্রাট সপ্তম এড-ওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক ভারতে ঘোষণা করিবার অভিপ্রায়ে এই মহা-দরবার। ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর এই দরবারের অধিপতি। দরবার-সভার সজ্জা এবং জনসমারোহ অতুলনীয় হইয়াছিল, সকলেই এই কথা বলিতেছেন।

"দিল্লী" এই শব্দটি কর্ণগোচর হইবামাত্র, প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ মনে পড়ে, মহামুনি ব্যাসদেবকে মনে পড়ে, বারণাবতের যৌঘর, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ, এবং কুরুক্ষেত্র মহা সংগ্রামাদির কথা মনে পড়ে; অনেক দূর নামিয়া আসিলে, মোগল-বংশের আকবরাদি চারিটী বাদসাহের সমৃদ্ধির কথা মনে পড়ে; আর মনে পড়ে—সেই দিল্লী এখন এই।

এই দিল্লী সহরে লর্ড কর্জ্জনের দরবার। জনশ্রুতি বলিতেছে, বিংশতি লক্ষ লোকের সমাগম। সহরের বাহিরে জুম্মা মস্‌জিদের নিকটবর্ত্তী সুপ্রশস্ত

প্রান্তরে (প্রায় আটচল্লিশ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া) দরবারক্ষেত্র সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। অসংখ্য পটাবাস পৃথক্ পৃথক্‌রূপে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীর অবস্থানের নিমিত্ত সংস্থাপিত, এবং সুরঞ্জিত করা হইয়াছিল। লাট সাহেবের পট-মন্দির সর্ব্ব শিবির অপেক্ষা প্রশস্ত এবং উৎকৃষ্ট। দেশ বিদেশ হইতে যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, বৈদেশিক রাজদূত, ভারতের স্বাধীন ও করদ মিত্ররাজগণ এবং অপরাপর সম্ভ্রান্ত রাজা জমিদার নবাব ও বড় বড় পদস্থলোকের মর্য্যাদানুসারে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পটমণ্ডপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ভারত-বর্ষের মুদ্রাযন্ত্র সমূহের (সংবাদপত্র সম্পাদক ও সংবাদদাতা প্রভৃতি) প্রতি-নিধিগণের অভ্যর্থনার জন্য আটত্রিশটি তাঁবু নির্দ্দিষ্ট ছিল। দেশীয় সংবাদ-পত্র সমূহের সম্পাদকগণের মধ্যে যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়া নিমন্ত্রিত হইয়া-ছিলেন, তাঁহারা যোগ্য যোগ্য তাঁবুতে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া বিশেষরূপে সমাদৃত হইয়াছিলেন। দরবারের ভাণ্ডার হইতে তাঁহারা সকলেই উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন। খ্যাতনামা সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত জে, এন, গুপ্ত মহাশয় দেশীয় সম্পাদকবর্গের অভ্যর্থনার তত্ত্বাবধান ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শুনা গেল, তিনি সুচারুরূপে স্বকর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন।

শারীরিক অসুস্থতা, পারিবারিক বিষাদ অথবা অন্য কোন অপ্রতিবিধেয় প্রতিবন্ধকতা বশতঃ দুই চারিজন রাজা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তদ্ভিন্ন পুরুষানুক্রমিক পদমর্য্যাদা সম্পন্ন এবং আধুনিক সম্মান-সূচক উপাধি-সম্পন্ন রাজা—মহারাজা—নবাব বাহাদুর, সকলেই সভাস্থ হইয়া, যজ্ঞসভা আলো করিয়াছিলেন। ভারতীয় রাজগণের অলঙ্কার বস্ত্র দর্শন করিয়া, অনেক মাননীয় ইংরাজ পুঙ্গব চমকিয়া গিয়াছেন। ইহাই বা কি আশ্চর্য্য! রাজ-গণের শত শত হস্তী এই দরবারে কাজ করিতে আসিয়াছিল, এক একটি হস্তির মুক্তামালা, সাটিন মখমলের পোষাক, কিংখাপের ওড়না, রেশমের মুশারী, সোণার হাওদা, স্বর্ণদণ্ড ছত্র, ইত্যাকার শোভা দর্শন করিয়া, বিদেশ হইতে নবাগত কেহ কেহ চক্ষের ধাঁধাঁয় মূর্চ্ছা যাইতে যাইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

গজযাত্রা, অশ্বযাত্রা, শকটযাত্রা এবং সহস্র সহস্র উষ্ট্রযাত্রায় সকৌতুক দর্শনীয় হইয়াছিল। ষ্টেশন হইতে পুষ্পশোভিত রাস্তায় গজপৃষ্ঠে কর্জ্জন-দম্পতি শোভাময় হস্তির উপর লর্ড দম্পতির পরম শোভা। তৎপশ্চাতে ডিউক অব কনট, সহচারিণী বধু শ্রীমতী ডাচেস্। তাঁহাদের বাহনটিও বহুমূল্য উপকরণে সুসজ্জিত। তৎপশ্চাতে হাইদ্রাবাদ, বরোদা, ইন্দোর প্রভৃতি

রাজ্যের নরপতিগণ ক্রমান্বয়ে হস্তীপৃষ্ঠে শ্রেণীবদ্ধ। শোভাটি নয়ন-মোহিনী। তথাপি যেন অঙ্গহীন। হস্তী আরোহণে গজারোহী লাট সাহেবের সঙ্গে যাইবার জন্য সকল রাজা অনুমতি প্রাপ্ত হন নাই। অনুযাত্রী ভাগ করা হইয়াছিল। কোন দলের মান অধিক, কোন ভাগের মান কম, সে বিচার আমরা জানি না। সমারোহের ঘটা ইতিহাসের স্মরণীয় হইয়াছিল।

দরবারে আমাদের লাট সাহেবের বক্তৃতা।—লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর বক্তৃতায় সুপণ্ডিত; তাঁহার বাক্যগুলি অতি মধুর। উপস্থিত বক্তৃতার মর্ম্ম এই যে, রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড ভারতবর্ষের সম্রাট হইয়াছেন, এই শুভ সংবাদ ভারতবাসীগণকে বিজ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত ভারতের সর্ব্বত্র—জেলায় জেলায়, প্রধান প্রধান নগরে নগরে সম্রাটের প্রতিজ্ঞাত ঘোষণাপত্র ১লা জানুয়ারি তারিখে পাঠ করা হইবে। প্রধান দরবার দিল্লীতে। জগতের চারিখণ্ডের প্রতিনিধি এবং ভারতের চির রাজভক্ত রাজগণ সানন্দে এই দরবারে আসিয়া এক সম্রাটের সিংহাসনতলে শির নত করিতেছেন; ইহা সামান্য গৌরবের কথা নহে। দেশীয় রাজগণ আমাদের গবর্ণমেণ্টের বিস্তর উপকার করিয়াছেন; যুদ্ধে সৈন্য দিয়াছেন, দেশের দুর্ভিক্ষে ঋণ গ্রহণ করিয়া প্রজালোকের সাহায্য করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রীত আছি। এই দরবারে তাঁহাদের প্রতি এই কৃপা প্রদর্শিত হইল যে, সৎকার্য্যের জন্য গরর্ণমেণ্টের কাছে যাঁহারা ঋণী আছেন, তাঁহাদের কাছে তিন বৎসরের সুদ লওয়া হইবে না। যথেষ্ট অনুগ্রহ! একটি পীড়িত লোক দিল্লীতে আসিয়া, শীতে হীমে পীড়া বৃদ্ধি হওয়াতে দিল্লী রেলওয়ে ষ্টেশনে তাহার প্রাণপক্ষী উড়িয়া গিয়াছে। লোকটি নিতান্ত কুলীমজুর ছিলেন না, গবর্ণমেণ্টের হিতৈষী বন্ধু আরকটের নবাব।

লাট সাহেবের বক্তৃতার একাংশে আছে—ভারতবাসীগণের স্বাধীনতা-সুখ, উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং সৎশিক্ষা ইত্যাদি ভারতবর্ষ-শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য; যাহাতে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, লর্ড কর্জ্জনের তাহাই বাসনা,—সম্রাটেরও সেই ইচ্ছা। শাসন-প্রণালী এক্ষণে যে ভাবে চলিতেছে, এই ভাবে চলিলে অচিরেই মঙ্গল সাধিত হইবে; কোন প্রকার দৈব দুর্ঘটনা না হইলে, দিন দিন প্রজাগণের সুখ বাড়িবে, দেশীয় রাজন্যবর্গ ব্রিটিশ শাসনে যেরূপ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার অধিক অধিকার দান করা এক্ষণে অসম্ভব। সম্রাট এডওয়ার্ডের আদেশে তিনি মহা রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন; সমারোহ দর্শনে সর্ব্ব লোক আনন্দিত হইলেন, ভারতবাসীর রাজভক্তি নূতন হইয়া জাগিয়া উঠিল,

ইহা অবশ্যই মহা গৌরবের বিষয়। এই মহোৎসব উপলক্ষে প্রজাগণের করভার কিঞ্চিৎ লাঘব করিতে তাঁহার ইচ্ছা আছে, কিন্তু কোন বিষয়ে লাঘব করা হইবে, বৈষয়িক বৎসর শেষ না হইলে, তাহা তিনি নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। আশা করেন, কিয়ৎ পরিমাণে লবণের শুল্ক হ্রাস করা হইবে।

৩রা জানুয়ারী তারিখে লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর সংবাদপত্র সম্পাদকগণের শিবিরে উপস্থিত হইয়া, উৎসাহবর্দ্ধক মিষ্ট বচনে এবং সানন্দ করমর্দ্দনে সকলকে অপ্যায়িত করিয়াছেন, সম্পাদকগণের মুখ্য প্রতিনিধি বাবু নরেন্দ্র নাথ সেন সকলের পক্ষ হইতে লাট সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার উদারতা ও বদান্যতার প্রশংসা করিয়া রাজভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। লাট সাহেব বলিয়াছেন,—"দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রগুলিকে তিনি বড় ভালবাসেন।" স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি!

৫ই জানুয়ারী তারিখে বরদার রাজকুমার গুঁইকুমার সম্পাদক শিবির দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, সম্পাদকেরাও তাঁহার নিকট পরিচিত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। দরবারের এই অংশটি নিতান্ত তামাসায় পরিণত হয় নাই; মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করিলে রাজা প্রজার মঙ্গল হয়। আমরা আশা করি, লর্ড কর্জ্জনের ন্যায় সুনীতিজ্ঞ রাজপুরুষ ইহা বিস্মৃত হইবেন না।

মহামহোৎসবে সর্ব্বাংশে সত্য কথা বলিলে, কেহই অসন্তুষ্ট হইবেন না। ইহাই আমাদের বিশ্বাস। মূল কথা, সম্রাটের ঘোষণা পত্র। বক্তৃতা করিতে করিতে লর্ড কর্জ্জন সেই ঘোষণাপত্র পাঠ করিলেন। মর্ম্ম এইরূপ যে, গত আগষ্ট মাসে লণ্ডন নগরে আমার রাজ্যাভিষেক হইয়াছে, তদুপলক্ষে অতি অল্প ভারতবাসীর আগমন হইয়াছিল; যাহাতে ভারতের সমস্ত লোকে এই অভিষেক বৃত্তান্ত জানিতে পারেন, তন্নিমিত্ত দিল্লীনগরে মহা দরবার করিয়া আমার এই ঘোষণা সকলকে জানাইয়া দেওয়া হউক, এই বিষয়ে আমার প্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জনকে আমি অনুমতি দিয়াছি। ভারতকে আমি বড় ভালবাসি, এই দরবার উপলক্ষে স্বয়ং ভারতে যাইবার আমার ইচ্ছা ছিল, কার্য্যগতিকে ঘটিল না, আমার স্নেহাস্পদ প্রিয় সহোদর ডিউক অব কনটকে আমাদের বংশের প্রতিনিধি স্বরূপ দিল্লীতে প্রেরণ করিলাম। অচিরে আমার পুত্র ও পুত্রবধূ ভারত দর্শনে যাইবেন, ইহাই আমার আনন্দ। ভারতবর্ষকে সুখী করিতে পারিলে আমি সুখী হইব। যেরূপ রাজনীতি অবলম্বন করিয়া আমার স্বর্গগতা

জননী সর্ব্বত্র সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, আমি যত্নপূর্ব্বক সেই পথের অনুসরণ করিব।

১৯০৩ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে ভারতের সর্ব্বত্র এই ঘোষণাপত্র পঠিত হইয়াছে, কলিকাতার সেরিফ কলিকাতার টাউন হলের উচ্চ সোপানে দাঁড়াইয়া উপস্থিত লোকবৃন্দের কর্ণে ঐ ঘোষণাবলি বর্ষণ করিয়াছেন। ঘোষণায় নব সম্রাটের মনোভাব যেরূপ ব্যক্ত হইয়াছে শ্রোতারা সমভাবে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন, সকলে মুক্তকণ্ঠে ঈশ্বরের নিকটে তাঁহার দীর্ঘ-জীবন ও সুশাসন প্রার্থনা করিয়াছেন, ভারতের এক এক প্রধান নগরে গণনীয় ব্যক্তিগণ রাজভক্তি প্রকাশার্থ উৎসব করিয়া দরিদ্রগণকে অন্ন বস্ত্র দান করিয়াছেন, অনেকে আজিও করিতেছেন, মাঘ মাসে কলিকাতায় আনন্দোৎসব হইবে।

দিল্লীর দরবারে মহা-সমারোহ হইয়াছে, হাতি ঘোড়ার সঙ্গে মানুষ নাচিয়াছে, নয়নমুগ্ধকর আতসবাজি পুড়িয়াছে, কোন অংশে কৌতুকামোদের ত্রুটি হয় নাই। ভারত-সন্তানেরা রাজভক্তি দেখাইতেও ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু দরবারের ফল আলোচনা করিবার সময় সাধারণ প্রজালোকের কি কি উপকার লাভ হইল, তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হয়। ফল কথা, সমৃদ্ধি প্রদর্শন, বক্তৃতা, আলোকমালা, অগ্নিক্রীড়া এবং সাহেব বিবির পান ভোজনাদি ভাল হইয়াছিল। আমাদের আনন্দবর্দ্ধক অনুষ্ঠান—শিল্পপ্রদর্শনী, ১৬ হাজার বন্দি খালাস এবং কতিপয় যোগ্য ব্যক্তির উপাধি প্রাপ্তি, ১৬ হাজার বন্দির মধ্যে শত মুদ্রা ন্যূন ঋণগ্রস্ত দেওয়ানী জেলের জনকতক দরিদ্র বন্দী, ফৌজদারি জেলের কয়েদীগণের সহিত চারিশত দায়মালী। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া যৎকালে ভারতেশ্বরী মহারাজ্ঞী (এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া) উপাধিপ্রাপ্ত হন, সেই সময় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটন প্রমুখ দিল্লীর দরবার উপলক্ষেও ১৬ হাজার কয়েদী খালাস পাইয়াছিল।

এবারে লর্ড কর্জ্জনের উচ্চ প্রশংসার পরিচায়ক ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী। ভারতের শিল্প ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, দাসত্বপ্রিয় হইয়া ভারতের শিল্পিবংশ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, শিল্পবন্ধু লর্ড কর্জ্জন তজ্জন্য আক্ষেপ করেন। যাহাতে ভারতীয় শিল্প পুনরায় জাগিয়া উঠে, ভারতে যাহাতে বিদেশী শিল্প অপেক্ষা ভারতীয় শিল্পের অধিক আদর হয়, লর্ড কর্জ্জন তাহাই দেখিতে চাহেন। ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে দিল্লীর মহা প্রদর্শনী খোলা হয়, প্রদর্শনীর

শোভা ও চমৎকার চমৎকার শিল্পদ্রব্য চক্ষে না দেখিলে অক্ষরে লিখিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যায় না; দশটি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া শিল্পজাত বস্তুগুলি প্রদর্শন করা হইয়াছিল। চমৎকার চমৎকার বস্তু দর্শনে দর্শকেরা প্রীত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ভারতে শিল্প আছে, শিল্পি আছে, বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। সকলে তাহার নিদর্শন দেখিলেন, কেবল বিদেশী শিল্পিগণের সহিত প্রতি-যোগীতায় এ দেশের শিল্পিরা অক্ষম হওয়াতেই এই দুর্দ্দশা; বিশেষত, এ দেশের ধনবান্ হইতে গরীবেরা পর্য্যন্ত বিদেশী বস্তুর চটকে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাও দেশীয় শিল্পের অনাদরের একটি প্রকাশ্য কারণ। লর্ড কর্জ্জন যদি ইচ্ছামত কার্য্য সুসিদ্ধ করিয়া বিলুপ্তপ্রায় ভারতশিল্পকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি ভারতের সহস্র সহস্র ধন্যবাদের পাত্র হইবেন। ত্রিশকোটি ভারতবাসী সমস্বরে তাঁহার প্রশংসা গান করিবে—জগদীশ সমক্ষে তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিবে, তৎবিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই; উৎসবের নামে লোকের নয়ন ধাঁধাঁইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা আগুনে দগ্ধ করিয়া যে উপকার লাভ হইল, দেশীয় শিল্পের পুনর্জ্জীবনকল্পে তাহার বিংশতিগুণ ব্যয় করিলেও অপব্যয় বলিয়া কেহ নিশ্বাস ফেলিতে পারিতেন না।

এই উৎসবে এ দেশের যে কয়েকজন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি রাজপ্রদত্ত উপাধি সম্মানে সমাদৃত হইলেন, তাঁহাদের নামের তালিকামধ্যে দুটি সাহিত্যবন্ধুর নাম দর্শন করিয়া আমরা সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম-এ, এবং বিখ্যাত কবি ও ঔপন্যাসিক, আমাদের পরম সুহৃদ, জন্মভূমির বিশিষ্ট লেখক বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত। শাস্ত্রী মহাশয় রায় বাহাদুর হইয়াছেন, রক্ষিত বাবুটি রায় সাহেব উপাধি পাইয়াছেন। মর্য্যাদালাভে সম্মান বৃদ্ধি হইল, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

উপসংহারের অগ্রে সাধারণত দু-একটি কথা বলা আবশ্যক। দরবার বেশ হইয়াছে, বক্তৃতা বেশ হইয়াছে। নিমন্ত্রিতগণের মানরক্ষা বেশ হইয়াছে, আগুন বাজি বেশ জ্বলিয়াছে, কিন্তু একটি অভাবের কথা শ্রবণ করিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। বক্তৃতায় লর্ড কর্জ্জন বলিয়াছেন, "এ দেশের একতা বাড়িতেছে, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলে সমান অধিকার পাইতেছে।" ইহা আহ্লাদের কথা। কথা আহ্লাদের বটে, কিন্তু কাজে আহ্লাদ আসে কই? ভিন্ন ভিন্ন রিপোর্ট পাঠে জানা হইয়াছে, চর্ম্ম এবং পোষাকবিরোধি হইয়া লর্ড কর্জ্জনের ঐ উদার বাক্যের বিফলতা সপ্রমাণ করিয়াছে। রঙ্গভূমে প্রবেশ প্রস্থানে কৃষ্ণ-চর্ম্ম এবং

ভারতীয় পরিচ্ছদ প্রতাপশালী পুলিশের নিকটে অনেক স্থলে হতমান হইয়াছে, সমদর্শিতা ও সমাধিকারের এমন বিপরীত পরিচয় শ্লাঘনীয় নহে, কথাটা নিতান্ত জনশ্রুতিমূলক, তাহাও বলা যায় না। হিতবাদী সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়, ঐ বিভ্রাটের বিষয় লাট সাহেবকে জানাইয়াছিলেন, লাট সাহেব তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিয়া দিয়াছেন, তৎবিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান লইবার জন্য আদেশ প্রচার করা হইয়াছে। ইহাতে কি প্রতিপন্ন হয়? বর্ণে ও পরিচ্ছদে মান উপমান নির্ভর করে, ভারতের সর্ব্বত্রেই প্রায় এই অভিযোগ শোনা যায়। লর্ড কর্জ্জনের অনুসন্ধানের ফল শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সকলেই উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। দরবারের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে, অত বড় সমারোহ ব্যাপারে কোন প্রকার সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটে নাই, ইহাই মঙ্গল। আমরা সপ্তম এডওয়ার্ডের এবং লর্ড কর্জ্জনের দীর্ঘজীবন ও চিরমঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি।

রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার বিজয়-গীতি।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া চিররাজভক্ত ভারতবাসীর হৃদয়-মন্দিরে সাক্ষাৎ দেবতারূপে বিরাজ করিতেন, এক্ষণে তিনি স্বর্গবাসিনী হইয়াছেন, তথাপি আমাদের হৃদয়ে সেই ভক্তির উচ্ছ্বাস কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। নামের উদ্দেশ্যে বরং আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে! দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়ার যুদ্ধের অবসরে, মহারাণীর জন্মোৎসব দিবসে এতদ্ রাজধানীর ষ্টার থিয়েটার নামক সুপ্রসিদ্ধ নাট্যশালার সুদক্ষ কার্য্যসম্পাদক কবিবর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু যে একটি ভক্তির উচ্ছ্বাসব্যঞ্জক ভক্তিরসাত্মক সুমধুর গীতিকাব্য রচনা করিয়া জন্মভূমি পত্রিকার প্রকাশার্থ পূজনীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির দ্বারা আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, আক্ষেপের বিষয়, সেই আদর্শখানি বিশৃঙ্খল লিপিসমূহের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল, সময়ে সেখানি আমরা অন্বেষণ করিয়া পাই নাই, সম্প্রতি মেঘান্তরিত প্রভাকরের ন্যায় সেই মনোরম গীতি কাব্যটী আমাদের নেত্রপথে সমুদিত হইয়াছে। অসাময়িক হইলেও কবিবরের অকপট রাজভক্তি ও গুণপনা সাধারণ পাঠকবর্গের গোচরার্থ সাদরে এই স্থলে গৃহীত হইল।—জং সং।

মহারাণীর জন্মোৎসব গীতি।

কে আজি মুকুট পরে এত গরিমায়,
কাহার গৌরব-জ্যোতি এত শোভা পায়?
ইংলণ্ড সাম্রাজ্য করে, এ ভারতে অধিকার—
কার রাজ্যে দিনমণি অস্ত নাহি যায়?
পারাবার কার আজ্ঞা বহিছে মাথায়?
জয় রাণী ভিক্টোরিয়া জয়,
শুভ জন্মদিনে যাঁর আনন্দ উদয়।
বরষে বরষে হরষে হরষে,
গাই যেন হেন তব জীবন জয়॥
কার রাজ্যে নাহি দাস,
কার কার্য্যে এত আশ,
বিদ্যার ঐশ্বর্য্য হেন কাহার ভাষায়?
বঙ্গের সন্তান তব পাইয়াছে স্নেহ দান,
তাই মা গাই মা সবে খুলে প্রাণ তুলে তান!
দেশেতে দিয়েছ শান্তি,
মনেতে জ্ঞানের কান্তি,
রাজভাষা দ্বার খুলে,
দেবভাষা কোলে তুলে,
জাগালে ঘুমন্ত প্রাণ মাতৃভাষা প্রেম তায়।
সে ভাষা বাসিতে ভাল আসিয়াছি এ সভায়॥
ধর মা ভক্তির হার,
হৃদয়ের উপহার,
বহুবর্ষ হর্ষভরে থাক সিংহাসনে।
অরির লাগুক শঙ্কা,
বাজুক বিজয় ডঙ্কা,
জয় জয়! জয় হোক আফ্রিকার রণে!
জগ ভরি গাবে জয়, মোরা যোগ দিব তায়,
দেবতা, রক্ষুন সদা রাণী ভিক্টোরিয়া মায়॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

কালী-কীর্ত্তন।

মেঘ—চৌতাল।

নমামি কালীকে, ঈশানি অম্বিকে,
রাখ মা চণ্ডিকে, বিপাকে পায়।
কাতরে কাঁদি মা, কৃপা কর শ্যামা,
রবি-সুত-ভয়ে ঠেকেছি দায়॥

আঁধার গগন, আঁধার জীবন,
আঁধারে খেলিছে বিজলী ভীষণ।
এ আঁধার নাশি, পূর্ণচন্দ্র হাসি,
দেখাও জননি, স্বরূপ-প্রভায়॥

মাভৈঃ মাভৈঃ বল্ মা বদনে,
এই যে মা তোরে হেরি হৃদাসনে,
(আর) কারে করি ভয়, কিসেরি বা ভয়,
(ঐ) ভয় পেয়ে ভয়, পলায়ে যায়।

ঘুচিল শঙ্কা, বাজাও ডঙ্কা,
কালী কালী ব'লে ডাক রে ভাই।
জনমে জনমে, জীবনে মরণে,
কালী নাম ওরে, না যায় বৃথায়॥

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

প্রাপ্তিস্বীকার।

পুষ্পরাজ তৈল।—কৃতজ্ঞতার সহিত আমরা স্বীকার করিতেছি যে, হ্যারিসন রোডের শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ রায় কবিরত্ন "পুষ্পরাজ" নামক এক শিশি সুগন্ধ তৈল আমাদিগকে উপহার পাঠাইয়াছেন। ব্যবহারে জানা গেল, পুষ্পরাজের সৌরভ মনোহর, তৈলের উপকারিতা যথেষ্ট আছে। বাজারে আজকাল গন্ধ তৈলের অধিক গুলজার, তন্মধ্যে যেগুলি উৎকৃষ্ট, কবিরত্ন মহাশয়ের "পুষ্পরাজ" সেই শ্রেণীর সহিত গণনীয় হইবে। মূল্য ৪ আউন্স শিশি ১৲ টাকা, গুণের সহিত তুলনায় এ মূল্য অধিক বোধ হইবে না।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।)

১১শ বর্ষ। } মাঘ, ১৩০৯ সাল। { ৭ম সংখ্যা।

শ্রীপঞ্চমী।

নমি আজি বীণাপাণি, চরণ-অম্বুজে,
বাগীশ্বরী কৃপাদৃষ্টি কর অকিঞ্চনে।
তোমারি সংসার দেবি, বিশ্বচরাচর—
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল তোমারি কৃপায়—
কথা কহে, ভাষা শেখে, গায় প্রেমগীত,
ভাসায় প্রেমের তরি প্রেমের সাগরে!
প্রেমের প্রতিমা তুমি ভাষার ঈশ্বরি।
লক্ষ্মী সরস্বতী নাম জপি রসনায়,
বসাই যুগল মূর্ত্তি হৃদয়-আসনে,
প্রেমপুষ্পাঞ্জলি দিই শ্রীপদপঙ্কজে,
জানি না মা, কেবা তুমি, কেবা পদ্মাসনা
কমলাক্ষি হরিপ্রিয়া জলধিকুমারি।
পাঠশালে শিশুকালে শিখিয়াছি স্তুতি,
শুভ্রবর্ণা পদ্মালয়া ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
গলে দোলে মণিময় গজমতি হার,
বেদবিদ্যা শিক্ষাদাত্রি, বিদ্যার জননী।
কল্পনা বলিয়া দেয় সর্ব্বকর্ণমূলে,
তব রূপে কণামাত্র মলিনতা নাই,

সেই হেতু শ্বেতবর্ণ মূরতি তোমার
মানসে, গঠনে, চিত্রে ভক্তজনে হেরে,
নির্ম্মলা সরোজ-কান্তি দেবী সরস্বতি।
এইরূপে মা তোমারে চিনিয়াছি আমি,
প্রতিমাতে সেই রূপ করি নিরীক্ষণ
কিছু কিছু বিভিন্নতা অনুভব হয়,
তোমার এ রূপে আর কমলার রূপে,
গৌরবর্ণা, সুরূপাঞ্চ পঙ্কজবাসিনী,
রুক্ম-পদ্ম ব্যগ্রকরা বরদা দাক্ষিণে।
তুমিও বরদা দেবি! পদ্ম-বিলাসিনী,
গীতবাদ্য-বিনোদিনী, করপদ্মে বীণা।
এই ত প্রভেদ রূপে চক্ষে দেখে সবে,
ফলে কিন্তু বুঝা যায় ভিন্ন কিছু নাই।
ভারতীতে শুনা যায় (জানি না স্বরূপ!)
পদ্মালয়া রমা আর তুমি মা ভারতি,
চরাচরে কর বাস সহোদরা দুটি।
কে বলিবে, কে বুঝিবে, তোমাদের খেলা,
ভগিনী, জননী, কিংবা জগদ্ধাত্রীরূপা।
কেহ বলে মহা-শক্তি, দুই নামে এক,
কল্পনায় ভিন্ন রূপ, বিভিন্ন প্রতিমা।
কি যে তুমি, কি যে সেই ভগিনী তোমার
আবির্ভূতা যিনি ভবে জলধি-মন্থনে,

বিচার করিতে নারি, না পারি ভাবিতে,
তত বুদ্ধি দেহে নাই বুদ্ধি-বিধায়িনি।
ধনদা লক্ষ্মীর নাম, তুমি মা জ্ঞানদা,
জ্ঞান বিতরণ কর বিশ্ববাসিগণে,
এই ত জ্ঞানের কথা, কিন্তু মা জ্ঞানদে!
পামর অধম এই পৃথিবাসী নর,
কৃপা করি কৃপাময়ি তাহাদের প্রাণে
দিয়াছ কি সেই জ্ঞান বচন-ঈশ্বরি?
(দেহ নাই বলিব না, বড় পাপ কথা!)
জ্ঞানী যদি হয়ে থাকি সেই জ্ঞানবলে,
লক্ষ্মী সরস্বতী তবে ভিন্ন কেন ভাবি?
ভাবিবার হেতু আছে, বলবান হেতু—
সে হেতুর মূল সাক্ষী তুমি নারায়ণি!
কল্পনার দুটি নাম কল্পনায় বুঝি,
যুগল ভগিনী বলি, বুঝি কল্পনায়,
কিন্তু মাগো ভগিনীর এই কি পিরীতি?
দুটি মূরতিতে কভু ঘনিষ্ঠতা নাই।
যেথানে তোমার দয়া, সেথানে কমলা
ভুলিয়াও নাহি চান, এমনি প্রকৃতি!
হা অন্ন হা অন্ন করে তোমার সেবক!
আবার যেথানে দেখি কমলার বাস,
সেথানে মা তুমি যেন চির উদাসিনী!
ধন জ্ঞান, জ্ঞান ধন, একত্র মিলনে,
কত সুখ উপচয় জান না কি তুমি?
সব জান, তবু যেন মায়া ব্যবহারে—
দেখাও মানবগণে অপরূপ লীলা,
লক্ষ্মীতে তোমাতে যেন সতিনী সমান!
মুখ দেখা-দেখি নাই! একি বিড়ম্বনা?
আমি কিন্তু হৃদিপদ্মে বসায়ে তোমায়,
তোমার দক্ষিণ-ভাগে বসাব লক্ষ্মীরে,

প্রদানিব চারিপদে কুসুম অঞ্জলি,
একমন্ত্রে স্তুতি-গীত গাইব দোঁহার,
এই সাধ সাধেশ্বরি. উদিত মানসে,
দয়া করি দয়াময়ি পূর্ণ কর সাধ,
ভগিনী সতিনীপনা ঘুচাব উল্লাসে।
সমাগত শুভদিন রাশি-চক্রভোগে,
মকরেতে প্রবেশিলা দেব-দিবাকর,
শুক্লপক্ষ শ্রীপঞ্চমী আখ্যান যাঁহার,
নবীন বসন্তে নাম বসন্ত-পঞ্চমী.
মধুময়ী শ্রীপঞ্চমী আনন্দদায়িনী।
সেই দিন সমাগত, ভারতমণ্ডলে
পূজিবে সবাই দেবি তব শ্রীচরণ ;
আমিও পূজিব মা গো, পূজি চিরদিন—
যতদিন ইহধামে লভিয়াছি জ্ঞান,
আর্য্যকুলে জন্ম মম, ভক্তিউপচারে
পূজা করি মা তোমার রাঙা পা-দুখানি ;
এবারেও পাদ-পদ্ম করিব অর্চ্চনা।
মাটি দিয়া গঠিব না প্রতিমা তোমার,
সাজাব না তব বপু ডাক অলঙ্কারে,
চিত্তপটে, চারু রূপ জনমের মত
আঁকিয়া রেখেছি দেবি, ভক্তিতুলি দিয়া,
সেই রূপ আরাধিব, এক রূপে নহে,
স্থাপিব যুগলরূপ হৃদি-পদ্মাসনে,
দুই রূপ আঁকা আছে, হেরি অনুক্ষণ,
দক্ষিণে কমলাসনা, বামে সরস্বতী ;
শোভিছে যুগলরূপ বিশ্ব আলো করি,
ঝকিছে পরম জ্যোতিঃ মানস নয়নে ;
সেই রূপে পূজা আমি করিব এবার।
আদরের ছোট ছোট শিশুগুলি লয়ে,
প্রেমের কুসুম তুলি জুড়ি দুটি হাত,

প্রেমামোদে তব পদে দিব ফুলাঞ্জলি,
নাচিয়া নাচিয়া প্রেমে শিশুদের সনে—
গাইব তোমার স্তব, লিখিয়াছি যাহা
শিশুকালে, সেই গীত গাব সমস্বরে,—
"গলায় গজমতি মুকুতার হার,
দাও মা সরস্বতী বিদ্যার ভার।"
স্তবে আরো বেশী করি বলিব তোমারে
স্থানে থেকে কাণে তাহা শুনিও সর্ব্বাণি !
"কমলে কমলালয়া শ্রীকরে কমল,
দেহি দেহি মহালক্ষ্মি মানব মঙ্গল।"
শশাঙ্কবরণী তুমি অকলঙ্ক শশী—
সরস্বতি ! মহালক্ষ্মি ভাগ্যের ঈশ্বরি—
কল্পনায় সেই মূর্ত্তি কাঞ্চনবরণী,
একাসনে দুই মূর্ত্তি পূজিব তোমার,
গ্রহণ করিও পূজা, এই ভিক্ষা করি।
কামনা কিছুই নাই, কামনা কেবল
উভয়েই একসঙ্গে করিও মা বাস।

পরম কল্যাণ গীতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পরম পদ বর্ণন।

উত্তরগীতায় লেখা আছে :—

"অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যা ধ্বনিঃ
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতি জ্যোতিরন্তর্গতো রবিঃ।
রবেরন্তর্গতং স্থানুঃ স্থানোরন্তর্গতং মনঃ।
তন্মনঃ বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
তৎপদং পরমং ধ্যানং তদ্ধ্যানং ব্রহ্ম উচ্যতে॥"

এই সকল বিষয়ের অর্থ নানা শাস্ত্রে নানা প্রকার বর্ণিত আছে, কিন্তু, ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, নাদ শব্দে প্রকৃতি পুরুষ, অ, উ, ম ত্রিগুণাত্মা

মায়া ব্রহ্ম, বিন্দু শব্দে জ্ঞানরূপ ঈশ্বর সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ। ঐ প্রকাশ জ্যোতিঃতে ঈশ্বর রবি অর্থাৎ অন্তঃচৈতন্য ভাবে সূর্য্যনারায়ণই আছেন। এবং সূর্য্যনারায়ণে বুদ্ধি আছেন, অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণই বুদ্ধিরূপে প্রকাশ আছেন, এবং বুদ্ধিতে মন আছেন অর্থাৎ বুদ্ধিই ভ্রমবশতঃ শরীরাদিতে আসক্ত হইয়া মন রূপে পরিণত হন। যখন পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু নারায়ণে জীবের নিষ্ঠা হয়, তখন জীবরূপ মনের বিশুদ্ধ জ্ঞানোদয় হইয়া পরমপদ প্রাপ্তি অর্থাৎ আত্মায় পরমাত্মায় অভেদ হইয়া জ্ঞান স্বরূপে পূর্ণ পরব্রহ্মরূপেই বিরাজমান থাকেন। তখন মন জ্যোতিঃ প্রভৃতি শব্দ লয় হইয়া যায়, তখন ব্রহ্ম যাহা তাহাই পূর্ণরূপে ভাসমান হন। এই ভাবকে পরম ধ্যান এবং এই অবস্থাকে বিষ্ণু ভগবান্ অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মের পরমপদ বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থা কহা যায়।

যেমন—অবস্থা, রূপ, গুণ, ক্রিয়ার প্রভেদ হেতু অগ্নিতে উষ্ণতা প্রকাশ শুক্লবর্ণ প্রভৃতি পৃথক পৃথক নাম কল্পনা করা হয়, সেই প্রকার অনাহত শব্দ, ধ্বনি, জ্যোতিঃ, স্থানু, মন, ধ্যান ও পরমপদ, নাম গুণ ক্রিয়ার প্রভেদ হেতু ভিন্ন বোধ হইতেছে, কিন্তু তাহা পূর্ণ পরব্রহ্মের নামরূপই জানিবে। যেমন, অগ্নির ধূমের মধ্যে পীতবর্ণ, তন্মধ্যে রক্তবর্ণ, তন্মধ্যে শুক্লবর্ণ, তন্মধ্যে প্রকাশ, তন্মধ্যে উষ্ণশক্তি আছে। এই প্রকারে অনাহত শব্দ নাদ বিন্দু প্রভৃতি নাম, গুণ, ক্রিয়া পরব্রহ্মে বুঝিয়া লইবে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, শব্দই ব্রহ্ম। কিন্তু এই সকল বিষয়ের সার ভাব অবগত না হইয়া তাহারা নানা প্রকার বিপর্য্যয় ঘটাইয়া থাকে। এ বিষয়ের সার ভাব এইরূপ বুঝিবে, যেমন পিতা কারণ স্বরূপ এবং তাঁহার উচ্চারিত শব্দ তাঁহা হইতে পৃথক কোন পদার্থ নহে। তাঁহরই গুণ মাত্র। সেই প্রকার অনাহত শব্দ পরব্রহ্ম হইতে কোন ভিন্ন পদার্থ নহে। তাঁহারই আকাশ রূপের গুণ মাত্র, যেমন পিতাকে ভক্তি পূর্ব্বক ধারণ করিলে শব্দাদি গুণের সহিত পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া শব্দমাত্রকে ধারণ করিলে কোন ফল হয় না। কারণ পিতাকেই পুত্রের প্রয়োজন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পিতাকে ধারণ করিতে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্তই যেমন, পিতার উচ্চারিত শব্দের অনুসরণ করিয়া যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছে, সেই দিকে অগ্রসর হইতে হয় এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে যেমন আর শব্দ ধারণের প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ পিতারূপী পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপকে ধারণ করিলে অনাহত শব্দাদির সহিত তাঁহাকে পূর্ণরূপে ধারণ করা হয়, এবং ইহাকে পরিত্যাগ

করিয়া কেবলমাত্র ইহাঁর অনাহত শব্দ ধারণ করিলে কোন ফলই হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাকে ধারণ করিতে সমর্থ না হও, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অনাহত শব্দ অনুসারে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিবে। যখন, পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানকে পূর্ণরূপে ধারণ ও বিশ্বাস করিতে পারিবে, তখন তাঁহার অনাহত শব্দ গুণ বা "ওঁ"কার নাম ধারণ করিবার প্রয়োজন থাকিবেক না। শব্দ মাত্রেই আকাশের গুণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে পূর্ণরূপে ধারণ করিলেই শব্দাদি সমস্ত গুণকে ধারণ করা হয়।

যেমন, তুমি একটী বস্তু এবং তোমারি উচ্চারিত শব্দ তোমারই গুণ মাত্র। এবং ঐ শব্দ মাত্রেই তুমি নহ; সেই প্রকার অনাহত শব্দ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের গুণ মাত্র। ইহাই কেবলমাত্র ব্রহ্ম নহেন। যেমন তোমার উচ্চারিত শব্দ তোমা হইতে পৃথক নহে, তোমারই শক্তি ও রূপ। সেই ভাবে অনাহত শব্দ ব্রহ্ম হইতে পৃথক কোন বস্তু নহে, ব্রহ্মশক্তিও ব্রহ্মরূপ। এইজন্য কেহ কেহ অনাহত শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। এবং যেমন তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার রূপ গুণ ধারণ করা হয় না, সেই প্রকার পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া অনাহত শব্দ ধারণ করা হয় না। এবং তোমাকে পূর্ণরূপে ধারণ করিলে যেমন রূপ গুণও ধারণ করা হয়, সেই প্রকার পূর্ণরূপে পরমাত্মাকে ধারণ করিলে অনাহত শব্দাদি গুণ শক্তি ধারণ করা হয়। শক্তি আদি যেমন কর্ত্তার আয়ত্বাধীন, সেই প্রকার অনাহত শব্দাদি শক্তি ও পরমাত্মার অধীন। পরমাত্মা যদি কৃপা না করেন, তাহা হইলে—অনাহত শব্দের দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না। পরমাত্মাকে ধারণ করিলেই সকল কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

জীব ও ঈশ্বরের কর্ত্তা ভোক্তা বিষয়।

কেহ কেহ জীবকে, কেহ কেহ ঈশ্বরকে এবং কেহ কেহ উভয়কেই কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া থাকেন। কিন্তু জ্ঞান বা স্বরূপ বোধ না হইলে, এই সকল বিষয়ের মীমাংসা বা সহজে ইহার সত্যতা বুঝা অতিশয় দুরূহ। তথাপি তোমাদিগকে সরলভাবে বুঝাইয়া দিতেছি, গম্ভীরতার সহিত শান্ত-ভাবে এই সকল বিষয়ের সারভাব বুঝিতে চেষ্টা কর।

যেমন, জীব স্বপ্নাবস্থায় সুখ দুঃখ ও নানা প্রকার ঐশ্বর্য্যাদি ভোগ করিতেছি

মনে করে, তাহার আত্মাই যে ঐ সকল রূপ সাজিয়া, ভোগ কল্পনা করিয়া, স্বপ্ন দেখিতেছে, তখন তাহা বুঝিতে সমর্থ হয় না; এবং উহা সত্য কি মিথ্যা, তাহাও বুঝিতে পারে না। এই অবস্থায় জীবগণ আপনাকে, ঈশ্বরকে এবং কোন কোন সময় উভয়কেই কর্ত্তা ও ভোক্তা মনে করে। এবং কখন বা মনে করে যে, আমি ধন, রাজ্য, তপস্যা, জ্ঞান প্রভৃতি অর্জ্জন ও নানা প্রকার উত্তম অধম কর্ম্ম করিতেছি, ও সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছি, আমার ন্যায় পণ্ডিত, জ্ঞানী, মানী বা রাজা বা মহাত্মা কেহই নাই। এই অবস্থায় আপনাকে কর্ত্তা ভোক্তা বা ঈশ্বর কিম্বা উভয়কেই কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া মনে করে। কিন্তু স্বপ্ন লয় হইয়া যখন জাগ্রত হন, তখন স্বপ্নের কাল্পনীক বস্তু পাণ্ডিত্য, জ্ঞান, বাজ, কর্ত্তা ও ভোক্তা ভাব লয় হইয়া আপনি যাহা তাহাই বিরাজমান থাকেন। তখন স্বপ্নের বস্তু আদি ও অভিমানাদি ত্যাগ হইয়া যায় ও মনে করেন যে, আমি অহঙ্কার পূর্ব্বক কাহার কর্ত্তা ভোক্তা হইতে-ছিলাম এবং যখন স্বপ্নের পদার্থ কর্ম্ম ও ফলা ফলাদি সমস্ত মিথ্যা, তখন আমাতে কর্তৃত্বাদি ও কর্ম্মফল কোথায়, আমি বৃথা কর্ত্তা ও ভোক্তা মনে করিতেছিলাম। এই প্রকারে স্বপ্নের কর্ত্তা জাগ্রত অবস্থাতে অকর্ত্তা, এবং জাগ্রতের কর্ত্তা অকর্ত্তা এবং স্বপ্নের কর্ত্তাভাব সুষুপ্তি অবস্থাতে কর্ত্তা অকর্ত্তা হইতে অতীত হইয়া যান। তখন কোন প্রকার বোধ বা কর্ত্তা ভোক্তাভাব থাকে না, সেইরূপ যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনুষ্য স্বপ্নরূপ অজ্ঞানাবস্থায় আপন ও পূর্ণ পরব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মনুষ্য আপনাকে কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া মনে করে। যখন জাগ্রতরূপ জ্ঞানোদয় হয় অর্থাৎ আপনার ও পরব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিতে ইচ্ছা করে, বা সমর্থ হয়, ঐ অবস্থায় জীব আপনাকে অকর্ত্তা ও ঈশ্বরকে কর্ত্তা মনে করে। এবং যখন সুষুপ্তিরূপ বিজ্ঞান বা তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি দেখেন যে, আমি বা ঈশ্বর কেহই কর্ত্তা ভোক্তা নহেন, অথচ উভয়েই কর্ত্তা ভোক্তা এবং স্বরূপতঃ আমাতে বা ঈশ্বরে কর্ত্তা ভোক্তাভাব নাই, কারণ ঈশ্বরই পূর্ণরূপে একমাত্র বিরাজমান আছেন, তাঁহা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। যিনি বা যাহার কর্ত্তা ভোক্তা ঈশ্বর বা আমি হইব।

(ক্রমশঃ)

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী।

বিধবার আত্মকথা।

(১)

আমি বিধবা অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে যাঁহার হস্তে পিতা আমাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি নিয়তিবশে এ পৃথিবীতে আর নাই। আমি যথা-রীতি আতপ চাউল, নিরামিষ একবেলা আহার করি, সাদা কাপড় পরি, পান খাই না, কোন অলঙ্কার পরি না, ইত্যাদি বিধবার আচার সবই পালন করি। মা আমার হাতটা একেবারে খালি করিতে দেন নাই, সম্পূর্ণ সাদা কাপড়ও আমাকে পরিতে দেন নাই; তাতেই যদি তাঁহাদের দুঃখের ভার একটু কম হয়, হউক, আমার আপত্তি নাই, সে জন্য আমি তাঁর মতেই চলি—দু'চার গাছা চুড়ীও হাতে রাখিয়াছি, পেড়ে কাপড়ও পরি,—আমার নিজের কিন্তু তাতে লাভ লোকসান কিছুই নাই। পেড়ে কাপড় পরিয়াই যে আমি বেশী সুখী, তাও নয়, না পরিলেই যে মনের খুঁৎখুঁতি, তাও নাই, অলঙ্কার আদির সম্বন্ধেও তাই। লোকে আমাকে দেখিয়া কত দুঃখ করে, কত জন মায়ের চোকের জলে জল মিশাইয়া তাহার সহানুভূতি জ্ঞাপন করে; কারণ আমি অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছি, আমি কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কিছুই বিভিন্নতা বুঝিতেছি না। সধবা আর বিধবাতে যে কি এত বেশী প্রভেদ, তাহা আমি বুঝিতেছি না। কেবল দেখিতেছি, মাছ খাইতে পাই না, দু-বেলা আহার নিষেধ, কতকগুলি আচার নিয়ম পালন করিতে হয়—বস্তুতঃ, মাছ খাইতে না পারায়, দুই চারি দিন কিছু অসুবিধা হইত বটে, কিন্তু এখন তা কিছুই বোধ হয় না—অভ্যাসে সবই হয়, এখন বরং মাছের উপর একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছে। যদি এখন শাস্ত্র উল্টাইয়া আবার বিধবার মাছ খাইবার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, তাহা হইলেও বোধ হয়, আমি আর মাছ খাই না। যাহা হউক, যাঁহারা আমার এই গল্প শুনিতেছেন, তাঁহারা হয় ত আমাকে মিথ্যাবাদিনী মনে করিতেছেন, না হয় পাগলিনী বলিয়া হাসিতেছেন, সেটা অসম্ভব নহে; তবে প্রথম কথার উত্তরে আমি বলিতে পারি যে, আমি যখন নাম ধাম প্রকাশ করিতেছি না, তখন আমার লজ্জার বিষয় কি আছে যে, মিথ্যা কথা বলিব? আমি আমার নিজের অবস্থা নিজেই বুঝিতে পারি না, তাই অকপটে হৃদয়ের সব কথা সকলকে, বিশেষতঃ আমার স্বজাতীয়া ভগিনীদিগকে খুলিয়া বলিতেছি। সকলে বুঝুন যে, আমার অবস্থাটা কি? আমার দোষ, গুণ, ত্রুটী, চ্যুতি,

সব আমি অকপটে সংক্ষেপে বলিতেছি, আপনারা আমার বিচার করুন; যদি আমার ন্যায় অবস্থাপন্না কেহ ইহা শুনেন, তিনি আমাকে বুঝিতে পারিবেন, আর অন্ততঃ তাঁহার কাছে আমি একটু স্নেহ মায়া বোধ হয় পাইব। দ্বিতীয় কথার বিষয়ে আমার বক্তব্য যে, আমার আত্মীয়স্বজন সকলেই আমাকে পাগল বলিয়া ডাকেন, অন্যের নিকটও পাগলটার উপায়ের জন্য কাঁদেন সুতরাং দশচক্রে ভগবানের ভূতযোনি প্রাপ্তির ন্যায় আমাকেও পাগলামী স্বীকার করিয়াই লইতে হইতেছে—তথাপি আবার বলিতেছি—আমি যে সধবা কবে ছিলাম, আর বিধবা হইয়াই বা সধবাত্বের এমন বিশেষ কি হারাইলাম, তাহা আমি বুঝি না। এ কথা বুঝিতে হইলেই আমার গত-জীবনের কথা কিছু বলা আবশ্যক, তাই সংক্ষেপে আগে বলিয়া যাই, তারপর আর আর কথা বলিব।

(২)

নাম ধাম জাতি গোত্রের কোন প্রয়োজন করে না। আমি স্ত্রীলোক, পিতা-মাতা ভাই ভগ্নী অন্য আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির কতক ছিল, কতক আছে। একজনের সঙ্গে আমার বিবাহও হইয়াছিল, তাহাও শুনিয়াছেন। যাঁহার সহিত বিবাহ হয়, তাঁহাকেই যদি স্বামী বলিতে হয়, তবে তিনি আমার স্বামীই ছিলেন; তবে তাঁহার স্বামীত্বের সহিত আমার কোন সংস্রব ছিল না। যাহা হউক, তাঁহার বিষয় বলিতে—বুঝিবার সুবিধার জন্য স্বামীই বলিব। যখন আমার বিবাহ হয়, তখন আমার বয়স বারবৎসরের মধ্যে। আমি সহরের মেয়ে নয়, লেখা পড়াতে অক্ষর পরিচয় মাত্র তখন ছিল, সুতরাং কোন নাটক নভেল তখন পড়া দূরে থাকুক, চক্ষেও দেখি নাই, গল্পেও শুনি নাই—বাটীতে সংসারের কাজকর্ম্ম করিতাম, ফুল কুড়াইতাম, মালা গাঁথিতাম, নিজে পরিতাম, অন্যকে পরাইতাম, পুতুলখেলা করিতাম, হাসিতাম, কাঁদিতাম, এইরূপে দিন কাটিত। এ সবই বিবাহের পূর্ব্বের কথা—আমার চেহারা যে একটা ভারি সৌন্দর্য্যপূর্ণ—তাহা নহে, তবে কুৎসিতও বলিতে পারি না—চলনসইএর মধ্যে বোধ হয় একটু ভাল।

আমার বয়স যখন চারিবৎসর, যখন অনেক সময় উলঙ্গ হইয়া মাথায় ঝুটি বাঁধিয়া আঙ্গিনায় ছুটাছুটি করিতাম, সেই সময় একটি নূতন লোক আমাদের বাটীতে প্রথম আসিলেন—সে লোকটি আমাদের একজন আত্মীয় বটে—তবে কোন বিরুদ্ধসম্পর্কীয় জ্ঞাতি নহেন,—কোনও সূত্রে তাঁহার সহিত আমাদের আত্মীয়তা হয়, ইহার বেশী আর কিছু বলিতে পারিব না।

যাহা হউক, এই আত্মীয়টি তদবধি আমাদের বাটীতে মধ্যে মধ্যে আসিতেন, এখনও আসেন। তাঁহার চেহারাতেই যে তেমন কিছু একটা অমানুষিক সৌন্দর্য্য ছিল, তাহা নহে, কিন্তু তাঁর স্বভাবের মাধুর্য্যে বাটীর সকলেই তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। প্রথম প্রথম দু-চারিবার যে যাতায়াত করিয়াছেন, তখন আমি বিশেষ কিছু বুঝিতে পারি নাই বা মনেও হয় নাই, কিন্তু শেষে তাঁহার স্নেহে, ব্যবহারে আমি যেন বড় মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। তিনি বেশী কথা বলিতেন না, বেশী কিছুই করিতেন না, তবুও জানি না, সেই পাঁচ বৎসর বয়সেই তাঁহার প্রতি আমার একটা বিশেষ টান হইয়া পড়িল। তখন আমি পাঁচ বৎসরের বালিকা—সুতরাং সে যে কেবল আত্মীয়তা ভিন্ন আর কিছু নহে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি যে আমাকেই কেবল বিশেষ স্নেহ করিতেন, তাহা নহে, সকলের প্রতিই তাঁহার সমান স্নেহ ছিল, যদিও তাঁহার মত আরও অনেক আত্মীয় স্বজন আমাদের বাটীতে আসিতেন, কিন্তু আমি সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার আগমনেই বেশী সুখবোধ করিতাম। তিনি আসিলে বাল-স্বভাবের বশে দশ পনর মিনিট তাঁর কাছে যাইতাম না, কাছে কাছে ঘুরিতাম; শেষে কোনরূপে গেলে সর্ব্বদা তাঁর কাছেই থাকিতাম, ফাই ফরমাস খাটিতাম, ঘামাচি মারিয়া দিতাম, মাথার চুলে হাত বুলাইতাম, আঙ্গুল মটকাইয়া দিয়া বুদ্ধি গণনা করিতাম, ফুলের মালা গাঁথিয়া দিতাম, পুতুলের বিয়েতে ধূলোমাটীর ভাত ব্যঞ্জন খাইতে নিমন্ত্রণ করিতাম, তিনিও অবলীলাক্রমে মাটীর ডেলাগুলি কচ কচ করিয়া চিবাইতেন, আমরা হাসিয়া খুন হইয়া কত সাধ্য সাধনা করিতাম, যাহাতে ওগুলি ফেলিয়া দেন। প্রাণে ভয় হইত, বুঝি বাস্তবিকই তিনি খাইয়া ফেলিবেন। তিনি যাইতে চাহিলে ছাতা, চাদর, জামা লুকাইয়া রাখিতাম। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের সঙ্গে রহস্য করিতেন বটে, কিন্তু বেফাঁস একটি কথাও তিনি কখন বলেন নাই, তাহাতে তিনি অতিরিক্ত সাবধান অথচ ছেলেমানুষকে কেমন করিয়া আমোদ দিতে হয়, তাহা তিনি খুব জানিতেন। তাঁহার পাতে বসিয়া খাওয়া একটা প্রধান আমোদ ছিল, তার জন্য অনেক ঝগড়া বিবাদও ভাই বোনে আমরা করিয়াছি। তিনি চলিয়া গেলে, সে দিনটা মন কেমন করিত, শেষে খেলাধুলায় সব ভুলিয়া যাইতাম। এইরূপে আমার বাল্যকালের নয় দশ বৎসর পর্য্যন্ত কাটিয়া গেল—ক্রমেই তাঁহার উপর আমার শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা বাড়িতে লাগিল। ভালবাসা কথাটা আবার ব্যবহার করিতে ভয় করে, কারণ ওটা

একটা সঙ্কীর্ণতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—যাহা হউক, সে সন্দেহ যেন কেহ না করেন।

(৩)

ক্রমে আমি মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিলাম, আমি তাঁহাকে যেমন দেখি, যেমন ভালবাসি, অন্য কোন আত্মীয় (অর্থাৎ পর ব্যক্তি আপন হইয়া গেছে) সম্বন্ধীয় ব্যক্তিকেই আমি তেমন ভালবাসি না। আমার কাছে তাঁর সবই সুন্দর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল—যতই আমার বয়স বাড়িতে লাগিল, ততই আমি তাঁহার স্বভাবের সরলতা, মাধুর্য্য, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি দেখিতে লাগিলাম, ততই আমার প্রাণ তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতে লাগিল। আমার কাছে তাঁহার চেহারাও যেমন মিষ্ট, স্বভাবও তেমনি মিষ্ট লাগিতে লাগিল, তাঁহার হাঁটা, শোওয়া, বসা প্রভৃতি সবই আমার কাছে সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার যেখানে যেমনটি আছে, ঠিক সেখানে তেমনটি হইলেই ঠিক মানায়, তা না হলে মানায় না, আমার এই বিশ্বাস হইতে লাগিল। আমার মনে কখন কোন গণ্ডগোল নাই, সুতরাং আমি অকপটেই তাহা সকলের কাছে ব্যক্ত করিতাম। তাঁহার কাছে যাইতেও কখন আমি লজ্জা বোধ করি নাই, বাহিরেও না, অন্তরেও না। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত আমি সমভাবেই তাঁর কাছে যাই, বসি, কথা বলি, সেবাশুশ্রূষা করি—তাঁহার তো উদার হৃদয়, পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই, সুতরাং তিনি সেই পাঁচ ছয় বৎসরের সময়ও আমাকে যেমন আদর করিতেন, অসঙ্কোচে আমার সঙ্গে কথা বলিতেন, এখন যে আমি ১৫।১৬ বৎসরের, এখনও ঠিক সেইরূপ ভাবেই কথাবর্ত্তা বলেন, সব করেন, তাহাতে তাঁহার কিছুই ভাবান্তর নাই। মনের ভিতর পাপ থাকিলেই একটা সমিহ আসিয়া পড়ে—তাহাতে আমারও কোন দ্বিধা হয় না।

যাহা হউক, যাহারা ঠাট্টা করিতে পারে, তাহারা আমাকে তাহা বলিয়া কত ঠাট্টা করিয়াছে, আমি কিছুই বলি নাই। এখনও আবার আমি সকলকে বলিতেছি যে, আমার মনে অন্য কোন উদ্দেশ্য বা ভাব ছিল না—আমি বিশেষ রূপেই জানিতাম, অতি বাল্য হইতেই জানিতাম যে, তাঁহার সহিত আমার কোন বিবাহ সম্বন্ধ হইতে পারে না, কোন বিশেষ কারণে তাহা অসম্ভব। সুতরাং আমার মনে কখনও সে কল্পনা পর্য্যন্তও হয় নাই—এখনও তাহা উদয় হয় না, এ কথা আমার মনেই আসিত না, তবে লোকে স্ত্রীলোকের ভালবাসার

পবিত্রতাতে বড় বিশ্বাস করে না, এজন্য খুলিয়া দিতে হইল। তাঁহার জন্যই তাঁহাকে ভালবাসিতাম, জানি না, কি চক্ষে আমি তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, জানি না, কি বিশেষ গুণে তিনি আমাকে এত আকর্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া পারিতাম না—যে তাঁহাকে জানে, সেই তাঁহাকে ভালবাসে, তাঁর কেউ শত্রু নাই—তবে আমি হয় ত একটু বেশী ভালবাসিতাম। কেন, তাহা ভগবান্ বলিতে পারেন। আমি তাঁহাকে হৃদয়ের কোন স্থানে রাখি, তাঁহাকে দেখিলে আমার কেমন আনন্দ হয়, তাহা আমি বলিয়া বুঝাইতে পারি না—নিজেই আমি তাহা বুঝিতে পারি না। আমি আরও অনেককে ভালবাসি, কিন্তু তাঁহাকে অপেক্ষা আর কাহাকেও, বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই, বেশী সুন্দর ও বেশী ভালবাসার যোগ্য বলিয়া ভাবিতে পারি না, তিনিও আমাকে খুব স্নেহ করেন—তার জন্যও আমি বড় সুখী।

যাহা হউক, এইরূপে মনের অন্তস্তলে তাঁহার প্রতি অসীম ভালবাসা লইয়া আমি এগার বছরে উপস্থিত হইলাম। সকলে জানিত, আমি তাঁহাকে ভালবাসি, আমিও জানিতাম, আমি তাঁহাকে ভালবাসি, তদতিরিক্ত আমরা কেহই জানি না—কাহারই মনে কোন সন্দেহ নাই। আমার এগার বছরে পড়া দেখিয়া, বাবার মুখে অন্ন উঠা বন্ধ হইয়া গেল, তিনি রাতদিন ভাবিয়া ভাবিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া একেবারে সারা হইয়া গেলেন। কেন? আমাকে বিবাহ দিতে—সৎপাত্রস্থা করিতে! আমারও তাহাতে মনে কোন কষ্ট নাই, বোধ হয়, বিয়ের কথায় মনে মনে একটু সুখই পাইয়াছিলাম, ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু যখন বাবা সুপাত্র বলিয়া একজনকে নির্ব্বাচিত করিলেন এবং তিনি স্বয়ং আসিয়া স্বচক্ষে আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত পছন্দ করিয়া আনন্দে চলিয়া গেলেন, আমি তখন তাঁহাকে দেখিয়া কি জানি কেন পছন্দ করিলাম না। আমার সেই 'তাঁর' মত সুন্দর তো ইহাকে দেখিলাম না, কি জানি কেন আমি শত চেষ্টা করিয়াও মনকে বুঝাইতে পারিলাম না, মনকে আমার বরের প্রতি সুভাবাপন্ন করিতে পারিলাম না। অবশ্য তাহা কেহই জানিল না—সে কথা মনে মনেই চাপা থাকিল, কিন্তু দুই একবার অসামাল হইয়া একটু আদটু বোধ হয় বাহির হইয়া গিয়াছিল, তার জন্য আমাকে কালামুখী বলিয়া অনেকে গালিও দিয়াছিলেন। যাহা হউক, বাবার ও বাটির আর সকলের বিশেষ আনন্দ। বাটীর সকলের একান্ত আগ্রহে 'তিনি' আমার বিবাহের পূর্ব্বদিন আমাদের বাটীতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই আমার

প্রাণ পুলকিত হইয়া পড়িল,—তিনি আদর করিয়া আমাকে কাছে ডাকিলেন, কত স্নেহ দেখাইলেন, কত কথা বলিলেন, কত শিক্ষা দিলেন। তাঁহার অমৃতময় বাক্য আমার কর্ণে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। মনের বোঝা যেন হাল্‌কা হইল। তিনি মহা আগ্রহে তাঁহার স্নেহের পরিমাণানুসারেই সব কাজে আপন বাড়ীর মত অসঙ্কোচে হাত দিয়া সকলের প্রশংসা পাইতে লাগিলেন, আর আমার মনেও আনন্দ হইতে লাগিল। ক্রমে লগ্নকালে সম্প্রদানকার্য্য হইয়া গেল, বাসর ঘরে গেলাম। আমাদের সেই আত্মীয়টিও সেখানে বহুক্ষণ ছিলেন এবং আমার বরের সঙ্গে অনেক কথাবর্ত্তা করিয়াছিলেন। যখন তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইলেন, তখন আমার মন যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল, তাঁহাকে তাহা বলিলাম, তিনি নানারূপে বুঝাইয়া রাখিয়া গেলেন, তাঁর কথা আমান্য করিতে পারি না, সুতরাং বাসর জাগিতে যে সব সখীরা আসিয়াছিল, তাহাদের একজনকে আমার কাছে রাখিলাম এবং তারই সঙ্গে শয়ন করিয়া থাকিলাম। আমার বর আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য সেই রাত্রিতেই অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন, তাঁর কতকগুলি ব্যবহারে আমার মন আরও খারাপ হইয়া গেল—আমি কোন কথাই বলিলাম না এবং তাঁহাকে স্পর্শ পর্য্যন্তও করিলাম না। তিনি তাহাতে কিছু ক্ষুব্ধ হইলেন, তা কি করিব! বিবাহ হইয়া গেল, পিতা এক মহাদায় হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

(৪)

আমার বিবাহের পর দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আমার স্বামী কয়েকবার আমাদের এখানে আসিয়া ছিলেন। আমিও ২।৩ বার শ্বশুর বাড়ী গিয়াছিলাম, কিন্তু স্বামীর সহিত সম্ভাষণ দূরে থাকুক, তাঁহাকে স্পর্শ পর্য্যন্তও করি নাই। কেন যে আমার মন একেবারেই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হয় নাই, তাঁহার কাছে যাইতে বা থাকিতে বা তাঁহার কথা শুনিতে আমার একেবারেই ভাল লাগিত না, স্বামীগৃহে থাকিবার জন্য আমার সখীগণ ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, আমাকে কত প্রহার যন্ত্রণা পর্য্যন্ত সহিতে হইয়াছে কিন্তু তথাপি আমি তাঁহার কাছে যাই নাই। শ্বশুরালয়েও ঠিক এইরূপই হইত, সুতরাং সেখানেও আমার ভাগ্যে আদর স্নেহ যতদূর ঘটিয়াছিল বুঝিতেই পারেন। আমার স্বামী আমার রূপ দেখিয়া বড় পাগল হইয়াছিলেন, বোধ হয় তিনি আমাকে পাইবার জন্য অনেকরূপ চেষ্টা করিতেন, অনেক বলিতেন, কত কষ্ট প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তথাপি

আমি তাঁহাকে সুখী করিতে পারি নাই; কেন যে আমার মন ওরূপ দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিল, তাহা আমি জানি না।—যাহা হউক আমার দিন এইরূপে কাটিতে লাগিল। আমাদের সেই আত্মীয়টি সব শুনিতে পাইলেন। আমাকে বুঝাইয়া পত্র দিলেন, একবার দেখা হইলে বিশেষ করিয়া বলিলেন, কিন্তু আমি তথাপি মন ফিরাইতে পারিলাম না। সকলে আমাকে গালি দিতেছেন, কুলনাশিনী বলিতেছেন, তাহা আমি বুঝি, কিন্তু বুঝিয়াও আমার উপায় নাই, মনের উপর কোন জোর আমি খাটাইতে পারি নাই।

বিবাহের প্রায় দুই বৎসর পর আমার স্বামীর কোন কঠিন ব্যারাম হইল। সে সময় কিছুদিন আমি তাঁহাদের নিকটেই ছিলাম। তখন আমার সাধ্যমত তাঁহার শুশ্রূষা, সেবা, শয্যাদি প্রদান, বাতাস করা, বিষ্ঠামূত্র পরিষ্কার ইত্যাদি আমার দ্বারা যাহা সম্ভব, তাহা সবই করিয়াছি, তাহাতে মনে কোন বিরুদ্ধ-ভাবও আসে নাই। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যথাসম্ভব তাঁহাকে শক্তি দিতে চেষ্টা করিয়াছি। তারপর আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতেও আমি কোন দুঃখ বোধ করি নাই। তাহার ব্যারাম অবস্থায় কোন সংবাদ না পাইলে বাটীর সকলে ব্যস্ত হইতেন, আমি কিন্তু একটুও ব্যস্ত হইতাম না।

তারপর একদিন হঠাৎ লোকপরম্পরায় সংবাদ আসিল, আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। বাটীতে যে কি কান্নাকাটীর ধূম পড়িয়া গেল, তাহা আর বলিয়া কি হইবে। চৌদ্দ বৎসরের কন্যা বিধবা হইলে যেমন হয়, আমাদের বাটীতে তাই হইল। আমার মন যে কেমন হইল, তা ঠিক বলিতে পারি না—তাহা বুঝাইতে পারি না, তবে খুব বেশী একটা ক্ষতি আমার হইয়া গেল বলিয়া মনে কিছু বুঝিতে পারিলাম না। সকলের কান্নাকাটীতে প্রাণ যেন অস্থির বোধ হইল। আমি নীরবে ঘরে শয়ন করিয়া থাকিলাম। আমার চোক দিয়া এক ফোঁটা জলও পড়ে নাই, প্রাণেও বিশেষ আঘাত পাই নাই। সকলের কান্না ক্রমে থামিয়া গেল, আমার মনও অনেকটা স্থির হইল! বলাবাহুল্য, আমার দুঃখে সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। যে আসিল, সেই না কাঁদিয়া গেল না। কেবল আমিই বুঝিতে পারিলাম না যে, আমার কি এমন একটা ক্ষতি হইয়া গেল। এখনও আমি বুঝি না, আমার কি এমন একটা দুর্ভাগ্য হইয়াছে। পূর্ব্বেও যেমন ছিলাম, এখনও তেমনই আছি। আমার দেবতা স্বরূপ 'তিনি' এই সংবাদ পাইয়া আমাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন, আমাকে লইয়া তিনি অনেক কাঁদিলেন,

কষ্ট করিলেন, তাহা দেখিয়া আমার কষ্ট হইল। তিনি আমাকে অকপটে কতকগুলি কথা আমার স্বামীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমিও ঠিক ঠিক তাঁহার উত্তর তাঁহাকে দিলাম—তাহা হইতে তিনি বুঝিলেন, আমি বিবাহিতা হইলেও সর্ব্বপ্রকারেই কুমারীই রহিয়াছি, আমার স্বামীর প্রতি—আমার হৃদয়ের কোনও একটা আকর্ষণই হয় নাই। তিনি কি ভাবিলেন, তিনিই জানেন, একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। তিনিও কি আমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারেন না;—তাহা তিনিই জানেন, আমি কখন তাহাকে তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই, কখনও জিজ্ঞাসা করিবও না।

এইরূপে আমার বিবাহের জীবন শেষ হইল। ছেলেখেলা অপেক্ষাও ছেলেখেলা লইয়া আমার জীবনের এক অধ্যায় একটা স্বপ্ন সমাপ্ত হইয়া গেল। আমি পিতার গলগ্রহ স্বীয় সত্ত্বার দ্বারা দিন দিন তাঁহার জীবন পলে পলে ক্ষয় করিতে লাগিলাম।

(৫)

ইহার পর আরও প্রায় দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে; আমি এখন ১৫।১৬ বর্ষ বয়স্কা, কিন্তু এখনও তো আমি কোন পরিবর্ত্তন বুঝিতেছি না। ১৫।১৬ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোক যুবতী নাম পায় কিন্তু আমিতো ১২ বৎসর বয়সেও যাহা ছিলাম, এখনও আকৃতিতেও তেমনই আছি, একটু পরিবর্ত্তনও হয় নাই, তবে তদপেক্ষা একটু কৃশ হয়ত হইয়াছি, প্রকৃতিতেও আমার কোনই পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া আমি বুঝি না। বাবা সেই বার বৎসর বয়সেই আমাকে অরক্ষণীয়া স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু এখনও আমার দেহে অরক্ষণীয়ার কোন চিহ্নই নাই, পিতৃপুরুষকে নরকস্থ করারও কোন হেতু নাই। বাটীতে সংসারের কাজ কর্ম্ম করি, হাসি, খেলি, খাই দাই, থাকি, ঝগড়া দ্বন্দ্বও মধ্যে মধ্যে না করি তা নয়। কি জানি কেন আমি কারো কথা সহিতে পারি না। আমার এই দোষে অনেকেই আমার উপর বিরূপ হইয়াছেন কিন্তু আমার সেই আত্মীয়টি বিরূপ হন নাই; তাঁহার সঙ্গে আরও ৪।৫ বার আমার দেখা হইয়াছে। তিনি আমার এই বৈধব্যে বড়ই বেশী দুঃখিত হইয়াছেন, আমার দিকে তাকাইলেই তাঁর চোক দুটি ছল ছল করে। আমার এইটাই আশ্চর্য্য বোধ হয়, যে জন্য আমি কিছুমাত্রও ভাবি না, সেজন্য অন্য সকলে এত ভাবিয়া সারা হয় কেন?

দাম্পত্য প্রেম কি জিনিস, আমার সে সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নাই,

অন্য কোন ব্রহ্মচর্য্যবিরোধী ভাবও কখন আমার কল্পনাতেও আসে না—ঐ সব বিষয়ের কথাবার্ত্তা যেন আমার কাছে মিথ্যা গল্পের ন্যায়, কি একটা স্বপ্নের মত বোধ হইল।

তিনি সঙ্গোপনে আমাকে পুনরায় বিবাহ দিবার প্রস্তাবও আমার কাছে করিয়াছিলেন। বলিব কি, তাঁর মুখে সে কথা শুনিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল, তিনিও কি আমার মন জানেন না? বিবাহ করিব? আবার বিবাহ করিব? কাহাকে বিবাহ করিব? বিবাহের কি প্রয়োজন? কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়াই আমি বোধ করি না! আমার প্রাণের মধ্যে যে কেমন করে, কি ভাবি, কি করি, তা আমিই জানি, কিন্তু সকলকে ঠিক বলিতেছি, যাহাই ভাবি না কেন, তাহাতে আমি খুব সুখ পাই, শান্তি পাই, আমোদ পাই। স্বামীভক্তি কি, তাহাও জানি না, আমার অদৃষ্টে তাহা নাই—আমার দোষেই নাই—অথবা তাই বা বলিব কেন—আমার অদৃষ্টে ছিল না বলিয়াই নাই—নতুবা আমার মন এমন হইবে কেন? যাহা হউক, সে না হইয়াছে ভালই হইয়াছে, তাহা হইলে বিধবা হওয়ার কষ্টটা বড়ই অনুভব করিতাম বোধ হয়, কারণ আমার মত বিধবারা যেরূপ কষ্ট পায় দেখি! আমি সধবা জানি না, বিধবাও জানি না, যেমন পূর্ব্বেও ছিলাম, এখনও তেমনি আছি। বেশ আছি। আমার এ হৃদয়ে স্নেহ ভালবাসা নাই, তাহা কেহ ভাবিবেন না। প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া যে কি সুখ, কি শান্তি, তাহা আমি বিশেষ জানি—বোধ হয় আমার মত কেহই জানেন না। আমি ইহ-পরকালে কোনও প্রতিদান চাহি না, জগতের কাহারও কাছে আমার হৃদয়ের স্নেহ ভালবাসা জানাইতেও চাহি না—ভাল না বাসিয়া পারি না, তাই ভালবাসি, সেই আমার পুরস্কার। যাঁহাকে আমি ভালবাসি, তিনি নিকটে থাকুন বা দূরে থাকুন, আমার তাহাতে কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, তাঁহাকে দেখিলে সুখী হই বটে, তাঁহার দাস্য করিতে পাইলে জীবন সার্থক জ্ঞান করি বটে, কিন্তু না দেখিলেও ভালবাসার কোন ব্যত্যয় নাই। তিনি ইহলোকেই থাকুন, পরলোকেই থাকুন, চিরদিন তাঁহাকে ভক্তি করিব, ভালবাসিব। আমার কোন কামনাই নাই, প্রেম কাহাকে বলে, তাহাও জানি না, কেবল আমি ঐ একমাত্র সার জানি, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি কোনও রূপ প্রতিদানের প্রয়াসী নহি—পাইলেও প্রত্যাখ্যান করি, কখন গ্রহণ করি না।

আমাকে সকলে 'পাগলী' বলে, কারণ আমি এখনও কথাবার্ত্তায় সেই

১০।১১ বছরের মত আছি, কাজে কর্ম্মেও তাই, অথচ আমার বয়স ১৫।১৬ বৎসর হইল। আচ্ছা, সেটাও একটা দোষ না কি? দোষই হোক আর গুণই হোক্, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, মনের ভাব গোপন করার দরকার যেন আমার কোন দিনই না হয়—আমার হৃদয়ের পবিত্র ভালবাসার বস্তু যেন চিরদিন আমার কাছে পবিত্র থাকেন, তাঁহার সহিত চিরদিন যেন এইরূপ অসঙ্কোচে আমি মিশিতে পারি, কথা কহিতে পারি, সেবা করিতে পারি; এ জগতের কাহারও যেন সাধ্য না হয়, যে তাহা হইতে আমাকে নিবৃত্ত করে বা তাহাতে কোন কথা বলিবার অবসর পায়! পাপ হউক, পুণ্য হউক, যাহাই হউক, কিছুই আমি চাই না, আমি কেবল এই চাই, চিরদিন যেন পাগলীই থাকি, কখনও যেন আমাকে অশ্রুজল ফেলিয়া আত্মীয়-স্বজনকে পীড়িত করিতে না হয়, এ হৃদয়ে যেন দুঃখের—কি শোকের কোন স্থান না থাকে, কেবল দিনে দিনে হৃদয়ের অদৃশ্য হস্তরোপিত ভালবাসালতাটি বৃদ্ধি পাইয়া সমস্ত স্থান পূর্ণ করিয়া ফেলে, অন্য কাহারও যেন তথায় স্থান না হয়, আমার সেই প্রিয় বস্তুকে মনে করিয়া আমি যেন এ সংসারের অশ্রুজল যথাসাধ্য মুছাইয়া যাইতে পারি।

আপনারা আমার এ ক্ষুদ্র জীবনের কাহিনী শুনিলেন,—আপনারা প্রথমে আমাকে এই আশীর্ব্বাদটি মন খুলিয়া করুন, তারপর আমাকে যত ইচ্ছা গালাগালি দিন, তিরস্কার করুন, যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন, আমি তাহাতে বিন্দুমাত্রও ক্ষুব্ধ হইব না। এ সংসারের নিন্দা প্রশংসাতে আমার কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু তারপর? সেই জন্যই আপনাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। আমার কোন দুঃখ দূরের জন্যও আশীর্ব্বাদ চাহি না, আমার এ অবস্থার জন্যও আপনাদের সহানুভূতি করিতে বলি না, কারণ ইহা আমার নিকট দুঃখই নয়। কেহ কেহ দুঃখ করিয়া বলেন, আহা, যৌবনে যোগিনী! যৌবন কাহাকে বলি, ষোড়শী হইয়াও এ পর্য্যন্ত তাহা জানি না, জানিতেও চাহি না; সে কখন আসে, কখন যায়, তাহা যেন আমি জানিতেও না পারি, যোগিনী হওয়া কি, তাও জানি না, তবে ধ্যান করিতে শিখিয়াছি, তাহাতেই যেন জীবন কাটিয়া যায়, এই আমার ভিক্ষা, এই আমার প্রার্থনা, এই আমার আত্ম-নিবেদন। আপনারা কৃপা করিয়া বলুন,—তথাস্তু, আমিও বিদায় হই।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

ন-আনন্দ।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হালিসহরের একটী বাড়ীর প্রদীপ আজ নিবিয়া গেল। গৃহিণী অভাবে লোকের গৃহ শূন্যময় অন্ধকারাচ্ছান্ন হয়, হরপ্রসাদ ঘোষের বাড়ীটী আজ সেই দশা প্রাপ্ত হইল। তাঁহার সপ্তবিংশতি বর্ষীয়া সহধর্ম্মিণী আজ লোকান্তর গমন করিলেন। ঐ দেখ, রূপলাবণ্যভ্রষ্টা বিধুমুখীর অচেতন দেহ বিশুষ্ক গোলাপফুলের ন্যায় প্রাণহীন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। শবপার্শ্বে এক নিস্পন্দ পুরুষমূর্ত্তি উপবিষ্ট, সে মূর্ত্তি অতি ধীর গম্ভীর প্রশান্ত। হরপ্রসাদের মুখে আর সে হাস্যময় প্রফুল্লভাব নাই, চক্ষে সে প্রীতিপূর্ণ জ্যোতিঃ নাই,—ক্রমাগত রাত্রিজাগরণ এবং দুশ্চিন্তা হেতু নয়নযুগল কোটরপ্রবিষ্ট কালিমা বেষ্টিত হইয়াছে। হরপ্রসাদ অর্থশূন্যনেত্রে বিগত-প্রাণা প্রেয়সীর দেহপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন; চক্ষের পলক যেন আর পড়িতে চাহে না। হরপ্রসাদের নয়নে একবিন্দুও জল নাই, তাঁহার কাঁদিবার শক্তি অন্তর্হিত। ধীর স্থির নির্ব্বাক নিস্পন্দ হরপ্রসাদের হৃদয় পাষাণবৎ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; প্রবল শোক তাঁহাকে নির্ব্বিকার করিয়াছে, তাই তিনি "নাহং সুখী নাহং দুঃখী" যোগীর ন্যায় কি এক প্রকার ধ্যানে নিমগ্ন। মায়িক জগতের পক্ষে হরপ্রসাদ আজ মৃত। যে দিন হইতে গৃহিণীর জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেইদিন হইতে ধীরে ধীরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, বলিলে চলে। বিধুমুখীর ক্রমশঃ রোগবৃদ্ধি এবং চিকিৎসকগণের হতাশবচন হরপ্রসাদকে যেন মোহময় সংসারের সাধারণ নিয়মাদির বহির্ভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

সেই শোকসমাচ্ছন্ন কক্ষ মধ্যে দারুণ রোদন ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। সে রোদনধ্বনি হরপ্রসাদের একমাত্র পুত্র মাতৃহীন নলিনের। বালক মৃতা মাতার পা দু-খানি ধরিয়া কাঁদিয়া আকুল। আজ হইতে এ সংসারে "মা" বলিয়া ডাকিবার কেহ রহিল না, ইহা ভাবিয়া বালক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে ও মাতার শীতল চরণ দু-খানি চক্ষের জলে অভিষিক্ত করিতেছে। তাহাকে সান্ত্বনা করিবার কেহ নাই, বুঝাইবার কেহ নাই। পিতার সেই ধীর স্থির জড়ভাব দেখিয়া মাতৃহীন বালকের যন্ত্রণা যেন আরও বাড়িতেছে!

হরপ্রসাদের সেই গম্ভীর বিষাদ, নির্ব্বাক বিলাপ, অর্থশূন্য চক্ষুদ্বয় হইতে বহির্গত হৃদয়াগ্নি অনুভব করিয়া বালকের যাতনা যেন দ্বিগুণ হইতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে হরপ্রসাদ হঠাৎ চৈতন্যলাভ করিলেন। গাত্রোত্থান করতঃ অতি ধীর পাদবিক্ষেপে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া প্রতিবেশী বন্ধুগণকে ডাকিয়া আনিলেন। কৃষ্ণত্রয়োদশীর গভীর নিশীথে হরপ্রসাদ প্রাণপ্রিয়া গৃহিণীর চিতাভস্ম পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর জলে ভাসাইয়া দিয়া কথঞ্চিৎ ঋণমুক্ত হইলেন।

এ সংসারে স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি যাহাদিগকে আমরা সর্ব্বদা "আমার আমার" করি, কেহই প্রকৃত আমার নহে, অন্য পরে কা কথা, এই যে সাধের তনু, সেটীও আমার নয়। এত যত্নে "আমার" "আমার" করিয়া পুষ্ট করতঃ শেষে ইহাকেও জননী ধরিত্রীর করে সমর্পণ করিয়া যাইতে হয়। পৃথিবীতে কেহই যদি বাস্তবিক আমার নয়, তবে কোন্ কুহকে এরূপে সকলকে "আমার" "আমার" করিয়া মরি? এ কুহক ঋণদায়, এ দুনিয়া কেবলমাত্র দেনা-পাওনার কারখানা; এখানে আমরা সুদু পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋণ পরিশোধ করিতে বারম্বার যাতায়াত করিতেছি, এক ঋণ শোধ করিতে আসিয়া আবার নূতন নূতন ঋণ করিতেছি, তাই এই গমনাগমনের শেষ করিতে পারি না। ঋণের জের একদম্ না মিটাইতে পারিলে ভববন্ধন ছেদনের অন্য উপায় নাই। আমরা যাহা কর্ত্তব্য মনে করিয়া কায়মনোবাক্যে সম্পাদন করি, তাহা ঋণ পরিশোধের চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। নতুবা কিসের কর্ত্তব্য? মরি! মরি! কি সুন্দর ব্যবস্থা! পিতৃ ঋণ, মাতৃ ঋণ, ভ্রাতৃ ঋণ, স্ত্রী ঋণ, কন্যা ঋণ, ভগ্নী ঋণ, আত্মীয়-কুটুম্ব-বন্ধুবান্ধবগণের ঋণ, সমাজের ঋণ, স্বদেশের ঋণ, সমগ্র মানব-মণ্ডলীর ঋণ, সূর্য্যচন্দ্রগ্রহাদির ঋণ, পূর্ব্বপুরুষগণের ঋণ, দেবতাদের ঋণ, পশু-পক্ষীকীটপতঙ্গ বৃক্ষলতাগুল্ম প্রভৃতির ঋণ;—মূলকথা, বিশ্বচরাচরের জড়চৈতন্য উদ্ভিদাদি যাবতীয় পদার্থের নিকট আমরা নানাপ্রকার ঋণে আবদ্ধ হইতেছি, হইয়াছি, আরও কতকাল হইব, ঠিক নাই। আবার এই বিপুল ঋণ প্রতিনিয়ত চিন্তা বাক্য ও কার্য্য দ্বারা বৃদ্ধি পাইতেছে। কি সর্ব্বনাশ! পাঠক হয় ত মনে করিতে পারেন, একাকী আসিয়াছি, একাকী যাইব, কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তবে এত ঋণ কিসের? প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়; দেখিতে একা আসা, একা যাওয়া, কিন্তু সমগ্র বিশ্বের সবাই পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্যশৃঙ্খলে বদ্ধ, কেহ কাহাকেও ছাড়িতে পারে না, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলেই একত্রে বাঁধা। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী সেন-গৃহিণী।

মুকুন্দ-মালা

(কুলশেখর-রাজ-বিরচিতা)

(২৬)

তৃষ্ণাতোয়ে মদনপবনোদ্ধূতমোহোর্ম্মিমালে
দারাবর্ত্তে তনয়সহজগ্রাহসঙ্ঘাকুলে চ।
সংসারাখ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতে মে ত্রিধামন্
পাদাম্ভোজে বরদ ভবতো ভক্তিনাবং প্রদেহি॥

সংসার-সাগর এই পরম ভীষণ,
বিষয়-বাসনা-জল, মদন-পবন;
সর্ব্বদা উঠিছে মোহ-তরঙ্গ সকল,
গৃহিণী-আবর্ত্ত রয় পরম প্রবল;
তনয়-কুম্ভীর যত ভাসিতেছে তায়,
সমস্ত ভয়ের বস্তু রয়েছে তথায়।
এ হেন সাগরে মগ্ন আছি হে সদাই!
ভক্তি-তরি দাও হরি! পার হ'য়ে যাই!

(২৭)

মা দ্রাক্ষং ক্ষীণপুণ্যান্ ক্ষণমপি ভবতো ভক্তিহীনান্ পদাব্জে
মা শ্রৌষং শ্রাব্যবন্ধং তব চরিতমপাস্যান্যদাখ্যানজাতম্।
মা স্মার্ষং মাধব ত্বামপি ভুবনপতে চেতসাঽপহ্নুবানান্
মা ভূবং ত্বৎসপর্য্যাব্যতিকররহিতো জন্মজন্মান্তরেঽপি॥

যেই জন ভক্তিহীন তব পদে হরি!
সে পাপীর মুখ যেন কভু নাহি হেরি।
যে কথায় নাই তব চরিত্র-বর্ণন,
সুমিষ্ট হ'লেও যেন না করি শ্রবণ।
হে মাধব! লোকনাথ! নাস্তিক যে জন,
তারে যেন কভু মনে না করি স্মরণ।
জন্মে জন্মে যদি আমি আসি এ ধরায়,
ক্ষান্ত যেন নাহি হই তোমার সেবায়

(২৮)

জিহ্বে কীর্ত্তয় কেশবং মুররিপুং চেতো ভজ শ্রীধরং
পাণিদ্বন্দ্ব সমর্চ্চয়াঽচ্যুতকথাঃ শ্রোত্রদ্বয় ত্বং শৃণু।
কৃষ্ণং লোকয় লোচনদ্বয় হরের্গচ্ছাঙ্ঘ্রি যুগ্মালয়ং
জিঘ্র ঘ্রাণ মুকুন্দপাদতুলসীং মূর্দ্ধন্ নমাঽধোক্ষজম্ ॥

কেশবের গুণ জিহ্বে! কর সঙ্কীর্ত্তন,
মুরারির পদ-চিন্তা কর, ওরে মন!
শ্রীধরের পূজা তুমি কর, ওরে কর!
অচ্যুতের কথা কর্ণ! শুন নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি সদা দেখ রে নয়ন!
হরির মন্দিরে সদা যাও রে চরণ!
হে নাসিকে! কর তুমি এই অবধান,
মুকুন্দের পদ-তুলসীর লও ঘ্রাণ!
হে মস্তক! শুন এই বচন আমার,
অধোক্ষজ-পদে তুমি কর নমস্কার!

(২৯)

হে লোকাঃ শৃণুত প্রসূতিমরণব্যাধেশ্চিকিৎসামিমাং
যোগজ্ঞাঃ সমুদাহরন্তি মুনয়ো যাং যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ঃ।
অন্তর্জ্যোতিরমেয়মেকমমৃতং কৃষ্ণাখ্যমাপীয়তাং
তৎ পীতং পরমৌষধং বিতনুতে নির্ব্বাণমাত্যন্তিকম্ ॥

শুন শুন বলি আমি, শুন ওহে নর!
জন্ম মৃত্যু এই দুই রোগ ভয়ঙ্কর।
যাজ্ঞবল্ক্য-আদি যত যোগবিৎ মুনি,
এ রোগের এ বিধান ক'রেছেন শুনি,—
যাহা জ্যোতির্ম্ময়, যাহা পরম প্রচুর,
সেই কৃষ্ণ-নাম-সুধা পিও সুমধুর।
ভক্তিভরে কর যদি এ ঔষধ পান,
জন্ম মৃত্যু রোগ যাবে, পাইবে নির্ব্বাণ!

(৩০)

হে মর্ত্ত্যাঃ পরমং হিতং শৃণুত ভো বক্ষ্যামিসংক্ষেপতঃ
সংসারার্ণবমাপদূর্ম্মিবহুলং সম্যক্ প্রবিশ্য স্থিতাঃ।
নানা জ্ঞানমপাস্য চেতসি নমো নারায়ণায়েত্যমুং
মন্ত্রং সপ্রণবং প্রণামসহিতং প্রাবর্ত্তয়দ্ধ্বং মুহুঃ ॥

বিপৎ-তরঙ্গ-ময় সংসার-সাগরে,
মগ্ন আছ ওহে নর! চিরদিন ধ'রে।
যাহাতে তোমার হয় মঙ্গল-সাধন,
সঙ্ক্ষেপে তাহাই আমি বলি হে এখন,—
নানাবিধ জ্ঞান-লিপ্সা করি পরিহার
প্রণব প্রণাম সহ তুমি অনিবার
মনে মনে ভক্তিভাব রাখি সর্ব্বক্ষণ,
"নমো নারায়ণ!" মন্ত্র কর উচ্চারণ!

(৩১)

পৃথ্বী রেণুরণুঃ পয়াংসি কণিকা ফল্গুঃ স্ফুলিঙ্গো লঘু-
স্তেজো নিশ্বসনং মরুৎ তনুতরং রন্ধ্রং সুসূক্ষ্মং নভঃ।
ক্ষুদ্রা রুদ্রপিতামহপ্রভৃতয়ঃ কীটাঃ সমস্তাঃ সুরা
দৃষ্টে যত্র স তারকো বিজয়তে শ্রীপাদধূলীকণঃ ॥

তোমার চরণ-ধূলি বিচিত্র-ব্যাপার,
যাহার প্রভাবে হয় জীবের উদ্ধার।
জয় তব শ্রীপদের এক ধূলি-কণা!
হরি হে! তাহার সনে কাহার তুলনা?
তার কাছে পরমাণু এই ভূমণ্ডল,
অসার কণিকা-সম সমুদ্র সকল।
রহে যত তেজোময় জ্যোতিষ্ক-নিচয়,
অতি লঘু অগ্নি-কণা তুল্য বোধ হয়।

বায়ুরাশি বোধ হয় ক্ষণিক নিশ্বাস,
ক্ষুদ্র ছিদ্র বোধ হয় অনন্ত আকাশ।
কিবা শিব, কিবা ব্রহ্মা, যত দেবগণ
বোধ হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের মতন!

(৩২)

বদ্ধেনাঞ্জলিনা নতেন শিরসা গাত্রৈঃ সরোমোদ্গমৈঃ
কণ্ঠেন স্বরগদ্গদেন নয়নেনোদ্গীর্ণবাষ্পাম্বুনা।
নিত্যং ত্বচ্চরণারবিন্দুযুগলধ্যানামৃতাস্বাদিনা-
মস্মাকং সরসীরুহাক্ষ সততং সম্পাদ্যতাং জীবিতম্॥

কৃতাঞ্জলি-পুটে পুনঃ অবনত-শিরে,
পুলকিত-গাত্রে পুনঃ গদ্গদ-স্বরে,
প্রেমভরে অশ্রু-পূর্ণ-নয়ন-যুগলে,
চিন্তিতে চিন্তিতে তব চরণ-কমলে,
করিতে পারি হে যেন জীবন যাপন,
কৃপা করি কর তাহা কমল-লোচন!

(৩৩)

হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে হে সিন্ধুকন্যাপতে
হে কংসান্তক হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ হে মাধব।
হে রামানুজ হে জগত্ত্রয়গুরো হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাং
হে গোপীজননাথ পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা॥

হে গোপাল! রমানাথ! করুণা-সাগর!
হে গজেন্দ্র-কৃপা-পর! কংস-ধ্বংস-কর!
হে মাধব! রামানুজ! ত্রিভুবন-পতি!
হে পদ্ম-নয়ন! ওহে গোপীজন-গতি!
ইহাই প্রার্থনা, মোরে রক্ষা কর তুমি,
তোমা বিনা কাহাকেও নাহি জানি আমি!

(৩৪)

ভক্তাপায়ভুজঙ্গগারুড়মণিস্ত্রৈলোক্যরক্ষামণিঃ
গোপীলোচনচাতকাম্বুদমণিঃ সৌন্দর্য্যমুদ্রামণিঃ।
যঃ কান্তামণিরুক্মিণীঘনকুচদ্বন্দ্বৈকভূষামণিঃ
শ্রেয়ো দেবশিখামণির্দিশতু নো গোপালচূড়ামণিঃ॥

যিনি ভক্তাপায়-সর্প-গরুড়-রতন,
ত্রিভুবন-রক্ষা-মণি যিনি অনুক্ষণ,
গোপী-নেত্র-চাতকের যিনি মেঘমণি,
অতিশয় সৌন্দর্য্যের একাদর্শ যিনি,
কান্তামণি রুক্মিণীর যিনি কুচমণি,
ত্রিভুবনে সর্ব্ব-দেব-শিরোমণি যিনি,
গোপ-চূড়া-মণি যাঁর নাম অবিরল,
তিনি আমাদের সদা করুন কুশল!

(৩৫)

শক্রচ্ছেদৈকমন্ত্রং সকলমুপনিষদ্বাক্যসম্পূজ্যমন্ত্রং
সংসারোত্তারমন্ত্রং সমুপচিততমঃসঙ্ঘনির্যাণমন্ত্রম্।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যৈকমন্ত্রং ব্যসনভুজগসন্দষ্ট সংত্রাণমন্ত্রং
জিহ্বে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রং জপ জপ সততং জন্মসাফল্যমন্ত্রম্॥

যে মন্ত্র জপিলে হায় শক্র নষ্ট হয়,
যে মন্ত্রকে পূজে উপনিষদ্-নিচয়,
যে মন্ত্র জপিলে লোক তরয়ে সংসার,
যে মন্ত্র জপিলে ঘুচে মনের আঁধার,
যে মন্ত্র জপিলে সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য আসিবে,
যে মন্ত্র জপিলে সর্ব্ব বিপদ্ যাইবে,
যে মন্ত্র জপিলে হয় জীবন সফল,
সেই কৃষ্ণ-মন্ত্র জিহ্বে! জপ অবিরল! (ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি-এ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল-প্রোক্ত—

শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ।

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সঙ্কলিত।

১। একাদশী তিথি অন্ন না খাইহ আর।
যতনে পালিহ তুমি এ বোল আমার॥ আদিখণ্ড ৫৯ পৃ।

২। মরণ সভার মাতা! আছয়ে নিশ্চয়।
ব্রহ্মা রুদ্র সমুদ্র পর্ব্বত-হিমালয়॥
ইন্দ্র বরুণ অগ্নি—কালে সর্ব্ব নাশে।
মরণ লাগিয়া কেনে পাইছ তরাসে॥ আঃ ৬০ পৃষ্ঠা।

৩। বান্ধবের কার্য্য মৃত্যুকালে সত্য জানি।
স্মরণ করায় প্রভু দেব যদুমণি॥ আঃ ৬০ পৃষ্ঠা।

৪। শোক না করিহ আর—শুন মোর মাতা।
নির্ব্বন্ধ না ঘুচে যেই লিখিল বিধাতা॥ আঃ ৭৭ পৃষ্ঠা।

৫। লোহ-মোহ-কাম-ক্রোধে মত্ত পশুগণ।
কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত সর্ব্বজন॥
সঙ্গিগণে হাসিয়া বুঝান ভগবান্—।
যে বুদ্ধি পশুতে সে মানুষে বিদ্যমান॥
কৃষ্ণজ্ঞান নাঞি মাত্র পশুর শরীরে।
মনুষ্যে না ভজে কৃষ্ণ—পশু বলি তারে॥ আঃ ৮৫ পৃষ্ঠা।

৬। বিপ্রপাদোদক খাইলে সর্ব্ব পাপ হরে॥ আঃ ৮৬ পৃষ্ঠা।

৭। কৃষ্ণ না ভজিলে দ্বিজ নহে কদাচিত।
পুরাণে প্রমাণ এই শিক্ষা আছে নীত॥ আঃ ৮৬ পৃষ্ঠা।

৮। কৃষ্ণদীক্ষা বিনু দেহ অকারণ লেখি।
পুরাণে এ সব বাক্য সাধুমুখে সাক্ষী॥ আঃ ৮৬ পৃষ্ঠা।

৯। প্রভু কহে—ভক্ষ্য সঙ্গে মনুষ্যের জন্ম।
না বুঝি বিকল হঞা করে কত কর্ম্ম॥ আঃ ৮৭ পৃষ্ঠা।

১০। পড় এক সত্য বস্তু—কৃষ্ণের চরণ।
সে ই বিদ্যা—যাথে হরিভক্তির লক্ষণ॥

অবিদ্যা সকল—কৃষ্ণবিনু—শাস্ত্রে কহে।
রাধাকৃষ্ণভক্তি বিনে কেহো সঙ্গী নহে॥
বিদ্যা-কুল-ধনমদে কৃষ্ণ নাহি পায়।
ভক্তিতে সে অনায়াসে পাই যদুরায়॥ মধ্যখণ্ড ৮৯ পৃঃ।

১১। বৈষ্ণব-প্রসাদে প্রেম পাবে মাতা তুমি॥ মঃ ৯০ পৃষ্ঠা।

১২। ঠাকুর কহিলা পুন—শুনহ মুরারি।
আমারে পিরিতি কর—এই প্রেমা তোরি॥
ভজিবে পরমব্রহ্ম নরাকৃতি-তনু।
ইন্দ্রনীল-বরণ—ত্রিভঙ্গ—করে বেনু॥
নবগোরোচনাগর্ভ-গর্ব্ব-ভঙ্গ-দ্যুতি।
বৃষভানুসুতানাম—মূল যে প্রকৃতি॥
নব-বরাঙ্গনা কত বল্লবী-বল্লবে।
সমর্পিবে নিজ তনু—নন্দসুতে পাবে॥
চিন্তামণি ভূমি রত্নমন্দির সুন্দর।
কল্পবৃক্ষ রত্নবেদী আসন উপর॥
কামধেনুগণ তথা অচিন্ত্যপ্রভাব।
অভীষ্ট করয়ে পূর্ণ—করয়ে যে ভাব॥
তার অঙ্গ-ছটা নিরাকার ব্রহ্ম বলি।
জানিবে এসব তত্ত্ব কৃষ্ণের মাধুরী॥ মঃ ৯২ পৃষ্ঠা।

১৩। নাম—রূপী, নাম—এক আদি যে পুরুষ।
কলি মূর্ত্তিমন্ত আছে—না জানে মূরুখ॥
নাম রূপী ভগবান্—জানিবে কেবল।
দ্বিধা ঘুচাইতে ব্যাস বোলে তিনবার॥ *
তিনবার বহি আর আছে একবার।
দুরাশয় পাপী জীব জন বুঝাবার॥
হরিনাম-মাত্রে হয় কৈবল্য তাহার।
কেবল—কৈবল্য-অর্থ জানিবে তাহায়॥

* অর্থাৎ 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।'

ইহা বহি আন দেব মানে যেই জন।
তার গতি নাহি—তিনবার এ বচন †॥ মঃ ৯৩ পৃষ্ঠা।

১৪। হৃদয়ে যাবত কৃষ্ণ উদয় না করে।
তাবত তীর্থের অনুগ্রহ নাহি তারে॥
কৃষ্ণপ্রেম বিনু ধর্ম্ম কেহো কিছু নহে।
পড়িয়া দেখহ ইহা শাস্ত্রে সব কহে॥ মঃ ৯৪ পৃষ্ঠা।

১৫। মনোরথ-সিদ্ধি হৈব বৈষ্ণব-প্রসাদে॥ মঃ ৯৪ পৃঃ।

১৬। মোর মায়াবলে সৃষ্টি সকল সংসার।
না বুঝি সকল লোক বোলে আপনার॥
মোর মায়া-দড়ি কেবা ছিঁড়িবারে পারে।
সবে এক পথ আছে মায়া জিনিবারে॥
যতযত দেহ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে লোকে।
সর্ব্বকর্ম্ম আরোপণ করে যদি মোকে॥
নহে বা সকল এই হয় অনর্থক।
ঈশ্বরে অর্পিলে সব সংসার সার্থক॥ মঃ ৯৮ পৃঃ।

১৭। সকল সম্পদ চাহ আপনার হিত।
দ্বিভুজ-ধেয়ানে তবে মজাইবে চিত॥ ঐ

১৮। জীবার বাসনা যদি থাকয়ে তোমার।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে যদি ইচ্ছা থাকে আর॥
অধ্যাত্ম-চরচা তবে কর পরিত্যাগ।
গুণসংকীর্ত্তন কর কৃষ্ণে অনুরাগ॥ ঐ

১৯। কৃষ্ণপাদাম্বুজ প্রেম ভক্তি সর্ব্বসারে॥ মঃ ১০১ পৃঃ।

২০। তবে সেই গৌরহরি বোলে পুনর্ব্বার—।
অধ্যাত্ম-চরচা তোরা না করিবি আর॥
যদি বা অধ্যাত্মবাদে দেখি শুনি তোমা।
তবে পুন তোসভারে নাহি দিব প্রেমা॥ মঃ ১০২ পৃঃ।

২১। করিহ আমাতে ভক্তি—সুখ পাবে বড়ি॥ মঃ ১০৪ পৃঃ।

২২। তোমার জ্যেষ্ঠের সেবা আমার অর্চ্চন॥ মঃ ঐ।

† 'কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।'

২৩। নিত্যানন্দ-প্রতাপে পবিত্র ত্রিভুবন॥
মঃ ১০৫ পৃষ্ঠা।

২৪। শুনশুন সর্ব্বজন আমার বচন।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি এই নহে সাধারণ॥
আগে জ্ঞান হয়—তবে উপজে বিরক্তি।
তবে সে জনমে সর্ব্বভোগে বিরকতি॥
এইমনে ক্রমেক্রমে বাঢ়ে অনুদিন।
কৃষ্ণ-অনুরাগ বাঢ়ে—হয় পরবীণ॥ মঃ ১০৫ পৃঃ।

২৫। নিত্যানন্দ-পাদোদক লহ শিরোপরি।
পাইবে পরম-প্রেমা-আনন্দ-লহরী॥ মঃ ১১১ পৃঃ।

২৬। এই মোর হরিনাম দেহ ঘরেঘরে। মঃ ১১২ পৃঃ।
হাসিয়া কহিল প্রভু ভক্ত সভাকারে—॥
সভারে শিখাও হরিনাম গ্রন্থ করি।
অনায়াসে সব লোক যাউ ভব তরি॥ ঐ

২৭। হরিনামসঙ্কীর্ত্তন কলিযুগধর্ম্ম।
নাম-গুণ-সঙ্কীর্ত্তনে সাধিব সব কর্ম্ম॥
আনহ যেথানে যেই আছে বন্ধুজন।
মিলিয়া সকল লোক কর সঙ্কীর্ত্তন॥
গায়ন বায়ন সে মৃদঙ্গ করতাল।
উচ্চস্বরে কর নামকীর্ত্তন রসাল॥ মঃ ১১৩ পৃঃ।

২৮। একবার নিত্যানন্দ বোলে জন্ম ধরি।
সে জন পবিত্র হৈল—সে লোক আমারি॥ মঃ ১১৪ পৃ।

২৯। দয়া করি পুন কহে গৌর ভগবান্।
জগাই-মাধাই তোরা পাপ দে রে দান॥ মঃ ১১৫ পৃঃ।

৩০। ধন জন যৌবন—সকল অকারণ।
না ভজিনু সত্য বস্তু কৃষ্ণের চরণ॥
নিরন্তর দগ্‌ধে সংসারে মোর হিয়া।
না করিলুঁ কৃষ্ণকর্ম্ম হেন দেহ পাঞা॥
সংসারে দুর্ল্লভ এই মানুষশরীর।
কৃষ্ণ ভজিবারে কিবা পুরুষ-নারীর॥

কৃষ্ণ না ভজিলে এই মিছা সব দেহ।
পতি সুত পিতা মাতা মিছা সব গেহ॥ মঃ ১১৯ পৃঃ।

৩১। সংসারে যতেক জীব—সে-ই মোর মিত্র।
বৈষ্ণবের দ্বেষ করে—সেই মোর শত্রু॥
বৈষ্ণবের অপরাধ করে যেইজন।
তার পরিত্রাণ আমি না করি কখন॥
বাহিরে পরাণ দেখ এই মোর দেহ।
বৈষ্ণব অন্তরে প্রাণ—নাহিক সন্দেহ॥
বৈষ্ণবের সেবা করে মোর করে দ্বেষ।
তার পরিত্রাণ করি ঘুচাইয়ে ক্লেশ॥
বৈষ্ণবের হিংসা করে যেই মূঢ় জন।
নরকে পড়য়ে—তার নাহিক শরণ॥ মঃ ১২০ পৃঃ।

৩২। সর্ব্বধর্ম্মসার এই সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্ম।
বিশেষ জানিবে কলিযুগে এই কর্ম্ম॥
পঞ্চম সে বেদ হৈতে প্রকাশ ইহার।
শিব তেঁই পঞ্চমুখে গায় অনিবার॥
নারদ বীণায় গাই বুলয়ে নাচিয়া।
শুক-সনকাদি ভক্ত বুলয়ে গাইয়া॥
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ এই বেদ লঞা।
গোপীসঙ্গে নাচি বুলে প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
নিত্য বৃন্দাবনে স্থিতি পঞ্চম জানিবে।
তেঞি শিব গান করে মহাপ্রেমভাবে॥
তথাপি গাইয়া শিব ওর না পাইল।
হেন বেদ কলিযুগে প্রকাশ হইল॥
গানে যেই করে সেই প্রবোধ হইয়া।
গানরূপে বেদের উচ্চারে মহাদয়া॥
সব-লোক-কর্ণ-গর্ত্ত—কুণ্ড-পরিসর।
জিহ্বা—স্রুব, ধ্বনিরস—ঘৃত মনোহর॥
অন্তরে প্রবিষ্ট হঞা ভাব-অগ্নি জ্বালে।
অগ্নিশিখা—পুলকাশ্রু কম্প কলেবরে॥

সর্ব্বপাপে মুক্ত হৈয়া সব জন নাচে।
সালোক্যাদি মুক্তি তার ফিরে পাছেপাছে॥
কদাচ না দেখে সেই নয়ানের কোণে।
নাচিয়া বুলয়ে কৃষ্ণরস-আস্বাদনে॥
সে যজ্ঞ বেড়িয়া রহে বৈষ্ণব আচার্য্য।
জানিবে কীর্ত্তনযজ্ঞ—সর্ব্বযজ্ঞ-আর্য্য॥
ইহাতে জন্মিল এই প্রেম মহাধন।
ইহার গৃহস্থ—নিত্যানন্দ-আবরণ॥
গদাধর পণ্ডিত এই প্রেমের গৃহিণী।
এই তত্ত্ব জানিবে সকল ভক্তমণি॥
অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি আমারে আনিঞা।
সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞ স্থাপে সুদৃষ্টি হইয়া॥
শ্রীনিবাস-নরহরি-আদি ভক্তগণ।
তোসভারে লঞা মোর যজ্ঞের স্থাপন॥
এই যজ্ঞ কলিকালে দেহ ঘরেঘরে।
তরুক সকল লোক পতিত পামরে॥ মঃ ১২৪ পৃঃ॥

৩৩। সত্যযুগে পূর্ণধর্ম্ম ধ্যানমাত্র সাধি।
ত্রেতায় সাধয়ে যজ্ঞধর্ম্ম উদারধী॥
দ্বাপরে কৃষ্ণের পূজা কহিল এ মর্ম্ম।
কলিযুগে শক্তি কেহো নহে এই কর্ম্ম॥
আপনে ঠাকুর নামরূপী ভগবান্।
কলিযুগে সর্ব্বশক্তিময় হরিনাম॥
সত্য-আদি তিনযুগে যত সব জন।
ধ্যান-যজ্ঞার্চ্চনাবিধি সেবে নারায়ণ॥
পাপ কলিযুগে লোক দুরন্ত-চরিত।
এই ত কারণে দয়া ভেল বিপরীত॥
আপনে ঠাকুর নিজসঙ্কীর্ত্তনরূপে।
অনায়াসে সর্ব্বসিদ্ধি সাধি কলিযুগে॥
সত্য-আদি যুগে যাহা সাধি মহাদুখে।
প্রভুর কৃপাতে সুখে সাধি কলিযুগে॥ মঃ ১২৮ পৃঃ।

৩৪। কৃষ্ণের উদ্দেশে মুঞি দেশেদেশে যাব।
কোথা গেলে প্রাণনাথ কৃষ্ণ মুঞি পাব ॥ মঃ ১২৯ পৃঃ।

৩৫। কৃষ্ণবিনু জীবন—জীবনে নাহি লেখি।
কি কাজ এ ছার জীবে—যেন পশু পাখী ॥
মড়ার যেহেন সর্ব্ব অবয়ব আছে।
জীবা কে—জীয়ায় যেন লতাপাতা গাছে ? ॥
কৃষ্ণবিনু ধর্ম্মকর্ম্ম, দ্বিজ—বেদহীন।
পতিবিনু যুবতী যেন—জল-বিনু মীন ॥
ধনহীন গৃহারম্ভে কিছু নাহি কাজ।
বিদ্যাহীন বৈসে যেন বিদ্বান্‌সমাজ ॥ মঃ ১৩১ পৃষ্ঠা।

৩৬। শুন সব জন, সংসার দারুণ, সংশয় করিল মোরে।
বিষম বিষয়, যেন বিষময়, গুপতে অন্তর পোড়ে ॥
যতেন্দ্রিয়গণ, বলিয়ে আপন, বাসনা না ছাড়ে কেহো।
নিত্যই নূতন, করাই ভোজন, তবু না লেউটে সেহো ॥
লোহ মোহ কাম, কেহো নহে ন্যূন, মদ অভিমান ক্রোধে।
চিত চুরি করি, আছয়ে সম্বরি, তিলেক নাহি প্রবোধে ॥
বাহিরে বান্ধয়ে, ভ্রমাই মায়ায়ে, আশ্রম এ জাতিকুলে।
কৃষ্ণ পাসরিয়া, বুলয়ে ভ্রমিয়া, পাপ দুর্ব্বাসনা মূলে ॥
জগতে যতেক, দেখ অপরূপ, কৃষ্ণ-আবরক সভে।
তবহুঁ যতন, মানুষ জনম, শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়ে যবে ॥
মানুষ জনম, দুর্লভ জানিয়ে, কৃষ্ণ ভজিবার তরে।
হেন দেহ পাঞা, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া, মরিয়ে মিছা-সংসারে ॥
শুন সব-জন, কহিলুঁ মরম, আশীর্ব্বাদ কর মোরে।
কৃষ্ণে রতি হউ, এ দুখ পালাউ, এ বর মাগোঁ সভাকারে ॥
কৃষ্ণের চরিত, গাও অবিরত, বদনে লাগয়ে সাধে।
শ্রীমুখকমলে, নয়ানযুগলে, হিয়া বান্ধ ছিরিপদে ॥
কি কহিব হিয়া, কৃষ্ণ না দেখিয়া, মরমে বিরহজ্বালা।
সংসারসাগরে, পড়িয়া পাথারে, চিত বিয়াকুল ভেলা ॥
সে-ই পিতা-মাতা, সে-ই সে দেবতা, সে ই গুরু বন্ধুজনে।
সে-ই সে শুনায়ে, কৃষ্ণকথা কহে, ভজায়ে কৃষ্ণচরণে ॥ মঃ ১৩১।

৩৭। অস্তব্যস্ত নহ—শুন আমার বচন।
মিছা কাজে দুঃখ চিত্তে কর কি কারণ ॥
বারে-বারে কহি তোরে—নাহি অবধানে।
মিছা কর লোহ মোহ ক্রোধ অভিমানে ॥
কে তুমি তোমার পুত্র—কেবা কার্ বাপ।
মিছা তোর মোর করি কর অনুতাপ ॥
কি নারী পুরুষ আর কেবা কার্ পতি।
শ্রীকৃষ্ণচরণবিনু আর নাহি গতি ॥
সে-ই মাতা সে-ই পিতা সে-ই বন্ধুজন।
সে-ই হর্ত্তা সে-ই কর্ত্তা সে-ই মাত্র ধন ॥
তা বিনু সকল মিছা—কহিল এ তত্ত্ব।
তা বিনু সকল মিছা যতেক জগত ॥
বিষ্ণুমায়াবন্ধে সব লোক সুযন্ত্রিত।
নিজ মদ অহঙ্কারে কেবল পীড়িত ॥
নিজ ভাল ভাল বলি যেই করে কর্ম্ম।
পরকালে বন্দী হয় সেই সব ধর্ম্ম ॥
কর্ম্মসূত্রে বন্দী হৈয়া বুলয়ে ভ্রমিয়া।
আপনা না জানে মূঢ় কৃষ্ণ পাশরিয়া ॥
চতুর্দ্দশলোকমধ্যে মনুষ্যের জন্ম।
দুর্ল্লভ করিয়া জানি—কহিল এ মর্ম্ম ॥
বিষয়-বিপাকে ইথি আছয়ে অপার।
ক্ষণেকভঙ্গুর এই অনিত্য সংসার ॥
তবহু দুর্ল্লভ জানি মনুষ্যশরীর।
শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে যে মায়ায় হৈয়ে স্থির ॥
শ্রীকৃষ্ণভজন মাত্র যেই করে দেহে।
মুক্তবন্ধ হয় যদি কৃষ্ণে করে নেহে ॥
সংসারে আরতি করে মরিবার তরে।
শ্রীকৃষ্ণে আরতি করে ভব তরিবারে ॥
সে-ই সে পরম বন্ধু সে-ই মাতা-পিতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা ॥ মঃ ১৩৭-১৩৮ পৃঃ।

৩৮। সকল সম্পদময় কৃষ্ণের চরণ ॥ মঃ ১৩৮ পৃঃ।

৩৯। ইহলোকে পরলোকে অবিনাশী প্রেমা ॥ মঃ ১৩৮ পৃঃ।

৪০। যেই গুরু নাহি করে—পশু-পক্ষ মানি ॥ মঃ ১৩৮ ॥

৪১। যে দিন দেখিতে তুমি চাহ অনুরাগে।
সেইক্ষণে আমা তুমি দেখিবারে পাবে ॥ মঃ ১৩৮ পৃঃ।

৪২। জগতে যতেক দেখ, মিছা করি সব লেখ,
সত্য এক সবে ভগবান্।
সত্য আর বৈষ্ণব, তা বিনে যতেক সব,
মিছা করি করহ গেয়ান ॥
মিছা সুত পতি নারী, পিতা মাতা যত বলি,
পরিণামে কেবা বা কাহার।
শ্রীকৃষ্ণচরণ বহি, আর ত কুটুম্ব নাহি,
যত দেখ এ মায়া তাহার ॥
কিবা নারী পুরুখ, সভারি সে আত্মা এক,
মিছা-মায়াবন্ধে হয়ে দুই।
শ্রীকৃষ্ণ সভার পতি, আর সব প্রকৃতি,
এই কথা না বুঝয়ে কোই ॥
রক্ত-রেতঃ-সম্মিলনে, জন্ম বিষ্ঠা-মূত্র-স্থানে,
ভূমে পড়ে হঞা অগেয়ান।
বাল যুবা বৃদ্ধ হঞা, নানাদুখে কষ্ট পাঞা,
দেহে-গেহে করে অভিমান ॥
বন্ধু করি যারে পালি, তারা সব দেই গালি,
অভিমানে বৃদ্ধকাল বঞ্চে।
শ্রবণ-নয়ান-আন্ধে, বিষাদ ভাবিয়া কান্দে,
তভু নাহি ভজয়ে গোবিন্দে ॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে, দেহ ধরি এ সংসারে,
মায়াবন্ধে পাশরে আপনা।
অহঙ্কারে মত্ত হঞা, নিজ প্রভু পাশরিয়া,
শেষে মরে নরক-যন্ত্রণা ॥ মঃ ১৪০ পৃঃ ॥

৪৩। মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে ॥ মঃ ১৪০ পৃঃ ॥

৪৪। অদ্বৈত আচার্য্যগোসাঞি ত্রিজগতে ধন্য।
তারেধিক বন্ধু মোর নাহি আর অন্য ॥
আপনে ঈশ্বর-অংশ—অখিলের গুরু।
যে চাহে আপনা হিত—তার সেবা করু ॥
জগতের হিত সেই বৈষ্ণবের রাজা।
পরম ভকতি করি করু তার পূজা ॥
তার দেহে পূজা পাইলে কৃষ্ণ পূজা পায়।
নিভৃতে কহিল তোরে—রাখিবে হিয়ায় ॥ মঃ ১৪১ পৃঃ ॥
সংসারে দুর্ল্লভ এই মানুষের জন্ম।
তাহাতে দুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি পরধর্ম্ম ॥
বড়ই দুর্ল্লভ তাহে ভক্তজনসঙ্গ।
মানুষের এ দেহ তিলেকে হয় ভঙ্গ ॥
বিলম্ব করিতে এই দেহ যায় যবে।
তবে আর বৈষ্ণবের সঙ্গ হবে কবে ॥ মঃ ১৪৬ পৃঃ ॥

৪৬। আশীর্ব্বাদ কর মোরে—শুন মাতা পিতা।
সাধ লাগে কৃষ্ণের চরণে দেঙ মাথা ॥
যার যেই নিজ পতি—সেই তাহা চাহে।
তার চিত্ত বান্ধিবারে করয়ে উপায়ে ॥
রূপ যৌবন যত এ রস লাবণ্য।
নিজপতি ভজিলে সে সব হয় ধন্য ॥
মনেমনে কর—এ সভার অনুভব।
পতি বিনু যুবতীর মিছা হয় সব ॥
কৃষ্ণপদ বিনু মোর নাহি অন্য গতি।
নিজ অঙ্গ দিয়া মো ভজিব প্রাণপতি ॥ মঃ ১৪৭ পৃঃ ॥

৪৭। তোমরা থাকিবে—আজ্ঞা করিবে পালন।
নিরন্তর দিবা-নিশি করিবে কীর্ত্তন ॥
(হরিনাম ভক্তসেবা করিবে স্থাপন।
এই ধর্ম্ম করি যেন তরে সর্ব্বজন ॥)
নির্ম্মৎসর-অন্তর হইবে সর্ব্বজন।
সভে সভাকার মন কর্য্য আরাধন ॥ মঃ ১৫৫ পৃঃ ॥

৪৮। কাহার হৃদয়ে না রাখিব দুঃখ-শোক।
সংকীর্ত্তনসমুদ্রে ডুবাব সর্ব্বলোক॥
কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া কিবা মোর মাতা শচী।
যে ভজয়ে কৃষ্ণ—তার কোলে আমি আছি॥ মঃ ১৫৬ পৃঃ॥

৪৯। কলিযুগে ধর্ম্ম—হরিনামসঙ্কীর্ত্তন।
প্রকাশ করিল কৃষ্ণ নাম-মহাধন॥
নাম-গুণ-সঙ্কীর্ত্তনে করহ আনন্দ।
নাচাহ নাচহ লোক হউ মুক্তবন্ধ॥ শেষ-খণ্ড ১৭০ পৃঃ॥

৫০। পুত্র বলি মিছা মায়া না ঘুচিল তোর।
ঐছন দুস্ত্যজ মায়া এ সংসার ঘোর॥
ঘুচিলে না ঘুচে—মায়া ঐছন দারুণ॥ শেঃ ১৯১ পৃঃ॥

৫১। কিবা ভক্ত কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া কিবা তুমি।
যে ভজয়ে কৃষ্ণ—তার কোলে আছি আমি॥
মায়ে নমস্করি প্রভু বোলে বারবার—।
না ছাড়িহ কৃষ্ণ—না ভজিহ এসংসার॥ শেঃ ১৯১ পৃঃ॥

৫২। প্রভু বোলে—সবজন শুনহ বচন।
সন্ন্যাসির ধর্ম্ম নহে রাজ-দরশন॥ শেঃ ১৯৩ পৃঃ॥

৫৩। কৃষ্ণের কেবল দয়া সম সর্ব্বজীবে।
দেহের স্বভাব নিজ জানি অনুভবে॥
কিবা রাজা কিবা প্রজা—সম সুখ দুঃখ।
কর্ম্ম-অনুসারে জীব হয় গৌণ-মুখ্য॥
নিজ অনুমান করি যে জানে সভারে।
সেই সে কৃষ্ণের দাস—কহিল তোমারে॥ শেঃ ঐ॥

৫৪। আপনার দোষ জীব না দেখয়ে কিছু।
আপনি করিয়া দোষ প্রভুরে দোষে পাছু॥
আপনে করয়ে নিজ-ভাল-মন্দ বলি।
ভুঞ্জিবার বেলে দোষ প্রভুর উপরি॥
সুখ সে ভুঞ্জিতে গুণ কহে আপনার।
প্রভুরে দোষয়ে দোষ দুখ ভুঞ্জিবার॥ শেঃ ১৯৫ পৃঃ॥

সাধারণ উপদেশ।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—

১। যার যে নির্ব্বন্ধ আছে—ঘুচাইবে কে।
সকল সংসার মিথ্যা এই সব দে॥
শরীর ধরিয়া কেহো মৃত্যু না এড়ায়।
ব্রহ্মাদি দেবতা যত তারা মৃত্যু পায়॥
কেহো আগে কেহো পাছে—মরণ সভার।
জনম মরণ মাত্র সভার ব্যভার॥
সত্য এক বস্তু কৃষ্ণ—বেদে মাত্র জানি।
হেন কৃষ্ণ যেনা ভজে—সেই মূঢ়খণি॥ আঃ ৭৬ পৃঃ॥

২। চাতুরী না ঘুচে ছার পাষণ্ডি-হিয়ায়।
জড়িত অন্তর তার এ বিষ্ণুমায়ায়॥
নির্ম্মল হইবে—যবে শুনে গোরাগুণ।
ভববাধি নাশিবারে এই সে কারণ॥ মঃ ১০৭ পৃঃ॥

৩। লোক-বেদ-অগোচর অপরূপ কথা।
অমৃতের সার এই গোরা-গুণ-গাথা॥ মঃ ১১০॥

৪। (প্রভুর প্রতি জগাই-মাধাইর উক্তি—)
তোমার কৃপায় মোরা আইলুঁ তোর ঠাঞি॥ মঃ ১১৫ পৃঃ॥

৫। যে জন যেমনে ভজে—তারে তেন প্রভু।
ভজন অধিক-ন্যূন না করয়ে কভু॥ মঃ ১৪৩ পৃঃ॥

৬। পূর্ব্বজন্মে কৈলুঁ মুঞি অনেক অধর্ম্ম।
দরিদ্র হইলুঁ মুঞি সেই সব কর্ম্ম॥
না ভুঞ্জিলে নাহি ঘুচে অদৃষ্টলিখন॥ শেঃ ১৯৪ পৃঃ॥

৭। প্রভু বিনা নারে কেহো কর্ম্ম ঘুচাবার॥ শেঃ ১৯৪ পৃঃ॥

৮। কর্ম্মবন্ধে বন্দী লোক সুখদুঃখ লাভ।
ভুঞ্জিলে সে ঘুচে সেই কর্ম্ম পুণ্য-পাপ॥
জগন্নাথমুখ দেখ করিয়া পিরীতি।
জন্মান্তরে নহে যেন দুঃখ-উপনীতি॥ শেঃ ১৯৫॥ *

* পৃষ্ঠাঙ্কগুলি 'বঙ্গবাসী'-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত সংস্করণের।

সমালোচনা।

ভারত-বিলাপ।—(ব্রহ্মালয়ে ভিক্টোরিয়াদর্শন) কবিবর শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য চারি আনা মাত্র।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া লোকলীলা সম্বরণে ব্যথিত-চিত্ত হইয়া, কবিবর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কতিপয় সুললিত কবিতা রচনা করিয়াছেন, সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের অভিষেক উৎসব উপলক্ষে উপহার দিবার নিমিত্ত সেই কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতায় ভারতের অবস্থা বর্ণনা এবং মহারাণী বিয়োগে ভারতবাসীর হৃদয় বেদনা পরিস্ফুটরূপে বিভাষিত রহিয়াছে। শোকসন্তপ্তচিত্তে যুবরাজের অভিষেক আনন্দে শোকাশ্রুর সহিত আনন্দাশ্রু মিশাইয়া কবিবর আমাদের বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন বাহাদুরের নিকটে সেই পুস্তকখানি উপহার স্বরূপ ডাকযোগে প্রেরণ করিয়াছিলেন, লর্ড বাহাদুরের আদেশে তাঁহার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী মহাশয় একখানি গৌরবসূচক পত্র লিখিয়া "কবিবর কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়" শিরোনামে কবিবরকে গবর্ণরজেনারেলের ধন্যবাদ বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। কবিবরের এ গৌরবে আমরা আন্তরিক সুখী হইয়াছি। স্থানাভাবে পুস্তকের কোন অংশ উদ্ধৃত করিতে পারা গেল না, বাস্তবিক অনেকগুলি কবিতা সময়োচিত শোকউচ্ছ্বাস প্রবাহিণী হইয়াছে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

নূতন পঞ্জিকা।—১৩১০ সালের "গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা" প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাহার একখণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্ষে বর্ষে যথানিয়মে এই সুন্দরী পঞ্জিকা উপহার প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছি, প্রীতভাজন কার্য্যকুশল ৺ জগজ্জ্যোতি গুপ্তের অকাল মৃত্যুতে কাতর থাকিয়াও এই পঞ্জিকার সৌন্দর্য্য দর্শনে আমরা যথেষ্ট আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম। জ্যোতিষ গণনা, তিথি নক্ষত্রাদির সামঞ্জস্য সাধন এবং পঞ্জিকার অঙ্গিভূত সমস্ত নির্ঘণ্ট অতি সুন্দর ও সুপ্রণালীবদ্ধ, চিত্রগুলিও মনোহর; হিন্দুসংসারে এই পঞ্জিকার সবিশেষ আদর এবং প্রচলিত, সমস্ত পঞ্জিকা অপেক্ষা কাগজ অক্ষর ও মুদ্রাঙ্কণ পরিপাট্য বিশেষ প্রশংসার যোগ্য, এই পঞ্জিকার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ, পণ্ডিতেরা একবাক্যে স্বীকার করেন, এই বিশুদ্ধ পঞ্জিকা এতদ্দেশে প্রচলিত

সমস্ত পঞ্জিকার আদর্শ স্থল হয়, ইহাই আমাদের বাসনা, মূল্যও অতি সুলভ। শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর রামরূপ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যত্নে ও তত্ত্বাবধানে এই পঞ্জিকা সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের পদ্ধতি অপেক্ষা এ বৎসরের পদ্ধতি সুসংস্কৃত হওয়া ভিন্ন কোন অংশে নিকৃষ্ট হয় নাই। আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম, সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তে যোগ্য কার্য্যের ভার সমর্পিত হইয়াছে।

চিত্র-পঞ্জিকা।—আমরা সম্প্রতি দুইখানি সিট-পঞ্জিকা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রথমখানি বিখ্যাত "পারিজাত-কুসুম" নামক তৈল-বিক্রেতা শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় বাহির করিয়াছেন। ইহাতে চতুর্ভুজা লক্ষ্মীদেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। প্রতিমূর্ত্তিখানি অতি মনোহারীণী হইয়াছে। প্রার্থনা, এই লক্ষ্মীদেবী পদ্মের ন্যায় পারিজাত কুসুমের প্রতিও কৃপা দৃষ্টি করিবেন। দ্বিতীয়খানি বিখ্যাত চসমা বিক্রেতা রায় মিত্র কোম্পানির প্রদত্ত। ইহাতে জনৈক ভক্তরমণী করযোড়ে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একাগ্রচিত্তে সেই অনন্তশক্তিময় ভগবানের চিন্তা করিতেছেন। এখানিও উত্তম হইয়াছে, চিত্র দুইখানিই ভক্তি-রসোদ্দীপক, এজন্য গৃহে রাখা কর্ত্তব্য।

জননী-জীবন।—শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত, ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য দশ আনা মাত্র। রমণীগণ গর্ভাবস্থায় কিরূপ সাবধান থাকিলে সন্তান সবল ও সুস্থকায় হয়, কিরূপে শিশু পালন করিতে হয়, প্রসূতির আহারাদির নিয়ম কিরূপ, জননীর দ্বারা সন্তানের কিরূপ শিক্ষা হওয়া উচিত এবং জননীর প্রতি সন্তানের কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, স্বামী স্ত্রী কথোপকথনচ্ছলে বাবু বিপ্রদাস সেইগুলি সরল ভাষায় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকের শেষভাগে ছেলে সোহাগের একটি সুন্দর ছড়া আছে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। আর্য্যমহিলাগণ গৃহে বসিয়া এই পুস্তকের আলোচনা করিলে সংসার-ধর্ম্মের ও শিশুপালনের অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন। আমরা আশা করি, আর্য্য অন্তঃপুরে এ পুস্তকের আদর হইবে।

শান্তিলতা।—একখানি উপন্যাস একটি সম্ভ্রান্ত বঙ্গমহিলা প্রণীত, দাস-যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১৲ টাকা। সুশিক্ষিতা বামাকুলের

পবিত্র রত্ন পাঠ করিতে বিশেষ আনন্দ ও আগ্রহ উপস্থিত হয়, আগ্রহ-বশে আমরা এই শান্তিলতার অধিকাংশ পাঠ করিয়াছি। ভাষা সুললিত, রচনা মাধুরী পূর্ণ এবং উপন্যাসচ্ছলে কতকগুলি গার্হস্থ্য নীতি ইহাতে সন্নিবেশিত। যিনি এই শান্তিলতার রচয়িত্রি, তৎপ্রণীত আর দুইখানি পুস্তক ইতিপূর্ব্বে আমরা পাইয়াছি, স্নেহলতা ও প্রেমলতা। সেই দুইখানি পাঠ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইয়াছি। লতাপ্রস্ফুটিত পুষ্পগুলিও অতি সুন্দর। অনেক পুরুষ গ্রন্থকার এরূপ পুষ্পচয়ন করিয়া মাল্য-গ্রন্থন করিতে বিফল প্রযত্ন হন, এ কথা বলিলে, নিতান্ত অন্যায় বলা হয় না।

প্রসূনাঞ্জলি।—ঐ সকল "লতা" রচয়িত্রি সেই বিদ্যাবতী বঙ্গবালা অতঃপর লতাপ্রসূত প্রসূনগুলি নূতন প্রণালীতে গ্রন্থন করিয়াছেন, স্নেহবশে এই প্রসূনাঞ্জলি তিনি স্নেহাস্পদ তনয়ের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। নিবেদন, আদিদেব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ এই কয়েকটি প্রসূন এই প্রসূনাঞ্জলির ভূষণ। রচনা হৃদয়গ্রাহিণী, স্থল বিশেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাও আছে, তাহাও সুললিত, পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। অধুনা বঙ্গসাহিত্য কাননে গোপঙ্গনা বসু, দিগঙ্গনা চৌধুরী, গগঙ্গনাভট্টাচার্য্য, ইত্যাকার স্ত্রীলোকের নাম যুক্ত কতকগুলি ফুল ফুটিতে দেখা যায়, অধ্যাপকের উপাধির ন্যায় বড় বড় উপাধি ধারণেও কেহ কেহ অত্যন্ত অনুরাগিণী, সকল ফুলে সুবাসের আঘ্রাণ পাওয়া যায় না, যে গুলিতে পাওয়া যায়, সে গুলি অবশ্য আদরের বস্তু; এই প্রসূনাঞ্জলি মনোমুগ্ধকর সুগন্ধ বিতরণ করিয়া আমাদিগকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করিল, কেবল একটি কথা এই যে, প্রসূনাঞ্জলি নামটিতে কবিত্বের কিঞ্চিৎ কঠিনতা উপলব্ধি হইতেছে, কুসুমাঞ্জলি অথবা পুষ্পাঞ্জলি নাম হইলে বলিতে ও শুনিতে বোধ হয় অধিক মিষ্ট হইত। চেরি-প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য পাঁচ আনা মাত্র।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।)

১১শ বর্ষ। } ফাল্গুন, ১৩০৯ সাল। { ৮ম সংখ্যা।

মুকুন্দ-মালা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

(৩৬)

ব্যামোহপ্রশমৌষধং মুনিমনোবৃত্তিপ্রবৃত্ত্যৌষধং
দৈত্যেন্দ্রার্ত্তিকরৌষধং ত্রিজগতীসঞ্জীবনৈকৌষধম্।
ভক্তাত্যন্তহিতৌষধং ভবভয়প্রধ্বংসনৈকৌষধং
শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিকরৌষধং পিব মনঃ শ্রীকৃষ্ণদিব্যৌষধম্॥

যে ঔষধে মোহ-রোগ হয় নিবারণ,
যে ঔষধে মুনিগণ সাধুচিত্ত হন্;
যে ঔষধে দৈত্যগণ হয় নিপীড়িত,
যে ঔষধে থাকে এই ত্রিলোক জীবিত;
যে ঔষধে ভক্তগণ শুভ লাভ করে,
যে ঔষধে ভব-ভয় সব যায় দূরে;
যে ঔষধে মানবের মঙ্গল-সাধন,
সেই কৃষ্ণ-দিব্যৌষধ খাও ওরে মন!

(৩৭)

শ্রীমন্নাম প্রোচ্য নারায়ণাখ্যং
কে ন প্রাপুর্বাঞ্ছিতং পাপিনোঽপি।

হা নঃ পূর্ব্বং বাক্ প্রবৃত্তা ন তস্মিন্
তেন প্রাপ্তং গর্ভবাসাদিদুঃখম্ ॥

হেন কোন্ পাপী জন এ জগতে রয়,
যে জন হরির নাম মহা পুণ্যময়
উচ্চারণ করিয়াও মুখে একবার
করিতে না পারিয়াছে ইষ্টসিদ্ধি তার ?
পূর্ব্বজন্মে এই নাম নাহি লইয়াছি,
গর্ভবাসাদির দুঃখ তাই ভুগিতেছি !

(৩৮)

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয়মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ভৃত্যভৃত্যপরিচারকভৃত্যভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥

লইয়া মানব-জন্ম এসেছি শ্রীহরি !
আছে এক সাধ, তাহা দাও পূর্ণ করি।
সেই সাধ মিটাইয়া দিলে একবার,
বুঝিব আমার প্রতি করুণা তোমার।
তোমার দাসের দাস, তারো দাস-দাস,
তারো দাস-দাস-দাস থাকি বারমাস !

(৩৯)

নাথে শ্রীপুরুষোত্তমে ত্রিজগতামেকাধিপে চেতসা
সেব্যে স্বস্য পদস্য দাতরি সুরে নারায়ণে তিষ্ঠতি।
যং কঞ্চিৎ পুরুষাধমং কতিপয়গ্রামেশমল্পার্থদং
সেবায়ৈ মৃগয়ামহে নরমহো মূঢ়া বরাকা বয়ম্ ॥

যিনি দেব নারায়ণ, পুরুষের সার,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেও রাজত্ব যাঁহার,
মনে যদি ভাব তাঁরে, পাবে তাঁর পদ,
অতুল ঐশ্বর্য্য পাবে, না রবে বিপদ্।

কতিপয় মাত্র গ্রামে যার জমীদারী,
কিবা ফল হবে সেই নরে সেবা করি ?
আমরা পরম মূঢ়, জানিও নিশ্চয়,
প্রধানে ত্যজিয়া লই ক্ষুদ্রের আশ্রয়।
তাই বলি, ওরে মন ! ছাড়িয়া মানবে
ধর এক নারায়ণে, অভাব না রবে !

(৪০)

মদন পরিহর স্থিতিং মদীয়ে
মনসি মুকুন্দপদারবিন্দধাম্নি।
হরনয়নকৃশানুনা কৃশোঽসি
স্মরসি ন চক্রপরাক্রমং মুরারেঃ ॥

নিবেদন করি তোরে, শুন রে মদন !
এই মন হরি-পাদ-পদ্মের আসন।
দূর হও, এই স্থানে থাকিও না আর,
এখানে থাকিলে আর না পাবে নিস্তার।
তুমি হর-নয়নের কৃশানুর বলে
চিরদিন ক্ষীণ হয়ে আছ ভূমণ্ডলে।
হর-কৃশানুর শক্তি এতই যখন,
চক্রীর চক্রের শক্তি ভাব না তখন ?

(৪১)

তত্ত্বং ব্রুবাণানি পরং পরস্মাৎ
মধু ক্ষরন্তীব সতাং ফলানি।
প্রাবর্ত্তয় প্রাঞ্জলিরস্মি জিহ্বে
নামানি নারায়ণগোচরাণি ॥

কৃতাঞ্জলি-পুটে এই যাচি হে রসনা !
শ্রীকৃষ্ণের নাম গুলি করহ জল্পনা ;
যে নাম পরম তত্ত্ব বলে অবিরল,
যে নাম সাধুর পক্ষে মধুময় ফল ;

যে নাম আনিলে মুখে হইয়া তন্ময়
কৃষ্ণের দর্শন-লাভ হয় সুনিশ্চয়!

(৪২)

ইদং শরীরং পরিণামপেশলং
পতত্যবশ্যং শ্লথসন্ধি জর্জ্জরম্।
কিমৌষধৈঃ ক্লিশ্যসি লোক দুর্ম্মতে
নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব॥

পরিণামে এ দেহের শক্তি নাহি রবে,
ক্রমে ক্রমে সন্ধিগুলি শিথিল হইবে,
বার্দ্ধক্য আসিয়া পরে দিবে দরশন,
শেষে এ দেহের হবে অবশ্য পতন।
তাই বলি, ওরে মূঢ়! শুন মন দিয়া,—
কেন এত কষ্ট পাও ঔষধ খাইয়া?
নীরোগ হইতে যদি এ সংসারে চাও,
কৃষ্ণ-নাম-রসায়ন প্রাণ ভ'রে খাও!

(৪৩)

দারা বারাকরবরসুতা তে তনুজো বিরিঞ্চিঃ
স্তোতা বেদস্তব সুরগণো ভৃত্যবর্গঃ প্রসাদঃ।
মুক্তির্মধ্যে ত্রিভুবনমিদং তাবকে দেবকী তে
মাতা মিত্রং বলরিপুসুতস্ত্বৎপরং নৈব জানে॥

সিন্ধু-সুতা লক্ষ্মীদেবী গৃহিণী তোমার,
তব নাভি হ'তে জন্ম হইল ব্রহ্মার;
চতুর্ব্বেদ করে তব স্তুতি অনুক্ষণ,
ভৃত্যভাবে তব সেবা করে দেবগণ;
তুমি তুষ্ট যার প্রতি, মুক্তি হয় তার,
তোমাতেই অবস্থিত এই ত্রিসংসার;

দেবকীর গর্ভে তুমি জন্ম লইয়াছ,
ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুনের সখা হইয়াছ।
তোমার এসব কথা ত্রিভুবনে শুনি,
তোমা বিনা কাহাকেও আর নাহি জানি!

(৪৪)

স ত্বং প্রসীদ ভগবন্ কুরু ময্যনাথে
বিষ্ণো কৃপাং পরমকারুণিকঃ কিল ত্বম্।
সংসারসাগরনিমগ্নমতীবদীনং
উদ্ধর্ত্তুমর্হসি হরে পুরুষোত্তমোঽসি॥

ওহে ভগবন্! তুমি এত গুণধর,
প্রসন্ন হও হে সদা আমার উপর।
ওহে দেব নারায়ণ! তুমি কৃপাময়,
কৃপা কর মোর প্রতি,—আমি নিরাশ্রয়।
নিমগ্ন হইয়া এই সংসার-সাগরে
ছট্‌ফট্ করিতেছি বহুদিন ধ'রে।
যখন ধরেছ নাম "পুরুষ-রতন,"
আমার উদ্ধার করা কর্ত্তব্য তখন!

(৪৫)

নমামি নারায়ণপাদপঙ্কজং
করোমি নারায়ণপূজনং সদা।
বদামি নারায়ণনাম নির্ম্মলং
স্মরামি নারায়ণতত্ত্বমব্যয়ম্॥

নারায়ণ-পাদ-পদ্মে করি নমস্কার,
নারায়ণ-আরাধন করি অনিবার,
নারায়ণ-সুনির্ম্মল-নাম লই মুখে,
নারায়ণ-নিত্য-তত্ত্ব সদা ভাবি সুখে;

(৪৬)

শ্রীনাথ নারায়ণ বাসুদেব
শ্রীকৃষ্ণ ভক্তপ্রিয় চক্রপাণে।
শ্রীপদ্মনাভাচ্যুত কৈটভারে
শ্রীরাম পদ্মাক্ষ হরে মুরারে ॥

হে শ্রীনাথ! বসুদেব-সুত! নারায়ণ!
হে শ্রীকৃষ্ণ! চক্রপাণি! ভক্ত-প্রিয়-ধন!
হে অচ্যুত! পদ্মনাভ! কৈটভ-নাশন!
হে রাম! মুরারি! হরি! পঙ্কজ-নয়ন!

(৪৭)

আনন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ রাম
নারায়ণানন্ত নিরাময়েতি।
বক্তুং সমর্থোঽপি ন বক্তি কশ্চিৎ
অহো জনানাং ব্যসনানি মোক্ষে ॥

হে আনন্দ! হে গোবিন্দ! হে মুকুন্দ! রাম!
হে অনন্ত! নারায়ণ! নিরাময়! নাম!
উচ্চারণ করিতেও শক্তি আছে যার,
সে জন না উচ্চারণ করে একবার।
হায় রে ইহাই এক বিচিত্র ঘটন,—
মোক্ষ হেতু মানবের না রহে যতন!

(৪৮)

ধ্যায়ন্তি যে বিষ্ণুমনন্তমব্যয়ং
হৃৎপদ্মমধ্যে সততং ব্যবস্থিতম্।
সমাহিতানাং সততাভয়প্রদং
তে যান্তি সিদ্ধিং পরমাঞ্চ বৈষ্ণবীম্ ॥

অনন্ত অচ্যুত যিনি এই ত্রিভুবনে,
সর্ব্বদাই স্থিতি যাঁর হৃৎপদ্মাসনে,
যাঁহারে একাগ্র-চিত্তে করিলে আহ্বান,
অমনি করেন তিনি অভয় প্রদান;
সেই শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করে যেই জন,
সেই জন বিষ্ণুলোকে করয়ে গমন!

(৪৯)

ক্ষীরসাগরতরঙ্গশীকরা-
সারতারকিতচারুমূর্ত্তয়ে।
ভোগিভোগশয়নীয়শায়িনে
মাধবায় মধুবিদ্বিষে নমঃ ॥

ক্ষীরোদ-সাগরে রয় তরঙ্গ সকল,
তা হ'তে উঠিছে জলকণা অবিরল;
সেই জলকণা গুলি তারকার মত
যাঁহার শরীর খানি করিছে শোভিত;—
অনন্ত নাগের শিরে শয্যা বিরচিয়া
আছেন সর্ব্বদা যিনি শয়ন করিয়া;
যিনি দেব লক্ষ্মীপতি, শ্রীমধুসূদন,
ভক্তিভরে নমি আমি তাঁর শ্রীচরণ!

(৫০)

বাৎসল্যাদভয়প্রদানসময়াদার্ত্তার্ত্তিনির্ব্বাপণা-
দৌদার্য্যাদঘশোষণাদগণিতশ্রেয়ঃপদপ্রাপণাৎ।
সেব্যঃ শ্রীপতিরেব সর্ব্বজগতামেকান্ততঃ সাক্ষিণঃ
প্রহ্লাদশ্চ বিভীষণশ্চ করিরাট্ পাঞ্চাল্যহল্যা ধ্রুবঃ ॥

বাৎসল্য অভয়-দান বিপদ্-মোচন
উদারতা পাপনাশ মোক্ষ-বিতরণ.—
এ সব পাইতে যদি ইচ্ছা কর ভবে,
একমাত্র শ্রীপতির সেবা কর সবে।

প্রহ্লাদ ইহার সাক্ষী, সাক্ষী বিভীষণ,
আর এক সাক্ষী সেই গজেন্দ্র-রতন,
দ্রৌপদীও সাক্ষী, সাক্ষী অহল্যা পাষাণী,
আর এক সাক্ষী ধ্রুব,—ত্রিজগতে শুনি!

(৫১)

যৎকৃষ্ণপ্রণিপাতধূলিধবলং তন্মস্তকং স্যাৎ শুভং
তে নেত্রে তমসোজ্ঝিতে সুরুচিরে যাভ্যাং হরির্দৃশ্যতে।
সা বুদ্ধিঃ ক্ষিতিমণ্ডলে সুবিমলা যা মাধবধ্যায়িনী
সা জিহ্বাঽমৃতবর্ষিণী প্রতিপদং যা স্তৌতি নারায়ণম্॥

ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে
প্রণাম করিতে গিয়া পড়িয়া ভূতলে
যে মস্তক ধূলি লাগি শুভ্রবর্ণ হয়,
সে মস্তক শুভকর বলিব নিশ্চয়।
সেই অন্ধকারামৃত নয়ন সুন্দর
শ্রীকৃষ্ণের রূপ যাহা দেখে নিরন্তর।
এ সংসারে সেই বুদ্ধি পরম নির্ম্মল,
শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা যাহা করে অবিরল।
যে করে কৃষ্ণের স্তুতি দিবস-যামিনী,
সেই জিহ্বাকেই বলি অমৃত-বর্ষিণী।

(৫২)

লাটীনেত্রপুটীপয়োধরঘটীরেবাতটীদুষ্কূটী-
পাটীরদ্রুমবর্ণনেন কবিভিমূঢ়ৈর্দিনং নীয়তে।
গোবিন্দেতি জনার্দ্দনেতি জগতাং নাথেতি কৃষ্ণেতি চ
ব্যাহারৈঃ সময়স্তদেকমনসাং পুংসামতিক্রামতি॥

লাট-দেশ-নিবাসিনী যত নারী রয়,
কি সুন্দর তাহাদের নেত্র-কুচ-দ্বয়।
রেবা-তটে রহে যত নিকুঞ্জ চন্দন,
কি সুন্দর রূপ তারা করয়ে ধারণ।

এ সব অলীক বস্তু বর্ণন করিয়া
মূঢ় কবিগণ দেয় দিন কাটাইয়া!
কিন্তু কৃষ্ণ-পদে যারা সদাই তন্ময়,
এ সব নামেই তারা কাটায় সময়,—
হে গোবিন্দ! জনার্দ্দন! ত্রিভুবন-পতি!
হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমা বিনা নাহি আর গতি।

(৫৩)

নামানি নারায়ণগোচরাণি
ত্যক্ত্বান্যবাচঃ কুহকাঃ পঠন্তি।
আশ্চর্য্যমেতদ্ধি মনুষ্যলোকে
সুধাং পরিত্যজ্য বিষং পিবন্তি॥

মায়াবী মনুষ্যগণ ছাড়ি কৃষ্ণনাম
অন্য কথা লইয়াই ব্যস্ত অবিরাম।
ইহাই আশ্চর্য্য এক দেখি ভূমণ্ডলে,
সুধা ছাড়ি বিষ খায় নর কুতূহলে!

(৫৪)

অযাচ্যমক্রেয়মযাতযাম-
মপাচ্যমক্ষয্যমদুর্ভরং মে।
অস্ত্যেব পাথেয়মিতঃ প্রয়াণে
শ্রীকৃষ্ণনামামৃতবিন্দুরেকঃ॥

চলিয়া যাইব যবে ছাড়ি এ সংসার,
কৃষ্ণ-নাম-সুধা-বিন্দু সম্বল আমার,—
ভিক্ষা করি এ সম্বল পাইতে না হয়,
ধন দিয়া নাহি হয় করিতেও ক্রয়,
এ সম্বল নয় পর্য্যুষিত হইবার,
পাক করিতেও কভু না হয় ইহার,
এ সম্বল কিছুতেই নাহি হয় ক্ষয়,
ভারী বস্তু নয় ইহা,—লঘু অতিশয়!

(৫৫)

যস্য প্রিয়ৌ শ্রুতিধরৌ কবিলোকবীরৌ
মিত্রে দ্বিজন্মবরপদ্মশরাবভূতাম্।
তেনাম্বুজাক্ষচরণাম্বুজষট্‌পদেন
রাজ্ঞা কৃতা কৃতিরিয়ং কুলশেখরেণ॥

দ্বিজবর কবিবর প্রিয় শ্রুতিধর
পদ্ম শর ছিল যাঁর দুই বন্ধুবর;
শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্ম-মধু-পানে রত
ভ্রমরের মত যিনি ছিলেন সতত;
সেই মহারাজ কুলশেখর যতনে
রচিলা "মুকুন্দ-মালা"—ভারত-ভুবনে!

মুকুন্দ-মালা।

"মুকুন্দ-মালা" ভক্তিরসাত্মক ও মহাভাবপূর্ণ বিষ্ণু-স্তব। বাঙ্গালা প্রদেশে ৬।৭ খানি পুস্তকে এই স্তবটী মুদ্রিত হইয়াছে; কিন্তু এই পুস্তক গুলিতে সমান-সংখ্যক শ্লোক নাই। কোনও কোনও খানিতে ২১টী, কোনও কোনও খানিতে ২২টী এবং কোনও কোনও খানিতে ৪০টী মাত্র শ্লোক আছে। তাহাতে আবার অনেক শ্লোকেরই পাঠ পরস্পর বিভিন্ন, এবং ব্যাকরণ, ছন্দঃ, অলঙ্কার ও বর্ণশুদ্ধি বিষয়ে এরূপ বিষম দোষ আছে যে, অনেক স্থানেই তাহার অর্থ-প্রতীতি হয় না। "নির্ণয়-সাগর-প্রেসে" মুদ্রিত এক খানি পুস্তকে এই স্তবটী সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহতে ৩৪টী শ্লোক আছে। এই শ্লোক গুলির পাঠ প্রায়ই বিশুদ্ধ, স্থানে স্থানে দুই একটী মাত্র প্রমাদ দৃষ্ট হয়। শোভাবাজার-স্থিত ৺ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র ৺ আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের নাম বাঙ্গালা প্রদেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের অবিদিত নাই। তিনি যেরূপ সাধু, সদাশয় ও

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সেরূপ আবার সুপণ্ডিত ছিলেন। পুস্তক-মণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া বিদ্যাচর্চ্চা করাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্রত ছিল। তাঁহার সংগৃহীত পুস্তকাবলীর মধ্যে একখানি প্রাচীন পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ৺ আনন্দকৃষ্ণ বাবুর অনুরূপ, সুধার্ম্মিক ও সুপণ্ডিত পুত্র, কলিকাতা পেপার-কারেন্সীর বর্ত্তমান দেওয়ান, মদীয় পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় আমাকে এই পুস্তক খানি দেখিতে দিয়াছিলেন। পুস্তকখানির নাম "নিউ ইয়ার্স ফ্রেণ্ড" (New Year's Friend), মান্দ্রাজ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকীল, শ্রীরঙ্গপট্টন পার্থসারথি আয়েঙ্গার নামক জনৈক দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত মহাশয় এই পুস্তকের মুদ্রণকর্ত্তা। ইহাতে "মুকুন্দ-মালা" স্তবটী ইংরাজী অক্ষরে মুদ্রিত আছে, এবং প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নভাগে তাঁহার কৃত ইংরাজী অনুবাদও সন্নিবেশিত হইয়াছে। "মুকুন্দ-মালা"-প্রণেতা ত্রিবাঙ্কুর-রাজ কুলশেখরের বংশধর জনৈক রাজাকেই পার্থসারথি মহাশয় নব-বর্ষোপলক্ষে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে ৪০টী শ্লোক আছে। শ্লোক গুলির পাঠ অতি বিশুদ্ধ। এই কয়েকখানি পুস্তক ব্যতীত দেবনাগর অক্ষরে লিখিত একখানি অতি প্রাচীন পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আরব সাগরের উপকূল-বর্ত্তী ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্য-স্থিত কোচিন নগর হইতে জনৈক তৈলঙ্গী পণ্ডিত মহাশয় প্রতিলিপি করিয়া লইবার জন্য ইহা আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই পুঁথি খানিতে ৫৫টী শ্লোক আছে। মুদ্রিত পুস্তকগুলির পাঠের সহিত এই পুঁথি খানির পাঠের যথাযথ সমন্বয় করিয়া লইয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক শ্লোক থাকায় "অধিকন্তু ন দোষায়" ভাবিয়াই কোচিন নগরের পুঁথির অনুসারেই "মুকুন্দ-মালায়" ৫৫টী শ্লোক রাখিয়া বাঙ্গালা পদ্যে তাহাদের অনুবাদ করিলাম। পুঁথি খানির স্থানে স্থানে অস্পষ্ট লেখা থাকায় আমাকে কয়েকটী মূল শ্লোকের কোনও কোনও চরণে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতেও হইয়াছে। তবে ব্যাকরণ, ছন্দঃ ও অলঙ্কার রক্ষা করিয়া পরিবর্ত্তন করিতে ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে ভিক্ষা এই যে, এই পরিবর্ত্তনের জন্য স্বয়ং ভগবান্ মুকুন্দদেব ও রাজর্ষি কুলশেখর যেন এই দীনহীন অধমের অপরাধ মার্জ্জনা করেন।

রাজর্ষি কুলশেখরের পূর্ণ জীবন-চরিত প্রাপ্ত হওয়া দুঃসাধ্য। তবে তাঁহার সম্বন্ধে দুই চারিটীও কথা বলা অনুবাদকের কর্ত্তব্য। রাজর্ষি কুলশেখর ত্রিবাঙ্কুর (প্রাচীন কেরল) রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। ত্রিবি-

দ্রুম নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেও তাঁহার হৃদয় ভগবদ্-ভক্তি-রসে সর্ব্বদাই পরিপ্লুত থাকিত। বাল্য-কালে "রামায়ণ"-গ্রন্থ-পাঠে তিনি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, এবং এই গ্রন্থ ভক্তিভরে অহর্নিশ পাঠ করাতেই বৈষ্ণব ধর্ম্মে তাঁহার সবিশেষ আস্থা জন্মিয়াছিল। এই "মুকুন্দ-মালা"ই সেই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-লতার সুধাময় ফল। "মুকুন্দ-মালা"র এক একটী শ্লোক এক একটী অমূল্য রত্ন। কুল-শেখর যেরূপ সুপণ্ডিত, সুধার্ম্মিক ও ভক্তিনিষ্ঠ ছিলেন, এই স্তবটীও তাঁহার অনুরূপ হইয়াছে। প্রত্যেক শ্লোকেই ভাবের মাধুর্য্য, ভক্তির প্রাচুর্য্য, ভাষার সৌন্দর্য্য ও রচনার চাতুর্য্য দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। জীবনের শেষভাগে তিনি রাজকার্য্যে বীতস্পৃহ হইয়া পদ্ম ও শর নামক দুইজন সুদক্ষ কর্ম্মচারীর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ভগবান্ নারায়ণের পাদ-পদ্মেই স্বীয় জীবন-ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। "মুকুন্দ-মালা"র শেষ শ্লোকেই পদ্ম ও শরের নাম উল্লিখিত আছে। যখন উভয়কেই দ্বিজবর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, তখন বোধ হয়, পদ্ম জাতিতে ব্রাহ্মণ ও শর ক্ষত্রিয় ছিলেন। শ্রীরঙ্গপট্টন পার্থসারথি আয়েঙ্গার মহাশয় কহেন, "পদ্ম ও শর ব্যক্তি-বিশেষের নাম নহে, ইহাদের এক একটী স্বগুণ-প্রকাশক উপাধি মাত্র। পদ্ম দর্শন করিলে হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের উদ্রেক, এবং শর দর্শন করিলে শত্রুগণের হৃদয়ে সুবিষম ভয়ের সঞ্চার হয়। কুলশেখর নৃপতি পদ্ম সম সৌম্যগুণাবলম্বী কোনও ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর হস্তে প্রজাপালনের ভারার্পণ করিয়া শর সম তীক্ষ্ণ-শক্তি-সম্পন্ন ধনুর্ব্বিদ্যাবিৎ কোনও ক্ষত্রিয়ের সাহায্যে শত্রুভয় নিরাকৃত রাখিয়াছিলেন। নামের পরিবর্ত্তে উপাধি দিয়াই যে ব্যক্তি-বিশেষের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, তাহা নূতন কথা নহে। অতি পূর্ব্বকালে রোম-রাজ্যেও নামের পরিবর্ত্তে উপাধি দ্বারা পরিচয় পাইবার প্রথা প্রচলিত ছিল। রোম-রাজ্য-বাসিগণ ফেবিয়াস্‌কে ঢাল (Shield) ও মার্সেলাস্‌কে উপদেশ (word) বলিয়া অভিহিত করিতেন।"

শুনিতে পাওয়া যায়, ত্রিবিন্দ্রমে শ্রীরঙ্গদেবের একটী মন্দির আছে। এই নগরের বালকগণ প্রতিদিন শ্রীরঙ্গদেবের উৎসব-কাহিনী গান করিয়া থাকে। এরূপ প্রবাদ আছে যে, বিদ্যা-শিক্ষার প্রারম্ভ-কালে ও "মুকুন্দ-মালা"-স্তব পাঠ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সকলকেই রাজর্ষি কুলশেখরের মাহাত্ম্য-সূচক এই শ্লোকটী পাঠ করিতে হয় :—

ঘুষ্যতে নগরে যস্য রঙ্গযাত্রা দিনে দিনে।
তমহং শিরসা বন্দে রাজানং কুলশেখরম্ ॥

শ্রীরঙ্গনাথের পুণ্য উৎসবের গান
যাঁহার নগরে নিত্য আছে বর্ত্তমান,
শ্রীকুলশেখর এই নাম ছিল যাঁর,
ভক্তিভরে করি তাঁর পদে নমস্কার!

অনুবাদক
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি-এ।

বাঙ্গালার প্রথম প্রাত্যহিক পত্র।

"পরিদর্শক"।

(১২৬৭ সালের বৈশাখ হইতে ১২৬৯ সালের মাঘ মাস পর্য্যন্ত)

অর্থাৎ—

[১৮৬০ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল্ মাসের শেষার্দ্ধ অথবা ১৫ই এপ্রেল্ হইতে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারির ১৫ই কিংবা ১৬ই তারিখ পর্য্যন্ত।]

(১)—কলিকাতা-স্থিত রাজকীয় সংস্কৃত-বিদ্যামন্দিরের (গবর্ণমেণ্ট-সংস্কৃত-কালেজের) তদানীন্তন লাইব্রেরিয়ানস্ (Librarians) অর্থাৎ পুস্তকা-লয়ের অধ্যক্ষ পণ্ডিত-প্রবর জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামী এই মহাশয়-দ্বয়, "পরিদর্শক" নামক একখানি দৈনিক সংবাদ-পত্র-পরিচালনায় ব্রতী হন।

(২)—তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জন্ম-ভূমি—এই রাজধানীর "বড়িশা-বেহালা"-নামক মনোহর উপ-নগর। "বড়িশা-বেহালা" গ্রাম-দ্বয়ের আখ্যা কি না, তাহার আবার পৃথক্ পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। প্রথম গ্রামেই এই পণ্ডিত-প্রবর, ভূমিষ্ঠ হন। "বড়িশা" কলিকাতার অদূরে উত্তরাংশেই অবস্থিত থাকিয়া, যে সকল অনেকানেক বিদ্বানের সুগুণের আঘ্রাণে, লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছে বা করিতেছে,—পণ্ডিত তর্কালঙ্কার মহাশয়, যে তাঁহাদের অগ্রণী—তৎপক্ষে বিন্দু-প্রমাণ সংশয় কোথায়? হায়! আমাদের এই প্রিয়-চিকীর্ষু সদাশয় আত্মীয় মহাশয়, এক্ষণে এই মর-ধরা-ধামে বিদ্যমান

নাই! তাঁহার অসীম-মহিম নামের অগ্রে "৺" লিখিতেই আমাদের লেখনী, অতি মাত্রই কাতর। অস্মদীয় হিত-চিকীর্ষুর মুমূর্ষু দশায়, তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে কখন আসীন—কখনও বা দণ্ডায়মান থাকিয়া, আমাদিগকে একদিন অজস্র অশ্রু-ধারা-স্রোতে বক্ষঃপ্লাবিত হইয়া গিয়াছিল!

"বি-এ"-পরীক্ষার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট সংস্কৃত "বেণী-সংহারের" সুসংস্করণাদি, সুকীর্ত্তির অন্যতম নিদর্শন, বর্ত্তমান কালেও বিদ্যমান থাকিয়া, বঙ্গ-ভূমির মুখ-মণ্ডল, সমুজ্জ্বল করিয়া দিয়াছিল,—তাঁহার যশঃ, অশেষ প্রকারেই বিশেষ ভাবেই—বিলক্ষণ দেদীপ্যমান—জাজ্বল্যমান।

(৩)—"শান্তিপুর" অদ্বৈতবাদী "অদ্বৈত প্রভুর" লীলা-স্থলী—"শ্রীচৈতন্য-দেবের"—দুই প্রধান সহচর ও শিষ্য—"অদ্বৈত" ও নিত্যানন্দ। তাঁহাদের গুরুদেবের সম্মান—"মহাপ্রভু" সংজ্ঞায় দেদীপ্যমান। বৈষ্ণব-সমাজ, আজও পর্য্যন্তও এই দুই ভক্ত-প্রধানকে শ্রদ্ধা-ভরে "প্রভু"-পদে পরিচিত করিয়া আসিতেছেন। মহাগুরু ও তদীয় এই ভক্ত-দ্বয়—এই মহাপুরুষ-ত্রয়ই—পবিত্র বিপ্র-বংশ-সম্ভূত। তাঁহাদের জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভগবদ্-ভক্তি, প্রীতি, পূজ্যের প্রতি অ-প্রতিম শ্রদ্ধা—এ-সকলই, জন-সাধারণের শিক্ষা-স্থল। অধিক কি, শেষোক্ত মহাজন-দ্বয়ের সন্তান-গণ, বৈষ্ণববৃন্দ ও ভক্ত-সমস্ত কর্ত্তৃক "প্রভু-পাদ" বিশেষণে অদ্যাবধি বিশেষিত। সেই সুন্দরী, শান্তিপূর্ণা "শান্তিপুর"-নগরীই, পণ্ডিতবর মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের জন্ম-স্থান। "শান্তিপুরের "মহিমা অসীমা—তাহার আর কেন বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিয়া, এই নাতি-দীর্ঘ সন্দর্ভের কলেবর বি-বর্দ্ধিত করিতে যাই? তিনিও, তাঁহার অভিন্ন-হৃদয়, আত্মীয় মহাশয়ের ন্যায়, কিয়ৎকাল পূর্ব্বে গতাসু।

তাঁহাদের অসীম-প্রায় গুণ-গ্রামের দ্বিতীয় তুলনা, বিদ্যমান নাই।

"রাম-রাবণয়োর্যুদ্ধং,
রাম-রাবণয়োরিব।"

রাঘব ও রাবণের রণের তুলনা, যেমন রাম ও রাবণের যুদ্ধেই আছে—অন্যত্র তাহার নিরুপমা উপমা নাই,—ঐ পণ্ডিত-দ্বয়ের সু-যশের কথাও, তদ্রূপ।

(৪)—'বাহির-মৃজাপুর'-স্থিত এক মুদ্রা-যন্ত্রালয়, এই "পরিদর্শক"-শিশুর সূতিকাগার। কিন্তু ঐ 'সূতিকালয়ের' কি নাম ছিল, এত সুদীর্ঘ কালের

পর তাহার সন্ধান পাওয়া, এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার বলিলেও, বলা চলিতে পারে। বহুল অন্বেষণে—অশেষরূপে তন্ন তন্ন অনুসন্ধানেও—তদ্বিষয়ের সন্ধান করা, অথবা নিদর্শন পাওয়া গেল না। ভবিষ্য সময়ে কি হইবে, না হইবে—তাহা, ভবিতব্যতার উদরে নিশ্চিতই—অন্তর্নিহিত।

(৫)—এইবার আমাদের কর্ত্তৃক এই বালকের আকার-প্রকার, বর্ণিত করিবার পর্য্যায়। আকৃতিতে "পরিদর্শক" হ্রস্ব। রয়াল্ সাইজে (Royal size) রাজকীয় অর্থাৎ বৃহত্তর আকারে উহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিত্রিত বিচিত্রিত করা হইত না। ডিমাই সাইজ্ (Demy size) অর্থাৎ ক্ষুদ্রাকারেই "পরিদর্শক" 'পরিদর্শক'-রূপে লোক-সমাজস্থ জনগণের নয়ন-পথের পান্থ হইতেন।

(৬)—"পরিদর্শকের" পরিদর্শন-কার্য্যারম্ভের কিয়ৎ-কাল, অতীত হইবার পরেই, তর্কালঙ্কার মহানুভবের সাহায্যকারী সহযোগীর পরলোক-প্রাপ্তি হইল। অগত্যা, তখন সম্পাদক-যুগলের তাবৎ কর্ম্ম, একমাত্র জগন্মোহনকেই নির্ব্বাহিত করিতে হইত। একাকীর ক্রিয়া-কলাপও, কিয়ৎ-কাল ব্যাপিয়া সম্পাদিত প্রয়তম প্রতীত হইয়াছিল। ধন্য জগন্মোহন! অভাবনীয় প্রভাব ও প্রতাপ তোমার! দেখিতেছি না কি তুমি, তৎ-কালে "একাই একশ!"

(৭)—স্ব-নাম-গ্রথিত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের নাম, প্রথমাবধিই এই প্রাত্যহিক পত্রিকার স্বত্বাধিকারিত্ব-সূত্রে গ্রথিত থাকিতে শ্রুত হওয়া গিয়াছে।—সিংহ মহোদয়ের গুণানুবাদের ইয়ত্তাবধারণ, আমাদের পক্ষে এক-প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। বিশেষরূপে তাঁহার যশঃ-কীর্ত্তন, সময়োচিত যোগ্য কার্য্য হইলেও—এই হ্রস্ব-কায় নাতি-দীর্ঘ সন্দর্ভের প্রাসঙ্গিক বিষয় হইলেও,—তদীয় জীবনের-কাহিনীর অগণ্য-ঘটনা-পরিপূর্ণ জীবন-বৃত্তান্তের সহিত আমাদের সম্যক্ পরিচয়ের অসদ্ভাবে, বর্ত্তমান উপযুক্ত ক্ষেত্রে অনিচ্ছা-পূর্ব্বকই অগত্যা আমাদিগকে নীরব থাকিতে হইতেছে। "কালীপ্রসন্ন সিংহ" বাবুর সমীপে বঙ্গীয় ভাষা ও সাহিত্য, কি পরিমাণে ঋণাবদ্ধ—এই সীমাবদ্ধ প্রবন্ধ, তদ্বর্ণনে আপাততঃ অশক্ত থাকিয়া, নিস্তব্ধ ও হত-বুদ্ধি হইয়াই রহিল! অহো বিড়ম্বনা! সু-পণ্ডিত নিজ-নাম-প্রথিত-যশস্বী মনস্বী অক্ষয়-লেখক "অক্ষয়কুমারের" ভাষায়, কেবলই আমাদিগকে বলিতে হইতেছে——

"মনস্তাপ! মনস্তাপ! মনস্তাপ!"

"হুতোম্-প্যাঁচার নক্সা" ও "মহাভারতের" 'বঙ্গীয় ভাষান্তরই'—যাঁহার 'গৌড়ীয়-সাহিত্য-সংসারে' দুই প্রকাণ্ড স্তম্ভ—তাঁহার অনন্ত কীর্ত্তির অভাব কি?—

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

এই শ্লোকার্দ্ধেই, সিংহ বাবুর সুখ্যাতি-রব, এই পতিত, তিরস্কৃত 'বাঙ্গালার' সু-বিশাল ভূরি ভূমি-ভাগে, চির-দিনই নিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে। নিজের জীবৎ-কালের সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেই যাঁহার গুণাবলী, মূর্ত্তিমতী হইয়া দেদীপ্যমান ও জাজ্বল্যমান ছিল—এমন কি, অধুনাপি যে গুলির প্রসঙ্গের সঙ্গে ঘটনা অভিজ্ঞ বহুজ্ঞ জন-গণের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—তাঁহার গুণানুবাদে অন্ধ হইলেই যে, আমাদিগকেই লোকে, হেয় ও অ-শ্রদ্ধের বিবেচনা করিতে বিরত হইবেন না।

এক-মাত্র "নীল-দর্পণ"-নাটকের ইংরাজি-অনুবাদকর্ত্তা পাদরি-পুঙ্গব জে, লঙ্ সাহেব মহানুভবের কারাদণ্ডের জরিমানা ১০,০০০ (দশ সহস্র) মুদ্রা, অ-কাতরেই—অব-লীলায়—সহাস্য আস্যে—বৈরাগ্য, যিনি বিচারকের সম্মুখে সম্প্রদান করেন,—তাঁহার পক্ষে "পরিদর্শক" পরি-চালনে সম্পাদক-দিগের পারিশ্রমিক প্রদান, পত্রিকার গুরুতর ব্যয়-ভার-বহন, গুরুতর বিস্ময়ের বিষয় বলিয়াই, বিবেচিত হওয়া অনুচিত। কিন্তু, একমাত্র তাঁহারই উত্তম উৎসাহ বা উদ্যম থাকিলে, কি হইবে? এ দেশের জলবায়ু-মৃত্তিকার গুণেই, নিতান্ত অনিচ্ছা-সহকারেই—উক্ত অধ্যবসায় হইতে, তাঁহাকে ক্ষান্ত ও নিরস্ত হইতে হইয়াছিল।

(৮)—পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি—১২৬৭ বঙ্গাব্দের প্রথম মাসে "পরিদর্শকের উদ্ভব। আর, বঙ্গীয় "১২৬৯ সনের মাঘ" মাসে উহার কলেবর—"ইংলিস্‌ম্যান্" ("The Englishman") নামক প্রখ্যাত দৈনিক বার্ত্তাবহের আকারে উহা, বাহির হইতেছিল।

(৯)—তৎকালীন "রাম-প্রেস্"-অভিধেয় যন্ত্রালয়ের কর্ত্তৃ-পক্ষীয়-গণের তত্ত্বাবধানে "পরিদর্শকের" বরবপুঃ, পরিশোভিত হইত।

(১০)—আর, পত্রিকার নির্দ্দিষ্ট বাৎসরিক মূল্য ১।০ (পাঁচ সিকার) অধিক ছিল না। এত স্বল্প—সুতরাং সুলভ মূল্যও, গ্রাহক-সমূহের নিকট অনাদায় থাকিত! এ সকল কথাই—মনঃ-ক্ষোভের বিষয় নয় কি? এই প্রকার ব্যাপারের আন্দোলন ও অনুশীলনও, এখন অতীব অশোভন।

(১১)—এই ঘটনা ঘটিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই—অর্থাৎ "পরিদর্শকের" প্রথম-প্রচারাবধিই—স্ব-নাম-পরিচিত ও প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বিদ্যাভূষণ) (২) মহাশয়, পত্রিকার জয়েণ্ট সম্পাদকতা (Joint-editor-ship)-পদে বৃত হন। তাঁহাকে, প্রধান সম্পাদক তর্কালঙ্কার ও স্বত্বাধিকারী "সিংহ" মহোদয়, স্নেহ-লোচনে নিরীক্ষণ করিতেন। এরূপ না হইবেই বা কেন? ভুবনচন্দ্র বাবু, সত্যই না কি ভুবনস্থ জন-গণের মনোবিমোহন;—সুতরাং, তাঁহার সদ্‌গুণে লোকের মনঃ সমাকর্ষণ, কখনই বিচিত্র বিষয় নয়। এখনও, মুখোপাধ্যায় মহাশয়, সেইরূপই পূর্ব্বাপর মানব-সমাজের প্রিয়। তদীয় অমায়িকতা, সুজনতা ও সদাশয়তা, লোক-বিখ্যাত বস্তু। যে কেহ, তাঁহার সহিত সামান্য-রূপ পরিচিত—তিনিই, ইহার অনুকূল পক্ষে অযাচিত ভাবেই সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

(১২)—সেই সময় হইতে, ভুবনচন্দ্র বাবুকে এই পত্রিকার সম্পাদকতায় ব্রতী হইতে হয়। অতি যোগ্যতার সহিত উক্ত কার্য্য, তাঁহা কর্ত্তৃক হিন্দুর পরম পূত ব্রত-বৎ সম্পাদিত হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার কৃত কার্য্যে, সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়া দিত। তদনুষ্ঠিত কার্য্য দেখিয়া, সর্ব্বসাধারণে আশ্চর্য্য হইতেন। কারণ, নানাবিধ ক্রিয়াবলীতে পরিবৃত থাকিয়াও, তিনি নিতান্ত সুচারু-রূপেই অবলম্বিত কর্ম্মে শৈথিল্য কিংবা অনাস্থা প্রদর্শন করিতেন না।

(১৩)—তৎ-কালে 'শান্তিপুরের' শ্রীযুক্ত হরলাল মৈত্র মহাশয়, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহকারিত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর ———— মহাশয়ের অগ্রজ সহোদর।

(১৪)—কার্য্য বাহুল্যে, মাসত্রয়ের পরেই (অর্থাৎ পরবর্ত্তী চৈত্রে) "পরিদর্শক"—পত্র, "সিংহ" বাবুর সংস্রব ও সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হয়। নির্দ্দেশ করা, অত্যুক্তি মাত্র যে—এই উপলক্ষ্যেই উহার তিরোধান।

(১৫)—সহস্রাধিক গ্রাহক যাহার—তাহার অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান!—এই অশ্রদ্ধেয় কথা, সাধারণ্যে গৃহীত হওয়া দুরূহ। ১০০০ (এক হাজার)

(২) "গুপ্ত-কথা" প্রভৃতির প্রণেতা ভুবনচন্দ্র বাবু, "সাহিত্য-সমাজ" হইতে উক্ত উপনামে মণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাকে সম্মান-জনক উপাধি না দেওয়ায়, 'বঙ্গসাহিত্য-সমাজ'—প্রত্যবায়-গ্রস্ত হইতেছিলেন। ১২৪৯ সালের ৬ই শ্রাবণের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী—তাঁহার জন্ম-তিথি।

গ্রাহকের নিগ্রহেই পত্রিকার বিলোপ, বিষম মনঃকষ্টের বিষয়। কিন্তু তথাপি আমাদিগকে উল্লিখিত উক্তিরই, উচ্চৈঃস্বরে প্রতি-রব করিতে হইবে। সত্যের ভৃত্য যাহারা—ঘটনার দাস যাহারা—তথ্যমূলক তত্ত্ব-প্রচারণ ব্যতিরেকে তাহাদিগকে কে, কবে অপথে পদ-প্রক্ষেপে অভিনিবিষ্ট দেখিয়াছেন?

(১৬)—উহার কি কোন কারণ নাই?—বিনা কারণে কোন্ কার্য্যই বা সংঘটিত হয়? মূল্যের অনাদায়ই, অদ্বিতীয় হেতু। কিন্তু, তৎ-পক্ষে প্রবর্ত্তকদিগের দোষাভাব কৈ? তাঁহারা, দামের জন্য গ্রাহকদিগের বাটীতে প্রায়ই আদায়-কারকদিগকে পাঠাইতেন না। এমন অবস্থায় টাকা-আদায়ের সম্ভাবনা অথবা প্রত্যাশা কোথায়? যে য়ুরোপ-ভূমি, মুদ্রিত সমাচার-পত্রিকার খনি, সেখানেও কত কষ্টে টাকা আদায় করিতে হয়! শুধু কি ইহাই? বিল প্রস্তুত করিবারও বিধানাভাব।

(১৭)—কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুৎসাহের পর, "পরিদর্শকের" জীবৎ-কাল সংবর্দ্ধিত করিতে, তর্কালঙ্কার মহাশয়, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণকে সমভিব্যাহারে করিয়া, বালী-"উত্তরপাড়ার" জমিদার বিদ্যোৎসাহী জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও "কলিকাতা"-স্থিত "পাথুরিয়াঘাটার" খেলচন্দ্র ঘোষ দাস প্রভৃতি বাবুদিগের দ্বারস্থ হন। কিন্তু বিফল-চেষ্টা। এতদ্দেশীয়দের এই দীর্ঘ সূত্রিতা-সূত্রেই এমন একটা বস্তু, "বঙ্গের" অঙ্গ হইতে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল।

(১৮)—কেমন তমিস্রাচ্ছন্ন সময়েই এই পত্র, জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছিল—সে কথা, ভাবিলেও, হৃদয়, বিশেষ বিস্মিত হইয়া পড়ে না কি? তাহার এমন শোচ্য বিলয়ে বিষাদের আবির্ভাবেরই কথা।

(১৯)—সম্পাদক ও লেখক লইয়া, সর্ব্বসমেত কয়জনের লেখনীর রেখাপাতে "পরিদর্শকের" অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চিত্র-বিচিত্রিত হইত,—তাহার সম্বন্ধেও বর্ত্তমান সন্দর্ভে দুই চারি কথার প্রসঙ্গ, অপ্রাসঙ্গিক না হইয়া, বরং তদ্ব্যতিক্রমে মনোরম বোধ হইতে পারিবে। এতদুপলক্ষে সকল কার্য্য-কারকদিগকেই, এখানে উপস্থিত করিলাম।

(সংখ্যা)	(কর্ম্মচারীর নাম ও উপাধি)	(কোন্ পদ?)	(বক্তব্য)
(১)।—	পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার	সম্পাদক	
(২)।—	„ মদনগোপাল গোস্বামী	„	

(সংখ্যা)	(কর্ম্মচারীর নাম ও উপাধি)	(কোন্ পদ?)	(বক্তব্য)
(৩)।—	পণ্ডিত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-বিদ্যাভূষণ	প্রথমতঃ সহকারী সম্পাদক (Sub-Editor) তৎপরে সহযোগী সম্পাদক (Joint Editor) শেষে সম্পাদক।	
(৪)।—	বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ	স্বত্বাধিকারী ও লেখক	
(৫)।—	পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন	লেখক	নিয়মিত লেখক শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট নহেন, সময়ে সময়ে লিখিতেন
(৬)।—	„ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন	„	„
(৭)।—	„ অযোধ্যানাথ পাকড়াশী	„	„
(৮)।—	বাবু হরলাল মৈত্র	সহকারী সম্পাদক	ভুবনচন্দ্র বাবুর সম্পাদক অবস্থায় সহকারী ছিলেন
(৯)।—	„ শ্যামাচরণ সান্যাল	মৃতলোকের তালিকার সংগ্রহকার ও সংবাদ-দাতা।	
(১০)।—	„ শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	"পরিদর্শকের" সরকার	

(২০)—পণ্ডিতবর কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন মহাশয়, 'হুগলি-স্থিত নর্ম্মাল স্কুলের' প্রধান ও প্রথম পণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'সংস্কৃত ভাষা' তৎ-কর্ত্তৃক অনায়ত্তীকৃত ছিল না;—প্রত্যুত, তাহাতে তাঁহার অসামান্য, সুতরাং সুন্দর ও সুচারু-রূপেই বোধাধিকার জন্মিয়া গিয়াছিল! পুরুষসিংহ 'সিংহ' বাবুকে 'মূল সংস্কৃত মহাভারতের' গৌড়ীয় ভাষান্তরের রচনা-কার্য্যে যে পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহায়তা-প্রার্থী হইয়াছিল,—'বিদ্যারত্ন কালীপ্রসন্ন'—অগ্রণী না হইলেও, তাঁহাদিগের মধ্যে একতম প্রধান;—অতএব তাঁহাকে অগণনীয় অথবা অপ্রধান বলিয়া, উপেক্ষা করা চলিতে পারে না। তেজস্বী খ্যাতনামা 'বাঘ্নাপাড়া' গ্রাম, এই মনীষী মনস্বীর জন্ম-গ্রহণে, অধিকতর প্রখ্যাত করিয়া তুলিয়াছিল। 'রঘুবংশের' সু-সংস্করণ এবং সুপণ্ডিত অক্ষয়-

কুমার দত্তজ মহাশয়ের প্রণীত 'চারুপাঠের ৩য় ভাগের' সদ্ব্যাখ্যা-মূলক অর্থ-পুস্তকও, তদীয় সৎকীর্ত্তির প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। এমন গুণবান্ জনের সন্দর্ভ, 'পরিদর্শকের' শরীর শোভা-সংবর্দ্ধক, অন্যতম উপকরণ—তৎপক্ষে বিন্দু পরিমাণ সংশয়াভাব। ইনি, বৃটিশাধিকৃত ভারতীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠাপিত রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের (কলিকাতাস্থিত গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের) প্রতিষ্ঠাবান্ বিদ্যাবান্ ভূতপূর্ব্ব অন্যতম বিদ্যার্থী।

(২১)—সুপণ্ডিত শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লেখনীও, উক্ত 'বার্ত্তাবহের' অনল্প, অতএব আশ্চর্য্যজনক-রূপেই সু-সৌন্দর্য্য-ব্যঞ্জক। বাল্মীকীয় মূল 'রামায়ণের' বঙ্গভাষায় আদ্যন্ত অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। এই ভাষান্তরিত পুস্তকে অস্মদীয় জাতি-ভাষার অল্প গৌরব বৃদ্ধি করে নাই। বাঙ্গালার তাবৎ কৃতি-সন্ততিগণই, তৎ-কৃত ভাষান্তরিত গ্রন্থের নিমিত্ত জননী-রূপিণী জন্মভূমির ও স্বদেশীয় ভাষায় ঐ অলঙ্কার দ্বারা গৌরবান্বিত। পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নও, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের ন্যায়, সংস্কৃত কালেজের এক প্রধান ছাত্র। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' নাম্নী পাক্ষিক পত্রিকা, কিয়ৎ ইঁহার সম্পাদকতার মনোহারিণী বিশুদ্ধ ভাষায় পরিচালিত হইত। এই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'—রাজর্ষি রাজা রামমোহন রায় মহানুভবের প্রতিষ্ঠিত 'আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের' মুখ-পত্র। ইহার উপরও মহাভারতানুবাদের গুরু ভার, বিন্যস্ত ছিল।

(২২)—পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয়, "আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের" একজন 'উপাচার্য্য'। তিনিও, মহাভারতের অনুবাদে ব্রতী ছিলেন। তাঁহারও রচনা, বিদ্যারত্ন-দ্বয়ের মত, পরিমার্জ্জিত ও সু-সংস্কৃত, বাঙ্গালা-ভাষা, তাঁহার নিকট নিতান্ত অল্প ঋণে আবদ্ধ নহেন।

(২৩)—পাঠকগণ, 'পরিদর্শক'-পরিচালনার তালিকায় অবশ্যই প্রণিধান করিলেন—যতদূর উত্তম অনুষ্ঠান হইলে, একখানি প্রাত্যহিক পত্রিকার সু-সম্পাদন, সম্যক্ প্রকারে সম্ভাবিত—তদায়োজনে উদ্যোগ-কর্ত্তার যত্ন ও শ্রমের, অর্থব্যয় ও মানসিক চিন্তার কিঞ্চিন্মাত্রও ত্রুটি হয় নাই। তথাপি যে উহার প্রচার, রহিত হইয়া গিয়াছিল,—সে সকলই, আমাদের কু-গ্রহের ফল-ভোগ বৈ আর কি বলিব ?

(২৪)—যৎকালে এই অনুষ্ঠান চলিতে থাকে,—তৎকালে "দ্রোণ-পর্ব্বের" বঙ্গীয় অনুবাদও, সমাপন হয় নাই। ঠিক সেই সময়েই, "হুতোম্ প্যাঁচার

নক্সার" ২য় (দ্বিতীয়) খণ্ডের রচনা, পরিসমাপ্ত হয় নাই। এতদুভয়ের অব্যবহিত মধ্যবর্ত্তি-কার্য্য—"পরিদর্শকের" পরিচালন তখন বাবু কালীপ্রসন্নের নিশ্চেষ্ট বা অলস থাকিবার অবসরাভাব। যিনি যে মাত্রায় স্বকীয় কর্ত্তব্য-কার্য্যে যত্নশীল ও শ্রমশালী—তাঁহার সু-যশঃ-সৌরভ-গৌরবও, তেমনই শ্লাঘনীয় ও প্রার্থনীয়। নিজের জীবনাবসান না হওয়া পর্য্যন্ত, চিরকালই—বরাবরই "সিংহ" মহাশয়, তুল্য-ভাবে সিংহ-সম উদ্যোগী।—নিশ্চেষ্টতা, অলসতাদি, কালীপ্রসন্নের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

(২৫)—কলিকাতা—"বালাখানার" শ্যামাচরণ সান্ন্যাল, অন্য-তম কার্য্য-কর্ত্তা। রাজধানীতে দুইটী শ্মশান। "নিমতলায়" শবদাহ স্থান একটী আছে। দ্বিতীয়—"কাশী-মিত্রের" ঘাট। "সিংহ" বাবু কর্ত্তৃক তাঁহার "মুদ্দা-ফরাস্" এই পদবী প্রদত্ত হয়। কৌতূক ও কৌতূহল-সহকারেই উক্তবিধ মনোরম উপনামের সৃষ্টি।

(২৬)—শ্রীনাথ বাবুকে "সিংহ" মহাশয়, "দারোগা" এই সাদর মধুর সম্ভাষণে আহ্বান করিতেন। পত্রিকার বিতরণের ভার, তাঁহারই উপর সমর্পিত ছিল।

(২৭)—যখনকার কথা, লিপিবদ্ধ হইতেছে,—তখনই "হুতোমের" ২য় (দ্বিতীয়) ভাগের পাণ্ডুলিপি, লিখিত হইয়া, মুদ্রণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে-ছিল। 'মূল-মহাভারতের' রচন-কর্ত্তা এবং বক্তা—"শ্রীবেদব্যাস-দেব"। লেখক-সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদাতা "শ্রীগণেশ"। অ-সামান্যের সঙ্গে ন-গণ্যের তুলনা-প্রসঙ্গ—একটী অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচিত হইবে না বটে,—কিন্তু, তাদৃশ উপমা-মূলক কথা, অনেকের নিকট অসঙ্গত প্রতিভাত হওয়া বিচিত্র ব্যাপার নহে। তথাপি কিন্তু, লোকের প্রকৃতি, সাদৃশ্যের সহিত মিলাইতে চাহে। অতঃপর আর সুদীর্ঘ ভূমিকার অবতরণিকার দিকে দৃষ্টি না দিয়া, বক্তব্য কথাগুলি অভিব্যক্ত করিয়া ফেলা যাউক না কেন ?

"হুতোম্ প্যাঁচার নক্সা" ২য় খণ্ডের সং-রচন-কালে 'কালীপ্রসন্ন' "ব্যাস-দেবের" স্থানীয় ছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই, তদুপলক্ষে তখন "শ্রীগণেশ-জীউ"।

কথঞ্চিৎ পার্থক্য-প্রদর্শনই, এক্ষণে আমাদের লক্ষ্য। "শ্রীগণেশদেবের" লেখনী, মনোরম পরমপূত "ভারত"-লেখন (৩) কর্ম্মে, অবিরাম-গতিতে প্রধাবিত হইত। ক্ষণেকের তরেও "গণেশ"-লেখনী, বিশ্রাম করিবে না—

ইহাই দেবতাগ্রগণ্যের প্রতিজ্ঞা ছিল। কার্য্যতঃও, তাহাই সংঘটিত হইয়াছিল। তবে তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইতে হইয়াছিল—বিনা শব্দার্থ-পরিজ্ঞানে বর্ণ-মাত্রও, গণেশ-দেব, নিবদ্ধ করিতে পারিবেন না। রচক ও লেখকের মধ্যে এই সর্ত্ত ধার্য্য হইয়া, অতবড় প্রকাণ্ড "মহাভারত" লিখিত হয়। মধ্যে মধ্যে শ্রীদ্বৈপায়ন-দেবকে, গণেশ-জীউর লেখনীর অ-বিরাম-গতি, ব্যাহত করিতে দুরূহার্থক শ্লোক-মালার সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। সেই গুলির সাধারণতঃ সংজ্ঞা—"ব্যাস-কূট"।

এখানকার গণেশ-স্থানীয় গণেশ-দাসানুদাস মুখোপাধ্যায় বাবুকে এই অংশে গণেশের সদৃশ পণ না করিলেও, সর্ব্বস্থানের অর্থজ্ঞানে তাঁহার কোনই ক্লেশে নিপতিত হইতে হইত না। কেন না, বাঙ্গালায় এই সামাজিক-চিত্র-ময় ক্ষুদ্র 'মহাভারতে' (হুতোমে) তদ্রূপ কূটার্থক এক বর্ণও, বিদ্যমান নাই। আরও এক এই বৈলক্ষণ্য যে, 'মূল সংস্কৃত মহাভারতের' "গণেশের" কোন রচনা নাই। এখানে তাহার অস্তিত্ব আছে। সময়ে সময়ে ভুবনচন্দ্র, কিছু কিছু "হুতোমে" লিখিয়া দিতেন। স্বভাব-সিদ্ধ ঔদার্য্য-গুণে "সিংহ" সেগুলিকে সমাদর-সহকারে গ্রহণ করিতে, কুণ্ঠিত কি সঙ্কুচিত হইতেন না। একবারের একটী ঘটনার নির্দ্দেশ দ্বারা আমাদের প্রস্তাবিত বৃত্তান্তের উপসংহার করিতে হইতেছে।

"দুর্গা-বিজয়া"-বিষয়ে সংগীত সং-রচিত করিতে করিতে উপদেশ দিয়া—"সিংহ" বাবু, একদা বিচারালয়ে গমন করিলেন। ওদিকে ভুবনচন্দ্রও, আদিষ্ট গান রচনা করিলেন। আদালত হইতে প্রত্যাগত হইবামাত্রই গানটী তাঁহার দর্শন-পথে পতিত হইল। 'সুর' ও কতক কতক 'ভাব' বা 'পদ' পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া, গীতটী পুস্তকের অন্তর্নিবেশিত করিয়া লওয়া হইল। এই কার্য্যেও "সিংহের" কি আশ্চর্য্য ঔদার্য্য অভিব্যক্ত! পাঠকগণ! প্রস্তাবিত সঙ্গীত সন্দর্শন করুন :——

"বিদায় হও মা ভগবতী! এ সহরে এস নাকো আর।
দিনে দিনে 'কলিকাতার' মর্ম্ম দেখি চমৎকার॥
জষ্টিসেরা ধর্ম্ম অবতার, কায়মনে ক'র্‌ছেন সুবিচার—
কিন্তু ধূলোর চোটে, রাজপথেতে টেঁচিয়ে চে'য়ে চলা ভার।
হেল্‌থ্ অফিসার, ইন্‌কমের এসেসার—
গাইখানায় "মেজিষ্টর্" সা'র্‌লে সবারে—

আবার গবর্ণরের গুয়ে দৃষ্টি—ছিষ্টি-ছাড়া ব্যবহার।
জীয়ন্তেতে তো এই দশা মা!—ম'লেও শান্তি পা'বে না—
মুখে অগ্নির দফা রফা 'কলেতে' (৪) ক'র্‌বে সৎকার॥"

এই স্থলেই ভুবনচন্দ্রের গ্রন্থের কতক কতক তালিকা তুলিয়া দিলাম,—

(১) অগ্নি-কুমারী।
(২) আমি রমণী (কাব্য)
(৩) আশা চপলা।
(৪) 'আমিনা-বাই'।
(৫) উপন্যাস-ভাণ্ডার (গ্রন্থাবলী)।
(৬) কুঞ্জবালা।
(৭) কংস-যজ্ঞ।
(৮) কামিনী-বিলাস।
(৯) গুপ্তচর (Detective Story অর্থাৎ গোয়েন্দার গল্প।)
(১০) গলিভারের অপূর্ব্ব ভ্রমণ (Galiver's Travel)।
(১১) চন্দ্রমুখী।
(১২) "জন্মভূমির" (এই মাসিক পত্রের) সন্দর্ভ-সমূহ।
(১৩) চারু-শীলা।
(১৪) জল-কন্যা।
(১৫) "টমাস্" কালাচাঁদ।
(১৬) ঠাকুর বাড়ীর দপ্তর (৪ ভাগ)
(১৭) তুমি কি আমার? (৪)
(১৮) তুমি কে? (অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দের কাব্য)
(১৯) 'দারোগা'-বিলাস।
(২০) ধর্ম্ম-শীল।
(২১) নবীন-সন্ন্যাসী।
(২২) পারুল (সেই কি তুমি)।
(২৩) পাঁচ পাগলের ঘর (প্রহসন)।
(২৪) পুলিস কমিশনার্ (৫)।

(৪) ১২৮০ সালে মুদ্রিত।
(৫) ইহা, ১২ খণ্ডে সমাপ্ত। প্রকাশক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দে।

(২৫) প্রেম-পত্রিকা।
(২৬) বিলাতী গুপ্তকথা।
(২৭) বঙ্কিম বাবুর গুপ্তকথা (Keneth গ্রন্থের ভাবান্তর)।
(২৮) বাপুজী বৈদ্যরাজ।
(২৯) বঙ্গোপন্যাস।
(৩০) বন-বালা।
(৩১) বাসর-বিলাস।
(৩২) ভারত-বিলাস।
(৩৩) "মধু"-বিলাপ (৺মাইকেলের মৃত্যু-জন্য)
(৩৪) মহাদেবের মাতুলী।
(৩৫) মা' এয়েছেন (প্রহসন) (৬)।
(৩৬) মাধুরী।
(৩৭) মরকত-মোহিনী (৭)।
(৩৮) মহরম্।
(৩৯) যাত্রা-বিলাস।
(৪০) রহস্য-মুকুর।
(৪১) রজত-কুমারী।
(৪২) রামকৃষ্ণ পরমহংসবেদের জীবন-বৃত্তান্ত (৮)।
(৪৩) শনি মাধব।
(৪৪) ষোল-কুশী ময়দান।
(৪৫) সমাজ কুচিত্র ("হুতুমী" ভাষায়) (৯)।
(৪৬) সখের বুল্-বুল্ (নক্সা)।
(৪৭) সাত খুন্ (ডিটেক্‌টিভ গল্প)।
(৪৮) সন্তপ্ত সয়তান্।
(৪৯) সরসী-বালা।

(৬) "রয়াল্ বেঙ্গল থিয়েটারে" একাধিকবার অভিনীত।
(৭) "জন্ম-ভূমি-কার্য্যালয় হইতে প্রচারিত।
(৮) ঐ ঐ ঐ।
(৯) ১২৭০ সালে প্রকাশিত।

(৫০) 'হরিদাসের গুপ্তকথা' (১০)।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাবু ভুবনচন্দ্র, 'বঙ্গ-সাহিত্যের' নানা-বিভাগে বিশেষ বিশেষ করিয়া, স্ব-নাম-খ্যাত হইলেন। তাঁহার প্রগাঢ়-প্রযত্ন-মূলক পরিশ্রমের ফল, তিনিই ভোগেন ;—আর—সমজ্‌দার সামাজিকেরাই বুঝিবেন। (১১) *

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

"মাহিষ্য" শব্দ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

বর্ত্তমান প্রস্তাবের প্রথমে তৃতীয় প্রমাণের অবতারণা করিতেছি। তৃতীয় প্রমাণ—পাঠক মহাশয়দিগের বোধ হয় জানা আছে, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মালাবার উপকূলে খৃষ্টীয় দুই শতাব্দীতে অর্থাৎ প্রায় অষ্টাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টীয় যাজকেরা খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। রোমাণ কাথলিক পাদ্রীরা এ দেশের জাতি সমূহের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া অভিধানাকারে লাটিন ভাষায় এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন ; লাটিন হইতে নানা ভাষায় ঐ গ্রন্থ অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, এখনও উহা অভিধান বলিয়াই বিখ্যাত। লাটিন হইতে সর্ব্ব প্রথম উহা ইটালী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। ইংরাজিতে উহার নাম The Hindu caste Lexicon (Lexicography) compiled under the auspices of the Hindu King of Tamorin's Territory.

দক্ষিণাবর্ত্ত সমুদ্রকূলে অবস্থিত, এজন্য সেখানে ধীবর (জেলেদিগের

(১০) ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও বহুল প্রচারিত। এই গ্রন্থেই, ভুবনচন্দ্রকে সর্ব্বজন-পরিচিত করিয়া দেয়।

(১১) এই প্রবন্ধের অস্থি-মজ্জা—ভুবনচন্দ্রের নিকট হইতেই সংগৃহীত। এজন্য তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ।

* সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগৃহীত হইতেছে ; "সচিত্র জীবনী" যথাসময়ে জন্মভূমিতেই প্রকাশিত হইবে। জং সং।

সংখ্যা অধিক) সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। অভিধানের সংগ্রহ-কর্ত্তা, মৎস্যধারী ও মৎস্য ব্যবসায়ীর বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিতেছেন, "ইহারা কৃষিকার্য্যও করিয়া থাকে, কিন্তু আমরা নৌকাপথে বাঙ্গালা দেশে গিয়া দেখিয়াছিলাম, তথায় কৈবর্ত্ত নামক জাতীর নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মৎস্য ব্যবসায় করে। তাহাদের উচ্চ শ্রেণীয় লোকেরা মৎস্য ব্যবসা না করিয়া কেবল কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য, ব্যবসা, শস্ত্ররক্ষা, প্রজাশাসন এবং রাজকীয় কার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের মধ্যে অনেকে রাজত্ব করিতেছে। এই সকল উচ্চ শ্রেণীর কৈবর্ত্তেরা মাহিষ্য উপাধি সমাযুক্ত হইয়া থাকে, কারণ ইহারা মাহিষ্য এবং বৈশ্য।" অনেকে অনুমান করেন, এই অভিধান আচার্য্য বোত্‌লিং সাহেব প্রণীত (Bohtlink's Vocabulary) কিন্তু ইহাতে সংগ্রাহকের নাম নাই।

চতুর্থ প্রমাণ।—কলিকাতা হাইকোর্টের জজ শ্রীল শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয় যখন ওকালতী করিতেন, তখন এক সময়ে এক দেওয়ানী মোকর্দ্দমায় কৈবর্ত্তের জাতিত্ব লইয়া তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত মাহিষ্য জাতি এবং প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত কৈবর্ত্ত জাতি যে একই জাতি, কেবল নামান্তর মাত্র, ইহা তিনি উক্ত মোকর্দ্দমার বিচারকালে আদালতকে সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছিলেন, নৃত্য, গীত, লিখন, প্রজাশাসন, কৃষি, এবং শস্যরক্ষা করা মাহিষ্যের নির্দ্দিষ্ট ও প্রধান কর্ম্ম ছিল, কিন্তু উহাদের অনেকে নৌজীবিকা, দাস্য-বৃত্তি, মৎস্য-বৃত্তি, বিশেষতঃ জ্যোতিষতত্ত্বের অনুশীলন প্রভৃতি শূদ্রোচিত কার্য্য দ্বারা "পতিত" বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় মাহিষ্য উপাধি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, মাহিষ্যদিগের মধ্যে যাহারা বৈশ্যজনোচিত কর্ম্ম ও ক্রিয়া সংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছিল, তাহারা হালিক কৈবর্ত্ত নামে আখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গে সেন বংশের শাসনকালেই কৈবর্ত্তের এই অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছিল, সুবর্ণ বণিকদিগকেও তৎসময়ে এইরূপ অযথা অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ড এবং বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের উত্তর খণ্ডের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সুপণ্ডিত শম্ভুনাথ মাহিষ্য ও কৈবর্ত্ত একই অর্থবাচক, একই জাতিবাচক এবং একই বর্ণবাচক এইরূপ প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। এত বড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ, বিচারকের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করা যায় না।

পঞ্চম প্রমাণ।—বল্লালের রাজত্বকালে অথবা তাঁহার কিঞ্চিৎ পরে বল্লাল চরিত গ্রন্থে স্পষ্টতঃ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বল্লাল সেন কৈবর্ত্ত দিগকে মাহিষ্য বৈশ্য স্থির করিয়াছিলেন। বৈশ্য বর্ণের মধ্যে তিনি মাহিষ্যের নামও উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু আনন্দ ভট্টের বল্লাল চরিত পুস্তকের উত্তর খণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে ইহাতে দেখা যায় যে, "অতঃপর দাস দাসীর সংখ্যা অপ্রতুল হইয়া উঠিলে, বল্লাল সেন কৈবর্ত্ত দিগকে দাস্য কর্ম্মে (শূদ্র-জনোচিত কার্য্যে) বল পূর্ব্বক প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন।" তদ্যথা—

এবম্ভূতে মহাকষ্টে প্রজাবর্গে নিবেদিতঃ।
কর্ত্তব্যং চিন্তয়ামাস তদানীং ভুবনেশ্বরঃ।
নান্যোপায়ং তদা দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণানন্বশাদিদম্।
কার্য্যা লোকহিতার্থায় কৈবর্ত্তা দাস্যকর্ম্মসু।
দাস্যকামাস্তু কৈবর্ত্তাঃ শ্রুত্বা নৃপতি-শাসম্।
আজগ্মুপ্তে রাজকুলং শতশোঽথ সহস্রশঃ। ইত্যাদি।

শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট বিরচিত আর একখানি "বল্লাল চরিত" পুস্তকের উত্তর খণ্ডে (২৪—৩০ শ্লোকে) ঠিক এইরূপ লেখা আছে। সুতরাং এ আর অপ্রামাণিক থাকিতে পারে না। উভয় পণ্ডিতের একই অভিমত অবশ্য গ্রহণীয়।

পঞ্চম প্রমাণ।—বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের ১৪শ অধ্যায়ে ৬১ শ্লোকে লিখিত আছে।

"দাসেতু কৃষি কর্ম্মাণি"

ইহার টীকায় রাঘবাচার্য্য লিখিতেছেন—

"অর্থাৎ মাহিষ্যানাং কৃষিকর্ম্মাণি।"

জগদ্বিখ্যাত রাঘবাচার্য্যের মৃত্যুর ৩২ বৎসর পরে প্রসিদ্ধ টীকাকার কেশবাচার্য্য এবং গণপতি ভট্ট প্রাদুর্ভূত হয়েন, ইহাঁরা উভয়ে মিলিয়া বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের পুনরায় ভাষ্য ও টীকা প্রস্তুত করেন। টীকায় (ব্যাখ্যায়) তাঁহারা লিখিয়াছেন, "দাসেতু (মাহিষ্যেতু) কৃষিকর্ম্মাণি" আবার লিখিতেছেন, "মাহিষ্যানাং কৈবর্ত্তানাং" "মাহিষ্যেতু কৈবর্ত্তেতু দাসেতু (কৈবর্ত্তঃ ইতি নামঃ)" ইত্যাদি। বৃহৎধর্ম্মপুরাণের মূলে দুই স্থানে কৈবর্ত্তানাং মাহিষ্যানাং এবং "মাহিষ্যেভঃ কৈবর্ত্তেভঃ" এইরূপ উল্লিখিত আছে। তাহা হইলে শাস্ত্রকর্ত্তা (পুরাণ কর্ত্তা) কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্যকে একই বলিয়া স্থির করিয়াছেন, ইহাই নিশ্চয়। অনেকের বিশ্বাস এই যে, "দাস" শব্দ কেবল শূদ্র-

বাচক শব্দ ; এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের অপনোদন জন্য টীকাকার সুস্পষ্টভাবে "মাহিষ্যানাং কৈবর্ত্তানাং" এবং "দাসেভ্যোঃ মাহিষ্যেভোঃ" ইত্যাদি লিখিয়া দিয়া সংশয়ের নিরাকরণ করিয়া গিয়াছেন। দাস শব্দের প্রকৃত প্রয়োগ ও অর্থ অনেকে এখনও জানে না। এ স্থলে বলিয়া রাখা উচিত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণই অবাধে "দাস" উপাধি ব্যবহারে অধিকারী। উড়িষ্যায় অনেক ত্রিসন্ধ্যাযুক্ত মহাপবিত্র ব্রাহ্মণাধ্যাপকের "দাস" উপাধি আছে, কিন্তু "দাসেতু কৃষিকর্ম্মাণি" শ্লোকের দাস শব্দ বৈশ্যত্ব-প্রতিপাদক।

সপ্তম প্রমাণ।—যাঁহারা বলেন, "মাহিষ্য শব্দ যেমন অতি প্রাচীন, কৈবর্ত্ত শব্দও তদ্রূপ অতি পুরাতন ; হিন্দুশাস্ত্রে এইরূপ দুইটী শব্দ পুনঃ পুনঃ নানা স্থানে উল্লেখ থাকায়, মাহিষ্য ও কৈবর্ত্ত এই দুইটিকে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন জাতি বুঝাইতেছে।" যাঁহাদের মনোমধ্যে এবম্প্রকার সন্দেহ আছে, তাঁহাদের বোধ হয় জানা নাই যে, শাস্ত্রে যাহাদিগকে মাহিষ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদিগকেই কৈবর্ত্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বামন সংহিতা ও বামন পুরাণাদি পাঠ করিলে স্পষ্টতঃ জানা যায় যে, বদান্যবর বলী রাজার পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীভগবান যখন বামনরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তখন জলপথ রক্ষাকারী কৈবর্ত্তকে সম্বোধন করিবার সময়ে তিনি কখনও কৈবর্ত্ত, কখনও বা মাহিষ্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহাতে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়, মাহিষ্য ও কৈবর্ত্ত শব্দ একই অর্থ এবং একই জাতি বাচক। বিশেষতঃ ইহা স্বয়ং শ্রীভগবানের উক্তি এবং তাঁহার শ্রীমুখারবিন্দ হইতে নিঃসৃত। কন্যাকে দুহিতা, সন্ততি, পুত্রী, বেটী প্রভৃতি যাহাই বলুন, তাহা কন্যাকেই বুঝায়, অথবা মহাদেবকে শিব, রুদ্র, পিনাকী, ত্রিপুরারী, চন্দ্রচূড়, উমাপতি, ত্রিশূলী, মহেশ, ত্রিলোচন, ধূর্জ্জটী, পঞ্চানন, বৃষবাহন, মৃত্যুঞ্জয়, গঙ্গাধর, শম্ভু, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি যে কোন নামেই অভিহিত করুন, সেই কৈলাসপতি মহেশ্বর ভিন্ন আর কাহাকেও বুঝায় না। পল্লীগ্রামের ব্যবসায়ী "কথক" ব্রাহ্মণবৃন্দ এবং গীত-ওয়ালারা রামায়ণ গাহিবার সময়ে, বামনদেব কর্ত্তৃক বলীরাজার পরীক্ষার "পালা" গাহিবার সময় পুনঃ পুনঃ মাহিষ্য ও কৈবর্ত্ত শব্দ একই জাতির প্রতি প্রয়োগ করিয়া থাকে, ইহা তাঁহাদের নিজের কথা নহে, ইহা প্রাচীন শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত ও কণ্ঠস্থ।

অষ্টম প্রমাণ।—দেশকাল পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন জাতি একাধিক ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে অভিহিত ও অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার কায়স্থ জাতি উড়িষ্যায় করণ, আসামে কলিতা, পশ্চিমে লালা, অযোধ্যায় শুকসেনী, মধ্যদেশে মাথুরী, দক্ষিণাবর্ত্তে কায়াকর্ষ প্রভৃতি নামে পরিচিত আছে, অথচ ইহারা সকলেই কায়স্থ। ব্রাহ্মণজাতিও এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে কথিত হইয়াছিল। ("শব্দকল্পদ্রুম" অভিধানে ব্রাহ্মণ শব্দ দেখুন।) শূদ্র জাতিরও ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, তদ্যথা—প্লক্ষদ্বীপে সত্যাঙ্গ, শাল্মল দ্বীপে ইষুন্দর ; কুশদ্বীপে কুলক ; ক্রৌঞ্চ দ্বীপে সেবক ; শাক দ্বীপে অনুব্রত ; পুষ্করে একবর্ণা ইত্যাদি। (শব্দকল্পদ্রুম দেখুন)। কৈবর্ত্ত জাতিও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত, তদ্যথা—

উড়িয়্যায়—কেউট, রাঢ়ী, গোথা।
অঙ্গ দেশে—প্রসাদী
কর্ণাটে—ক্ষৌত্রি
কলিঙ্গ দেশে—মহাবল
মগধে—মাহেশ্রী
পশ্চিম প্রদেশ—মাহিষ্য
অযোধ্যায়—গণকী
উত্তরাবর্ত্তে—পঞ্চাস্য
দ্রাবিড়ে—দ্যুতি
মধ্যদেশে—অঙ্গীনা
ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্যে—মীনা
দক্ষিণাবর্ত্তে—কোলন্দ
গুজরাটে—কোল
সিন্ধু দেশে—কপালী
গোমতী তটে—পালী
মালব দেশে—রঙ্গক
রাজপুতানায়—হেলে
নেপালে—কৃষক
আসামে—সিংহক

ইহাতে বুঝা গেল, কৈবর্ত্ত জাতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একাদশ সম্প্রদায় "পতিত", বা "অন্ত্যজ", অবশিষ্ট সম্প্রদায় বৈশ্য এবং শুদ্ধ। কৈবর্ত্তের যে সম্প্রদায় মাহিষ্য উপাধি-ধারী তাহারা কখন শূদ্র সংস্পর্শ-দোষে দূষিত হয় নাই।

নবম প্রমাণ।—উড়িষ্যার খুব প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন কবি জগন্নাথ দাসের পূর্ব্বপুরুষ মাধব দাস কবিভট্ট উড়িষ্যা ভাষায় "শ্রীক্ষেত্র মহা মাহাত্ম্যম্" নামক কাব্যে লিখিয়াছেন—

"গৌড় বাঙ্গালায় থিলা কৈবর্ত্ত মাহিষ্য।
বিক্রমে যেমতি হয় সমুদ্রের অশ্ব॥"

এই বহুকালের প্রাচীন কবি কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্যকে এক বলিয়া গিয়াছেন।

দশম প্রমাণ।—মাহিষ্য ও কৈবর্ত্তের উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তি, আশ্রম, আচার, ক্রিয়া-কলাপ, স্বভাব, প্রকৃতি, সমাজ প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিলে উভয়কে এক ভিন্ন দুই বলিয়া কদাপি বোধ হয় না। রাম যদি সর্ব্ব প্রকারে শ্যামের সমতুল্য হয়, তাহা হইলে শ্যাম ও সর্ব্ব প্রকারে রামের সমতুল্য নহে কি? তাহা হইলে শ্যাম ও রাম একই ব্যক্তি কি না? তর্কশাস্ত্রে বলে, "যে বস্তু যে বস্তুর সহিত সমান, সেই বস্তু সেই বস্তুর সহিত এক"। জ্যামিতিকার বলেন,—

Things which are equal to the same thing are equal to one another, তাহা হইলে কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্য একই জাতি এবং উভয় শব্দ একই অর্থ ও একই উদ্দেশ্যবাচক।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

'শিবাখ্যা-কিঙ্কর'-কাব্য।

(শ্রীধর্ম্ম-দেবের উক্তি)।

আপনি মজিলে মজালে সকলে
সতত কেবল কুমতে মতি।
নাহি বোঝে পাপ মরণ ঔষধ
গলায় বাঁধিছে কি হবে গতি॥

সুখদ শীতল সলিল পরশে
সুখের সরসী ত্যজি যেমন।
বরষার মীন বাহিরে আসিয়া
জীবন বিহনে ত্যজে জীবন॥
তেমতি কুমতি বসুধার পতি
পাপ স্রোতে সুখে ভাসিয়া যায়।
যাইছে কোথায়? উঠিবে কোথায়?
পরিণাম দিকে কভু না চায়॥
আতসের বাজি উঠিয়া গগনে
চারি দিক্ করে আলোকময়।
কিছুক্ষণ স্থায়ী তখনি তখনি
আঁধারে আকাশে বিলয় হয়॥
পাপের উত্থান পতন তেমতি
সত্বরে সমূলে মজিবে পাপ।
হায়! অকারণে প্রিয়তম গণে
অশেষ প্রকারে দিতেছে তাপ॥
দুখ দিয়া মোরে কে সুখী জগতে
কে জয়ী জগতে ত্যজি আমায়।
আমারে আশ্রয় ক'রেছে যে জন
রাখিব ধরণী তা'দের পায়॥
এবা কোন ছার ক্ষত্র "সুদর্শন"
কৌরব-দমন হয়েছে যবে।
হুঙ্কারে যাদের কাঁপিত মেদিনী
একচ্ছত্র যারা আছিল ভবে॥
পাঁচে করি'বল বহু অক্ষৌহিণী
পাঁচ দণ্ডে আমি করিছি লয়।
আমার কারণে হেন ক্ষত্র কুল
ত্রিসপ্তবার রণে হইল ক্ষয়॥
ত্রিলোকে অতুল ত্রিদশ দমন
কংশের বিনাশ আমার তরে।

দেবাসুর ত্রাস দশানন বলী
সবংশে পশিল যমের ঘরে ॥
দৈত্য নিশুম্ভের বিপুল বিক্রম
হেরিয়া ভাবিনু বুঝি এবার।
জনমের মত ধরাতল বাস
পাপের পীড়নে গেল আমার ॥
কোথা চণ্ড মুণ্ড কোথা রক্তবীজ
কোথা সুরজয়ী অসুরগণ।
এখনো কহিতে পারি অহঙ্কারে
স্থায়ী আমি সদা জল যেমন ॥
হিরণ্যকশিপু মূঢ় শিশুপাল
কত অপমান করেছে মোর।
উঠিল পড়িল গুঁড়া হয়ে গেল
দেখ আমি সেই চির কিশোর ॥
কেবল আমার তরে যতবার
ডুবেছে জগৎ অতুল জলে।
হেলিয়া আমায় মজিল বাসব
লইল জনম ধরণীতলে ॥
কিন্তু মহামায়া ত্রিগুণবারিণী
মা, আমার পাপবিনাশতরে।
মানুষীর মত লভিলা জনম
রাখিতে আমারে ধরণী'পরে ॥
দুখের জ্বালায় পশিনু কাননে
দুখেতে কাঁদিছে পাদপ গণ।
দেখিয়া জননী না দেখেন তবু
এবারে নিদয়া কেন এমন ॥
বুঝিতে না পারি করুণা তাঁহার
এ কেমন খেলা আমার সনে।
উঠিতে বসিতে কাঁদান আমায়
ভিকারী করিতে লাগে না মনে ॥

কভু বা পাহাড়ে লইয়া আমায়
যেন ঘোরতর দোষীর প্রায়।
রোষ-কষায়িত লোচনে দেখেন,
দেখিল তকত শুখায়ে যায়।
কভু বা জলের ভিতরে লইয়া
নিজ হাতে ধরি মাথা আমার।
রাখেন টিপিয়া হাবুডুবু খেয়ে
মরি তবু খেলা মিলে না তাঁর ॥
কভু বা সাগরে কোলেতে লইয়া
রাজরাজেশ্বর করি আমায়।
ত্রিদিব বাঞ্ছিত আশনে বসন,
রাখেন ধরণী আমার পায় ॥
এতকাল তার দেখিনু আবার
কালিকার মত মনেতে হয়।
কার্য্যের কৌশল জানেন জননী
আর দুখ ঘোর নাহিক ময় ॥
চরণে জীবন করিনু অর্পণ
কেবল তাঁহার চরণ বলে।
ভীষণ সমর সাগরে ভাসিব
হেলিব দুলিব যাইব চলে ॥
বিশাল সাগর তুফানে যেমন
অবাধে কলসী ভাসিয়া যায়।
যোজন ব্যাপিনী রণতরি যাহে
তরঙ্গ পীড়নে বিনাশ পায় ॥

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যভূষণ।

নিমতলা ঘাট।

হেদুয়া দীঘির উত্তরাংশে বিডন ষ্ট্রীট বাহিয়া চারিটী ভদ্রসন্তান শূন্যপদে অনাবৃত গাত্রে, একখানি খট্টাস্কন্ধে লইয়া সরাসর পশ্চিমাভিমুখে যাইতেছেন। খট্টার উপর একটি নরদেহ, তাহার গাত্রে একখানি শুভ্র চাদর আচ্ছাদন; কেবল মস্তকের অর্দ্ধাংশের কৃষ্ণ কেশ দৃষ্ট হইতেছে মাত্র। খট্টাবাহকদিগের অগ্রে পশ্চাতে অনেক লোক, গণনায় প্রায় দেড় কুড়ি। যে দেহটি খট্টার উপর দেখা গেল, তাহা নারীদেহ নহে, নরদেহ; মস্তকের কেশ দর্শন করিয়া তাহা স্থির করা হইল। খট্টার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একজন যজ্ঞোপবীতধারি শ্যামবর্ণ যুবাপুরুষ সেই দেহের মস্তকের উপর ছত্রধারণ করিয়া যাইতেছেন। তদ্দর্শনে স্থির করা হইল, শবদেহ নহে, লোকটি তখনও জীবিত। বেলা অনুমান দশটা।

খট্টা গিয়া গঙ্গাতীরে পৌঁছিল। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী দেবীর মন্দির যেখানে বিরাজ করিতেছেন, যে সময়ের কথা, গঙ্গা তখন এখনকার মত তৎপশ্চিমে এত দূরে ছিল না। একটি ছায়াময় স্থানে খট্টাখানি নামাইয়া বাহক মহাশয়েরা কোচার কাপড়ের দ্বারা স্ব স্ব অঙ্গে বাতাস খাইতে লাগিলেন; বৈশাখ মাস, পথশ্রমে ভারবহনে ভদ্রসন্তানগণের শরীরে ঘর্ম্ম হইয়াছিল, সেই বীজন বস্ত্রে তাঁহারা আপনাপন ঘর্ম্মবারি মোচন করিলেন। অল্প অল্প বাতাস উঠিয়াছিল, গঙ্গায় তখন জোয়ার আসিয়াছিল, মৃদু বাতাসে ভাগীরথী সলিলে হিল্লোল খেলিতেছিল, স্থান সুশীতল।

খট্টাখানি যেখানে রাখা হইয়াছিল, খট্টা শয়ন করিলে সেখান হইতে অবাধে গঙ্গা দর্শন হয়। যে দেহটি খট্টায় ছিল, সে দেহ নিস্পন্দ; প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল সমভাবেই সেইরূপ নিস্পন্দ রহিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে মাথাটি অল্প অল্প কাঁপিল, একখানি হস্তও ধীরে ধীরে পার্শ্ব হইতে বক্ষপরে আসিল। যাঁহারা দেখিতেছিলেন, তাহারা যেন স্বপ্নবৎ কি এক আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া শায়িত লোকটির মুখের আচ্ছাদন খুলিয়া দিলেন; দেখিলেন, চক্ষু দুটি মিট মিট করিতেছে, ঠোঁট দু-খানি অল্প অল্প নড়িতেছে, নাসারন্ধ্রে সরল নিশ্বাস বহির্গত হইতেছে; বিলক্ষণ সজীব।

দুইজন অনুযাত্রির পরস্পর কথোপকথনে প্রকাশ পাইল, লোকটি একজন পণ্ডিত, অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি। এই দিনের দুই

দিন পূর্ব্বে তিনি মধ্যাহ্ন ভোজনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, শীতল জল পান করিতে করিতে হঠাৎ বিষম লাগে, শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হয়, আসন হইতে টলিয়া ভূতলেই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। একদিন মূর্চ্ছা ছিল, পরদিন একবার একটু চৈতন্য হইয়াছিল, নল সহযোগে সেই অবস্থায় তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করান হইয়াছিল, এক ঘণ্টা পরে পুনরায় মূর্চ্ছা। দিবা রজনীর মধ্যে সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গে নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অর্থবল বেশী থাকে না, তাঁহারও ছিল না, সুতরাং পাড়ার একজন ডাক্তার দুই দিন দুইবার আসিয়া রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন, ঔষধের জন্য দুইখানা ব্যবস্থাপত্রও লিখিয়া দিয়াছিলেন, ঔষধও আসিয়াছিল, ফল কিন্তু কিছুই হয় নাই। কক্ষদেশে তাপমান যন্ত্র সংলগ্ন করিয়া রোগীর শরীরের তাপ নিরূপণের নূতন পদ্ধতিটা তৎকালে ডাক্তার মহলে প্রচার ছিল না, ষোল আনার ভিতর অন্যূন চৌদ্দ আনা ডাক্তারের নাড়ীজ্ঞান কতদূর, পরীপক্ক বিজ্ঞ লোকেরা নিশ্চয়ই তাহা জ্ঞাত আছেন। এই পণ্ডিতবরের চিকিৎসক ডাক্তার মহাশয়টিও নাড়ীজ্ঞানে সেইরূপ সুপণ্ডিত। এই দিন (তৃতীয় দিবস) প্রাতঃকালে সেই ডাক্তারটিকে আহ্বান করা হইয়াছিল, আসিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া ইংরাজীতে তিনি বলিলেন,—Hopeless।—অতঃপর গঙ্গা যাত্রার ব্যবস্থা দিয়া, দস্তুর মত ভিজিট লইয়া ডাক্তার মহাশয় নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। তাহার পরেই গঙ্গাযাত্রা।

ক্রমে ক্রমে লোকটির চৈতন্য হইল। পিপাসা হইয়াছে, ইহাই জ্ঞাপন করিবার অভিপ্রায়ে দুইবার তিনি অল্প অল্প হাঁ করিয়া রসনার দ্বারা ওষ্ঠলেহন করিলেন, একটি যুবা ব্যস্ত হইয়া তাঁহার মুখে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ প্রদান করিলেন, দুগ্ধটুকু ব্রাহ্মণের উদরস্থ হইল। তখন তিনি ভাল করিয়া চাহিতে পারিলেন। কথা ফুটিল না, কিন্তু বিনা ক্লেশে স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, তাড়িৎ সঞ্চারের ন্যায় দুই তিনবার সর্ব্বাঙ্গ সঞ্চালিত হইল, সেই সময় ওষ্ঠে অঙ্গুলি দিয়া ইঙ্গিতে দেখাইয়া আর একবার তিনি হাঁ করিলেন, পুনরায় দুগ্ধ প্রধান। ক্রমশই অল্পে অল্পে আরাম প্রাপ্তি। যাঁহারা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা স্থির বুঝিলেন, ভাগীরথী সলিলাক্ত সুশীতল সমীর সংস্পর্শে দীর্ঘ মূর্চ্ছার অবসান হইয়া চৈতন্যোদয় হইয়াছে; আর কোন ভয় নাই।

চৈতন্য প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান উদয়। তখনও বাক্‌রোধ। প্রায় এক দণ্ড পরে মুমূর্ষু পণ্ডিত মহাশয় যেন পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইয়া একবার একটি

মাথা উচু করিলেন, চকিতনেত্রে উভয় পার্শ্বে ও সম্মুখে দুইবার চাহিয়া দেখিলেন, ঊর্দ্ধনেত্রে সূর্য্য শোভিত আকাশ মণ্ডল দর্শন করিলেন, তৎক্ষণাৎ আবার পরিশ্রান্ত হইয়া নয়ন নিমীলন পূর্ব্বক বালিসের উপর ঢলিয়া পড়িলেন। মুদ্রিত নয়নে কি যেন অনুধ্যান করিয়া একটু পরেই পুনর্ব্বার নেত্র বিস্ফারণ করিলেন, করপুটে ললাট দেশ স্পর্শ করিয়া, মা আনন্দময়ী দেবীকে আর পতিত-পাবনী জাহ্নবী দেবীকে উদ্দেশ্যে মনে মনে প্রণিপাত করিলেন। মুখে বাক্য নাই। তখনকার মনের উচ্ছ্বাস যে প্রকার, পাঠক মহাশয় নিম্নভাগে তাহার আভাষ দর্শন করুন।

উচ্ছ্বাস।

কোথা আসিয়াছি আমি! কে আনিল হেথা?
ধূমবর্ণে বায়ুপথ আবরণ করি
উঠিতেছে ধূমরাশি, ভাগীরথী দেবী
খেলিছেন দুলিছেন ধূম দরশনে!
শ্মশানের ধূম সম গন্ধ বিতরিয়া
ঘুরে ঘুরে খেলা করে নিষ্ঠুর বাতাস!
অহো! ঠিক! আসিয়াছি ভাগীরথী তীরে!
আসিয়াছি, ভাল কথা, খট্টা কেন তবে?
খট্টাতে কি আসিয়াছি গঙ্গা দরশনে!
মাতর্গঙ্গে! এ কি দশা! পঙ্গু কি এ দাস?
পদব্রজে আসি নাই, নিজ বন্ধু জনে
স্কন্ধে করি বহিয়াছে, মৃতদেহ সম!
তাই বটে! ভ্রম লেশ নাহিক ইহাতে!
এই সেই নিমতলা ঘাট! এই ঘাটে আমি
নিতি নিতি আসিয়াছি করিবারে স্নান;
পূজিয়াছি জাহ্নবীরে জাহ্নবী সলিলে,
জপিয়াছি ইষ্ট মন্ত্র মুদিয়া নয়ন,
তুলিয়া গঙ্গার মাটি লেপিয়াছি গায়,
অষ্ট অঙ্গে প্রণিপাত করেছি গঙ্গারে,
এই ঘাটে কত খেলা করিয়াছি আমি.

সব কথা মনে আছে, কিছু ভুলি নাই,
আজি কেন হেন দশা হইল আমার!
এই সেই নিমতলা ঘাট। এই ঘাটে
প্রতি ঊষাকালে করিয়াছি প্রাতঃস্নান,
গঙ্গাপূজা করিয়াছি পূত গঙ্গাজলে,
ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে মুদিয়া নয়ন—
জপিয়াছি জাহ্নবীর শত অষ্ট নাম,
তখনি হেরেছি পুন নয়ন মেলিয়া—
বেগবতী ভাগীরথী কুল কুল স্বরে
ধাইছেন গতি পথে উচু করি বুক,
যুবক যুবতী বৃদ্ধ বালক বালিকা
করিতেছে গঙ্গাস্নান, কেহ বা সাঁতারি,
ভেসে ভেসে যাইতেছে তরী ধরিবারে,
সিক্ত বস্ত্র পরিহিতা প্রৌঢ়া বৃদ্ধা নারী—
করিতেছে শিব পূজা ফুল বিল্ব দলে
গঙ্গা মৃত্তিকাতে হাতে শিব লিঙ্গ গড়ি।
কি শোভা সে শোভা হায়, দেখিয়াছি যাহা
বহুদিন; আপনিও মজিয়াছি প্রেমে।
আজিও ত সেই ঘাটে রহিয়াছি আমি
জড়ের মতন শুয়ে দড়ির খট্টায়,
এ কি মানুষের দশা, ভেবে হৃদি কাঁপে,
স্বাধীন মানব আমি এত পরাধীন!
বল গঙ্গে! দীন আমি, বল কোন্ পাপে
আজি হেথা হেন দশা হইল আমার!
যত ভাবি, তত ভাব মানসে উদয়!
কত কি যে দেখিয়াছি, ছিলাম যখন
এই আমি এই দেহে সবল সচল,
পলকে পলকে এবে মনে পড়ে সব।
বায়ু সঙ্গে তরঙ্গিণী তরঙ্গ তুলিয়া
নেচে নেচে খেলিছেন সম-তালে তালে—

যে দেখেছে সে মজেছে লহরীর লীলা।
নাচেতে মিশায়ে নাচ নরনারী বুকে
চলেছে তরণী কত জোয়ারে উজানে,
সে শোভা হেরিয়ে কত লোভেছি কৌতুক,
কে বলিবে, সেই শোভা, দেখিতে না পাই,
আজি কেন হেন দশা হইল আমার!
মরিব কি? তাই ভাল! মরাই মঙ্গল!
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা, পুরাণের বাণী;
সুখী হব, মোক্ষ পাব, এড়াব যন্ত্রণা,
গঙ্গা যদি দয়া করি স্থান দেন কোলে!
মাতর্গঙ্গে! কতগুলি ভালবাসা জনে—
স্নেহ মাখা, যতনের ননীর পুতলি—
করেছি আপন হাতে তোমারে অর্পণ,
সে সব দারুণ কথা, (বুক ফেটে যায়!)
পতিত পাবনি! মনে আছে কি তোমায়?
ভুলে থাক ভুলিয়াছ, তাহে দুঃখ নাই,
নিস্তারিণী কোল পেয়ে তোরে গেছে তারা,
শোকে জর্জ্জরিত কিন্তু হৃদয় আমার!
বাঁচিতে বাসনা নাই, তবু ছিনু বেঁচে,
আজি এরা কৃপা করে স্কন্ধেতে বহিয়া
আনিয়াছে তব তীরে, মোক্ষপ্রদায়িণি!
তুমি যদি কৃপা কর! পাই পরিত্রাণ,
পারি না বহিতে আর পাপ দেহভার!
এই ভিক্ষা সুরধনি! তব শ্রীচরণে,
শ্রীচরণে স্থান দাও অভাগা পামরে!

গান।

রাগিণী গারা ভৈরবী তাল যৎ।

তাই গো করুণাময়ী কার কথা লওনা কাণে।
তুমি আপনার ভাবে আপনি মত্ত চেয়ে আছ আপনার পানে॥
তোমার দয়ায় জগৎ চলে, তাই দয়াময়ী তোমায় বলে,
নইলে মা পাষাণী বলে বল তোমায় কেনা জানে?
সংসারের পথ ঘুচাও তারা, তাই মা তুমি দুখহারা
তাই ভোগ সুখে না হয় সুখী, স্মরণ যে লয় তোর চরণে।
যে জন না জানে তোরে, সে হাঁকা হাকি করে মরে,
সুখের তরে কে তোরে চুম্বন খায় মা দুখের টানে।
তার সাক্ষী সুদন বলে, হরের হাল হের সকলে
ও যার ঘরে বাঁধা অন্নপূর্ণা, চলে না তার ভিক্ষা বিনে॥

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা।

রাবণ-কন্যা—মৈথিলী।—শ্রীবঙ্কুবিহারী ধর প্রণীত। প্রণেতার পরিচয়ে এখানি পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য, নিউ ব্রিটনীয়া প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য চারি আনা। সীতাদেবী রাবণের কন্যা, এই কথা জানাইবার উদ্দেশে বাবু বঙ্কুবিহারী অভিনব অমৃতাক্ষরচ্ছন্দে নাটক রচনার প্রণালীতে এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। আদ্যোপান্ত অমৃতাক্ষর। মধ্যে মধ্যে দু' একটী গীত আছে। পাঠ করিয়া তুষ্ট হওয়া যায়, কিন্তু কর্ত্তব্যানুরোধে সমালোচনা স্থলে দু-একটি কথা বলিতে বাধ্য হইতে হইল, আশা করি, নব নাট্যকার ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন না। গীতে ও কবিতাতে কতকগুলি মিষ্ট মিষ্ট শব্দ আছে, কিন্তু অনেক স্থলেই ভাবের অভাব; বিশেষতঃ অমৃতাক্ষরচ্ছন্দের প্রকৃতি পদ্ধতি সকল স্থলে পালিত হয় নাই। মিত্রাক্ষর অথবা অমৃতাক্ষর, যাহাই হউক, অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে সাধ্যমত যত্নে জ্যোতি রক্ষা করিতে হয়, এ পুস্তকে তাহা প্রায় নাই; তাহা ছাড়া কবিতার চরণেও এক এক স্থলে বিষম গোল। দু' একটী স্থল দেখাইয়া দেওয়া উচিত। যথা:—

"অতীব নিঠুর কালা, যে ভজেছে পেছে
জ্বালা মরমে মরমে; শুন সখি, এ!"

অন্য একস্থলে আরও বিভ্রাট। অমৃতাক্ষরে মিল রাখিতে হয় না বলিয়া যাহা ইচ্ছা, তাহাই করা দোষাবহ। বাবু বঙ্কুবিহারী অনেক স্থলে শব্দগুলি পর্য্যন্তও ভাঙ্গিয়া ছন্দরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন, উদ্ধৃত করিতে হইলে অনেক দেখাইতে হয়; দু-একটী দেখুন—

"রাণিতব, অনুক্ষণ জ্বলে মরে মদনের স্বরে।
ভাব আপনা নেহারি, অপকারি কেমনে অনঙ্গ।"

এইরূপ শব্দভঙ্গে কবিতা হইতে পারে না, বঙ্কুবাবু এটি স্মরণ রাখিবেন। ঐরূপ অনেক আছে বলিয়াই কবিরা হয় ত মৈথিলীর কবিতাগুলিকে কবিতা বলিতে লজ্জিত হইবেন। কাব্যাংশে এই পর্য্যন্ত, নামের সম্বন্ধে একটি কথা। রাবণ কন্যা মৈথিলী, ইহা দেখিয়া রাবণকন্যা সীতাদেবী, ইহা সকলে বুঝিবে না, রক্তের কলসীর গল্পটি না শুনাইলে পুস্তকের টাইটেল পাঠ করিয়া ভাবগ্রহ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না, মিথিলা প্রদেশে যাঁহাদের জন্ম, তাঁহাদের সকলকেই মৈথিলী বলা যাইতে পারে।

অরুণ।—একখানি কাব্য পুস্তিকা। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী বিরচিত, শোভাবাজার ভৈষজ্য মেসিন প্রেসে মুদ্রিত, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে উৎসর্গীকৃত। এই পুস্তিকায় নানাবিষয়িণী ত্রিশটী কবিতা আছে। পাঠ করিয়া দেখা গেল, কয়েকটী কবিতায় কবিতার লালিত্যের পারিপাট্য আছে, অনেক স্থলের রচনাও ভাবরসযুক্ত, এক একটি উপমা ও নূতন কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। বিষয় নির্ব্বাচনে বাবু দেবকুমারের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতার এক এক স্থলে কিন্তু কিছু কিছু অস্পষ্টতা দৃষ্ট হইল; কবির কল্পিত ভাবগুলি উত্তম, কবিতার সকল পদগুলি কিন্তু পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পায় নাই; এক এক স্থলে কবির মনোভাব মনে মনেই রহিয়া গিয়াছে। যথা—২৬ পৃষ্ঠায় "লক্ষ্যহারা" শিরোনামে—

"ব'হে যায় স্রোতস্বতী সন্ধ্যায় গগন,
বেষ্টিয়া পশ্চিমদিকে, মুগ্ধ অচেতন।"

সামঞ্জস্য রাখিয়া এই দুই চরণের প্রকৃত ভাবার্থ নিরূপণ করিতে অনেক পণ্ডিতের অনেক সময় লাগিবে। স্থানে স্থানে এইরূপ আরও জটিল ভাবার্থের ছায়া বিদ্যমান আছে। আমরা আশা করি, কবি ভবিষ্যতের এইরূপ অস্পষ্টতা পরিহার করিবেন।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।)

১১শ বর্ষ। } চৈত্র, ১৩০৯ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

একাগ্র কথক ঠাকুর।

এদেশে বহুদিবসাবধি কথকতার প্রথা আছে। এ প্রথার উপকারিতা অথবা অপকারিতা এ প্রবন্ধে আলোচনা করিব না। পূর্ব্বে যে সকল ভাল ভাল কথক ছিলেন, তাঁহারা একে একে সকলেই প্রায় সংসার হইতে অপসৃত হইয়াছেন, আজকাল যাঁহারা তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যথার্থ গুণবান্, তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। নিরবচ্ছিন্ন ব্যবসায়ী কথক সুপণ্ডিত হন না, অশিক্ষিত অথবা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকেরাই যাত্রার সঙের ন্যায় রঙ্গ তামসা দেখাইয়া, পয়সা উপার্জ্জন করেন, আর বাজে লোকের বাহবা লন। এই দলের একজন কথকের একটি দৃষ্টান্ত নিম্নভাগে প্রকটিত হইল।

তিনি পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণ, বয়স অনুমান পঞ্চাশ, একজন দশকর্ম্মান্বিত ভট্টাচার্য্যের টোলে পাঁচমাসকাল ব্যাকরণের সূত্র অভ্যাস করিয়াছিলেন, বিদ্যার সীমা এই পর্য্যন্ত। কথকতা করা তাঁহার জীবিকা। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের কল্যাণে বঙ্গের ইতরভদ্র সকলেই রামায়ণ, মহাভারতের অনেক কথা মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত কথায় কথায় রামায়ণ মহাভারতের দৃষ্টান্ত দেন। প্রস্তাবিত কথক ঠাকুরটি ঐ দুইখানি বাঙ্গালা কাব্য পাঠ করিয়া, সুনামলব্ধ কথকদিগের মুখে কথকতা শ্রবণ করিয়া, ভাব ভঙ্গি অভ্যাস করিয়া, গলাজলে গলা সাধিয়া, কথক হইয়াছিলেন, সামান্য সামান্য স্থানে পসারও মন্দ হয় নাই। আসল জ্ঞান তাঁহার যত থাকুক না থাকুক, তাঁহার একটি গুণ ছিল, তিনি রসিক ছিলেন।

কথক ঠাকুরের একটি পুত্রবধূ আর একটি পৌত্রি একদিন তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন, নিজের বাড়ীতে কথা কহিতে হইবে। আব্দার করিয়া নাত্‌নী বলিলেন, "দাদা! কেবল পরের বাড়ীতে কথা কও, পরেরা শোনে, আমরা কি একদিনও শুনিতে পাইব না? একদিন আমাদের রাম-রাবণের পালাটা শোনাও দাদা?"

গৃহিণী ঠাকুরাণীও ঐ আব্দারে যোগ দিলেন। ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই স্ত্রীবাধ্য, "দেহি পদপল্লব মুদারম্" এই মন্ত্রটি ঘরে ঘরে সকলে আবৃত্তি করেন কি না, তাঁহারাই বলিতে পারেন। কথক ঠাকুর গৃহিণীর অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া বাড়ীর বাহিরে খোলা যায়গায় বেদী বানাইয়া, সামিয়ানা খাটাইয়া, কথা কহিবার ব্যবস্থা করিলেন। কথা হইবে শুক্লপক্ষের পনের দিন, কথার নাম রাম-রাবণের পালা।

পাড়ার সকলেই শুনিল—কথকের বাড়ীতে কথা হইবে, প্রতিদিন বৈকালে কাঁসর বাজে, কথকঠাকুর ফুলের মালার গহনা পরিয়া চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গে বেদীর উপর যোগাসনে বসেন, অনেক লোক জড় হয়, স্ত্রী-লোকের ভাগ বেশী। যেখানে স্ত্রীলোক, কথকেরা সেইখানে রসিকতার ভাগটা বাড়াইয়া দেন, বসিয়া বসিয়া বানর সাজেন, দন্ত বাহির করেন, রাক্ষস সাজিয়া হাঁ করেন, গৃহিণী সাজিয়া নাক মুখ বাঁকাইয়া কর্ত্তার উপর ঝঙ্কার ঝাড়েন, সব রকম চলে। শ্রোতারা আমোদ পাইয়া হাস্যধ্বনির তুফান তোলে, মাঝে মাঝে হরিবোল দেয়।

নিজ বাড়ীর কথায় কথকের খুব সুখ্যাতি বাজিল। ভিন্ন পাড়া হইতেও বহুতর নরনারী জুটিতে লাগিল। আসর বেশ সরগরম। ইন্দ্রজিত মায়া-সীতা কাটিয়া রণক্ষেত্রে রামকে শোকাকুল করিয়াছেন, "হা সীতা, হা জানকী, হা রামময় জীবীতে!" এই সব কথা বলিয়া রামচন্দ্র বিলাপ করিতেছেন, কথক মধ্যে মধ্যে চক্ষের জল ফেলিয়া, হাঁচিয়া কাসিয়া, গলা শানাইয়া উত্তরীয় বসনে ক্ষণে ক্ষণে নেত্র মুখ মার্জ্জন করিতেছেন। ধর্ম্ম উপদেশের কথা পড়িল।

গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া কথক বলিতে লাগিলেন, "সকলে একাগ্র হও, একমন না হইলে ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণে কোন ফল হয় না। সন্ধ্যাহ্নিক কর, পূজা অর্চ্চনা কর, পুরাণ পাঠ কর, পুরাণ শ্রবণ কর, ধর্ম্মের নামে যে কার্য্যই

কর, একমন হওয়া দরকার, দুই মন, তিন মন হইলে সমস্তই পণ্ড হয়, পাশকথা পাড়িলে অনন্তকাল নরক বাস হয়, অতএব ধর্ম্মকথা শুনিবার সময়, ধর্ম্মকথা বলিবার সময় একাগ্রমন হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। সে সময় সংসারের মায়ামোহ বিসর্জ্জন দিতে হয়, কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ করিতে নাই। এমন কি, সে সময় যদি সম্মুখভাগে উপযুক্ত পুত্র বজ্রাঘাতে মরে, তথাপি সেদিকে চাহিয়া দেখিতে নাই। মায়া-মমতা কাটাইয়া এতদূর তন্ময় হইলে, তবে ধর্ম্ম কথা শ্রবণের, পঠনের, কথনের অধিকার জন্মে।"

রাম বিলাপ করিতেছেন। কোথায় সীতা, অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত চারিদিকে চাহিতেছেন, ঠিক্ অভিনয় দেখাইবার মতলবে কথক নিজেও সেই সময় সজল নয়নে চারিদিকে চাহিলেন।

বলা হইয়াছে, বাড়ীর বাহিরে খোলা যায়গায় সামিয়ানার নীচে কথক-তার মজলিস, কোন দিকে প্রাচীর ছিল না। বেদীর পশ্চাদ্ভাগে দক্ষিণ-দিকে কথকের স্বহস্ত-রোপিত তিনটি লাউ গাছ। ভূতলে লতাইয়া বেড়াইলে গোরুতে খাইয়া ফেলিবে, সেই উপদ্রব নিবারণের উদ্দেশে বাঁশের মাচা বাঁধিয়া তাহার উপর গাছগুলিকে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এক মাচা লাউশাক।

রামের বিলাপের অনুকরণে কথক যখন চতুর্দ্দিকে চাহিতে চাহিতে দক্ষিণদিকে মুখ ফিরাইলেন, তখন দেখিলেন, চুপি চুপি একটা গাভী আসিয়া চুরি করিয়া লাউপাতা খাইতেছে।

আর কোথায় যায়! কথক তৎক্ষণাৎ বেদী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, লম্বা একটা বাঁশ ঘাড়ে করিয়া, ছুটিয়া গিয়া গাভী ঠেঙ্গাইতে আরম্ভ করিলেন, গাভীর অধিকারীর চতুর্দ্দশ পুরুষকে পবিত্র করিতে লাগিলেন। হাম্বারব করিতে করিতে পুচ্ছ তুলিয়া গাভী ছুটিল, কথকও বাঁশ হাতে করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিলেন।

শ্রোতারা এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া কথকের উপদেশ শুনিতেছিলেন, এই রঙ্গ দেখিয়া হৈ হৈ রবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কাহার মুখে রামায়ণ শুনিতে আসিয়াছিলাম, এই অনুতাপে আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে দিতে সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্ম কথা শুনিবার সময় একমন হইতে হয়, মায়া কাটাইতে হয়, পুত্রশোক ভুলিতে হয়, যাঁহার মুখে এই উপদেশ,—দুই তিনটা লাউ পাতার মায়া কাটাইতে না পারিয়া, লাউশাকের শোক

ভুলিতে না পারিয়া, সেই উপদেশক রামায়ণ ভুলিয়া গাভীবধ করিতে ছুটিলেন, এমন পাষণ্ডের মুখে নিশ্চয়ই ধর্ম্মশাস্ত্রের অপমৃত্যু।

এই ব্যাপার ক্রমশঃ মুখে মুখে অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রচারিত হইল, কেহই আর সে কথককে কথা কহিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন না, কথকের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়া পড়িল, পেটের দায়ে অগত্যা তিনি গুরুমহাশয় সাজিয়া পাঠশালা খুলিয়া বসিলেন।

উপদেশের সঙ্গে কার্য্যের মিল দেখাইতে না পারিলে উপদেশককে এইরূপ হাস্যস্পদ ও ঘৃণাস্পদ হইতে হয়। ইংরাজীতে আছে, Precepts simile exemplur অর্থাৎ উপদেশের অনুরূপ দৃষ্টান্ত প্রয়োজন। এই কথকটি যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, এরূপ দৃষ্টান্তে শ্রোতৃবর্গের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বরং সঙ্কুচিত হইয়া যায়। আমরা আশা করি, আমাদের বর্ত্তমান সমাজের নবীন নবীনবাগ্মী মহাশয়েরা বক্তৃতা করিবার সময় এই কথক ঠাকুরটিকে স্মরণ করিবেন।

চীন চিত্র।

জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া যত প্রাচীন দেশের বিবরণ জানিতে পারা যায়, চীন তন্মধ্যে একটি। একদিন ভারতবর্ষ যেমন উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, চীনও তেমন একদিন উন্নতির শীর্ষ সীমায় আরোহণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ যেমন তাহার ভূতপূর্ব্ব বিবিধ অলৌকিক সামগ্রীর স্পর্দ্ধায় এখনও এই ঘৃণিত পরাধীনাবস্থায় বিজিত জাতির মনাকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, চীন যে তাহা হইতে ন্যূন, তাহা বলা যায় না। ভারতের অতীত-স্মৃতি জাগরুকের এখনও অবশিষ্ট চিহ্ন সকল যেমন তাহার পূর্ব্বের বিনষ্ট গৌরবের উজ্জ্বল-চিত্র মানব-নয়নে উদ্ভাসিত করিতেছে, চীনেও যে তাহার কিছু কম তাহা নয়। চীনও তেমনই নানা অলৌকিক বস্তু দ্বারা মানব-মন আকর্ষণ করিতেছে। ভারতবর্ষের এই চিত্তাকর্ষণীয় অবস্থাই যেমন তাহার অবনতির অন্যতম কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, চীন-সাম্রাজ্যও তেমনই তাহার চিত্তাকর্ষণকারী অবস্থার জন্য আজ ভারতের ন্যায় ঘোর দুর্দ্দশার ভিতর পড়িয়া নিরন্তর অনন্ত যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে। উভয়েরই ভাগ্য-চক্রে অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

উভয়েরই একদিন মহা সুখের অবস্থা ছিল। আবার আজ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে উভয়েই দুঃখের অনন্ত গাঢ় অন্ধকারের অন্ধতম নিভৃত প্রদেশে নিক্ষিপ্ত হইয়া, অসীম অত্যাচারের অভাবনীয় যাতনা নীরবে সহ্য করিতেছে!

যে হিন্দুজাতি একদিন, অসাধারণ বুদ্ধিমান্ বলিয়া জগদ্বিখ্যাত ছিলেন ও আধুনিক সভ্য-প্রাচ্য-সুধী-মণ্ডলী যাঁহাদিগের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা শত-মুখে ব্যক্ত করিয়া থাকেন, সেই হিন্দুজাতিও ত এখনও জগতে বিদ্যমান্, সেই চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রাদি গ্রহ উপগ্রহ সমূহ এখনও ত তেমনই পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত, ধরিত্রী ত তেমনই এখনও পূর্ব্বের ন্যায় পদার্থনিচয় বক্ষে ধারণ করিতেছেন, তবে হিন্দুজাতি এমনতর ভয়ানক দুর্দ্দশাগ্রস্ত কেন? তাহার কারণ, যে অবস্থার জন্য হিন্দুজাতির গৌরব ছিল, সেই অবস্থা আর সেই সময় এই উভয়েরই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। সুতরাং হিন্দুজাতির আজ এইরূপ ভয়ানক শোচনীয় অবস্থা। চীনও যে সেই অবস্থা এবং সময়ের পরিবর্ত্তনের জন্য এইরূপ যন্ত্রণাভোগ করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চীনদেশের সহিত ভারতবর্ষের যে পরিচয় শুধু ইংরাজ রাজত্বের কল্যাণে আমরা জানিতে পারিয়াছি, তাহা নয়। ভারত ও চীনের পরিচয় আজ নূতন নহে। উভয়ের ভিতর সৌহৃর্দ্দতা খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রায় (৫০০) পাঁচশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে উভয়ের ভিতর বিলক্ষণ ঘনিষ্টতা ছিল। ইহারই ফলে খৃষ্টীয় শতাব্দীর দুইশত বাটি বৎসর (২৬০ বৎসর) পূর্ব্বে অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ (Buddhist Bhikshus, ie Buddhist mendicants) দুর্লঙ্ঘ্য হিমাদ্রি শিখর উত্তীর্ণ হইয়া, চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে গমন করিয়াছিলেন এবং খৃষ্টীয় ছয়শত সাত বৎসরের পর (৬০৭ বৎসর) হর্ষবর্দ্ধণের রাজত্বকালে হুয়েন্থ স্যাঙ্গ (Hiouenthsang) ভারত ভ্রমণে আগমন করিয়াছিলেন। সময়ের কুটিলচক্রে আজ সেই ভারত এবং সেই চীনের কত আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! উভয়কে দেখিয়া উভয়ে যেন কত অপরিচিতের ন্যায় জ্ঞান করিতেছে। আমরা এখন আর চীনের খবর রাখি না, চীনও আর এখন আমাদের খবর রাখে না। চীনবাসীদিগের ভারতাগমনে কোনরূপ বাধা নাই। কিন্তু ভারতবাসীদিগকে চীনরাজ্যে না যাইতে দিবার জন্য চীন সম্রাটের "কড়া হুকুম" রহিয়াছে! তাহার কারণ, চীনারা ইংরাজদিগের হাতে অনেক লাঞ্ছনাভোগ করিতেছে। আমরা সেই ইংরাজের

অনুগত প্রজা। সুতরাং আমরাও চীনবাসীদিগের বিষ-নয়নে পতিত হইয়াছি। সেই হেতু চীনদেশে আমাদের প্রবেশ নিষেধ! আজ সেই ভূতপূর্ব্ব বিস্মৃতপ্রায় মিত্ররাজ্য চীনদেশের একটা ক্ষীণ আভাস দিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

চীন ইতিবৃত্ত।

চীনদেশে সাধারণতঃ আদিমবাসীগণ, মাঞ্চুতাতারীয় এবং চীনাম্যান (The Chinees) এই তিন শ্রেণীর লোক বাস করিয়া থাকে।

সর্ব্বপ্রথম এই দেশে আদিমবাসীর বিভিন্ন শ্রেণী সকল বাস করিত। ক্রমে চীনারা এই সকল অধিবাসীদিগকে পরাভূত ও দূরবর্ত্তী দুর্গম পর্ব্বতাদিতে বিতাড়িত করিয়া, রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। হিন্দুদিগের প্রাচীন বিবরণের ন্যায় চীনবাসীদিগেরও বিবরণ অপ্রকৃত বা অতিরঞ্জিত। হিন্দুদিগের মতে যেমন মান্ধাতা, তেমনই চীনবাসিদিগের মতে ফানকু (Phanku) তাহাদিগের আদি রাজা। এইরূপ প্রবাদ যে, ফানকুর সময় হইতেই সর্ব্বপ্রথম স্বর্গ ও পৃথিবী পৃথক হয়। ইহার পর অতি সম্ভ্রান্ত এবং মহাপরাক্রান্তশালী তিনটী রাজবংশ একাদিক্রমে রাজত্ব করে। চীনবাসিদিগের এইরূপ বিশ্বাস যে, ইহাদের মধ্যে দ্বাদশ জন স্বর্গীয়, একাদশ জন পার্থিব এবং নয় জন মানবজাতীয় রাজা, পঞ্চাশ হাজার বৎসর (৫০,০০০ বৎসর) পর্য্যন্ত অকণ্টকে রাজত্ব করে। ইহাদের রাজত্ব শেষ হইবার পর অসংখ্য বিভিন্ন শ্রেণীর রাজারা রাজত্ব করে।

চীনেরা বলে যে, তাহারা সর্ব্বপ্রথম কাস্পিয়ান সমুদ্রের (The Caspian Sea) দক্ষিণাংশ হইতে চীনদেশে আগমন করে। তাহারা যে সময় চীনদেশে আগমন করে, তখন তাহারা জ্যোতিষ ও লিখনপ্রণালী অবগত ছিল। এই বিষয়ে বেবিলোনিয়ানদিগের (The Babylonians) নিকট চীনারা চিরকৃতজ্ঞ। কারণ, উন্নত বেবিলোনিয়ানদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে চীনারা এই দুই বিষয় শিক্ষালাভ করে। প্রাচীন বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, হিন্দুদিগের প্রথমাবস্থার ন্যায় চীনারাও ঔপনিবেশিকপ্রিয় ছিল। চীনারা সর্ব্বপ্রথম চীনদেশের উত্তর পূর্ব্বাংশে বাস করিতে আরম্ভ করে। এই সময় হইতে তাহাদিগের সহিত আদিমবাসীদিগের সর্ব্বদাই যুদ্ধাদি হইত। এই সকল যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া, আদিমবাসীদের

দূরে বিতাড়িত করিয়া দিয়া, চীনারা তাহাদিগের স্বীয় রাজ্যবিস্তার করিত। এইরূপে তাহারা সমগ্র চীনদেশ, বহুদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর, স্বীয় শাসনভুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

কোন্ সময় যে সর্ব্বপ্রথম চীনারা চীনদেশে আগমন করে, তাহা অনিশ্চিত। তবে অনেকে অনুমান করেন যে, খৃষ্টের (২৫০০ হাজার বৎসর) দুই হাজার পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে তাহারা উক্ত দেশে প্রথম আগমন করে। তবে এ অনুমান যে এখন পর্য্যন্ত সন্দেহজনক, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কিন্তু চীনাদের যে ইতিহাস আছে, তাহাতে খৃষ্টের সাতশত একুশ বৎসর (৭২১ বৎসর) পূর্ব্বের অনেক বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লিখিত আছে; এবং এই সময় হইতে অনেকটা ধারাবাহিক ঘটনা জানিতে পারা যায়।

বহু বৎসর পর্য্যন্ত এই দেশ বিভিন্ন রাজাদের করায়ত্ত ছিল। এই সকল রাজারা পরস্পর প্রায় অনেক সময়ই যুদ্ধ-বিবাদাদিতে ব্যস্ত থাকিত। কিন্তু অনেক দিন এইরূপ অবস্থায় অতিবাহিত হইলে পর, এক সময় এই সকল রাজাদিগের ভিতর হইতে একজন সবিশেষ প্রাধান্য লাভ করেন। এবং অপর সকল রাজারা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে।

খৃষ্টীয় শতাব্দীর দুইশত পঞ্চান্ন বৎসর (২৫৫ বৎসর) পূর্ব্ব হইতে চীনদেশে শিন বংস (Tsin Dynasty) রাজত্ব করিতে আরম্ভ করে। খৃষ্টীয় শতাব্দীর দুইশত ছ'চল্লিশ বৎসর (২৪৬ বৎসর) পূর্ব্বে হোয়াঙ্গটি (Hwangte) চীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই রাজা সবিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। চীনদেশে সর্ব্বপ্রথম হোয়াঙ্গটিই "সম্রাট্" উপাধি লাভ করেন। এই সম্রাট্ অতিশয় অত্যাচারী এবং মহাপরাক্রমশালী ছিলেন। সেই হেতু প্রজাপুঞ্জের নিকট ইনি বড় অপ্রিয় ছিলেন। ইনি কৃষিবিষয়ক, চিকিৎসা এবং ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ ব্যতিরেকে আর সমস্ত গ্রন্থই ভস্মীভূত করেন। কেন যে এরূপ বিস্ময়কর অভিনব কার্য্যানুষ্ঠান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহা বলা বড়ই কঠিন। তবে অনেকে অনুমান করেন যে, সন্দিগ্ধতাই ইহার মূলীভূত কারণ। বোধ হয়, সম্রাটের মনে এইরূপ উদয় হইয়া থাকিবে যে, গ্রন্থোল্লিখিত ওজোস্বিনী ভাষার দ্বারা সহজেই মানব-মন আকৃষ্ট হইতে পারে; সুতরাং সম্রাটবিরুদ্ধে ওজোস্বিনী ভাষায় কোনও গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে প্রজাদিগের রাজভক্তির অভাব হইয়া ক্রমে

বিদ্রোহের আশঙ্কা হইতে পারে। দ্বিতীয় কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজাদিগের ব্যবহার চরিত্রাদি সম্বন্ধীয় বর্ণনা সম্বলিত গ্রন্থাদি প্রচলিত থাকিলে প্রজাবর্গ অনায়াসেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজাদিগের সহিত তাঁহার চরিত্র ব্যবহারাদি তুলনা করিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে ক্রমশঃ রাজভক্তির হ্রাস হইবার আশঙ্কা। তৃতীয় কারণ, সাহিত্যাদি গ্রন্থাধ্যয়ন দ্বারা তাহাদের ক্রমিক জ্ঞানোন্নতি স্বাভাবিক এবং জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই ভাল মন্দ, সৎ অসৎ বিবেচনা শক্তি এবং তাহার প্রতিবিধানের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। সুতরাং যদি সমুদয় গ্রন্থ নষ্ট করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে তাহাদিগকে চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে রাখা হইবে এবং মূর্খতা হেতু স্বাধীন ভাব মনের মধ্যে আসিতে পারিবে না। সুতরাং স্বাধীন হইবার চেষ্টাও তাহা হইলে করিতে পারিবে না। তাহা হইলে তাহাদিগকে অক্লেশে তাঁহার স্ববশে চিরকাল রাখিতে সক্ষম হইবেন। আমাদের নিকট শেষোক্ত মতই অধিক সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। কারণ, আধুনিক ইংরাজদিগের ইহাই মত যে, ভারতবাসীদিগের ভিতর যে রাজভক্তির অভাব দেখা যায়, তাহা শিক্ষার দ্বারা ক্রমশঃ জ্ঞানোন্নতিই তাহার মূল কারণ; এবং তাঁহাদিগের মত এইরূপ যে, ভারতবাসীদের হৃদয়ে রাজভক্তি অচলা রাখিতে হইলে তাঁহাদের উচ্চ শিক্ষার স্রোত বন্ধ করা। সম্রাট হৃদয়ে উপরোক্ত কারণগুলি উদয় হওয়াতে এই সকল পুস্তকাদি নষ্ট করিবার পক্ষে বিশিষ্ট কারণ হইতে পারাও বিচিত্র নহে।

এই সম্রাট তাতারদিগের দুর্দ্দমনীয় আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য চীনপ্রান্ত সীমায় পৃথিবী বিখ্যাত সাতটী আশ্চর্য্য পদার্থের অন্যতম আশ্চর্য্য পদার্থ "বৃহৎ প্রাচীর" (Great wall) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

১২০৯ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চুরীয় বা উত্তর তাতারীয়দিগকে বিদূরিত করণার্থ মোগল বা পশ্চিম তাতারীয়দিগকে আহ্বান করে। মোগলেরা মাঞ্চুরীয়দিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া, শেষে আহ্বানকারী চীনদিগকেও রাজ্যচ্যুত এবং বিতাড়িত করিয়া দিয়া, দেশ অধিকার পূর্ব্বক নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে মীঙ বংশীয়েরা (Ming dynasty) মোগলদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া পুনরায় রাজ্যশাসন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই মীঙ বংশ চীনদেশে একাদিক্রমে ২৭৬ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করে। তাহার পর এই বংশের একজন বলপূর্ব্বক চীন সিংহাসন অধিকার করে। ইহার প্রতিকার মানসে অপর পক্ষীয়েরা মাঞ্চুরীয়

দিগের শরণাপন্ন হয়। মাঞ্চুরীয়গণ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে চীনদিগকেও চিরদিনের জন্য চীন সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিয়া, পুনরায় রাজ্যাধিকার করিয়া, পিকিঙ দেশে (Peking) রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক রাজ্য শাসন আরম্ভ করে। মাঞ্চুরীয়গণ ক্রমশঃ সমুদয় চীন সাম্রাজ্যে রাজত্ব বিস্তার পূর্ব্বক এই বিশাল রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করে। এই মাঞ্চুরীয়দিগের বংশধরগণই বর্ত্তমান চীন রাজ্যের সম্রাটপদে বিরাজমান।

পুরুষদিগের সৌন্দর্য্য।

চীনাদের গায়ের রং হলুদ বর্ণ। গণ্ডদেশের অস্থি উচ্চ। চোক তের্ছা (Turned up outercorner of the eye) নাক চেপ্টা এবং অধরৌষ্ঠ পুরু। ইহাদের খুব পাতলা গোঁফ (a thin beard) এবং কদর্য্য কাল চুল হইয়া থাকে।

১৬৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চীনারা কেশরাশি মাথার উপর গুচ্ছাকৃতিতে ধারণ করিত। মাঞ্চুরীয়দিগের রাজত্বকালে, চীনাদের সমুদয় কেশরাশি মুণ্ডন করিয়া মস্তকের ঠিক মধ্যস্থলে (হিন্দুদিগের অর্কফলার মত) চুল রাখিবার আদেশ করেন। কেন যে এমন হাস্যবর্দ্ধক অদ্ভুত সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী হইয়া সম্রাট এই প্রকার আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা মানব-ধারণার অতীত। চীনারা প্রথমতঃ এই আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। আদেশ অমান্য করিবার জন্য বিজিত মাঞ্চুরীয়দিগের হাতে চীনাদের যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। এমন কি, অনেকের প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইয়াছিল! অবশেষে চীনারা এই আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে স্বীকার করিয়াছিল।

চীনারা কেশগুচ্ছ যত্নপূর্ব্বক বিন্যাস করিয়া পৃষ্ঠোপরি লম্বমানাবস্থায় রাখিয়া দেয়। এই প্রকার লম্বিত কেশগুচ্ছকে সাধারণতঃ "পিক টেইল" (Pig tail) বলা হইয়া থাকে। পুরুষদিগের এই প্রকার সুদীর্ঘ বেণী সৌন্দর্য্যের অন্যতম লক্ষণ। যদি কাহারও দৈববশে চুল ছোট হয়, তাহা হইলে চুলের সহিত রেশমী ফিতা বা ঐ রকমের কোন দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে বেণী দীর্ঘ করিবার প্রথা চীনদেশে খুব বেশী প্রচলিত। চীনাদের মধ্যে প্রধান অপমানজনক শব্দ "অর্ক-শূন্যতা" (Tail-less) চীনারা প্রাণদণ্ড এবং কেশগুচ্ছকর্ত্তন সমান জ্ঞান করিয়া থাকে।

অন্য লোকের এই কেশগুচ্ছের জন্য বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু ভারবহনকারী মুটিয়াদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। মুটিয়ারা ভারবহন সময়ে মাথায় বেণী জড়াইয়া রাখিয়া দিয়া থাকে।

রমণীদিগের সৌন্দর্য্য।

পুরুষদিগের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা রমণীদিগের সৌন্দর্য্য আরও চমৎকার ও অদ্ভুত। জাতিভেদে এবং দেশভেদে রুচির বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু এবন অস্বাভাবিক রুচি এক চীন ভিন্ন সভ্য জগতের আর কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। সুসভ্য জাতি সকল বিশেষতঃ ভারতবর্ষে নারীজাতির বিবাহের পূর্ব্বে যেমন বিবাহযোগ্যা কন্যার সচ্চরিত্রতা, বুদ্ধিমত্তা বা দৈহিক সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধান লওয়া হইয়া থাকে, চীনদেশে তেমনই কন্যার পদদ্বয়ের আয়তন সম্বন্ধে অনুসন্ধান লওয়া হইয়া থাকে। তিন ইঞ্চি দীর্ঘ পদদ্বয়যুক্তা রমণীদিগকে রমণী মণ্ডলীর সৌন্দর্য্য-সরসী-"স্বর্ণপদ্ম" (Goldenlily) বলিয়া চীনারা আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে। অর্থশালিনী সৌন্দর্য্যাভিমানিনী রমণীগণ বালিকাদিগের স্কন্ধে বা সুদৃঢ় যষ্টির উপর নির্ভর করিয়া অতি কষ্টে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া দুই এক পদ চলিতে পারে! আবার যদি কোনও সৌখিন চীন রমণীর কখনও উদ্যান ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা হয়, তবে তাহাকে নারীবাহিকাদিগের দ্বারা বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

ভারতবর্ষীয় কবির চক্ষে নারীজাতির মরাল বা গজগামিনী গমন যেমন সৌন্দর্য্যের চিহ্ন এবং শুভ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, চীনকবিগণ তেমনই রমণীদিগের "উইলো বৃক্ষের আন্দোলনের ন্যায়" গমন সৌন্দর্য্যের চিহ্ন এবং শুভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়া হাঁটিলে আমাদের যেমন দেখায়, চীনসুন্দরীগণেরও গমন অনেকটা তেমনই দেখাইয়া থাকে। আমার একজন বন্ধু এ সম্বন্ধে বেশ একটি সুযুক্তিপূর্ণ কারণ নির্দ্দেশ করেন। বন্ধুপ্রবর এ বিষয়ে চীনাদের মূর্খতা বা অসভ্যতা প্রমাণের পক্ষে বিশেষ নারাজ। তিনি এ বিষয়ে বরং চীনাদের চতুরই বলিয়া থাকেন। কারণ, স্ত্রীচরিত্রের গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে মানবজ্ঞান তো কম কথা, দেবতারাই দিশাহারা হইয়া যান। সুতরাং চতুর চীনারা স্ত্রী-চরিত্রের সতীত্বরক্ষার নিমিত্ত এই নিয়ম করিয়াছে! চীনারা

রমণীদিগের গমনাগনের অক্ষমতা করিয়া দিয়া প্রকারান্তরে রমণীদিগকে বন্দীভাবে রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস।

তবে, সকলকেই এই প্রকার বন্দীভাবে থাকিতে হয় না। ধনৈশ্বর্য্যশালিনী সৌন্দর্য্য-ভিখারিণীদিগকেই এই জ্বালা ভুগিতে হয়। দরিদ্রাদিগের ভিতর অনেকটা এ নিয়ম কম। কেন না, শুধু সৌন্দর্য্যে তো আর পেট ভরে না! উদরান্নের সংস্থানের জন্য পায়ের নিত্য প্রয়োজন; তাহার অভাবে আহার্য্য সংগ্রহে অক্ষমতা জন্মিলে মৃত্যু অনিবার্য্য। সুতরাং তাহাদের রূপ-পিপাসা থাকিলেও, তাহা নিবারণের উপায় নাই।

এই পা ছোট করণরূপ ব্যাপার শিশুর পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। এই সময় হইতেই লোহার জুতা ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোক আছে; তাহারাই এ সব সাধারণতঃ করিয়া থাকে। ইহাদিগকে সাধারণতঃ "পায়ের ডাক্তার" বলা হইয়া থাকে। যে সব বালিকাদিগের পা ছোট করিবার জন্য জুতা পরান হয়, তাহাদিগকে এক বৎসর পর্য্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে এই যন্ত্রণার সহিত আবার জ্বর হইয়া থাকে। সেই সময় তাহাদের যন্ত্রণা অসহ্য অবর্ণনীয়! এমন কি, চীন শিশু বালিকা শীতকালের রাত্রে গরম বস্ত্র গায় দিতে চায় না। ভয়, পাছে গরম বস্ত্রে পায়ের যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়!

চীনরমণীদিগের ভিতর কেশবিন্যাসের প্রথা বিশেষ প্রচলিত। কেশবিন্যাসের প্রথা চীন সাম্রাজ্যের ভিতর প্রত্যেক দেশেই বিভিন্ন প্রকার। চীনসুন্দরীগণ স্বাভাবিক কৃত্রিম পুষ্প মস্তকে ধারণ করিতে অতিশয় পছন্দ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় রমণীগণ যেমন চুলের খোঁপা দৃঢ় করণার্থ চুলের কাঁটা (Hair Pins) ব্যবহার করিয়া থাকে, সৌখিন চীনরমণীগণও তেমনই চুলের খোঁপা দৃঢ় করণার্থ বাঁশের সরু, দৃঢ় এবং লম্বা কাঁটা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই কাঁটাগুলি এত লম্বা যে, অনেক সময় মস্তকের বিশ্রামের স্থল হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় রমণীগণের ভিতর যেমন জাফ্রাণাদি দ্বারা হাত পায়ের নখাদি রং করিবার প্রথা প্রচলিত, তেমনই চীন রমণীদিগের ভিতর সাদা এবং লাল রংএর দ্বারা মুখ চিত্রিত করিবার প্রথা প্রচলিত।

শ্রীঅজিতপ্রসাদ সান্যাল।

কানন।

(১)

শান্তির আবাস ভূমি পবিত্র কানন
তোমারে যে ভালবাসি
তাই দেখিবারে আসি
আহা কি মধুরভাব সৌম্য দরশন
জান না সংসার জ্বালা জীবনে কখন।

(২)

থাক সুখে নীরবতা সহচরী সনে
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ
না আছে পার্থিব ক্লেশ
শান্তির বিমল জ্যোতি স্ফূরিত আননে
তোমা হেন সুখী কেবা এ বিশ্ব ভুবনে!

(৩)

অভাব কাহার নাম জান না কখন
প্রকৃতি আপন করে
কতই যতন ক'রে
রেখেছে সাজায়ে তব ভাণ্ডার কেমন
যাহা চাই তাহা পাই মনের মতন!

(৪)

বড় ভালবাসে আহা প্রকৃতি তোমায়
তাই তব শ্যাম কায়
যতনে সাজায়ে দেয়
বিবিধ সুরভী ফুল্ল পুষ্প অলঙ্কারে
তুলনা কোথায় তার ধরণী মাঝারে!

(৫)

রাজার অধিক সুখ ভুঞ্জ তুমি বন
নব শ্যাম-দূর্ব্বাদল
শোভে তব মখমল
জোঁনাকী চুমকি দিয়ে সাজায় কেমন
কি সুন্দর চন্দ্রাতপ শুনিল গগন!

(৬)

রবির কিরণে তপ্ত যবে তব কায়
পবন আসিয়ে বাসে
দাঁড়াইয়ে তব পাশে
নব কিশলয় দলে চামর ঢুলায়
তটিনী আপন করে চরণ ধোয়ায়।

(৭)

তোমার প্রমোদ তরে বিহঙ্গ কলাপ
কলকণ্ঠ কলস্বরে
(সুধাবিন্দু যাহে ঝরে)
বসন্ত বাহারে করে মধুর আলাপ
শুনে, যায় সন্তাপীর দূরে মনস্তাপ।

(৮)

শিখী সহ আসি দ্বারে শিখিনী সুন্দরী
আহা কি নর্ত্তন করে,
দেখে মন প্রাণ হরে,
কীচকে বাজায় তালে মধুর বাঁশরী
সে স্বরে বহিয়া যায় সুধার লহরী।

(৯)

বড় ইচ্ছা করে বন ত্যজি গৃহবাস
যাইয়ে তোমার পাশে
থাকি সদা মহোল্লাসে
ঘুচাই প্রাণের জ্বালা জ্বলন্ত হুতাশ
পরশিয়া সুশীতল শান্তির বাতাস।

(১০)

ভালবাসা সংসারের দারুণ বন্ধন
ছেদিতে সে ভালবাসা
মানবের বৃথা আশা
ছেদিলে আবার বাঁধে আশ্চর্য্য কেমন
পার না কি তুমি মোরে করিতে মোচন?

(১১)

সংসারের ভালবাসা নাহি চায় প্রাণ
স্বার্থের গরল মাখা
কালফণী ফুলে ঢাকা
চাতুরী সঙ্গিনী নিত্য ভরা অভিমান
পৃথিবীর প্রেমে কভু নাহি প্রতিদান।

(১২)

কত দুঃখী আমি, তুমি জাননা রে বন
প্রাণের অধিক জেনে
বুকে যারে নিশি দিনে
রেখেছি সোহাগে কত ক'রেছি যতন
হাঁটিলে বুকেতে ব্যথা পেয়েছি বিষম।

(১৩)

বাতাস বহিলে জোরে ভেবেছি বা কত
পাছে ব্যথা লাগে পায়
শিরীষ কুসুম প্রায়
ভুলেছে আমায় সেই জনমের মত
সাধিলেও কথা নাই বিরাগ সতত।

(১৪)

দেখিলে একটু হাসি যাহায় অধরে
ধরায় স্বরগ জ্ঞান
হ'য়েছে ভুলেছে প্রাণ
আকাশের চাঁদ যেন পাইয়াছি করে
দিনান্তে ফিরেও এবে চাহেনা সে মোরে।

(১৫)

একটী মুখের কথা শুনিলে যাহার
উল্লাসে নাচিত প্রাণ
দূরে যেত বাহ্য জ্ঞান
উথলিত সুখ উৎস আনন্দ অপার
ভাবিতাম এ সংসারে এই বুঝি সার।

(১৬)

হেরিতে মুখানি যার ভবে অতুলন
বরষার ধারা পাত,
দারুণ হিমানী বাত,
কিছুমাত্র মনে নাহি করিয়ে গণনা
ছুটেছি পাগল পারা সেত তা দেখে না।

(১৭)

কণ্টকে রুধির ধারা ছুটেছে চরণে
নিদাঘ রবির করে
সর্ব্বাঙ্গেতে স্বেদ ঝরে
পিপাসায় শুষ্কতালু কিছু নাই মনে
কেবল দেখিতে ইচ্ছা সে চাঁদ বদনে।

(১৮)

ঘুমালেও ভুলিবারে নাহি যারে যায়
ললিত লতার মত
লাবণ্যলহরী কত
হৃদয় সাগরে উঠে তুফান খেলায়,
ভুলেও সে মনোরমা চাহে না আমায়।

(১৯)

জানি আমি সে যে মোর সাধনের ধন
তাই পুণ্য সাধনায়
পেয়েছি যে আমি তায়
কি পাপে সে পুণ্য মোর ফুরাল এখন,
বলিতে কি পার তুমি আমারে কানন?

(২০)

অবশ্যই মহাপাপী এই নরাধম,
নতুবা সে চাঁদ মাঝে,
কলঙ্ক কভু না সাজে,
সে গোলাপে নাহি কাঁটা অতি মনোরম
নন্দনের পারিজাত সে যে অনুপম!

(২১)

সে যে মোর নিরমল ক্ষীরোদের জল
মলিনিমা নাহি তায় ;
স্বচ্ছ শুভ্র পূতকায়
পাপী আমি পাইতেছি তাই প্রতিফল
তাই সহি দিবানিশি যাতনা কেবল !

(২২)

সরলা প্রতিমা সেই দয়ার আধার
পরদুঃখে তার প্রাণ
সততই ম্রিয়মাণ
কেন সে বোঝেনা তবে এ দুঃখ আমার ?
আমারই সব দোষ দোষ নাহি তার।

(২৩)

অথবা যে জন ভবে দারিদ্র্যপীড়নে
নিয়ত কাতর প্রাণ,
সে পুনঃ হৃদয়বান্,
একথা বিশ্বাস বল করে কোন জনে
রুধিয়ে রক্তিমা তার কে ভাবে স্বপনে ?

(২৪)

সে জন যে ভালবাসে, ভালবাসা তার
এ সংসারে কেবা চায়
ফিরে কেবা দেখে তায়
বিরাগে সকলে তারে করে পরিহার
বাতাসে মিলিয়ে যায় ভালবাসা তার।

(২৫)

জলের বুদবুদ্ যথা জলেতে মিলায়,
মুহূর্ত্ত কালের তরে
ঝলসিয়া নীলাম্বরে
চঞ্চলা চপলা যথা মেঘেতে লুকায়
দুঃখীর জনম হায় তেমনি ধরায়।

(২৬)

একটিও চক্ষু তারে করুনা নেহারে
তাহার দুঃখের কথা
কে কবে শুনেছে কোথা ?
পশে না যে আর্ত্তস্বর শ্রবণ মাঝারে,
তার তরে বিন্দু অশ্রু কে ফেলে সংসারে।

(২৭)

একটিও আহা উহু কেউ ত করে না
একটিও ক্ষুদ্র প্রাণ
নাহি দেয় তারে স্থান
একটিও তার তরে নিশ্বাস ঝুরে না
ভুলে কারো মুখে তার নামটি স্বরে না।

(২৮)

তাই কাঁদি হে কানন আসি তব ঠাঁই
তোমার উদার প্রাণ
কর বিন্দু স্থান দান
তাহলে সুখেতে শেষ জীবন কাটাই
সংসারের ভোগসুখে বাঞ্ছা আর নাই।

(২৯)

দরিদ্রের নাহি সুখ সংসার মাঝারে
অশান্তির কালানল
দহে সদা অন্তস্তল,
ছটফট করে প্রাণ ফুকারিতে নারে
এসেছি কানন তাই তোমার দুয়ারে।

(৩০)

শান্তিময় তব স্থান পবিত্র আবাস
নাহি দম্ভ অহঙ্কার
না আছে পাশবাচার,
না আছে ধনের গর্ব্ব ধনীর সন্ত্রাস,
নাহি আছে হতাশের প্রবল নিশ্বাস।

(৩১)

সংসারের কুটিলতা এখানে না রয়,
স্বার্থের গরল শিখা
হেথা নাহি যায় দেখা
নারীর চাতুরী ছলা হলাহলময়
পশেনাকো হে কানন তোমার আলয়।

(৩২)

চিনিয়াছি ভোজবাজি নারীর পীরিতি
ভূয়া সব নাহি সার
তবে কেন বৃথা আর
মজিয়ে তাহাতে বল রব নিতি নিতি
স্থান দাও হে কানন রাখহে মিনতি।

(৩৩)

অমার আঁধারে ঘেরা এ মোর জীবন,
নাহি আলো এক বিন্দু
অন্ধকার মহাসিন্ধু,
মাঝে মাঝে ঝঞ্ঝা বহে নিশ্বাস পবন,
থেকে থেকে বৃষ্টিধারা অশ্রু বরিষণ।

(৩৪)

জীবনের শীত ঋতু কভু না ফুরাল,
চিরদিন কুয়াসায়
থাকিল ঢাকিয়া হায়,
এ দীর্ঘ তামসী নিশি কভু না পোহাল
সুখের বসন্ত বিধি কই বা মিলাল ?

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়।

মন্দাকিনী।

চিতোর যখন ধ্বংস হয় নাই, যবনের উপদ্রবে চিতোরের বীরাঙ্গনারা যখন জ্বলন্ত অনলকুণ্ডে জীবন বিসর্জ্জন করেন নাই, সূর্য্যবংশীয় রাণা-কুলের সেই শোকময়ী রাজধানী যখন শূকর শৃগালের আবাসভূমি হয় নাই, সেই সময়, সেই রাজ্যের এক ক্ষুদ্র নগরে দুইজন ধনবানের বাস ছিল; একজন রজপুত, আর একজন উগ্রক্ষত্রিয়। নিকটবর্ত্তী এক স্থানের একজন গরীব আগরওয়ালার এক পরম সুন্দরী কন্যা ছিল, কন্যার নাম "মন্দাকিনী।"

"মন্দাকিনী" অতুল সুন্দরী। সেখানকার লোকেরা বলিত, "তাদৃশী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী সুলক্ষণা সুকন্যা রাজপুরীতেও দুর্লভ।"—দুর্লভ সুন্দরী মন্দাকিনীর রূপ-লাবণ্যের উজ্জ্বল গল্পটা অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। ঐ যে রজপুত আর উগ্রক্ষত্রিয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের উভয়েরই বয়স অল্প, উভয়েই দেখিতে দিব্য সুশ্রী, উভয়েই অবিবাহিত, উভয়েই ধনবান্। ঘটনাক্রমে তাহারা উভয়েই দুই একবার মন্দাকিনীকে দর্শন করিয়াছিল, মন্দাকিনীর প্রতি তাহাদের উভয়েরই সমান অনুরাগ জন্মিয়াছিল, উভয়েই মন্দাকিনী-পাণিপ্রার্থী।

প্রেমের সহিত জাতিভেদের সম্বন্ধটা যেন কেমন কেমন শুনায়, কিন্তু আর্য্যমতে পরিণয়ের সময় সেই সম্বন্ধটির দর্শন শ্রবণে চিত্ত প্রফুল্ল হয়। আগরওয়ালার কন্যা রজপুতের ঘরে যায় না। কথাটা জানা জানি হইলে লোকে বলাবলি করিল, "দ্বিতীয় উমেদারের ভাগ্যই বোধ হয় সুপ্রসন্ন হইবে, মন্দাকিনী হয় ত ঐ উগ্রক্ষত্রিয়ের বরের অঙ্কশোভা করিবে; রজপুত পাইবে না। ধনে উহারা উভয়েই সমান, অনেক লোকে এই কথা বলে, সত্য কিন্তু তা নয়, রাজপুতের বেশী টাকা,—অনেক বেশী। রজপুত যদি মন্দাকিনীর পিতাকে বেশী টাকা প্রদান করিয়া গরীবের মন ভুলাইয়া দেয়, তাহা হইলেই গোলযোগ।

মন্দাকিনীর ভাবি বর কোথায় কে আছে, ঠিক জানা নাই, কিন্তু মন্দাকিনীর রূপের কাছে প্রেমিক উমেদার আছে অনেকগুলি; অতি কম দশ পনের জন। তাহাদের প্রধান উমেদার হইতেছে ঐ ধনবান রজপুত আর জাত্যাভিমানী উগ্রক্ষত্রিয়।

রজপুতের নাম হাতিরাম। এই লোকটি হস্তি বড় ভালবাসে বলিয়া, স্থানীয় সুরসিক লোকেরা তাহার ঐ "হাতী"রাম নাম দিয়াছেন। উগ্র-ক্ষত্রিয়ের নাম বিষণ্ণলাল; মন্দাকিনীর পিতার নাম কুঞ্জভজন।

হাতীরামের দ্বারে সদাকাল একটি হাতী বাঁধা থাকে। হাতীটি দেখিতেও দিব্য সুন্দর। নাম কমলরাজা। হাতীটি একাকী থাকে না। পরিবার তিনটি। কমল রাজা স্বয়ং একটি, সুন্দরী করেণু একটি, দিব্য সুন্দর করভ একটি, এই তিনটি। হস্তিনীকে করেণু বলে, হস্তি শাবককে করভ, একথা এখন পাঠশালার বালককেও বুঝাইতে হয় না, ইহা জানিয়াই এখানে ঐ দুটি সংস্কৃত শব্দ মিষ্টতা রক্ষার অনুরোধে প্রয়োগ করা হইল, কুতার্কিক পাঠক মহাশয়েরা ক্ষমা করিবেন।

হাতীরামের হস্তিটী, হস্তিনীটি, শাবকটি, এই তিনটি যখন একত্র এক সঙ্গে সারি সারি দাঁড়ায়, দেখিতে তখন এক প্রকার চমৎকার দৃশ্য হয়। শুঁড়ে শুঁড়ে জড়াজড়ি। শুঁড়ে ভক্তি, শুঁড়ে স্নেহ, শুঁড়ে আনন্দ, শুড়ে আদর, শুঁড়ে সেবা। চমৎকার দৃশ্য! তিনটিকে একসঙ্গে দাঁড় করাইয়া, হাতিরাম নিজহস্তে তাহাদের আহার সরবরাহ করেন, তাঁহার নিজের সযত্ন তত্ত্বাবধানে নিত্য নিত্য হাতী তিনটীর সেবা হয়। ইচ্ছা হইলে হাতীরাম এক একদিন বৈকালে কমলরাজের পৃষ্ঠে চাপিয়া বেড়াইতে যান।

হইতেছিল মন্দাকিনীর বিবাহের কথা, কোথা হইতে অকস্মাৎ হাতীর পরিবারবর্গের কথা আসিয়া পড়িল, সারজ্ঞ পাঠকেরা হয় ত এই বলিয়া আমাদিগকে তিরস্কার করিতে পারেন, কিন্তু অগ্রে তাঁহারা জানিয়া রাখুন, হাতীর সঙ্গে মন্দাকিনীর বিবাহের অতি ঘনিষ্ঠ বাঁধাবাঁধি সম্বন্ধ আছে।

হাতীরামের সহিত বিষণ্ণলালের বন্ধুত্ব ভাব ছিল, ব্যবহারে পরস্পর হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুভাব, কিছুমাত্র ছিল না। এই উপলক্ষে উভয়ের কিরূপ ভাব দাঁড়ায়, দেখা যাইবে। একটি কুমারীর জন্য দুইজন প্রার্থী, প্রতিযোগীতায় প্রার্থী, চিতোরের কথাপ্রসঙ্গে দুই প্রার্থীর বিবাহ সমন্ধে হঠাৎ আমাদের অভাগিনী কৃষ্ণকুমারীর কথা মনে হইল। উদয়পুরের রাণা ভীম সিংহের অনূঢ়া কৃষ্ণকুমারী। রাজ মানসিংহ এবং রাজা জগত সিংহ সেই কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণে প্রতিযোগী হইয়া, ঘোর যুদ্ধ বাধাইবার উপক্রম করিয়াছিলেন; সে বিপদে কৃষ্ণকুমারীর পরিণাম কিরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ; মাইকেল মধুসূদনের বিরচিত "কৃষ্ণকুমারী" নাটকেও হতভাগিনী রাজকন্যার শোচনীয় ভাগ্যফল রূপান্তরে সন্নিবেশিত আছে।

হাতীরামকে কন্যাদান করিতে মন্দাকিনীর পিতার মত হইল না। অল্প টাকা লইয়া বিষণ্ণলালের সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দিতে তাঁহার সঙ্কল্প হইল। আটমাস বিলম্ব। বিষণ্ণলাল যুবা পুরুষ, পিতার একমাত্র সন্তান, চারি মাস হইল তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হইয়াছে, বর্ষ পূর্ণ পর্য্যন্ত কালাশৌচ; আট মাস পরে বিবাহ হইবে, এইরূপ স্থির হইয়া রহিল।

হাতীরামের সহিত বিষণ্ণলালের এই বিবাহ বিরোধ সম্বন্ধে কোন ভিন্ন ভাব দেখা যায় নাই, মুখ দেখা দেখিও ঘোচে নাই, বাক্যালাপও ঘোচে নাই, এক সঙ্গে হাস্যকৌতুক করাও বন্ধ হয় নাই। বাহিরে ত এই ভাব, মনের ভিতর কাহার কি, যাহার মন, সেই জানে, অপরে জানিতে পারে না, বিবাহের অগ্রকাল পর্য্যন্ত নিখুঁৎ সৎভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর কি হইল, একটু পরেই জানিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় পল্লব।

বিবাহ ও হস্তীবধ।

ক্রমশঃ আট মাস উত্তীর্ণ, আয়োজনে আরও এক মাস অগ্রসর হইয়া গেল, মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী রজনীতে মন্দাকিনীর সহিত বিষণ্ণলালের শুভ বিবাহ (শুভ কি অশুভ, এখন বলা যায় না) সু-সম্পাদিত হইল। প্রথম রজনীতেই উভয়ের প্রতি উভয়ের চিত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণ বেগে সমাকৃষ্ট হইয়া উঠিল। মন্দাকিনী যেন এই বরটির জন্যই এতদিন তপস্যা করিতেছিল, সেই ফলেই মনের মত পতি মিলিল, প্রথম রজনীতেই এইটুকু বুঝিয়া লওয়া হইল।

নব দম্পতির অকৃত্রিম ভাব, পতি-সেবায় মন্দাকিনীর গাঢ় ভক্তি, লোকমুখে এই সব কথা শুনিয়া শুনিয়া, হাতিরাম দিন দিন ঈর্ষানলে জ্বলিতে পুড়িতে লাগিলেন। শোনা কথা ব্যতীত হাতিরাম দুই দিন বৈকালে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, বিষণ্ণলালেতে আর মন্দাকিনীতে হাত ধরাধরি করিয়া ছাদের উপর পায়চারি করিতেছে, অনাবৃত বদনে হেলিয়া দুলিয়া মন্দাকিনী কত রকম হাস্যকৌতুক দেখাইতেছে। স্বচক্ষে এই ভাব

দর্শন করিয়া, হাতিরামের হিংসানল যেন গগনস্পর্শী হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। কিরূপে প্রতিফল দেওয়া হয়, সর্ব্বদা তিনি তাহারই অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। মনে উদ্দীপন, প্রতিশোধ! প্রাণপণ।

একদিকে প্রতিশোধের অবসর প্রতীক্ষা, অন্য দিকে আর এক প্রকার মহাবিভ্রাট! হাতীরামের কমল রাজা হঠাৎ পাগল হইয়াছে, যাহাকে সম্মুখে দেখে, শুঁড় ঘুরাইয়া তাহাকেই তাড়া করিয়া যায়; মাহুত ঘেঁষিতে পারে না; আহার-দাতা পালন-কর্ত্তা হাতীরাম নিজেও নিকটে যাইতে ভয় পান। বদ্ধ পাগল! শক্ত শিকল দিয়া বাঁধা আছে, তথাপি বন্ধন ছিঁড়িবার জন্য পাগল যখন বিপুল বিক্রমে লম্ফ দিতে থাকে, তখন বিশ হাত মাটী পর্য্যন্ত কাঁপিয়া যায়!

হাতীরামের হাতী পাগল হইয়াছে, বিষণ্ণলাল তিন চার দিন পূর্ব্বে তাহা শুনিয়াছেন। সুযোগ মন্দ নয়, ইহা ভাবিয়া তিনি একটা মতলব স্থির করিলেন। সন্ধান লইতে লাগিলেন, হাতীরাম কোন্ সময় কতক্ষণ পর্য্যন্ত হাতীদের কাছে থাকেন। সন্ধান ঠিক ঠাক্ হইল। হাতীরাম এক দিন আহারে বসিয়াছেন, হাতী তিনটি বাহিরে পাশাপাশি বাঁধা আছে, পাগল হাতী স্ত্রী পুত্রের হিংসা করিতেছে না, শুঁড় দিয়া শাবকের গাত্র লেহন করিতেছে, বিষণ্ণলাল এমন সময় গোলা গুলি পূর্ণ প্রকাণ্ড একটা বন্দুক লইয়া হাতীগুলির সম্মুখে নির্ভয়ে দাঁড়াইলেন। বিষণ্ণলাল একজন সুশিক্ষিত সুদক্ষ শীকারী, কোথায় গুলি মারিলে হাতী মরে, তাহা তিনি বেশ জানিতেন; পাগলা হাতীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ লঘুহস্তে বন্দুক ছুড়িলেন! হাতী চীৎকার করিয়া উঠিল, লম্ফ ঝম্ফ করিল, শিকল ছিঁড়িবার জন্য সজোরে কতই টানাটানি করিল, একটা হস্তীর শরীরে তখন যেন দশহস্তীর বল আসিল। শিকলটা ছিঁড়িয়া গেল! হাতী অমনি আছাড় খাইয়া পড়িল,—পড়িল আর মরিল! বিষণ্ণলাল আর একটা ফাঁকা আওয়াজ করিয়া দ্রুতপদে নিজাবাসে প্রস্থান করিলেন।

আহারান্তে হাতীরাম বাহিরে আসিয়া মরা হাতী দেখিলেন, লোকের মুখে বৃত্তান্তটা শুনিলেন, চক্ষে জল পড়িল; দুই চক্ষেই জল নয়,—এক চক্ষে জল, একচক্ষে যেন আগুন। জল পড়িল মায়ায়, আগুন জ্বলিল রাগে।

হাতীরাম স্তম্ভিত হইয়া রাগে ফুলিতে ফুলিতে মনে মনে বলিলেন, "ছুঁড়ি যেন কলাগাছ! বিয়ের পর মন্দাকিনীর অধরপল্লব ঠিক যেন

নধর পল্লব হয়েচে, দশ দিনে মন্দাকিনী যেন ধবলগিরির মত উঁচু হয়ে উঠেছে! আহা হা! রূপলাবণ্য কতখানি বেড়েচে!"

মনের কথা মনে রাখিয়া, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে হাতীরাম সগর্জ্জনে প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ওরে বিষেরে বিষে! তোকে আমি নিপাত করিব! মন্দাকিনীর প্রেম-সলিলে ডুব দিয়ে বেটা যেন সাপের সাত পা দেখেছে! বল ওহে, বলত, বেটা আমার হাতীটিকে মেরে গেল কেন? যাবার সময় কি বোলে গেল?"

লোক।—বলে গেলেন এই কথা,—"হাতীটা পাগল হয়েছিল, অনেক লোককে প্রাণে মারিত, অনেকের প্রাণ বাঁচিল, পরের উপকার হইল।" বলেছেন এক প্রকার মন্দ কি? একটার বদলে পাঁচটা বাঁচে, ইহাইত ভাল। বিশেষত আপনারও তেমন লোকসান নাই। সকলেই জানে, মরা হাতী লাখ টাকা।

হাতীরাম শেষ কথাটায় কাণ দিলেন না; গোড়ার গোটা কতক কথা শুনিয়াই পুনর্ব্বার দন্তে দন্ত পেষণ করিয়া বলিলেন, "পরের উপকার! উঃ! বেটা যেন দৈত্যকুলের পেহ্লাদ! আরে, হিরণ্য দৈত্যের হাতীত পেহ্লাদকে পায়ে চেপে মারে নাই, পিঠে তুলিয়া নাচিয়াছিল, আমি এখন স্বয়ং হাতীরাম, বিষে বেটার কি করি! দেখ তোমরা, নরসিংহরূপে আমি পেহ্লাদের বাপের বদলে সেই নূতন পেহ্লাদটাকে নোখে চিরিয়া নিকাশ করিব! পেহ্লাগিরী বাহির করিয়া দিব! পরের উপকার! আমার হাতী মারিয়া পরের উপকার! আজ রাত্রেই শালাকে যমের বাড়ী পাঠাইব!"

আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, সজল নয়নে কমলরাজের দিকে আর একবার চাহিয়া, কম্পিত কণ্ঠে হাতীরাম পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "হায় হায়! কমলের স্ত্রীটি বিধবা হইল! কমলের ছানাটি পিতৃহীন হইল! আহা! কি আপ্‌শোষ! কি আপ্‌শোষ! প্রতিশোধ আমি লইবই লইব! থাক্ শালা!"

চক্ষু দুটী ছোট হইলেও হাতীর স্ত্রী আর হাতীর ছানাটি দয়াময় হাতী রামের শোকাশ্রুপূর্ণ সরোষ বদন বার বার নিরীক্ষণ করিল; হাতীদের কাণ খুব বড় বড়, হাতীরামের সকরুণ বিলাপ বাক্যগুলিও তাহারা স্পষ্ট স্পষ্ট শুনিল; তাহাদের চারি চক্ষেও দরদর ধারে জল পড়িল। চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া, হাতীরাম আরো কাতর হইলেন।

যেখানে রাখিলে লোকালয়ে দুর্গন্ধ আসিবে না, শৃঙ্খল খুলিয়া মরা হাতীটিকে তাদৃশ স্থলে রক্ষা করা হইল। সেই সময় করেণু-করভের শোকোচ্ছ্বাস যতদূর বাড়িল, লেখনীর দ্বারা লিখিয়া তাহা ব্যক্ত করা দুর্ঘট। অবলা জীবের শোকাচ্ছ্বাল—বিষম শোকাবহ!

দিনমান শেষ হইল। দিনমানের মধ্যে হাতীরাম আর কাহার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিলেন না। সন্ধ্যা হইল, রাত্রি আসিল, রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড। শুক্লপক্ষ, আকাশে চাঁদ উঠিল; হাতীরামের চক্ষে সেই চাঁদ খানি যেন কতই মলিন মলিন দেখাইতে লাগিল। নক্ষত্রেরাও মলিন।

তৃতীয় পল্লব।

প্রেমের ঈর্ষায় প্রাণান্ত।

রাত্রি ছয় দণ্ড। পূর্ব্বে বলা হয় নাই, হাতীরামের বাড়ী হইতে বিষণ্ণ লালের বাড়ী বেশী দূর নয়। এক বাড়ীর ছাদে উঠিলে অন্য বাড়ীর ছাদের কার্য্য কারখানা বেশ দেখা যায়; ডাকিয়া ডাকিয়া কথা কহিলে কথাগুলিও বেশ শুনা যায়। হাতীরামের ইচ্ছা হইল, এই সময় প্রতিশোধ লওয়া-য়াই ঠিক।

আবার স্থির হইল, আর একটু বিলম্ব হইলে ভাল হয়। সকলে তখনও ঘুমায় নাই, রাত্রি একটু বেশী হইলেই সুবিধা। চাঁদখানি সরিয়া পূর্ব্বাকাশ হইতে পশ্চিম দিকে অনেক দূর আসিল, ইংরাজী হিসাবে রাত্রি প্রায় ১১টা। হাতীরাম একটা কৃষ্ণবর্ণ চাপকান গায়ে দিয়া, মাথায় একখানা কৃষ্ণবর্ণ রুমাল জড়াইয়া, চুপি চুপি বাড়ী হইতে বাহির হইলেন।

বিষণ্ণ লালের বাড়ীর সন্নিকটে আর একখানি বাড়ী; সেই বাড়ীর ছাদ হইতে বিষণ্ণলালের ছাদে যাইবার ব্যবধান স্থান প্রায় তিন হাত। হাতীরাম অগ্রে সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। সে বাড়ীর কর্ত্তার সহিত হাতীরামের বিশেষ বন্ধুত্ব ভাব। কর্ত্তা তখনও শয়ন করিতে যান নাই, সাক্ষাৎ করিয়া হাতীরাম তাঁহার সহিত চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন, কর্ত্তা কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাহার পর একটা আলো জ্বালিয়া লইয়া অন্দর মহলে চলিয়া গেলেন। হাতীরাম সেখানে একাকী রহিলেন।

আর হাতীরাম সেখানে নাই। ইংরাজ শাসনে চোরের ভয়ে বঙ্গ দেশের গৃহস্থেরা যেমন রাত্রি হইলেই আপনাদের গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া

দেন, সে অঞ্চলে সে সময় এ প্রকার প্রথা ছিল না। প্রায় সমস্ত রজনী বড় বড় গৃহস্থের গৃহ দ্বার অনাবৃত থাকিত। হাতীরাম ছাদে উঠিয়া-ছেন, দুই ছাদের ব্যবধান স্থলে চার হাত লম্বা একখানা তক্তা ফেলিয়া দিয়াছেন, তক্তার উপর দিয়া বিষণ্ণলালের ছাদে নামিয়াছেন, চঞ্চল নয়নে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছেন, কেহ কোথাও নাই।

গ্রীষ্মকাল, গুমট গ্রীষ্ম, মধ্যে মধ্যে বোধ হয় ঠাণ্ডা হইবার আশায় ছাদে আসিতে হয়, সেই কারণে বিষণ্ণলালের ছাদের সিঁড়ির দরজা খোলা ছিল; নিঃশব্দপদসঞ্চারে হাতীরাম সেই সিঁড়ি দিয়া বাড়ীর ভিতর দালানে নামিলেন, দেখিলেন, দক্ষিণ ধারের একটি ঘরে এক জোড়া বাতী জ্বলি-তেছে, দ্বার-গবাক্ষ উন্মুক্ত রহিয়াছে, কাহারা সেই ঘরে ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা কহিতেছে, মধ্যে মধ্যে হাসিতেছে। হাতীরাম বুঝিলেন, সেই ঘরেই বিষণ্ণলাল আর মন্দাকিনী।

মনে একটা কল্পনা আনিয়া, মানসিক দর্পে প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষী বীর পুরুষ স্বগত বাক্যে চুপি চুপি বলিলেন, এই পরামর্শই ঠিক। জাগিয়া থাকিয়াই প্রতিফল ভোগ করুক! ঘুমন্ত মানুষকে আঘাত করা কাপুরুষের কাজ। আমি কাপুরুষ নহি, বীর প্রসূতি রাজপুতানার বীরপুরুষ আমি, চোরের মতন কেন আমি অন্ধকারে ঘুমন্ত মানুষের ঘরে চুরি করিতে প্রবেশ করিব? যাহা চুরি করিবার ইচ্ছা, জাগ্রত লোকের চক্ষের উপরেই তাহা চুরি করিব। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, হাতীরাম তখন নির্ভয়ে বুক ফুলাইয়া, বিষণ্ণ লালের শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

বিষণ্ণলাল চমকিত, মন্দাকিনী চমকিতা। একটু পূর্ব্বে তাঁহাদের হাস্য-কৌতুক চলিতেছিল, এককালে নীরব। শ্লেষ প্রকাশ করিয়া হাতীরাম সদম্ভে বলিলেন, "কুক্কুর-শাবক! সিংহিনী লইয়া ক্রীড়া করিতেছিস্! দেখ্, দেখ্! প্রতিফল ভোগ কর্!"—এই বলিয়াই বসন মধ্য হইতে তীক্ষ্ণ-ধার ছোরা বাহির করিয়া হুঙ্কার পূর্ব্বক বিষণ্ণলালের বক্ষে হাতীরাম সেই ছোরাখানা সজোরে বসাইয়া দিলেন! হাত কাঁপিয়া উঠিল, ছোরাখানা করমুষ্টি হইতে খসিয়া পড়িল। সজোরে সন্ধান করিলেও বিষণ্ণলালের বুকে সেই তীক্ষ্ণধার অস্ত্র অধিক বিদ্ধ হইল না, তথাপি বিষণ্ণলাল একটু কাৎ হইয়া চলিয়া পড়িলেন, বক্ষে অল্প অল্পধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। প্রিয় পতির সেই দশা দেখিয়া মন্দাকিনী যেন উন্মাদিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া,

লঘুহস্তে ছোরাখানা কুড়াইয়া লইল; এই লও বলিয়া হাতীরামের বুকে সেই ছোরা দুই তিনবার বিদ্ধ করিল; হাতীরাম রুধিরাক্ত কলেবরে ভূমিশায়ী হইলেন। জ্ঞান রহিল, তৎক্ষণাৎ প্রাণ গেল না, বার কতক উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদগদকণ্ঠে তিনি বিষণ্ণলালকে বলিলেন, "শূকর শাবক! তুই আমার মন্দাকিনীকে কাড়িয়া লইয়াছিস্! প্রতিফল প্রতিফল! হায় হায়! স্বহস্তে আমি প্রতিফল দিতে পারিলাম না! উঃ! মন্দাকিনী—পিশাচী—এই পিশাচী আমাকে প্রাণে মারিল! প্রাণ যায় বিষণ্ণ লাল! আচ্ছা, আমি পারিলাম না, আমার পিতৃহীন করি শাবক অবশ্যই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবে। হস্তি শুঁণ্ডে নিশ্চয়ই তোর বংশ নাশ হইবে! মন্দাকিনি! কি তুই? মানবী? না,—সাপিনী! পিশাচী! বাঘিনী! রাক্ষসী! উঃ। যন্ত্রণা! যন্ত্রণা! অসহ্য যন্ত্রণা! প্রাণ যায়! প্রাণ—প্রাণ—প্রাণ—মন্দা—কি—"

আর কথা বাহির হইল না। বার কতক ভূলুণ্ঠিত হইয়া সেইখানেই হাতীরামের জীবান্ত হইল! মন্দাকিনী সে দিকে না চাহিয়া, অর্দ্ধ মূচ্ছিত পতির মুখের কাছে গিয়া বসিল। বিষণ্ণ লালের তখন অল্প অল্প জ্ঞান হইয়াছিল, হাতীরামের কি হইয়াছে, তাহা জানিতে পারে নাই। হস্তী শুঁণ্ডে বংশ নাশ হইবে, এই বলিয়া হাতিরাম তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছে, বিষণ্ণলাল তাহাও শুনিতে পান নাই। আপন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াও মন্দাকিনীকে প্রবোধ দিবার জন্য যথাশক্তি স্পষ্টস্বরে বলিলেন, "মন্দাকিনী প্রিয়তমে! আমি মরিব না; আঘাত গুরুতর হয় নাই, তুমি ভাবিও না, তুমি কাঁদিও না, আমি বাঁচিব। পাষণ্ডটা গেল কোথা?"

মন্দাকিনীর ইচ্ছা ছিল, হাতীরামকে মারিয়া সেই ছোরায় আপনি আত্মঘাতিনী হইবে, কিন্তু বিষণ্ণলালকে সজ্ঞান দেখিয়া, বিষণ্ণলাল বাঁচিবে বিষণ্ণলালের মুখে এই আশ্বাস পাইয়া, সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল; ব্যগ্র হস্তে বিষণ্ণলালের সেবা করিতে লাগিল। বাড়ীতে খুন হইয়াছে, আপনি স্বহস্তেই খুন করিয়াছে, সে ভয়টা মন্দাকিনীর মন হইতে দূরে যায় নাই; নিশি থাকিতে দেহটা স্থানান্তর করাই পরামর্শ-সিদ্ধ বোধ হইল; তিনজন চাকরকে ডাকিয়া সে তখন তৎকার্য্য সাধনে হুকুম দিল। চাকরেরা হাতীরামের দেহটা একখানা কম্বলে জড়াইয়া রাতা রাতি দূরবর্ত্তিনী নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া আসিল।

সাতদিন পরে বিষণ্ণলাল আরাম হইলেন। নারী-প্রেমের ঈর্ষানল কতদূর প্রবল হইয়া জ্বলে, মনে মনে তাহা অনুধাবন করিয়া মন্দাকিনীকে তিনি বুঝাইয়া বলিলেন, "প্রেমানুরাগে হতাশ প্রেমিকেরা এক প্রকার পাগল হয়, তোমার প্রেমে হতাশ হইয়া হাতীরামটাও পাগল হইয়াছিল, পাগলকে প্রাণে মারিয়া তুমি ভালই করিয়াছ। পাগল বাঁচিয়া থাকিলে পাগলের হাতে অনেক লোকের প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা; কিন্তু পরের প্রাণরক্ষার জন্য হাতীরামের পাগল হাতী আমি মারিয়া দিয়াছি, অপরের প্রাণরক্ষার জন্য পাগল হাতীরামকে তুমি পৃথিবী হইতে বিদায় করিয়াছ, ভালই হইয়াছে। নিশীথ কালের কার্য্য কেহই কিছু জানিল না, কেহই কিছু জানিবে না, রাজ-বিচারে আসিবে না, উৎপাত চুকিয়া গেল।"—বিমর্ষ বদনে মন্দাকিনী একটু হাসিল। সে হাসিও যেন কিছু মলিন মলিন।

চতুর্থ পল্লব।

বংশনাশ।

এক মাসে বিষণ্ণলাল বিশেষরূপে আরাম হইলেন। হাতীরামের নিধন সম্বন্ধে কিছুমাত্র উচ্চ বাচ্য হইল না। হাতীরাম অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ ইহাই প্রায় সকলে এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিল; যাঁহারা হেতু মিলাইয়া কার্য্য ফলের বিচার করেন, তাদৃশ পণ্ডিতেরা স্থির করিলেন, হাতীর শোকেই হাতীরাম নিরুদ্দেশ। হাতীরামের পত্নী থাকিলে তিনিও বোধ হয় বিধবা হইতেন। হস্তিনীটি বিধবা রহিল, অবলম্বন সেই শাবকটি। বাড়ীর পরিবারেরা সম্ভবমত যত্নে সেই সবৎসা করিণীটির পালন করিতে লাগিলেন। পুরাতন মাহুত পুরাতন কার্য্যেই বাহাল রহিল।

পাঁচ বৎসর অতীত। মন্দাকিনীর গর্ভে বিষণ্ণলালের একটি পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছে। পুত্রটি যখন পাঁচ বৎসরের, সেই সময় বিষণ্ণলাল একদিন নদী হইতে স্নান করিয়া শূন্যহস্তে গৃহে আসিতেছিলেন, হাতীরামের মাহুত সেই সময় কমল রাজের বাচ্চা হাতীটিকে স্নান করাইবার জন্য লইয়া যাইতেছিল; পথিমধ্যে বিষণ্ণলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ। হস্তীজাতির স্মৃতিশক্তি এবং প্রতিহিংসা-বৃত্তির দৃষ্টান্ত পাঠক মহাশয়েরা অনেক শুনিয়াছে, এইখানে কমলের বাচ্চাটির আশ্চর্য্য কার্য্য শ্রবণ করুন।

বাচ্ছার নাম জল-তরঙ্গ। বিষণ্ণলাল যে দিন কমলরাজকে গুলি করিয়া মারেন, জল তরঙ্গ সে দিন স্বচক্ষে তাহা দর্শন করিয়া নীরবে রোদন করিয়াছিল, নিতান্ত বাচ্ছা হইলেও বিষণ্ণলালকে চিনিয়া রাখিয়াছিল, পাঁচ বৎসরের পর প্রতিহিংসা সাধনের সুযোগ ঘটিল।

বিষণ্ণলাল স্নান করিয়া সিক্তবস্ত্রে ঘরে ফিরিতেছিলেন, সম্মুখে জল তরঙ্গ। বিধাতার খেলা, হস্তী জাতীর বুদ্ধির আশ্চর্য্য সংঘটন। একচক্র ঘুরিয়া জলতরঙ্গ প্রথমে একবার বিষণ্ণলালকে প্রদক্ষিণ করিল, অনন্তর দ্বিতীয় চক্র ঘুরিয়া, সম্মুখে দাঁড়াইয়া, শুঁড়টি একবার শূন্যপথে উচু করিয়া তুলিল; বোধ হইল যেন বিষণ্ণের মস্তকে শুঁড়ের অগ্রভাগটি অগ্রে অগ্রে ছোঁয়াইল; তাহার পর বালীরাজা যে প্রকারে লাঙ্গূল দ্বারা সমুদ্রতীরে দশাননের গলদেশ বন্ধন করিয়াছিলেন, শুঁড় দ্বারা বিষণ্ণলালের গলদেশ সেইরূপে বন্ধন পূর্ব্বক জলতরঙ্গ তৎক্ষণাৎ শূন্যপথে ঘুরাইয়া পাথরের উপর আছাড় মারিল, মস্তকের সহিত বিষণ্ণলালের অস্থি পঞ্জর চূর্ণ হইয়া গেল; বিষণ্ণলাল মরিল।

হাতীরামের অভিশাপের প্রথম ফল এইরূপে ফলিল। ইহার পর দুই তিন মাস কাটিয়া গেল। বিষণ্ণলালের শিশু পুত্র মানিকলাল একদিন একজন পরিচারিকার কোলে উঠিয়া একটা মেলা দেখিতে গিয়াছিল, জলতরঙ্গের মাহুত জলতরঙ্গকে লইয়া সেই সময় সেইখানে অশ্বত্থ-পত্র ভক্ষণ করাইতে ছিল, হাতী দেখিবার জন্য আব্দার লওয়াতে পরিচারিকা অগত্যা মানিক লালকে ভূতলে নামাইয়া দিল, ক্ষুদ্র চক্ষে দর্শন করিয়া জলতরঙ্গ ক্রমশঃ ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে শুঁড় বেষ্টনে মানিকলালের কটিদেশ আঁটিয়া ধরিল, চক্ষের নিমিষে ঊর্দ্ধে তুলিয়া আছাড়! চক্ষের নিমেষেই বালকের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি!

হাতীরামের অভিশাপের ইহাই দ্বিতীয় ফল। বিষণ্ণলাল নির্ব্বংশ! মন্দাকিনী সত্য সত্য পাগলিনী। যে রাত্রে হাতীরাম মরে, সেই রাত্রে মন্দাকিনী আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, তখন করে নাই, ঘটনা-ক্রমে এখন সেই সাংঘাতিক পাপে নিমগ্ন হইতে বাধ্য হইল। পতিপুত্র শোকে মন্দাকিনী এক নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া জন্মের মত সংসার-লীলা সমাপ্ত করিল। বল হরি, হরিবোল!

শ্রীসতীন্দ্রনাথ দত্ত।

নিম্ব-তত্ত্ব।

হিন্দু-রাজত্বকালে এ দেশে সকল শাস্ত্রেরই ভূয়সী চর্চ্চা হইত। কি সাহিত্য বিষয়ে, কি গণিত বিষয়ে, কি বিজ্ঞান বিষয়ে, কি জ্যোতিষ বিষয়ে, কি আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ে ভারতবর্ষ এককালে সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। মহা-মহোপাধ্যায় আর্য্য মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক নানাবিধ বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতির প্রকৃত পরিচয় ও তাহাদের গুণাগুণ প্রভৃতি প্রকাশিত হওয়াতে, জগতের যে কতদূর উপকার হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

এক্ষণে, আধুনিক লোকেরা পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে মুগ্ধ হইয়া স্বদেশীয় দ্রব্যাদির প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ঈশ্বরেচ্ছায় লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার প্রতি লোকের ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা ও ভক্তি হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদ-প্রণেতা মহর্ষিগণ-কথিত সামান্য সামান্য লতা-গুল্মাদির দ্বারা প্রাচীন গৃহস্থ লোকেরা যে সকল কঠিন কঠিন রোগ আরোগ্য করিতেন, হয় ত, এখনকার নামলুব্ধ বড় বড় চিকিৎসকেরাও তাহা সহজে আরোগ্য করিতে পারেন না।

পল্লীগ্রামে প্রায় অনেকের বাড়ীতে একটী একটী নিমগাছ থাকে। কিন্তু সেই নিমগাছের দ্বারা মানবের কত উপকার হয়, তাহা সামান্য লোকে অবগত নহে। নিমগাছকে কর্ণাটী ভাষায় "বেউ" বলে, তৈলঙ্গী বা তেলুগু ভাষায় "যেপ্‌চেট্টু" বলে; এবং তামিলী ভাষায় "বেলুন্ মরম্" বলে। ইংরাজী ভাষায় নিমের নাম নাই, সাহেব ডাক্তারেরা এখন ইংরাজী অক্ষরে (Nim) নিম শব্দই লিখিয়া থাকেন। ঘোড়া-নিম নামক আর এক প্রকার নিম আছে। কিন্তু এ নিমের সহিত ঘোড়া নিমের আকৃতি ও গুণের সম্পূর্ণ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। আমি যে নিমের বিষয় বর্ণনা করিতেছি, তাহা ঘোড়া-নিম নহে। চৈত্র মাসের শেষে নিমের ফুল হয়, এবং বর্ষার প্রথমেই নিমের ফল সকল পাকিয়া উঠে ও আপনিই ঝরিয়া পড়ে। সেই সময় ফলগুলিকে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুষ্ক করতঃ ইষ্টক বা প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা ভাঙ্গিয়া খোসা বাদ দিয়া তন্মধ্যস্থ শস্যকে "ঘানি" দ্বারা তৈল বাহির করিয়া লইতে হয়। নিম সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কথিত আছে:—

নিম্বস্যাং পিচুর্মর্দ্দশ্চ পিচুমন্দশ্চ তিক্তকঃ।
অরিষ্টঃ পারিভদ্রশ্চ হিন্দু নির্য্যাস ইত্যপি॥

নিম্ব শীতো লঘুগ্রাহী কটু পাকোঽগ্নি বাতহৃৎ।
অহৃদ্যঃ শ্রম তৃট্‌কা সাবরা রুচি কৃমি প্রণুৎ।
ব্রণ পিত্ত কফচ্ছর্দ্দি, কুষ্ঠ হৃল্লাস মেহনুৎ॥ (ভাব-প্রকাশ)

অর্থাৎ পিচুমর্দ্দ, পিচুমন্দ, তিক্তক, অরিষ্ট, পারিভদ্র ও হিন্দু নির্য্যাস এই কয়টী নিম্বের পর্য্যায়। নিম্ব শীতবীর্য্য, লঘুপাক, গ্রাহী কটুপাক, অগ্নি ও বাতহৃৎ। অহৃদ্য (বিস্বাদ) এবং তাহা সেবনে শ্রম, তৃষ্ণা, কাশ, জ্বর, অরুচি, কৃমি, ব্রণ, পিত্ত, কফ, বমি এবং উপস্থিত বমনত্ব প্রশমিত ও নষ্ট হয়।

নিম্বপত্রের গুণ যথাঃ—

নিম্বপত্রং স্মৃতং নেত্রং কৃমিপিত্ত বিষপ্রণুৎ।
বাতলং কটু পাকঞ্চ সর্ব্বরোচক কুষ্ঠনুৎ॥ (ভাব-প্রকাশ)

অর্থাৎ নিম্বপত্রে নেত্ররোগ, কৃমি, বিষরোগ নষ্ট করে। বায়ুজনক ও কটুপাক এবং সেবনে সর্ব্বপ্রকার অরুচি ও কুষ্ঠরোগ আরাম হয়।

নিম্বফলের গুণ যথা ঃ—

রসেতিক্তং পাকেতু কটুভেদনং।
স্নিগ্ধং লঘূষ্ণং কুষ্ঠঘ্নং।
গুল্মার্শঃ কৃমি মেহনুৎ॥ (ঐ)

অর্থাৎ নিম্বফল তিক্তরস, কটুপাক, স্নিগ্ধ, লঘু ও উষ্ণবীর্য্য এবং তাহা সেবনে কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শ, কৃমি ও মেহরোগ নষ্ট হয়।

নিম্বতৈলের গুণ যথাঃ—

কটূষ্ণং কৃমিকুষ্ঠ কফঘ্নঞ্চ। (ঐ)

অর্থাৎ কটু, উষ্ণ, কৃমি, কুষ্ঠ ও কফনাশক।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ঔষধের সহিত নিম্বের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা সামান্য একটীমাত্র উদ্ভিদের কথা ব্যক্ত করিলাম। এই রত্নপ্রসূ ভারতবর্ষে এমন অনেক প্রকার উদ্ভিদ আছে যে, তাহা দ্বারা মনুষ্যের কত শত উপকার হয়; কিন্তু অনেকেই তাহা অবগত নহেন।

আধুনিক আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে অনেকেরই উদ্ভিদ পরিচয়ের ক্ষমতা নাই। তাঁহারা সামান্য "বেদিয়ার" মুখে শুনিয়া উদ্ভিদের পরিচয় প্রাপ্ত হন। চিকিৎসকগণের উদ্ভিদ-তত্ত্ব অবগত থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

যাদু! গিয়াছ কোথায়?

যাদু! গিয়াছ কোথায়?
কি কাজ করিতে এলে, কি কাজ করিয়ে গেলে,
ধূলাতে আসিয়ে পুন মিশিলে ধূলায়;
দুদিনের তরে এসে, পুন গেলি কোন দেশে,
হাসিয়ে হাসায়ে কেঁদে কাঁদা'য়ে সবায়
চপলা চমকি যথা চকিতে লুকায়।
যাদু! গিয়াছ কোথায়?
কোথায় লুকা'য়ে ছিলি, আবার লুকা'য়ে গেলি,
ভুলে গিয়ে জগতের স্নেহ-মমতায়।
শ্রান্ত পথিকের বেশে, এসেছিলে এই দেশে,
দুদিনের তরে যাদু বিশ্রাম আশায়,
শ্রান্তি দূর করি চলে গেলি পুনরায়।
যাদু! গিয়াছ কোথায়?
কে হেথা দু-দিন তরে, পাঠাইয়ে ছিল তোরে,
কি কাজ করিতে ভবে কিসের আশায়?
এরি মধ্যে কার্য্য সব, হ'ল কিরে শেষ তব,
তাই বুঝি ডেকে তোরে নিল পুনরায়।
দিলনা দুদিন চ'খে দেখিতে তোমায়!
যাদু! গিয়াছ যথায়—
সেই দেশ কি প্রকার, কিরূপ প্রকৃতি তার,
সে দেশে কি সমীরণ হেন মৃদু বয়?
সে দেশে কেমন পাখী, কেমন জুড়ায় আঁখি?
ফুলফুল দিতে পারে আনন্দ তোমায়?
যেমন অমোদ তুমি পাইতে হেথায়।
যাদু! গিয়াছ কোথায়?
তোমাকে লইয়া বুকে, ভুলিতাম শত দুঃখে,
পাইতাম স্বর্গ তাতে অমিয় কথায়,

আধ আধ আধ বুলি, বা-বা-মা-মা-দা-দা বুলি,
শুনিবনা চাঁদমুখে জন্মে পুনরায়,
জাগিয়া স্মৃতিতে পুন স্মৃতিতে মিশায়!
যাদু! গিয়াছ কোথায়?
এত শীঘ্র চলে যাবি, স্বপনে কভু না ভাবি,
তাহলে বুকের নিধি বুকেতে তোমায়
রাখিতাম সযতনে, হেরিতাম চন্দ্রাননে,
পরাণ পুতলি তোরে প্রাণের মায়ায়!
না পূরিল মনোআশা হায় হায় হায়।
যাদু! গিয়াছ কোথায়?
সত্য কিরে এসেছিলি, অথবা স্বপনে ছলি,
চকিতে পলায়ে গেলি স্মৃতি জেগে রয়;
অথবা ঘুমের ঘোরে, যেন হারায়েছি তোরে,
হইতেছে মনে সব ইন্দ্রজাল প্রায়
যেন জলবিম্ব জলে ক্ষণেকে মিশায়।
যাদু! গিয়াছ কোথায়?
পাও কি আদর তথা, এখন রয়েছ যথা,
তাই কি পলায়ে আছ কাটায়ে মায়ায়?
অথবা বনেতে তোরে, কেহ কি রেখেছে ধরে,
তাই না পারিছ যাদু আসিতে এথায়,
কিরূপে কেমনে আছ ভুলি বাপ মায়?
যাদু! গিয়াছ কোথায়?
যদিও গিয়াছ চলে, আসিবে না ধরাতলে,
কিন্তু রেখে গেছ স্মৃতি কভু না লুকায়,
যে দাগ দিয়াছ বুকে, উঠিবে না কোন যুগে,
সেই হাসি সেই কথা সেই সমুদায়
জাগিবে য'দিন রব জীবিত ধরায়।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী।

শিবুসাহেবের ঘোড়া।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, কিন্তু মিথ্যা নহে; অবিকল সত্য ঘটনা। নদীয়া জেলায় একজন রাস্তাবন্দীর ওভারসিয়ার ছিলেন, তাঁহার নাম শিবেষ্টার সাহেব। সেখানকার সাধারণ লোকে ঐ নামটা ঠিক উচ্চারণ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে শিবুসাহেব বলিয়া ডাকিত। ইহাতে কতকটা আদরও প্রকাশ পাইত। শিবুসাহেব কিছু বাঙ্গালী-ঘেসা ছিলেন, মধ্যে মধ্যে গ্রীষ্মকালে কালাপেড়ে ধুতি পরিয়া বাবু লোকের বৈটকখানায় গতিবিধি করিতেন। শিবুসাহেব খাস বিলাতী ছিলেন না, শ্বেতচর্ম্ম বিশিষ্ট ফিরিঙ্গি। সচরাচর এদেশের ফিরিঙ্গিরা যেমন বাঙ্গালা কথা কহে, ভাণেই হউক অথবা সত্যই হউক, পরিষ্কার বাঙ্গালা উচ্চারণ তাহাদের রসনায় বহির্গত হয় না, শিবুসাহেব সে ধরণের ফিরিঙ্গি ছিলেন না, বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কথা কহিতে পারিতেন, হাসিয়া হাসিয়া বাবুলোকের সহিত বেশ খোস-গল্প করিতেন। এই প্রকৃতির লোক ছিলেন মিষ্টার শিবেষ্টার।

অনেক লোকের বিশ্বাস পবলিক ওয়ার্কের ওভারসিয়ারেরা (শতকরা দু-একটি ভদ্রলোক ব্যতীত) প্রায়ই চোর হয়। ক্রমাগত সাত বৎসর ঐ জেলায় চাকরি করিয়া একটা বড় দরের চুরি ধরা পড়াতে শিবেষ্টারের চাকরি যায়। শিবেষ্টার কিন্তু তথাপি নদীয়া পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার একটি ঘোড়া ছিল; সেই ঘোড়াটির নাম শিবু সাহেবের ঘোড়া। শিবু সাহেবের ন্যায় ঘোড়াটিও বিলক্ষণ হৃষ্ট-পুষ্ট ছিল। চাকরি যাওয়াতে শিবু সাহেব দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন, নিজের আহারের কষ্ট, ঘোড়াটিকেও আর দানা দিতে পারিতেন না, মফঃস্বলের সাধারণ গৃহস্থেরা এবং চাষা-লোকেরা গরুগুলিকে যেমন উদম ছাড়িয়া দেয়, শিবুসাহেবও সেইরূপে ঘোড়াটিকে উদম ছাড়িতেন, ঘোড়া তখন মাঠে মাঠে চরিয়া ঘাস খাইয়া প্রাণধারণ করিত। কিছুদিন ঐরূপ করিতে করিতে মোটা ঘোড়া রোগা হইয়া পড়ে, অস্থিপঞ্জর বহির্গত হয়, এত রোগা হয় যে, বালকে ঠেলা মারিলে ঘোড়া পড়িয়া যাইত।

চুরি ধরা পড়িয়াছিল কিন্তু ভাগ্যফলে শিবুর অপরাধের কথাটা কোন ম্যাজিষ্টারের কর্ণগোচর হয় নাই, কেবল চাকরিটী ছুটিয়া গিয়াছিল মাত্র, ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তারা আসল কথাটি চাপা দিয়াছিলেন। অনেক যোগাড়

যন্ত্র, অনেক সুপারিস এবং অনেক আপিলাদির পর দেড় বৎসর গত হইলে শিবু সাহেব পুনরায় পদস্থ হন।

পদস্থ হইয়াই ঘোড়াটির প্রতি শিবু সাহেবের সর্ব্বাগ্রে নজর পড়ে। নূতন একজন সরকার নিযুক্ত হইয়াছিল, সাহেব সেই সরকারকে হুকুম দিলেন, এখন অবধি ঘোড়াকে বেশী বেশী দানা খাইতে দিও। ওভার-সিয়ারের সরকার, সে ব্যক্তিও কতক কতক মনীবের গুণের উত্তরাধিকারী, সুতরাং খাতায় দানা খরচ লিখিয়া মূল্যের টাকাগুলি সরকার নিজেই আত্মসাৎ করিত, ঘোড়া কেবল আহারের জন্য দু-আঁটি ঘাস আর পাঁচ গণ্ডা শুষ্ক বিচালী পাইত, শুষ্ক-বিচালী ভক্ষণ করা ঘোড়ার অভ্যাস ছিল না, কাজে কাজেই রোগা ঘোড়া দিন দিন আরও রোগা হইতে লাগিল, ছাড়া থাকা অবস্থায় বরং মাঠের ঘাস খাইয়া কথঞ্চিৎ পেট ভরাইত, বাঁধা পড়িয়া সে ভরসাও ফুরাইল, দুই মাসের মধ্যে মৃত্যুকাল উপস্থিত। ঘোড়াটি এক রাত্রে হঠাৎ মরিয়া গেল, সহিসের মুখে বার্ত্তা পাইয়া সরকারের বড় ভাবনা হইল, ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাল রকম বুদ্ধি আঁটিল। সে বুদ্ধির নাম চুরি ঢাকিবার ফিকির। সাহেবকে অগ্রে সংবাদ না দিয়া বুদ্ধিমান সরকার পাঁচ সের আন্দাজ কোথা পাটনাই ছোলা কিনিয়া উত্তম-রূপে জলে ভিজাইয়া একটা গামলা ভর্ত্তি করিল, গামলাটা সেই মরা ঘোড়ার মুখের কাছে রাখিয়া দিল, তাহার পর সাহেবের কাছে রিপোর্ট। ঘোড়াটিকে সাহেব বড় ভালবাসিতেন, মরণ খবর পাইয়া তিনি দুঃখিত হইলেন, কাতর হইয়া দেখিবার জন্য আস্তাবোল ঘরে গেলেন। দাঁত বাহির করিয়া ঘোড়াটি মরিয়া পড়িয়া আছে, মুখের কাছে ছোলার গামলা, দর্শন করিয়া সাহেবের চক্ষে জল আসিল। সরকারের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরকার! ঘোড়া এমন দাঁত বাহির করিয়া রহিয়াছে কেন?"

হেঁটমুখে মাথা চুলকাইয়া সরকার উত্তর করিল, "হুজুর! অনেক দিন দানা পায় নাই, এবার যে দিন হইতে দানা খাইতে পাইতেছিল, সেই দিন হইতেই রোজ রোজ খুসী হইয়া হাসিত, গত রাত্রে বোধ হয় ঐ গামলাপূর্ণ ভাল দানা দেখিয়া, কিছু বেশী হাসিয়াছিল, হাসিয়া হাসিয়া দন্ত বাহির করিয়া দম্ ফাটিয়া মরিয়া গিয়াছে!"

উত্তর পাইয়া সাহেব তখন রুমালে নেত্রমার্জ্জন করিতে করিতে ফিরিয়া

চলিলেন, ঘোড়ার দিকে আর চাহিতে পারিলেন না।' ধড়ীবাজ সরকারের বেমালুম জিত হইল, তদবধি গৌরাঙ্গদেবের জন্মভূমিতে একটা রব উঠিয়াছিল, শিবু সাহেবের ঘোড়া দানা দেখিয়া হাসিয়া মরিয়া গিয়াছে! আজি পর্য্যন্ত তথাকার কেহ কেহ এক একটা উৎকট বিষয়ের দৃষ্টান্ত স্থলে ঐ কথা বলিয়া উপমা দেয়।

লোকান্তর-প্রাপ্তি।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ-ভূষণের আর একটি রত্ন খসিয়া পড়িয়াছে। ডফকলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিতবর কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিগত ২৭শে ফাল্গুন বুধবার ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া যোগ্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত সমাজের পণ্ডিতমণ্ডলী, আত্মীয় মিত্রমণ্ডলী, পরিচিত বন্ধুমণ্ডলী এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রমণ্ডলী মহাশোকাকুল হইয়াছেন সন্দেহ নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার ৪৩ বৎসর মাত্র বয়স হইয়াছিল।

বঙ্গাব্দ ১২৬৬ সালের ২৫শে অগ্রহায়ণ তারিখে তাঁহার জন্ম হয়, প্রাথমিক শিক্ষার পর সংস্কৃত কালেজে যথারীতি অধ্যয়ন করিয়া তিনি সম্মানের সহিত এম, এ, উপাধি লাভ করেন, রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম-এ, মহাশয়ের সহধ্যায়ী ছিলেন। তদনন্তর প্রেসিডেন্সি কালেজে ইংরাজী অধ্যয়ন; বিদ্যাগৌরবেই তিনি বিদ্যাভূষণ হইয়াছিলেন। পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদ্বয়ের নিকট হইতে "সোমপ্রকাশ" নামক সুপ্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক সমাচার পত্রের স্বত্ব গ্রহণ করিয়া, এই কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সুচারুরূপে কয়েক বৎসর কাল তৎপত্রখানি সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন। পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্রের গুণাবলী বিশেষরূপে বর্ণন করিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়, ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকায় তাহার স্থানাভাব। সামাজিকতায়, অমায়িকতায়, মধুর ভাষিতায়, লোকানুরাগীতায়, বন্ধুবৎসলতায় এবং পরোপকারিতায় তিনি কৃতব্রত ছিলেন, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া কেহই কোন অংশে অসুখী হন নাই। এতাদৃশ সৎগুণশালী পণ্ডিতরত্নের বিয়োগে আমরা যারপর-

নাই মর্ম্মাহত হইয়াছি, রত্নের অন্বেষণের সময় রত্নহারা হইয়া নিতান্ত ব্যথিত-চিত্ত হইয়াছি, একথা বলাই বাহুল্য।"

পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র এবং কাব্য সাহিত্যে পাণ্ডিত্য দেখাইয়া গিয়াছেন, এমন নহে, সুমধুর সঙ্গীতশাস্ত্রেও তাঁহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য ছিল, তিনি সুশিক্ষিত ওস্তাদের ন্যায় উত্তম পাখোয়াজ বাজাইতে পারিতেন, কণ্ঠ সঙ্গীতেও তাঁহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল।

এই পূজ্যাত্মার মৃত্যু সম্বন্ধে একটি চমৎকার ঘটনা হইয়াছে, তদ্দ্বারা জ্যোতিষ গণনার একটি প্রকৃত গৌরব জানিতে পারা গিয়াছে। সহৃদয় বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্ব-মুখে প্রায় সর্ব্বদাই বলিতেন, তাঁহার কোষ্ঠিফল অখণ্ডনীয়। কোষ্ঠিতে ছিল, ৪৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রন্ধ্রগত শনির ভোগ, সেই দুর্যোগে জীবনান্ত অবশ্যম্ভাবি।"

বাস্তবিক এ গণনার সহিত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবনান্তের অদ্ভুত মিলন ঘটিয়াছে। যে সকল পণ্ডিত এক্ষণে এক টাকা দক্ষিণা লইয়া এক-দিনে কোষ্ঠি প্রস্তুত করেন, তাঁহারা ঐরূপ কোষ্ঠি ফল গণনা শিক্ষা করিলে শাস্ত্রের সহিত তাঁহাদেরও গৌরব বর্দ্ধিত হইবে সন্দেহ নাই। বস্তুত, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মৃত্যু কোষ্ঠি গণনার প্রত্যক্ষ ফল। তাঁহার পুত্র আছেন। তাঁহারা পিতৃগুণের উত্তরাধিকারী হইলে আমরা পরম সুখী হইব।

আর একটী শোক-সমাচারে পাঠক মহাশয়কে সন্তপ্ত করিতে হইল। শোভাবাজারের মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববাহাদুর গত ৬ই চৈত্র শুক্রবার অকস্মাৎ ইহ-লোকলীলা সমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন। মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সদাশয়, বিদ্যান পুরুষ ছিলেন, রাজদরবারে তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।)

১১শ বর্ষ। } বৈশাখ, ১৩১০ সাল। { ১০ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত। *

(শ্রীম-কথিত)

[বিংশতিবর্ষ পূর্ব্বে।]

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আইস ভাই, আজ আবার ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে দর্শন করিতে যাই। তিনি ভক্ত সঙ্গে কিরূপ বিলাস করিতেছেন, ঈশ্বরের ভাবে সর্ব্বদা কিরূপ সমাধিস্থ আছেন দেখিব। কখনও সমাধিস্থ,কখনও কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা, আবার কখন বা প্রাকৃত লোকের ন্যায় ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন, এই সব দেখিব। শ্রীমুখে ঈশ্বর-কথা বই আর কিছু নাই, মন সর্ব্বদা অন্তর্মুখ, ব্যবহার পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায়। প্রতি নিশ্বাসের সহিত মায়ের নাম করিতেছেন। একেবারে অভিমানশূন্য পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় ব্যবহার। পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় বিষয়ে আসক্তিশূন্য,

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত প্রথম ভাগ, মূল্য ১৲ টাকা, ১৩।২ নং গুরু-প্রসাদ চৌধুরীর গলিতে শ্রীপ্রভাসচন্দ্র গুপ্তের নিকট প্রাপ্তব্য।

কথামৃতের ইংরাজী অনুবাদ—LEAVES FROM THE GOSPEL OF SRI RAM KRISHNA শীঘ্র বাহির হইবে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীম—কে স্বামী বিবেকানন্দ এই নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন,—

সদানন্দ, সরল ও উদার প্রকৃতি। এক কথা, ঈশ্বর সত্য আর সমস্ত অনিত্য, দুই দিনের জন্য। চল, সেই প্রেমোন্মত্ত বালককে দেখিতে যাই। মহাযোগী অনন্ত সাগরের তীরে একাকী বিচরণ করিতেছেন, কি যেন সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দ সাগর মধ্যে দেখিতেছেন! দেখিয়া, প্রেমে উন্মত্ত হইয়া বেড়াইতেছেন!

আজ চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথি, রবিবার। গত কল্য শনিবার অমাবস্যাতে ঠাকুর বলরামের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। অমাবস্যা নিবিড় আঁধার মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণের অবস্থা আর এক রকম হইয়া যায়। অনন্ত আঁধার মধ্যে একাকী মহাকালী; মহাকালের সহিত রমন করিতেছেন, তাই ঠাকুর অমাবস্যাতে আর স্থির থাকিতে পারেন না। তাই বালকের

Dehra Dhun.

Letter I. 24th November, 1897.

My dear M.—

Many many thanks for your second pamphlet. It is indeed wonderful. The move is quite original and never the life of a great teacher was brought before the public untarnished by the writer's mind as you are doing. The language also is beyond all praise, so fresh, so pointed, and withal so plain and easy. I can not express in adequate terms how I have enjoyed them. I am really in a transport when I read them. Strange is'nt it? our Teacher and Lord was so original and each one of us will have to be original or nothing. I now understand why none of us attempted his life before—It has been reserved for you this great work. He is with you evidently. With all love and namaskar.

(Sd) VIVEKANANDA.

Socratic Dialogues are Plato all over. You are entirely hidden. Moreover the dramatic part is infinitely beautiful. Everybody likes it, here or in the west. V.

অবস্থা। যিনি মাকে অহর্নিশি দেখিতেছেন, আর মা না হলে চলে না, তিনি বালক।

আজ রবিবার, ৮ই এপ্রেল, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ, ২৬এ চৈত্র, প্রাতঃকাল। এই যে ঠাকুর বালকের ন্যায় বসিয়া আছেন। কাছে বসিয়া একটি ছোকরা ভক্ত—রাখাল।

মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল আছেন, কিশোরী ও আরও কয়েকটি ভক্ত আসিয়া জুটিলেন। পুরাতন ব্রাহ্মভক্ত শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন।

মণিমল্লিক ৺কাশীধামে গিয়াছিলেন, তিনি ব্যবসায়ী লোক, কাশীতে তাঁহাদের কুটি আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মণিমল্লিকের প্রতি)—হ্যাঁগা, কাশীতে গেলে, কিছু সাধু-টাধু দেখলে?

মণি। আজ্ঞা হাঁ, ত্রৈলঙ্গ্য স্বামী, ভাস্করানন্দ, এঁদের সব দেখতে গে'ছলুম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি রকম সব দেখলে বল?

মণি। ত্রৈলঙ্গ্য স্বামী সেই বাড়ীতেই আছেন, মণিকর্ণিকার ঘাটে বেণীমাধবের কাছে ঠাকুরবাড়ীতে। লোকে বলে, আগে তাঁর উচ্চ অবস্থা ছিল, কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্য কত্তে পারতেন, এখন অনেকটা কমে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও সব বিষয়ী-লোকের নিন্দা।

মণি। ভাস্করানন্দ সকলের সঙ্গে মেশেন; ত্রৈলঙ্গ্য স্বামীর মত নয়—একেবারে কথা বন্ধ!

[পাপপুণ্য। FREE WILL or GOD'S WILL?]

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভাস্করানন্দের সঙ্গে, তোমার কোন কথা হ'ল?

মণি। আজ্ঞা হাঁ, অনেক কথা হ'ল। তার মধ্যে পাপপুণ্যের কথা হ'ল। তিনি বললেন, পাপ পথে যেও না, পাপচিন্তা ত্যাগ করবে, ঈশ্বর এই সব চান, যে সব কাজ কল্লে পুণ্য হয়, এমন সব কর্ম্ম কর।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হুঁ, ও এক রকম আছে, ঐহিকদের জন্য। যাদের চৈতন্য হয়েছে, যাঁদের ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ অনিত্য বলে বোধ হয়ে গেছে,

তাদের আর এক রকম ভাব। তারা জানে যে, ঈশ্বরই একমাত্র কর্ত্তা আর সব অকর্ত্তা। যাদের চৈতন্য হয়েচে, তাদের বেতালে পা পড়ে না, তাদের হিসাব করে পাপ ত্যাগ কর্ত্তে হয় না, ঈশ্বরের উপর তাদের এত ভালবাসা যে, যে কর্ম্ম তারা করে, সেই কর্ম্মই সৎকর্ম্ম। কিন্তু তারা জানে, এ কর্ম্মের কর্ত্তা আমি নই; আমি ঈশ্বরের দাস, আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী; তিনি যেমন করান, তেমনি করি, তিনি যেমন বলান, তেমনি বলি, তিনি যেমন চালান, তেমনি চলি।

"যাদের চৈতন্য হয়েছে, তারা পাপপুণ্যের পার। তারা দেখে, ঈশ্বরই সব কচ্চেন। এক যায়গায় একটি মঠ ছিল, মঠের সাধুরা রোজ মাধুকরি ভক্ষা করতে যায়, একদিন একটি সাধু ভিক্ষা করতে করতে দেখে যে, একটা জমিদার একটি লোককে ভারি মারছে। সাধুটি বড়ই দয়ালু, সে মাঝে পড়ে জমিদারকে মারতে বারণ কল্লে। জমিদার তখন ভারি রেগে রয়েছে, সে সমস্ত কোপটা সাধুটির গায়ে ঝাড়লে, আর এমন প্রহার দিলে যে, সাধুটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। কেউ গিয়ে মঠে খপর দিলে, তোমাদের একজন সাধুকে একজন জমিদার ভারি মেরেচে। মঠের সাধুরা দৌড়ে এসে দেখে, সাধুটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। তখন তারা পাঁচজনে ধরাধরি করে তাকে মঠের ভিতর নিয়ে গিয়ে, এক ঘরে শোয়ালে। সাধু অজ্ঞান; চারদিকে মঠের লোকে ঘেরে বিমর্ষ হয়ে বসে আছে, কেউ কেউ বাতাস কচ্চে। একজন বল্লে, মুখে একটু দুধ দিয়ে দেখা যাক। মুখে দুধ দিতে দিতে সাধুর যেন চৈতন্য হ'ল। চোখ মেলে দেখতে লাগলো। একজন বল্লে, ওহে দেখি, জ্ঞান হয়েছে কিনা? লোক চিন্‌তে পারছে কি না? তখন সে সাধুকে জিজ্ঞাসা কল্লে খুব চেঁচিয়ে, মহারাজ! তোমাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছে? তখন সাধু আস্তে আস্তে বলছে, ভাই, যিনি আমাকে মেরেছিলেন, তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন।

"ঈশ্বরকে জানতে না পারলে এরূপ অবস্থা হয় না।

মণি। আজ্ঞে, আপনি যে কথা বল্লেন, সে বড় উচ্চ অবস্থা। ভাস্করানন্দের সঙ্গে এই সব পাঁচরকম কথা হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কোনো বাড়ীতে থাকে?

মণি। একজনদের বাড়ীতে থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কত বয়স?

মণি। পঞ্চান্ন হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর কিছু কথা হ'ল?

মণি। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ভক্তি কিসে হয়? তিনি বল্লেন, নাম কর, রাম রাম বলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ বেশ কথা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর বাড়ীতে শ্রীশ্রীভবতারিণী, শ্রীশ্রীরাধাকান্ত ও দ্বাদশ শিবের পূজা শেষ হইল, ক্রমে ভোগারতি বাজনা বাজিতে লাগিল। চৈত্র মাস, দ্বিপ্রহর বেলা হয় হয়। ভারি রৌদ্র। এইমাত্র জোয়ার আরম্ভ হইয়াছে, দক্ষিণদিক হইতে হাওয়া উঠিয়াছে। পুতসলিলা কলকলনাদিনী ভাগীরথী এইমাত্র উত্তরবাহিনী হইয়াছেন। ঠাকুর আহারান্তে কক্ষমধ্যে একটু বিশ্রাম করিতেছেন।

[গৃহস্থ ও কর্ম্মযোগ।]

রাখালের দেশ বশিরহাটের কাছে। দেশে গ্রীষ্মকালে বড় জলকষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মণিমল্লিকের প্রতি) দেখ, রাখাল বলছিল, ওদের দেশে বড় জলকষ্ট। তুমি সেখানে একটা পুষ্করণী কাটাও না কেন। তা হলে কত লোকের উপকার হয়। (সহাস্যে) তোমার ত অনেক টাকা আছে, অত টাকা নিয়ে কি করবে? তা শুনেছি, তেলিরা নাকি বড় হিসাবি। (ঠাকুরের ও ভক্তগণের হাস্য।)

মণিলাল মল্লিকের বাড়ী কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটি। সিঁদুরিয়া পটির ব্রাহ্মসমাজের অধিবেসন তাঁহার বাড়ীতেই হয়। ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তিনি অনেককে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণকেও নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। মণিলালের বরাহনগরে একখানি বাগান আছে, সে বাগানে তিনি প্রায় একাকী আসিয়া থাকেন, ও সেই সঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণকেও দর্শন করিয়া যান। মণিলাল যথার্থ হিসাবী লোক বটে। সমস্ত গাড়ী ভাড়া করিয়া বরাহনগরে প্রায় আসেন না; ট্রামে চাপিয়া প্রথমে শোভাবাজারে আসেন, সেখানে সেয়ারের গাড়ীতে চাপিয়া বরাহনগরে আসেন। অর্থের অভাব নাই, কয়েক বৎসর পরে গরীব ছাত্রদের ভরণ-

পোষণের জন্য এককালে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

মণিলাল চুপ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একথা ওকথার পর কথার পিটে বলিলেন,—

"মহাশয়! পুষ্করণীর কথা বলছিলেন। তা বললেই হয়, তা আবার তেলিফেলি বলা কেন?

ভক্তেরা কেহ কেহ মুখ টিপিয়া হাসিতেছিলেন। ঠাকুরও হাসিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও প্রেমতত্ত্ব।]

কিয়ৎক্ষণ পরে কলিকাতা হইতে কয়েকটি পুরাতন ব্রাহ্মভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তন্মধ্যে একজন শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সেন।

ঘরে অনেকগুলি ভক্তের সমাগম হইয়াছে, ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন,—সহাস্যবদন বালক-মূর্ত্তি। উত্তরাস্য হইয়া বসিয়াছেন। ব্রাহ্মভক্তদের সঙ্গে আনন্দে আলাপ করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ব্রাহ্মভক্ত ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) তোমরা প্যাম্ প্যাম্ কর; কিন্তু প্রেম কি সামান্য জিনিষ গা! চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। প্রেমের দুটি লক্ষণ। প্রথম,—জগত ভুল হয়ে যাবে, এত ঈশ্বরেতে ভালবাসা যে, বাহ্যশূন্য। চৈতন্যদেব

"বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে,
সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে।"

"দ্বিতীয় লক্ষণ—নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ, এর উপরও মমতা থাকবে না; দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যাবে। ঈশ্বর দর্শন না হলে প্রেম হয় না।

"ঈশ্বর লাভের কতকগুলি লক্ষণ আছে, যার ভিতর অনুরাগের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হচ্চে, তার ঈশ্বর লাভের আর দেরি নাই।

"অনুরাগের ঐশ্বর্য্য কি কি? বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুসেবা, সাধু সঙ্গ, ঈশ্বরের নামগুণ কীর্ত্তন, সত্য কথা, এই সব।

"এই সকল অনুরাগের লক্ষণ দেখলে ঠিক বলতে পারা যায়, ঈশ্বর দর্শনের আর দেরি নাই। বাবু যদি কোন খানসামার বাড়ী যাবেন এরূপ ঠিক হয়ে থাকে, খানসামার বাড়ীর অবস্থা দেখে ঠিক বুঝতে পারা যায়। প্রথমে বন জঙ্গল কাটা হয়, ঝুলঝাড়া হয়, ঝাঁটপাট দেওয়া হয়। বাবু নিজেই সতরঞ্চ, গুড়গুড়ি পাঁঠিয়ে দেন। বাবুর নিজের চাকরবাকর হাজির থাকে। সতরঞ্চ গুড়গুড়ি এই সব পাঁচরকম জিনিষ আসতে দেখলেই লোকের বুঝতে বাকি থাকে না, বাবু এসে পড়লেন বলে।

একজন ভক্ত। আজ্ঞে, আগে বিচার করে কি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করতে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও এক পথ আছে। বিচার পথ। ভক্তিপথেও অন্তর ইন্দ্রিয় নিগ্রহ আপনি হয়, আর সহজে হয়। ঈশ্বরের উপর যত ভালবাসা আসবে, ততই ইন্দ্রিয়সুখ আলুণী লাগবে।

"যে দিন সন্তান মারা গেছে, সেই শোকের উপর স্ত্রীপুরুষের শরীরের সুখের দিকে মন থাকতে পারে?

একজন ভক্ত। কই, তাঁকে ভালবাসতে পাচ্ছি কই?

(নাম-মাহাত্ম্য। উপায়—মায়ের নাম।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর নাম কল্লে সব পাপ কেটে যায়, কাম ক্রোধ শরীরের সুখের ইচ্ছা, এ সব পালিয়ে যায়।

একজন ভক্ত। তাঁর নাম কর্ত্তে ভাল কই লাগে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, যাতে তাঁর নামে রুচি হয়। তিনিই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

এই বলিয়া ঠাকুর সেই দেবদুর্ল্লভ কণ্ঠে গান গাহিতে লাগিলেন। জীবের দুঃখে কাতর হইয়া ঠাকুর মার কাছে হৃদয়ের বেদনা জানাইতে লাগিলেন। প্রাকৃত জীবের অবস্থা নিজে আরোপ করিয়া, মার কাছে জীবের দুঃখ জানাইতে লাগিলেন।

গীত।

দোষ কারু নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।
ষড়রিপু হ'ল কোদণ্ড স্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
যে কূপ বেড়িল কালরূপ জল, কাল মনোরমা।

আমার কি হবে তারিণী ত্রিগুণধারিণী,
বিগুণ করেছে স্বগুণে ; কিসে এ বারি নিবারি,
ভেবে দাশুরথীর, অনিবার বারি নয়নে ;
ছিল বারি কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে, জীবনে জীবন কেমনে হয় রক্ষে,
আছি তোর অপিক্ষে, দে মা মুক্তি ভিক্ষে,
কটাক্ষেতে করে পার ॥

আবার গান গাহিতে লাগিলেন। জীবের বিকারের রোগ। তাঁর নামে রুচি হলে বিকার কাটবে—

গীত।

একি বিচার শঙ্করী, কৃপাচরণতরী দিলেও ধন্বন্তরি।
অনিত্য আলাপ হ'ল অঙ্গদাহ, আমার আমার একি হ'ল পাপমোহ ;
তায় ধন জন তৃষ্ণা না হয় বিরহ, কিসে জীবন ধরি।
অনিত্য আলাপ, কি পাপ প্রলাপ, সতত সর্ব্বমঙ্গলে ;
মায়া কাকনিদ্রা তাহে দাশরথীর নয়নযুগলে।
হিংসারূপ তাহে সে উদরে কৃমি, মিছে কাজে ভ্রমি সেই হয় ভূমি,
রোগে বাঁচি কি না বাঁচি, ত্বন্নামে অরুচি, দিবা শর্ব্বরী ॥

শ্রীরাম। তন্নামে অরুচি! বিকারে যদি অরুচি হ'ল, তাহলে আর বাঁচিবার পথ থাকে না। যদি একটু রুচি থাকে, তবে বাঁচবার খুব আশা। তাই নামে রুচি, ঈশ্বরের নাম কর্ত্তে দুর্গা নাম, রাম নাম, কৃষ্ণনাম, শিবনাম, যে নাম ব'লে ঈশ্বরকে ডাক না কেন? যদি নাম কর্ত্তে অনুরাগ দিন দিন বাড়ে, যদি আনন্দ হয়, তা হলে আর কোন ভয় নাই—বিকার কাটবেই কাটবে। তাঁর কৃপা হবেই হবে।

(ক্রমশঃ)

ধ্যানে ভাবি কি?

ধ্যানের অর্থ রূপচিন্তা। ঈশ্বরের রূপ নাই। ঈশ্বর-পূজার সময় আমরা কি প্রকার রূপ চিন্তা করিব, ভাবিয়া অন্ধকার দেখিতে হয়! কতকপরিমাণে সেই অন্ধকার নিরসন করিবার অভিপ্রায়ে প্রবীণ প্রবীণ পুরাতন শাস্ত্রকারগণ ঈশ্বর উপাসনার সাধ্যমত সুবিধার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা করিয়াছেন। সর্ব্বদেবতার পূজার অগ্রে বক্ষে অঞ্জলি স্থাপন পূর্ব্বক নয়ন মুদিত করিয়া ধ্যান করিতে হয়। সেই ধ্যান আর কিছুই নহে, কেবল কল্পিতমূর্ত্তির রূপবর্ণনা। ধ্যানের অগ্রে একটা ধারণা থাকা আবশ্যক। একটি প্রচলিত কথা আছে, ধ্যান-ধারণা। শব্দ-প্রয়োগ ঠিক হয় নাই। অগ্রে ধারণা তাহার পর ধ্যান। ধ্যানের পরেও ধারণা আইসে, কিন্তু অগ্রে ধারণা না থাকিলে ধ্যানে কোন বস্তু প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। নিম্নে এই কথাটি কিঞ্চিৎ বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

গঠিত প্রতিমা অথবা চিত্রপট সম্মুখে না থাকিলেও কেবল জলে স্থলে পূজা করিবার অগ্রে লোকে ধ্যান করিয়া থাকে। ধ্যানে তাঁহারা কি পায়? রূপ। যে দেবতার যে রূপ, অগ্রে প্রতিমা দর্শন করিয়া মনে সেই রূপের ধারণা না জন্মিলে সে ধ্যানে কিছুই পাওয়া যায় না, যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার। অতএব বুঝিতে হইল, ধারণাই প্রধান।

মনে করুন, দুর্গাপূজা। দুর্গা-প্রতিমা আমরা দেখিয়াছি, সেই ধারণার সহায়ে ধ্যানে আমরা গৌরবর্ণা, ত্রিনয়না, দশভূজা দুর্গামূর্ত্তি দেখিতে পাই। শিবের প্রতিমা আমরা দেখিয়াছি, এই কারণে শিবের ধ্যানের সময় বিভূতি-ভূষিত, ফণীভূষণ, রজতগিরিনিভ, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিহিত ত্রিলোচন, মহাদেব-মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে উদয় হন। শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে ধড়াচূড়া-শোভিত, বনমালা-ভূষিত, ত্রিভঙ্গ, বংশীধারিরূপ আমরা দর্শন করি। প্রতিমা স্থাপন করিয়া যে সকল দেবতার পূজা করা হয়, তাঁহাদের সকলের ধ্যানেই ঐ প্রকার ভাব। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবগণের প্রতিমা গঠন করিয়া পূজা করিবার রীতি এতদ্দেশে নাই, সুতরাং ধ্যান করিয়া কল্পনা-পথে তাঁহাদের মূর্ত্তি আনয়ন করা যায় না। রূপের আকর্ষণ এতদূর প্রবল।

মানবাদি জীব জন্তুগণের সম্বন্ধেও ঐরূপ। ভোলানাথ আসিয়াছিল, এইমাত্র পরিচয় পাইয়া, ভোলানাথকে চিনিয়া লওয়া, সর্ব্বদা সম্ভব হয় না।

ভোলানাথের সঙ্গে পূর্ব্বের যদি দেখা সাক্ষাৎ থাকে, তবে ঐ নামটি শুনিবামাত্র ভোলানাথের আকৃতি সম্মুখে আইসে, কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত মনে পড়ে, নতুবা শ্রোতার পক্ষে ভোলানাথ একটা অন্ধকার পদার্থ। প্রবাসী আত্মীয়বন্ধু পরিবারবর্গের কথা মনে পড়িবামাত্র তাঁহাদের সকলের আকার-প্রকারাদি ঠিক যেন চক্ষের নিকটে আসিয়া দর্শন দেয়। যাঁহারা আমাদের চক্ষের উপর ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, শোকোচ্ছ্বাসে তাঁহাদিগকে ভাবিবার সময় তাঁহাদের সজিব চেহারা আমরা যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাই। এই সকল প্রমাণে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ধ্যানের অগ্রে ধারণা আবশ্যক, ধারণার অগ্রে ধ্যান হয় না। অতএব অজ্ঞানগণের সাধনার সৌকর্য্যার্থ পূর্ণব্রহ্মের রূপ কল্পনা।

এই ভূমিকাংশ পাঠ করিয়া, কেহ কেহ হয় ত মনে করিতে পারেন, নিরাকার ঈশ্বরকে সাকার বলিয়া স্বীকার করিতে যাঁহারা ব্যগ্র, সেই সাকারবাদিগণের অনুকূল পক্ষ অবলম্বন করিয়া, অকস্মাৎ আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। এ ধারণা যদি কাহারও হয়, তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবেন। প্রবন্ধের সে উদ্দেশ্য নহে। নিরাকারবাদী ও সাকারবাদীর বিরোধ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তর্কবিতর্ক অনেক হইয়া গিয়াছে, বড় বড় শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, সেই চর্ব্বিত চর্ব্বণের পুনশ্চর্ব্বণে একখানি মাসিক পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা আমাদের সংকল্প হইতে পারে না, সে তর্কে এখন আর নূতনত্ব কিছুই নাই। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য আমাদের বর্ত্তমান সমাজের একটি অভিনব অদ্ভুত ঘটনার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন। সে দৃষ্টান্ত এইস্থানে দর্শন করুন।

একটি নবীন বয়ঃপ্রাপ্ত রূপবান যুবা। এত শীঘ্র নাম প্রকাশের প্রয়োজন নাই, কোথায় বসতি, তাহাও এখন অপ্রকাশ থাকুক; ধরিয়া লউন, যুবার নাম কল্পতরু, গ্রামের নাম স্বর্ণপুর। কল্পতরুর পিতার দুটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছেন। রূপবানের বংশ—গ্রামের লোকেরা বলে, রূপের ঝাড়। কল্পতরুর পিতা ও পিতৃব্যদ্বয় তিন সহোদরেই পরম রূপবান। কনিষ্ঠ পিতৃব্যের একটি পরমরূপবতী কন্যা আছে; বিবাহ হয় নাই; অথচ নবযুবতী, নামটী মনে করুন পদ্মফুল। কল্পতরু এই কলিকাতা রাজধানির একটি অদ্বৈতবাদ-সমিতির তেজস্বী সভ্য। পিতৃব্য-কুমারী পদ্মফুলের রূপলাবণ্য ও নবযৌবন দর্শনে বিমোহিত হইয়া, তিনি

সেই পদ্মফুলকে বিবাহ করিতে অভিলাষি হইয়াছেন। বোধ হয় সুবিধাও হইতে পারে,—পন্থা এক প্রকার পরিস্কার। কেন না, পদ্মফুল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছে, দশমবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে কল্পতরুর মুখে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" মন্ত্রের শিক্ষা পাইয়াছে। কল্পতরু বিলাতী বিবাহের পক্ষপাতী। এখনকার কালে এক একদলের ঐরূপ পক্ষপাতি হওয়াও বিচিত্র বোধ হয় না। খৃষ্টান গবর্ণমেণ্টের হুজুরে দরখাস্ত করিয়া, যাঁহারা বিলাতী ধরণে রেজেষ্টারী করা বিবাহ চুক্তি ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন, অসবর্ণ বিবাহ-প্রথা অবাধে চালাইতেছেন, রজক পুত্রকে বিপ্রকন্যা সম্প্রদান করিতে যাঁহাদের মাথা হেঁট হইতেছে না, সর্ব্বপ্রকারে বিলাতী বিবাহের পদ্ধতি পালনে তাঁহারা যে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিবেন না, ইহা মনে করিতেও আমাদের লজ্জা বোধ হয়। আপনাদের দলে পরিণয় বন্ধন ছেদনের আইন, (Divorce Act) প্রচলণের আকাঙ্ক্ষায় যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ চঞ্চল, বিলাতী বিবাহের সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিতে কেন যে তাঁহাদের লোভ জন্মিবে না, এ প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন।

কল্পতরুর নজীর ইংরাজ জাতি। ইংরাজেরা সহোদরাভগ্নী ব্যতীত জ্যেষ্ঠতাত কন্যা, খুল্লতাত কন্যা, মাতুল কন্যা প্রভৃতি অতি নিকট-সম্পর্কীয়া ভগ্নিগণের পাণি-গ্রহণ করে, তাহাতে তাঁহাদের জাতিগত, বংশগত, আচারগত এবং ধর্ম্মগত গৌরবের বৃদ্ধি হয়, সাংসারিক সুখও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এ নজীরে কল্পতরু কেন যে খুল্লতাত কন্যা পদ্মফুলকে পত্নী করিতে পারিবেন না, তাহা তিনি বুঝিতে অক্ষম। কল্পতরু বলেন, ইংরাজ জাতি এ জগতে প্রধান সভ্য জাতি, সভ্যতার সর্ব্বাঙ্গ গ্রহণ করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কল্পতরুর দলের অবশ্য বাঞ্ছনীয়, সত্য, সভ্যতার অনুকরণ অবশ্য প্রার্থনীয়, কিন্তু ইংরাজেরা সভ্য হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে পৃথিবীর মুসলমানেরা সহোদরা ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া আসিতেছে। ইংরাজের মতে মুসলমানেরা অসভ্য; অনেকে কিন্তু অনুমান করেন, সভ্য ইংরাজেরা অসভ্য মুসলমানের নিকট হইতে ঐ অপরূপ বিবাহ-প্রথা ঋণ করিয়া লইয়াছেন। মুসলমানের তালাক এবং খৃষ্টানের "ডাইভোর্স" একই কথা। কল্পতরু হয়ত এ কথা জানেন না, জানিলে হয়ত অসভ্য মুসলমানের অনুকরণে পদ্মফুলকে বিবাহ করিবার দাবী করিতে তাঁহার ঘৃণা হইত।

হরি হে! দয়া কর! একটা ভাল কথা স্মরণ হইল। কল্পতরুর বিদ্যা

আছে। ইংরাজী বিদ্যার লবণসমুদ্রে ডুব দিয়াও ঔদার্য্য প্রভাবে তিনি প্রতিমা-পূজকের "ঘৃণাকর" পুরাণ শাস্ত্রের দু-একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীতে হস্ত ধৌত করিয়াছেন। তাঁহার মহাভারত পড়া আছে। অনেক অন্বেষণ করিয়া, মহাভারতে তিনি একটী নজীর পাইয়াছেন। নজীরটা সুভদ্রার বিবাহ। বেদব্যাসের বাক্য—"যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে।" অর্থাৎ মহাভারতে যাহা নাই, সমগ্র ভারতবর্ষে* তাহা নাই। এত বড় অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতের মধ্যে একটা নজীর বাহির হইয়াছে। সুভদ্রা ছিলেন—অর্জ্জুনের মাতুল কন্যা, শেষে তিনি হইয়াছিলেন—অর্জ্জুনের সহ-ধর্ম্মিনী। কল্পতরুর এই নজীর। নিস্কারণে এইরূপ নজীর সংগ্রহ করা, আজকাল দু-একজন সভ্যতা-শিক্ষার্থী বঙ্গযুবকের অভ্যাস হইয়াছে। সম্প্রতি একজন বিদ্যান বঙ্গসন্তান ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া হিন্দুশাস্ত্র মন্থন পূর্ব্বক প্রাচীন আর্য্যজাতীর গো মাংস ভক্ষণের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এতাদৃশ নজীর সংগ্রহে ভারতের যে কত উপকার, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা দুঃসাধ্য।

প্রসাঙ্গানুরোধে অগত্যা অনেক বেশী কথা বলা হইল। এখন মূল প্রসঙ্গের সূত্র ধারণ করা যাউক। কল্পতরু ভগ্নী বিবাহ করিবেন। কল্পতরুতে পদ্মফুল ফুটিবে। পদ্মফুলটি দূরস্থ পল্লীগ্রামে, কল্পতরু কলিকাতায়। বহুদূরে থাকিয়াও সূর্য্য যেমন প্রেমানুরাগে পদ্ম ফুটাইয়া দেন, কল্পতরু সেইরূপ পদ্মফুল ফুটাইতে পারেন কিনা, কল্পতরুই জানেন। পরিণয়ের আশায় কল্পতরু এখন দিবারাত্রি পদ্মফুল ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানে পাইতেছেন পদ্মফুলের রূপ। শয়নে স্বপনে জাগরণে কেবল পদ্মফুল ধ্যান। ধ্যানের সঙ্গে কল্পতরু আপনার মনকে বলেন, পদ্মফুলকে কেন পাইব না? এখন পদ্মফুলের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে, পদ্মফুল ইংরাজী পড়িয়াছে, পদ্মফুল এখন তুলসীগাছে জল দেয় না, ফুল-বিল্বদল দিয়া মাটির শিবলিঙ্গ পূজা করে না, সন্ধ্যাকালে শয়নগৃহে ধূনার ধোঁয়া দেয় না, গঙ্গাজল ছিটায় না, শাঁক বাজায় না, কোন প্রতিমার কাছে মাথা নোয়ায় না, হিঁদুয়ানীর কিছুই মানে না; পদ্মফুল হিন্দু নহে, তবে কেন আমাকে

* প্রাচীনেরা সমগ্র ভূমণ্ডলকে ভারতবর্ষ বলিতেন, যুক্তি দেখাইয়া অনেক পণ্ডিত এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন।

বিবাহ করিয়া সুখী করিবে না? ধারণার সঙ্গে, ধ্যানের সঙ্গে কল্পতরুর এইরূপ কল্পনা। পদ্মফুল রাজি কি গররাজি, সেইটুকু এখন জানিতে বাকি। কিছুদিন হইল জনরব উঠিয়াছিল, সিমুলিয়া অঞ্চলের কে একজন যুবক আপন সহোদরা ভগ্নীকে বিবাহ করিবার জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিল, নজীর অভাবে মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। কল্পতরুর নজীর অনেক ঘরে ঘরে বিবাহ করায় বড় সুখ। ইংরাজী নজীর, মুসলমানী নজীর অসংখ্য; আর্য্য নজীর সুভদ্রা অর্জ্জুন। এত নজীর থাকিতে কল্পতরুর মনোবাসনা কেন পূর্ণ হইবে না, প্রজাপতি তাঁহার প্রতি কেন প্রসন্ন হইবেন না, এই প্রশ্ন সর্ব্বদাই কল্পতরুর মনে সমুদিত হয়, উত্তর আইসে অনুকূল। ধ্যানের সময় কল্পতরু ভাবেন—পদ্মফুল, দশদিকে চাহিয়া দেখেন, পদ্মফুল, নয়ন মুদিত করিয়া দেখেন—পদ্মফুল, নির্জ্জন পাইলেই আপন মনে বলেন—পদ্মফুল পদ্মফুল পদ্মফুল,—পদ্মফুল—ওঁ—একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ধ্যানযোগে অপূর্ব্ব মহিমা। কল্পতরুর দীক্ষাগুরু যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, সে শিক্ষা এখন দূরে বিসর্জ্জিত হইয়াছে, সে শিক্ষার মূলমন্ত্র এখন আর ধ্যানে পাওয়া যায় না, পিতৃব্য পুত্রী সেই পদ্মফুলটি এখন কল্পতরুর ধ্যান ধারণার একমাত্র দেবতা। ধ্যানে ভাবিলে ধ্যানের বস্তুকে আয়ত্ব করা যায়, ইহাই কল্পতরুর বিশ্বাস। যুগলমিলন হইলে সেই বিশ্বাস-তরুতে চতুর্ব্বর্গ ফল ফলিবে।

বাধা অনেক। যাঁহারা কল্পতরুর মনোরথ সিদ্ধির পথে বিঘ্ন ঘটাইবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহারা কল্পতরুকে বুঝাইয়া বলিতেছেন, যে বংশে তোমার জন্ম, সে বংশের চিরপ্রথা আলোচনা কর, আর্য্যশাস্ত্রানুসারে পিতৃব্য কন্যা বহু দূরের কথা, ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি শ্রেষ্ঠবর্ণে স্ব-গোত্রে বিবাহ হয় না, বৈবাহিক শাস্ত্রের বিশেষ বিধি, পিতৃপক্ষের সপ্তমী কন্যা এবং মাতৃপক্ষের পঞ্চমী কন্যা শাস্ত্রীয় বিবাহ নিষিদ্ধ। ধ্যান করিয়া ভাবিয়া দেখ, এ নিষেধের তাৎপর্য্য কি? একবিধ শুক্র শোনিতে বংশের সন্তানেরা নির্জ্জীব ও অল্পায়ু হয়।

ধ্যাননিমগ্ন কল্পতরু ঐ প্রকার উপদেশ বাক্য শ্রবণে মুখ বাঁকাইয়া হাস্য করেন। তিনি জানিতে পারিয়াছেন, আর্য্যধর্ম্ম অসার, আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রের বচনগুলিও অসার, সার কেবল সেই পদ্মফুল। কল্পতরু মুক্তকণ্ঠে বলেন, তিনি হিন্দু নহেন, তাহার জন্মদাতা পিতা হিন্দুবংশে সমুৎপন্ন, ইহাও

তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন, কাজে কাজেই হিন্দুধর্ম্মের অথবা হিন্দুশাস্ত্রের কোন কথা তিনি গ্রাহ্য করেন না। ধ্যান কথাটা কোন ধর্ম্মের উপদেশ, সে বিষয়টি চিন্তা করিবারও তাহার সময় নাই, সময় থাকিলেও জ্ঞানের অভাব দাঁড়ায়। ধ্যানে আমরা ভাবি কি? অভিষ্টদেবতার রূপ। ধ্যানে কল্পতরু ভাবেন কি? জগৎ অন্ধকার, কেবল একমাত্র পদ্মফুলটি চন্দ্রালোকে সমুজ্জল। এইখানেই মরণ। চন্দ্রালোকে যে পদ্মফুল উজ্জ্বল হয়, সে পদ্মফুল জগৎসংসারে নাই। সে পদ্ম ধারণাতেও আইসে না, ধ্যানেও আইসে না, ত্রিভুবন অন্বেষণ করিয়াও তাদৃশ পদ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদি যায়, তাহা অলক্ষণ।

অলক্ষণ! অলক্ষণ বুঝাইলে কল্পতরু ক্রোধে মুখ ভারি করিয়া নিস্তব্ধ থাকেন, মনে ভাবেন, ভয় কি? কন্যা বয়স্থা হইয়াছে, আর কুমারী রাখা যায় না, ইহা ভাবিয়া চাচা চাচী যদি আমার অজ্ঞাতে বিবাহ দিয়া ফেলেন, তিনদিন পরে পদ্মকে দিয়া ডাইভোর্স করাইয়া, সেই বরকে তাড়াইব, পদ্মফুল আমার হইবে। মৌলবীদিগের আজ্ঞা আছে,—

"চাচা আপন, চাচী পর, চাচীর বেটি সাদী কর।"

সংস্কৃতের শব্দ সম্পদ্।

বর্ত্তমানকালে মনীষী শ্রমশীল ইয়ুরোপীয় অধ্যাপকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং বহু গবেষণার ফলে সংস্কৃত ভাষা জগতের একটি প্রধান এবং অতি প্রাচীন ভাষা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে; এবং এই ভাষার বৈচিত্র, মাধুর্য্য, প্রসাদগুণ প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বস্তুতঃ সংস্কৃতের ন্যায় মাধুর্য্যগুণসম্পন্ন ভাষা আর আছে কিনা, সে বিষয় সন্দেহ। ইহার রচনাবলীর এমনই একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যে, তাহা শ্রবণে হৃদয়ে একটা প্রসন্নতা আনয়ন করে, এবং ইহার ঐন্দ্রজালিক মোহন স্বর যেন হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবিষ্ট হইয়া একটা উচ্ছ্বাস জন্মাইয়া দেয়। সংস্কৃত কবিতাগুলির তো এই ক্ষমতা অসীম। সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তিকালে শ্রোতা যদি তাহার একবর্ণও বুঝিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলেও ইহার বীণানিন্দিত সুমধুর নিক্কণ তাঁহার নিকট এত সুমিষ্ট বোধ হইবে যে, তিনি একান্ত আগ্রহের সহিত তাহা শ্রবণ করিবেন, এবং আবৃত্তির

শেষে যেন একটা কি মোহন সুর তাঁহার হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া তাঁহাকে উন্মনা করিয়া তুলিবে। অনিন্দ্য বেদগান হইতে সাধারণ কাব্য গাথা পর্য্যন্ত প্রত্যেক সংস্কৃত রচনার প্রতিই এই উক্তির প্রযুক্ত হইতে পারে। সংস্কৃতের এই অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় বিদেশীয় পণ্ডিতগণ পর্য্যন্তও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাহা অবিসংবাদী সত্য বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে আমাদের নিকট প্রথমেই সংস্কৃতের শব্দ সম্পদই ইহার আদিও মুখ্য কারণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। শব্দ সাহিত্য রাজ্যের প্রধান এবং একমাত্র সম্রাট্ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিন্দা, প্রশংসা, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, তিরস্কার, পুরস্কার, দয়া, মায়া, ভজন, সাধন, যে দিকেই অগ্রসর হইতে হইবে শব্দের অনুমতি এবং সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদিগের আর গত্যন্তর নাই। যেখানে শব্দ অক্ষম, তথায় সাহিত্যও অক্ষম,—সাহিত্য সেরূপ স্থলে মূকের মানসিক ভাব প্রকাশের চেষ্টার ন্যায় কেবল নিস্ফলপ্রযত্ন করিয়া শ্রান্ত হয় মাত্র, কিছুতেই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে না! কাহাকেও গালি দিতে হইলেও শব্দের যেমন প্রয়োজন, কাহারও গুণকীর্ত্তন করিতে হইলেও শব্দের তেমনই প্রয়োজনীয়তা। আবার একই শব্দই প্রয়োগ ব্যতিক্রমে নিন্দা প্রশংসা সবই করিতে সমর্থ; এরূপস্থলে শব্দকে ধ্বনির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়; ধ্বনি শব্দের পশ্চাতে থাকিয়া তাহার ঈপ্সিত বিষয়ে সহায়তা করে। "তুমি এখান হইতে যাও" এই শব্দ সমষ্টি দ্বারা আমরা ক্রোধ, অনুনয়, আদেশ, করুণা, সবই প্রকাশ করিতে সমর্থ,—কিন্তু ধ্বনির সহায়তা প্রয়োজন।

ধ্বনি আবার আমাদিগের সংকল্পের অনুযায়িনী। সংকল্প ধ্বনির পরিচালনার পথ নির্দ্দেশ করিয়া স্বয়ং ধ্বনিকে সেই পথে চালিত করিয়া থাকে।

এই সংকল্প পরিচালিতা ধ্বনি প্রথমে শব্দের দ্বারে গিয়া তাহার সাহায্য ভিক্ষা করে, সংকল্পের আদেশও ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য শব্দের দ্বারস্থ হয়, শব্দ যদি অনুগ্রহ করিয়া নিজ বিরাট দেহ হইতে দুই চারিটি রোম ধ্বনির প্রার্থনানুসারে প্রদান করেন, তবে ধ্বনি সংকল্পের আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হন, নতুবা সংকল্পের তাড়নায় কতকগুলি

ব্যর্থ চেষ্টা করিতে হয় এই মাত্র। ধ্বনি আবার সংকল্পের আদেশ পাইলে স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতাবলে একরূপ কার্য্য করিয়া অন্যরূপ বুঝাইতে পারেন, নিন্দার ছলে প্রশংসা করিতে পারেন, এবং প্রশংসারছলে নিন্দা করিতে পারেন, 'রাম' বলিয়া 'রহিম' বুঝাইতে পারেন বা এমন ভাবে ইঙ্গিত করিয়া যাইতে পারেন যে, তদ্দ্বারা বিষয়ান্তরের বোধ প্রকট হইয়া পড়ে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এ সব বিষয়েই তাঁহাকে শব্দের সহায়তা, শব্দের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হয়। শব্দ মৌখিক ভাষায় ধ্বনির যেরূপ সহায়তা লাভ করিতে পারে, লিখিত ভাষায় ততদূর সহায়তা লাভ সকল সময় তাহার সম্ভব হয় না, কারণ লিখিত ভাষায় শব্দ লিখিত অবস্থায় যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ তাহার সহিত আলঙ্কারিক বস্তু ধ্বনি ব্যতীত প্রত্যক্ষ ভাবে ধ্বনি মিলিত থাকে না, পঠনারকালে ধ্বনি তাহার সহিত আসিয়া মিলিত হয়, কিন্তু সে মিলন সর্ব্বদা ঠিক উপযুক্তরূপ নাও হইতে পারে, এজন্য লিখিত ভাষায় শব্দ মহাশয়কে এরূপ ভাবে সজ্জিত থাকিতে হয় যে, তাহা দেখিবামাত্রই কোন্ জাতীয়া ধ্বনি তাঁহার সহিত সঙ্গতা হইতে পারিবে, তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই জন্যই লিখিত ভাষায় শব্দ মহাশয়ের প্রতিপত্তি আরও বেশী প্রবল; অর্থাৎ লিখিত ভাষায় শব্দের সংযোগ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা ও বিবেচনা অবলম্বন করিতে হয়। মৌখিক ভাষায় শব্দ বিজাতীয়া ধ্বনির সহিত মিলিত হইলে হয় ত অনেক স্থলে বিপরীত কার্য্য করিয়া ফেলিতে পারে, বৈদিক মন্ত্রাদি উচ্চারণে এই জন্যই স্বর বা ধ্বনির এত অধিক বাঁধাবাঁধি, কারণ দেবতাগণ যখন মন্ত্রাধীন, তখন উচ্চারণের ধ্বনির দোষে যদি সুপ্রার্থনা কু-প্রার্থনায় পরিণত হয়, তাহা হইলেই বিপদ,—একবার সেরূপ ঘটিয়াও ছিল, তাই সে বিষয় "যথেন্দ্র শত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ" ইত্যাদি বাক্যে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে, লিখিত বিষয়েও ধ্বনির অস্থান প্রয়োগে বা যতি ভঙ্গে ঠিক বিপরীত ফল উৎপাদিত হইতে দেখা গিয়া থাকে। এজন্য লিখিত বিষয়ে ধ্বনি ও যতির বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া শব্দের যোজনা করিতে হয়, এবং যিনি যে পরিমাণে এইরূপ ভাবে শব্দকে খাটাইয়া লইতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে কৃতীত্ব লাভ করেন।

ধ্বনির সহায়তা করিবার জন্য শব্দের বিরাট দেহে নানা সাধন বর্ত্তমান আছে; অব্যয় তাহার একটা প্রধান সাধন; ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির বোধক

ভিন্ন ভিন্ন অব্যয় Interjection আছে, তাহারা লিখিত বিষয়ের ধ্বনির অনেক সহায়তা হয়।

যাহা হউক, শব্দই যখন মনোভাব প্রকাশের প্রধান এবং একমাত্র সাধন, তখন শব্দের সম্পদ্ অনুযায়ী ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি বা হ্রাস হইয়া থাকে, একথা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

যে ভাষার শব্দ সম্পদ্ অধিক, সেই ভাষায় মনোভাব নানারূপে প্রকাশ করিবার পক্ষে অধিক সুবিধা সন্দেহ নাই।

রচনার মাধুর্য্য যে কেবলমাত্র শব্দ বৈচিত্র্যের উপরই নির্ভর করে, আমরা এরূপ কথা বলিতেছি না—তবে সে স্থানে যে ভাবটি প্রকাশ করিতে হইবে, তথায় যদি তদনুরূপ একটি শব্দ বসাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে যে রচনার উৎকর্ষতা বিশেষরূপে সম্পাদিত হয়, এ বিষয় নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক ভাবপ্রকাশ করিবার জন্য তদনুরূপ শব্দের ঐকান্তিকী আবশ্যকতা, এবং সেই শব্দাভাবে ঐরূপ ভাবপ্রকাশের বিশেষ অসুবিধা, কেহই বোধ হয় অস্বীকার করিতে পারেন না। Roget সাহেবও স্বীয় অমূল্যরত্ন The xsources of English wordsএর মুখবন্ধে সে কথা বেশ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, আমাদের সংস্কৃত ভাষা এই শব্দ সম্পদ্ সম্বন্ধে অতুলনীয়া—শব্দ সম্পদে বোধ হয় ইহা ভাষা রাজ্যের মহারাণী। প্রত্যেক শব্দের নানা প্রকার ধ্বনি ও ভাববিশিষ্ট বহুপ্রকার প্রতিশব্দ বর্ত্তমান থাকিয়া এই শব্দ সম্পদ্ নিয়ত ঘোষণা করিতেছে। এই সমস্ত প্রতিশব্দ নিরর্থক নহে, সংকল্পে ভেদানুসারে ধ্বনি ও অর্থদ্যোতনার বিভিন্নতানুযায়ী এই সমস্ত শব্দসাগর হইতে উপযুক্ত রত্ন নির্ব্বাচন পূর্ব্বক রচনাহারে পরাইতে পারিলে, তাহার উজ্জ্বলতা বিশেষরূপেই বৃদ্ধি পায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সংকল্প ধ্বনিকে চালনা করে, (এই সব স্থলে ধ্বনিও স্বর একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে যাহাকে ধ্বনি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহাকেও ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে) কিন্তু এই সংকল্পের জনক আবার ভাব, ভাবের জনক মন। মনে যখন যে ভাবের উৎপত্তি হইবে, তদনুসারে সংকল্পে আসিবে, এবং সংকল্পের ভেদানুসারে ধ্বনি শব্দ নির্ব্বাচন করিয়া মৌখিক বা লিখিত বাক্য দ্বারা তাহার অভিব্যক্ত করিবে। সুতরাং শব্দকে এই মনের ভাবের অনুগমন করিতে হয়। মনে বীরভাবের

সঞ্চারের জন্য ধ্বনির আবশ্যক আছে বটে, কিন্তু শব্দের আবশ্যকতাও বড় কম নহে। গম্ভীর বিষয় প্রতিপালন জন্য তদনুরূপ গম্ভীর শব্দেরই অবতারণার প্রয়োজন। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভাবাদি সব ঠিক রাখিয়া যদি কতকগুলি শব্দগত পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ধ্বনির প্রাচুর্য্য থাকিলেও তাহার গাম্ভীর্য্য, বীরভাব স্থির রাখা কঠিন হইবে।

রচনা মনোহারিণী করিতে হইলে সুধু ধ্বনি থাকিলে চলিবে না, তাহাতে রসের সমাবেশ থাকা আবশ্যক। এই রসের প্রাচুর্য্য অনুসারেই রচনার মাধুর্য্য সম্পাদিত হয়। আবার দেখিতে গেলে, এই রসের সঞ্চার করা—নির্জ্জীব বাক্য কঙ্কালে সজীবত্ব প্রদান করা, শব্দ যোজনার কৃতিত্বে সংঘটিত হইয়া থাকে। উপযুক্ত শব্দই প্রকৃতরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া বাক্যে এই সজীবত্ব সঞ্চার করিয়া থাকে। সুতরাং এখানেও শব্দ সম্পদের আবশ্যকতা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

আমাদের সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দ সম্পদ্ আছে বলিয়াই যে কোন রসেই হউক না কেন, কৃতীর হস্তে পড়িলে রচনা সজীব ও মধুর চিক্কণ সম্পন্ন হইবে।

আমাদের অভিধানগুলি দেখুন, ঠিক ইংরাজি The sarun এর ন্যায়। তাহারা যেন প্রত্যেকে শব্দের সদাব্রত। এক এক ভাগে এক জাতীয় নানাপ্রকার শব্দ সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে, যাহার যেরূপ প্রয়োজন, এই সব কল্পবৃক্ষের নিকট প্রার্থনা করিলেই পাইতে পারিবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

কৌতুকানন্দ।

আমার গরু।

মহকুমা কাহাকে বলে, বাঙ্গালী পাঠক মহাশয়গণের অনেকেই তাহা জানেন। ইংরাজীর প্রতি অধিক অনুরাগবশে যাঁহারা সেটা না জানেন, তাঁহারা জানুন, মহকুমা অর্থে আদালতের সব ডিবিজন। সেখানে এক একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং দু-একজন মুন্সেফ দস্তুরমত কাছারী করিয়া থাকেন।

মফঃস্বলের ঐরূপ এক মহকুমা এলাকা মধ্যে একজন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। গ্রামবাসী ভট্টাচার্য্য, সহরের ভট্টাচার্য্যের ন্যায় বুদ্ধি চাতুর্য্য সম্পন্ন ছিলেন না। সংসারে তিনি, তাঁহার ব্রাহ্মণী, এক গাইগরু আর একটি এঁড়ে বাছুর, এই কয়েকটি পরিবার। ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় শ্রম-শক্তি ছিল না, সুতরাং উপার্জ্জনও অধিক ছিল না, পূর্ব্বসঞ্চিত কতকগুলি টাকা ছিল, গহনাবন্ধকি কার্য্যে সেই টাকার সুদ হইতে যথাসম্ভব দিন গুজরান হইত। ব্রাহ্মণী তজ্জন্য বড় উদ্বিগ্ন ছিলেন। বুদ্ধিতে পতিপত্নী উভয়েই নিক্তির ওজনে কাঁটায় কাঁটায়। গ্রামে সেই সময় একটী নূতন পাঠশালা বসিয়াছিল। একজন বাবুলোকের বড় পুষ্করণীর দক্ষিণধারে একখানা আটচালা ঘর, সেই আটচালাতেই পাঠশালা। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা নিত্য বৈকালে ঐ পুষ্করণী হইতে খাবার জল তুলিয়া আনিতেন।

বর্দ্ধমানের একজন "মোশাই" সেই পাঠশালায় শিক্ষাদান করিতেন। পাঠশালার গুরুমহাশয়কে হুগলী বর্দ্ধমানাঞ্চলে কেবল "মোশাই" বলে, ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। মহাশয় একদিন বৈকালে একজন অনাবিষ্ট নির্ব্বোধ ছাত্রকে শাসন করিতেছিলেন, ধমক দিয়া বেত্রাঘাত করিতেছিলেন, প্রথমোক্ত ভট্টাচার্য্যের ব্রাহ্মণী সেই সময় কুম্ভ কক্ষে লইয়া, পাঠশালার সম্মুখ দিয়া পূর্ব্বোক্ত পুষ্করণীতে জল আনিতে যাইতেছিলেন, তিনি শুনিলেন, হাঁকাহাঁকি করিয়া ডাকিয়া গুরুমহাশয় "তুই বেটা কেরে? এই বয়সে কত জেলায়, কত গরুকে আমি মানুষ করিয়া আসিলাম, তো বেটাকে কিছুই করিতে পারিলাম না।"

ব্রাহ্মণী ঐ কথা শুনিলেন। জল লইয়া গৃহে গিয়া মনে মনে কেবল ঐ কথাই ভাবিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্যের নাম চন্দ্রভূষণ তর্কবাগীশ। পাড়ার পাঁচবাড়ীতে ঠাকুর পূজা করা, আর সন্ধ্যার সময় আরতি করা তাঁহার বৃদ্ধবয়সের কার্য্য ছিল। সন্ধ্যার পর আরতি সারিয়া তিনি গৃহে আসিয়া তাম্রকূট ধূম সেবন করিতেছিলেন, ব্রাহ্মণী সেই সময় নিকটে গিয়া বসিলেন। ঘর সংসারের দু-এক কথার পর ব্রাহ্মণী বলিলেন, "দেখ, তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, শরীর আর কতদিন বহিবে, ছেলে নাই, শেষদশায় বড়ই কষ্ট হইবে। একটা বড় সুবিধা হইতেছে। ঐ যে বর্দ্ধমানের নূতন গুরু এখানে আসিয়া পাঠশালা খুলিয়াছেন, তিনি খুব লোক, ভারি

পণ্ডিত, ভারি ক্ষমতা। আজ আমি জল আনিতে গিয়া শুনিয়া আসিলাম, একটা ছেলেকে তিনি বলিতেছেন, কত জায়গায় কত গরুকে তিনি মানুষ করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। তুমি এক কাজ কর, আমাদের ঐ এঁড়ে বাছুরটা কেবল বসিয়া বসিয়া খায়, কোন কার্য্যই করে না, ঐটাকে তুমি তাঁহার কাছে রাখিয়া আইস, তিনি ওটাকে মানুষ করিয়া দিবেন। গরুটা মানুষ হইলে শেষদশায় আমাদের অনেক উপকারে আসিবে।"

নারীবুদ্ধি শুভঙ্করী, নারীবুদ্ধি শুভঙ্করী! দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীতে বার কতক তুড়ি দিয়া, হাই তুলিতে তুলিতে ঐ কথা বলিয়া, তর্কবাগীশ মহাশয় ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "তুমিই আমার লক্ষ্মী, তোমার বুদ্ধিই আমার জীবন, গৃহের লক্ষ্মী, তুমি দীর্ঘজীবী হও, কল্য প্রভাতেই আমি ঐ বেয়াড়া বাছুরটাকে পাঠশালে দিয়া আসিব। বিশেষ অনুরোধ করিয়া গুরু-মহাশয়কে বলিব, শীঘ্র যেন মানুষ করিয়া দেন।"

পরামর্শ স্থির হইল। পরদিন প্রাতে চন্দ্রভূষণ তর্কবাগীশ সেই এঁড়ে বাছুরের দড়ি ধরিয়া পাঠশালায় উপস্থিত হইলেন, বাছুর দেখাইয়া গুরুকে বলিলেন, "মহাশয়! আমি শুনিলাম, আপনি অনেক গরুকে মানুষ করিয়া-ছেন, অনুগ্রহ করিয়া আমার এই বাছুরটিকে যদি মানুষ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমার যথেষ্ট উপকার হয়।"

ভট্টাচার্য্যের বুদ্ধির দৌড় কতদূর, গুরুমহাশয় তাহা বুঝিলেন। ভাল একটা দাঁও জুটিল, এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "এ রকম ছোট বাছুর মানুষ হইতে কিছু বেশী দিন লাগে, কিছু বেশী টাকাও খরচ হয়, আপনি যদি অগ্রিম ৫০৲ শত টাকা জমা রাখিতে পারেন, তাহা হইলে এক বৎসরেই মানুষ করিয়া দিব।"

একদিকে আশা, অপরদিকে টাকা, ভাবিয়া ভাবিয়া তর্কবাগীশ বলিলেন, "গরিব আমি, অত টাকা কোথায় পাইব, দয়া করিয়া ছয় মাসে মানুষ করুন, ধার করিয়া আড়াই শত টাকা আপনাকে আমি দিব।"

গুরুমহাশয় রাজি হইলেন, তর্কবাগীশ মহাশয় আড়াই শত টাকা আনিয়া দিলেন, বাছুরটি পাঠশালায় রহিল। তর্কবাগীশ মাঝে মাঝে এক একদিন পাঠশালার দিকে বেড়াইতে গিয়া আড়ে আড়ে দেখিয়া আইসেন, বাছুর ঘাস খাইতেছে, খড় খাইতেছে, আটচালার খুটিতে বাঁধা আছে।

ছয় মাস কাটিয়া গেল। শেষ দিন। গুরুমহাশয় সেই দিন বাছুরটিকে

লুকাইয়া ফেলিলেন, কেহ কেহ বলিল, গ্রামান্তরে দশ টাকায় বেচিয়া ফেলিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় অপরাহ্ণ সময়ে পাঠশালায় হাজির হইয়া দেখিলেন, বাছুর নাই, খুঁটিতে কেবল দড়িগাছটি বাঁধা আছে। ভাবিলেন, মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। গুরুমহাশয়ের কাছে গরু চাহিলেন। গুরুমহাশয় বলিলেন, মহাশয়ের বৎসটি মনুষ্য হইয়াছে, আড়াই শত টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে, আর আড়াই শত টাকা আমার বক্সিস পাওয়া চাই। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, মনুষ্যটি দেখি? গুরু বলিলেন, এখানে নাই, মহকুমার কাছারীতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বিচার করিতেছে। আমার টাকা-গুলি দিয়া ঐ দড়ি গাছটি লইয়া আপনি কাছারীতে গমন করুন, সেই খানেই দেখিতে পাইবেন। যাইবার সময় এক ডাল কাঁঠাল পাতা হাতে করিয়া যাইবেন, দেখিলেই ছুটিয়া আসিবে।

তর্কবাগীশের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিল না। আনন্দে তিনি উন্মত্ত। অতুলানন্দে গৃহে গিয়া আর আড়াই শত টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, গুরুমহাশয়কে দিলেন, বাছুর বাঁধা দড়িগাছটি খুঁটি হইতে খুলিয়া লইলেন, কাঁঠালপাতা যোগাড় করিতে চলিলেন, শীঘ্রই যোগাড় হইল।

বেলা প্রায় অবসান। কাছারী ভাঙ্গিবার অত্যল্প বিলম্ব। চন্দ্রভূষণ তর্কবাগীশ কাছারীঘরের বাহির বারাণ্ডায় দর্শন দিলেন। একহাতে গরুর দড়ি, এক হাতে কাঁঠালের ডাল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে যান, চাপ-রাসধারি আরদালী আসিয়া ধাক্কা দিয়া বাধা দিল। টিকি ঘুরাইয়া সক্রোধে তর্কবাগীশ বলিলেন, ছাড়, পথ ছাড়, আমার ঘরের বাছুর ঐ হাকিমটি। যখন মানুষ হয় নাই, তখন আমার গোয়াল ঘরে কত খড় খাইয়াছে, কত খোল খাইয়াছে, কত ভুষি খাইয়াছে, মানুষ হইয়া এখন হাকিমত্ব করিতেছে। পোষাক পরিয়াছে, পাগড়ী পরিয়াছে, পাটের দড়ির বদলে সোণার সিকল গলায় দিয়াছে। বেশ আছে। লক্ষ্মী আজিও আমার ঘরে জাব্না খাইতেছে। লক্ষ্মী উহার মা। উহার দুটি ভগ্নীও আমার বাড়ীতে রহিয়াছে। আজ আমি তাহাদের কাছে লইয়া যাইব।

আরদালী গণ্ডগোল বাঁধাইল। কাঁহাকা বাউরা হো! জোরে জোরে ইহা বলিয়া বার বার ধাক্কা দিতে লাগিল। আরদালী প্রবেশ করিতে দিবে না, তর্কবাগীশ যাইবেন, কাছারী ঘরের দরজায় ভীড় জমিয়া গেল। হো হো হাস্য, হৈ হৈ চিৎকার, রৈ রৈ ব্যাপার!

এজ্‌লাসে বসিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন, একজন উকীলের মুখে বর্ণনা শুনিয়া বেঞ্চ হইতে নামিয়া আসিলেন, ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? কেন এখানে গোলমাল করিতেছ?

ঘাড় বাঁকাইয়া মুখ দেখিয়া, কাঁঠালের ডালটি সম্মুখে ধরিয়া, দুই তিনবার সস্নেহে চুম্‌কুড়ী দিয়া, তর্কবাগীশ বলিলেন, হা! খাও খাও, পাতা খাও! কাঁঠাল পাতা বড় ভালবাসিতে, খাও খাও, আইস আমার সঙ্গে; সহজে যদি না আইস, এই দেখ, দড়ি আনিয়াছি, বাঁধিয়া লইয়া যাইব। যাইবে না। হুঁ হুঁ! চিনিতে পারিতেছ না? এখন চিনিবে কেন? হাকিম হইয়াছ, পোষাক পরিয়াছ, খোল ভূষি ভুলিয়া গিয়াছ, এখন চিনিবে কেন? কিছুই কি মনে পড়ে না? নগদ ৫০০৲ শত টাকা খরচ করিয়া তোমাকে আমি মানুষ করিয়া লইয়াছি, তাহাও কি মনে পড়ে না? পাঠশালের কথাটাও কি ভুলিয়া গিয়াছ?

ডেপুটি বাবু দেখিলেন, বিভ্রাট। স্থির করিলেন, বাতুল। যত কিছু বুঝাইতে চান, সমস্তই বিফল হয়। ঘন ঘন কাঁঠালের ডাল নাড়া দিয়া, ব্রাহ্মণ কেবল হা হা বলিয়া চুমকুড়ী দেন, দড়ি ঘুরাইয়া ধরিতে যান। বিপরীত কাণ্ড!

বাতুলকে নিরস্ত করা দুর্ঘট দেখিয়া, ডেপুটিবাবু অগত্যা নেটিব ডাক্তারকে তলব করিলেন। কি রকম পাগল, পরীক্ষা কর, পাগলা গারদে পাঠাইবার উপযুক্ত কিনা, দস্তুর মত পরীক্ষা করিয়া রির্পোট দাও, ডাক্তারের প্রতি এইরূপ হুকুম দিলেন। চাপরাসীরা ভট্টাচার্য্যকে টানিয়া লইয়া চলিল। ভট্টাচার্য্য তখন কেবল গুরুমশাই গুরুমশাই বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিলেন।

গুরুমশাই কি, বৃত্তান্ত জানিবার অভিপ্রায়ে ডেপুটী বাবু তখন চাপরাসীগণকে থামাইলেন। সেরেস্তাদার, মহাফেজ, নাজির, উকীল, মোক্তার এবং অন্যান্য আমলারা সেইখানে জড় হইলেন। রকমারী প্রশ্ন উত্তরে সকল কথা প্রকাশ হইল। অনন্তর ডাক্তারের পরীক্ষাতেও সিদ্ধান্ত হইল, পাগল নয়, বোকা ব্রাহ্মণ। চাউল কলা বাঁধা ভট্টাচার্য্য একটা এঁড়ে বাছুরকে মানুষ করাইবার আশায় ৫০০৲ শত টাকা নষ্ট করিয়াছে। বর্দ্ধমানের গুরু ভারী চালাক, বোকা ব্রাহ্মণকে ভুলাইয়া ঠকাইয়া টাকা লইয়াছে, এই পর্য্যন্ত মূল বৃত্তান্ত, পাগল নয়।

ডেপুটী বাবু নতবদনে মৃদু হাস্য করিয়া, পুনর্ব্বার এজলাসে গিয়া বসিলেন, ভট্টাচার্য্যকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, এখনি তুমি সেই প্রতারক গুরুর নামে প্রবঞ্চনার দাবীতে দরখাস্ত কর, কল্য আমি বিচার করিব।

একজন তুখোড় মোক্তার তৎক্ষণাৎ দরদাস্ত লিখিয়া দিল, তর্কবাগীশ দস্তখত করিলেন, দরখাস্ত পাশ হইল, গুরুমহাশয়ের নামে সমন জারির হুকুম লেখা রহিল, বড় আশায় নিরাশা হইয়া তর্কবাগীশ মহাশয় কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে গেলেন। বিচার কিরূপ হইয়াছিল, কৌতুকানন্দ তাহা শ্রবণ করেন নাই।

বামাদলের উপাধি-বিভ্রাট।

তর্কবাগীশ মহাশয়েরা আমাদের ক্ষুদ্র সমাজে দুটি নূতন বিভ্রাট বাহির করিয়াছেন। পুরুষের নাম-বিভ্রাট এবং বামাগণের উপাধি-বিভ্রাট। কতকগুলি পুরুষের নাম বুঝিবার উপায় নাই,—সি, সি, মুখার্জ্জি; এস, বি, বসু; টি, সি, গুপ্ত; ও, সি, নিয়োগী ইত্যাদি ইত্যাদি নাম কিছুদিন শোনা গিয়াছিল। গোড়ায় দুটি দুটি ইংরাজী অক্ষর, আগায় স্বজাতীয় উপাধি। এই নিয়মে কিছুদিন পুরুষগণের নাম লেখা চলিতেছিল। ব্রাহ্মণে, কায়স্থে, বৈদ্যে, নবশাখে এবং ইতরে, যেখানে একটু একটু ইংরাজী ভাষার কণা প্রবেশ করিয়াছে, সেইখানেই ঐ রীতি।

ইহার উপর আর এক উপসর্গ। দুই অক্ষরের পরিবর্ত্তে এখন আবার কতক কতক নাম কেবল একাক্ষর বিশিষ্ট হইতেছে। যথা—পি, বানার্জ্জি; ডি, ঘোষ; ও, দত্ত; বি, নন্দী; এ, সাধু খাঁ, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রথাটা এতদূর বাড়িয়াছে যে, শুঁড়ির দোকানের গায়ে বড় বড় অক্ষরে দেখা গিয়াছে, এস, সা এণ্ড কোং; টি, সা এণ্ড কোং ইত্যাদি। এ পদ্ধতির প্রথম প্রধান প্রবর্ত্তক আমাদের বিখ্যাত ডাক্তার স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গুপ্ত। তিনিই প্রথমে ম্যালেরিয়ানাশক আরক প্রস্তুত করিয়া, বিজ্ঞাপনে এবং বোতলের গায়ে নাম দিয়াছিলেন—ডি, গুপ্ত এণ্ড কোং। সেই দেখা দেখি কত যে একাক্ষর পুরুষ কলিকাতায় উদ্ভূত হইয়াছেন, যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই তাহার গণনা সংখ্যা বুঝিবেন।

এ প্রথাটাকে বিভ্রাট বলিয়া ধরা যায় কেন? আমাদের কাছেই এ

প্রশ্নের উত্তম উত্তর আছে। বিভ্রাট বলিয়া ধরা যায় এই জন্য যে, সেই সকল পুরুষের প্রকৃত নাম বুঝিয়া লইবার উপায় থাকে না। লেখার মাথামুণ্ডু যাহাই থাকুক, সম্মুখে বসাইয়া মুখে মুখে নাম জিজ্ঞাসা করিলে কোন কোন মূর্ত্তি পশ্চাতে হেলিয়া, বুক ফুলাইয়া, চরুটের ধোয়া উড়াইয়া, সগর্ব্বে উত্তর দেন, "এস বসু,—পিতা ডব্লিউ, বসু রায় বাহাদুর।"

এই দশা যখন, তখন আর বিভ্রাট না বলিয়া কি বলা যায়? এরূপ নাম-ধারিদের নাম তাঁহারা নিজে নিজে পূর্ণ করিয়া ব্যাখ্যা না করিলে, কিংবা তাঁহাদের পূর্ব্বপরিচিত কোন বন্ধুলোক ইন্‌টারপ্রিটার হইয়া বুঝাইয়া না দিলে, সত্য নামগুলি কিছুতেই জানা যাইবে না। যাহার মুখ দিয়া এস, বসু, ডব্লিউ বসু, এই দুটি কথা বাহির হইল, তিনি একজন রায় বাহাদুরের পুত্র; নিতান্ত কেও-কেটা নন। পাঠক মহাশয়! এখন আপনারা বিবেচনা করিয়া বলুন, এস, বসু নামে পরিচয় দিলে ক'জন লোকে তাঁহাকে চিনিবে? নিতান্ত অনুগত জনকতক ইয়ার-বক্সী ভিন্ন বোধ করি, দ্বিতীয় দ্বারের প্রতিবাসীরাও কিছুই বুঝিবেন না, কাহাকেও চিনিবেন না। মাতৃ-পিতৃ দত্ত নামটাও যদি কেহ না জানিল, তবে আর তাঁহার বিদ্যা-গৌরব, জাতি-গৌরব, (বড় মানুষ হইলে) ধন-গৌরব, দান-গৌরব, এ সকল গুণের খোষনাম বিকাশ পাইবে কিসে? পৃথিবীতে কেহই যদি তোমাকে একটা মানুষ বলিয়া না চিনিল, তবে আর তোমার বাঁচিয়া সুখ কি?

প্রথাটা অতীব নিন্দনীয়; কাজে কাজেই বিষম বিভ্রাট। বামাদলের উপাধি-বিভ্রাটটা ইহা অপেক্ষাও ভয়াবহ, দোষাবহ, মাঝে মাঝে কৌতুকাবহ। শ্রীমতী স্বর্ণলতা ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী শান্তবালা মিত্র, শ্রীমতী নিস্তারিণী পাল, শ্রীমতী সুরেশ্বরী মণ্ডল, শ্রীমতী গোপালমণি সাধু খাঁ। এই সকল অদ্ভুত অদ্ভুত নাম কর্ণে শুনিতে কেমন লাগে? ক্রমশঃ শুনিতে শুনিতে তাহাও যদি মিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করা অভ্যাস হয়, বস্তুতঃ আমাদের ব্যাকরণের দৃষ্টান্তে কেমন লাগে? প্রথমেই শ্রীমতী,—স্ত্রীলিঙ্গে প্রয়োগ, তাহার পর স্ত্রীলোকের নামটি, সেটিও অবশ্যই স্ত্রীলিঙ্গে প্রয়োগ; শেষকালে উপাধিটি। সেইটিকে লইয়াই সর্ব্বনাশ! উপাধিটি পুংলিঙ্গ। কি কারণে এক একটি গৃহলক্ষ্মীর নামে ব্যাকরণের এরূপ অপমান করা কেন হয়, কারণ ত আমরা কিছুই পাই না, এ সর্ব্বনাশের আবশ্যকতাও দেখা যায় না, তবে কেন এই হাস্যকর গণ্ডগোল? পূর্ব্বের পদ্ধতি ছিল, ব্রাহ্মণকন্যার

নামের সঙ্গে "দেবী", এবং শূদ্রকন্যার নামের সঙ্গে "দাসী" লেখা হইত। এখনকার কতকগুলি যুবক সেই পদ্ধতিটি উঠাইয়া দিতেছেন। "দেবী" শব্দটি উঠাইবার সত্য কারণ কিছুই বিনির্ণীত হইল না, কেহ কেহ কেবল এইরূপ অনুমান করিলেন যে, ঐ নূতন সংস্কারক দলে ব্রহ্মজ্ঞানীর সংখ্যা বেশী, নামের উপাধি স্থলে "দেবী" শব্দ থাকিলে মনে কোন প্রকার হিন্দু দেব-দেবীর ভাব আসিতে পারে, এই যুক্তি পাকাইয়া, ব্রাহ্ম সংস্কারকেরাই "দেবী" ব্যবহার উঠাইয়া দিয়াছেন। এটা কেবল অনুমানসিদ্ধ বাক্য; প্রকৃত কথা নহে।

প্রকৃত কথা না হউক, যাহারা ঐ মতের পোষক, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, ইহার উপর ব্যাকরণের অপমান কেন? সংস্কারক যদি স্ত্রীলোকের নামটি কোন প্রকারে ভাঙ্গিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে "শ্রীমতী শব্দটার বদলে "শ্রীযুক্ত বাবু বসাইয়া লইলেই ব্যাকরণের মান বজায় হইবে। আপাতত যতদিন নামটি ভাঙ্গিয়া লওয়া সহজসাধ্য না হয়, ততদিন নামটিকে এখনকার মত স্ত্রীলিঙ্গে রাখিয়া, "শ্রীযুক্ত বাবু" অগ্রে বসু, শ্রীযুক্ত বাবু শেষে বসু পুংলিঙ্গের উপাধি—শ্রীযুক্ত বাবু মৃণালিনী মুখোপাধ্যায়, শুনিতেও নিতান্ত মন্দ হইবে না।

বাবু দীনবন্ধু মিত্র তৎপ্রণীত একখানি প্রহসনে "বাবু" শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ অন্বেষণ করিয়াছিলেন, পরিশেষে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, "সাধু" শব্দের যেমন সাধন, সেইরূপ বাবু শব্দের সাধন করা হইবে, সিদ্ধান্তে স্থির হইয়াছিল, বাবু শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বাব্বী। প্রমাণ যথা—সাধু পদের স্ত্রীলিঙ্গে সাধ্বী।

কথাটি ঠিক হইয়াছিল। বাবু দীনবন্ধু এ সময়ে বাঁচিয়া থাকিলে ঐ বাব্বী শব্দের কত প্রচার দেখিতে পাইতেন, তাঁহার নিজের ব্যাকরণসিদ্ধ বাক্যটি অনেক লোকে মাদুলী করিয়া গলায় পরিয়াছে। আহা! দীনবন্ধু বাবু অকালে কাব্যসংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এই এক কলিকাতা সহরে বহু বাব্বী সমুদ্ভূতা, এ সৌভাগ্য তিনি দেখিতে পাইলেন না, আক্ষেপ রহিয়া গেল।

শ্রীমতী বিনোদিনী লাহা আর বাবু বিনোদিনী লাহা, এই দুটীর মধ্যে কোনটি ভাল শুনায়, গুণাকরেরা বিবেচনা করিবেন। শূদ্রেরা "দাসী" উঠাইয়া দিয়াছেন কেন? অনেকের মুখে এই শোনা যায় যে, তাঁহারা বলেন, সব সমান; ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ নাই। তবে কেন শূদ্রকন্যারা দাসী থাকিবে।

দাসী! কাহার দাসী! ছি ছি! বড় লজ্জা, বড় অপমান, দাসী আর রাখা হইবে না, ইয়ুরোপে পতির উপাধি পত্নী পায়, এখানেও তাহাই হইবে, ঘোষের স্ত্রী 'দাসী' না লিখিয়া নামের শেষে লিখিবে ঘোষ। ইহাই সিদ্ধান্ত। দৈবাৎ একদিন একটা লাইব্রেরী ঘরে দুই ষাঁড়ে যুদ্ধ লাগিয়াছিল, এক ষাঁড় ব্রাহ্মণ, এক ষাঁড় কায়স্থ। কায়স্থটির পৈতৃক উপাধি দাস, ব্রাহ্মণটির পৈতৃক উপাধি ঘটক। ব্রাহ্মণ ধরিলেন, "তুমি কায়স্থ, তুমি দাস, তবে কেন তোমার স্ত্রী দাসী বলিয়া নাম স্বাক্ষর করিবে না? অবশ্যই করিবে। তোমরা ইংরাজী শিখিয়াছ; অগ্রে অগ্রে নাম দস্তখত করিতে—সি, সি, দাস C. C. Das. সে এক রকম ছিল, স্ত্রীর নামে লিখিতে পারিতে, বিড়ুমণি ডসী। সেরূপ লিখিলে ডসীকে দাসী বলিয়া কেহ ধরিতে পারিত না। এখন বাঙ্গালা ধরিয়াছ, (শ্রীমতী বিধুমণি দাস) লিখিতে হয়। দাসী উপাধি থাকিলে যদি সর্ব্বজাতির দাসীত্ব করা বুঝায়, স্ত্রীলোকের দাস উপাধি থাকিলে. দাসী হইতে মুক্তা, ইহা বুঝাইবে কে? বুঝিবেই বা কে? অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তোমরা এখন পূর্ব্ব রীতির আদর কর। মেয়ে পুরুষে এক সমান করিবার দুশ্চেষ্টা পরিত্যাগ কর।"

ঘটকের ঐ সকল উক্তি শ্রবণ করিয়া, কায়স্থ সন্তান ক্ষণকাল যেন লজ্জায় অধোমুখ হইলেন; একটু পরেই উঠিয়া বাহির হইয়া চলিলেন; মুখের ভাবে বোধ হইয়াছিল, অত্যন্ত রাগে ফুলিতে ফুলিতে গেলেন।

তাহার মনের ভাব যেরূপ হউক, ঘটক ঠাকুরের এক একটি কথা বেশ পাকা পাকা। এককালে দুই নৌকায় পদার্পণ, সেটা বড় বিপদের হেতু। নারী-সংস্কারে মন হইয়া থাকে সংস্কারকেরা অন্য প্রকার উত্তম উপায়ে তাহা সাধন করিতে পারেন, নাম উপাধি লইয়া বিচিকিৎস্য বিভ্রাট উপস্থিত করায় কিছুমাত্র ফল নাই। ঘটক ঠাকুর সত্যই বলিয়াছেন, হয় পূর্ব্বের রীতি বজায় রাখ, না হয় সর্ব্ব প্রকারে ইংরাজী রীতির আশ্রয় করিয়া স্বতন্ত্র হও। আধা ডিক্রী, আধা ডিস্‌মিস, বড়ই হাস্যকর।

আমাদের গৃহলক্ষ্মীগুলির সুন্দর সুন্দর নামগুলি আমাদের কর্ণে বড় মিষ্ট জানায়, পরিণামজ্ঞানশূন্য জনকতক চঞ্চল চিত্ত বালক আজ কাল সেই নামগুলি স্বেচ্ছাচারে নষ্ট করিতেছে। শীঘ্র নিবারণ আবশ্যক।

তোরা কি গো মা আমার!

তোরা কি গো মা আমার! তা না হলে—যবে
কুড়াইয়া করজাল পশ্চিম গগনে—
ঢলে পড়ে দিনশেষে ক্লান্ত দিনমণি;
শ্রমপাণ্ডু মুখছবি কনক প্রভায়
রঞ্জি দেয় শ্যাম তাম্র বট-কিশলয়ে;
নিবাইয়া দেহতাপ সান্ধ্য-সমীরণে
নদীকূলে পড়ি হাসে শীত স্পর্শ বালি;
অস্থির জলদ শিশু সে স্বর্ণ সাগরে
নিমজ্জনে সন্তরণে ক্ষুদ্র শ্যাম দেহ
উজ্জ্বল করিয়া ফেলে তরল কণকে।
সুদূর পূর্ব্ববোত্তর পশ্চিম দক্ষিণ
গগন প্রান্তরে যবে দেবশিল্পিগণ—
অদৃশ্যে সৃজেন কত কণক তটনী,
অথবা সুবর্ণ শৃঙ্গ উত্তুঙ্গ ভূধর,
সোণার কেশরী অশ্ব গজ বিহঙ্গম;
যবে সে প্রান্তর বুকে হেথায় সেথায়
ফুটে গো হীরার ফুল মিটিমিটি হাসি;
প্রশান্ত প্রকৃতি মাতা কোলের সন্তানে
অলক্ষ্যে টানেন কোলে আকুল আহ্বানে—
বল দেখি তোরা কেন উৎসুক নয়নে
(দূরগত সন্তানের আগমন তরে
তাকান যেমতি মাতা পলে শতবার
তার আগমন পথ, তেমনি অধীরে)
আশারে পাঠায়ে দিস্ নিতি পথপানে
উৎকণ্ঠা পুরিয়া রাখি স্নেহভরা বুকে?
স্বহৃদয় প্রতিবিম্ব অমল কোমল
স্নেহের সৌরভমাখা শ্বেতপুষ্প-কলি
রাখিস্ যতনে তুলি—স্নেহ উপহার?

ধন্য'পূত স্নেহধারা, পবিত্র শীতল,
পরাণের তাপ জ্বালা করে নির্ব্বাপিত।
কিবা দিব প্রতিদান ; এ প্রার্থনা সদা
হৃদয় ফাটিয়া ওই স্নেহ উৎসধারা
ভোগবতী সম যেন ছুটিয়া বাহিরে
শীতল করিয়া দেয় সকল সংসার।
মোর স্নেহ-স্মৃতি যেন গায় অনিবার
"জগতের মার ছবি তোরা মা আমার।"

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রেষ্ঠ রণ।

(১)

আজি কে তোরা নিশীথে চাহিস্ পশিতে
সমর-মাঝে
রুদ্র-সাজে !
ওই শুন্ শুন্ মধুর বাঁশি
বিশ্ব-বধূর মোহন হাসি
নিঃস্ব-হৃদয়ের বাসনা-রাশি
জাগিছে লাজে ;
আয় আয় ভাঙ্গিয়া স্বপ্ন
আপন কাজে
সমর-সাজে।

(২)

ওগো, ওই হেসে ফিরে ভিতরে বাহিরে
মত্ত-ধ্বনি
শুনা না, শুনি,
নিত্য নিশিতে দীপ্ত-শশীতে
ক্ষিপ্ত করিছে এ রণে মিশিতে
জীবন সনে আপনা বুঝিতে
ডাকিছে ধ্বনি ;
শ্রবণ-রন্ধ্রের রুধিয়া দ্বার
বসেছে শনি
শুন না, শুনি।

(৩)

আর, হেলায় ফেলায় দিস্ না ফেলায়ে
জীবন-ধন
আয়রে মন,
চক্র বাসনা করি দে দূর
বাসব-চক্রে সাজিয়া অদূর
শনির চূড়া করিতে চূর
কররে পণ ;
আঁধারে আঁধারে আঁধারে আঁধার
হোক্ হনন
জীবন পণ।

(৪)

আজি, বিচিত্র আসন রেখেছে কেবা
দ্যুলোক'পরে
আলোকপুরে,
ভক্ত-রক্ত-সিক্ত ফুলে
অঞ্জলি দেবে চরণ-মূলে,
কোন্ এ মোহিনী প্রেমের কোলে
ডাকিছে তোরে ?
মত্ত ব্যথা ঠেলিয়া চল্
পক্ষ-ভরে
দ্যুলোক'পরে।

(৫)

হায়, এ রণ শেষে পারিনে ফিরিতে
ঘরেতে কেহ
লইয়া দেহ,
আপন বক্ষ চুষিয়া চুষিয়া
কোমল মর্ম্ম পিশিয়া পিশিয়া
বর্ম্মে অসিতে মিশিয়া মিশিয়া
চির-বিবাহ ;
এত যে মিলন ব্রত-আলিঙ্গন
তবু বিরহ
অশ্রু-সহ !

(৬)

ধর্ রে কৃপাণ
ধর্ রে কৃপাণ
কাটিয়া হৃদয় কর্ খান্ খান্
কে তোরা আজি দিবি রে প্রাণ
দেবীরে দান,
ছিঁড়িয়া অস্ত্র বাঁধিয়া যন্ত্র
তুলিবি তান ;
প্রণয়-শেষ—সুখের লেশ
চির-নির্ব্বাণ
মুক্তকণ্ঠে গাহিবি কবে
জীবন-গান ?
শোভিবে দিক্ লোহিত দৃশ্যে
ছুটিবে রক্ত-গঙ্গা বিশ্বে
টুটিবে ভেদ ধ্বনীতে নিঃস্বে
ঘুচিবে মান্
মিথ্যা ভান্ ;
জাগিবে নিয়ত নিখিল চিত্ত
সত্য প্রাণ,
উষ্ণার ধরা শোণিত স্রোতে—
করিয়া স্নান,
হবে উর্ব্বর—ফলিবে নিত্য
স্বর্ণ-ধান্,
মোহিবে কুসুম-কুঞ্জ পুঞ্জে
বিশ্বখান্।
ধর্ রে কৃপাণ
ধর্ রে কৃপাণ
কাটিয়া হৃদয় কর খান্ খান্
কে তোরা আজিকে শ্রেষ্ঠ রণে
দিবি রে প্রাণ
দেবীরে দান !

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

পরমকল্যাণ গীতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনুষ্য বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া আপনার ও পরমাত্মার স্বরূপ অবগত হইতে চেষ্টা না করে, ততক্ষণ তাহাকে অজ্ঞানাবস্থা জানিবে। যখন মনুষ্য বিবেকযুক্ত হইয়া, নশ্বর ভোগ বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমাত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করে, তখন উহাকে জ্ঞানাবস্থা জানিবে। যখন জীবাত্মা, আপন ও পরমাত্মার একই স্বরূপ বোধ করে, তখন বিজ্ঞানাবস্থা জানিবে। এবং যখন জীব মনে করে যে আমি কি স্বপ্ন, জাগ্রত, সুষুপ্তি, কি অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সকল অবস্থাতে আমিই একমাত্র ছিলাম, অবস্থা হেতু আমার অস্তিত্বের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, এই অবস্থায় জীব আত্মায় পরমাত্মায় অভেদ হইয়া যায়, এই অবস্থাকে তুরীয় অবস্থা জানিবে। এবং যখন পূর্ণরূপে পরমাত্মা বা আমি সর্ব্বাবস্থাতেই যাহা তাহাই থাকি, এই প্রকার ভাব হয়, উহাকে তুরীয়াতীত জানিবে। এই অবস্থায় কর্ত্তা অকর্ত্তা ও ভোক্তাদি ভাব লয় হইয়া কেবলমাত্র পূর্ণপরব্রহ্ম যাহা তাহাই প্রকাশমান থাকেন, কিছুই বলিবার থাকে না ও বলা যায় না। যেমন—

"চলি পুতুলি নুনকে সমুদ্রকে থহলেনে।
আপাপলট আপিহি ভই কৌয়ুন কহেগা বএন॥"

অর্থাৎ একটী নুনের পুতুল আপন কুতূহল চরিতার্থের জন্য সমুদ্রের গভীরতা জানিতে যাইলে উহা লবণাক্ত জলে গলিয়া লবণাক্ত জল হইয়া যায়; তাহার আর পূর্ব্ব শরীরের চিহ্ন মাত্র না থাকায়, সে যেমন আর ফিরিয়া আসিয়া সমুদ্রের মহিমা ও আশ্চর্য্যের বিষয় প্রকাশ করিতে পারে না; সেই প্রকার যখন জীবের পরমাভক্তির উদয় হয়, তখন জীব পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের মনোহর লীলার বিষয় অবগত হইবার জন্য ব্রহ্মসমুদ্রে নিমগ্ন হওয়ায় ব্রহ্মা স্বরূপ হইয়া যান। তখন তিনি এই মনোহর ব্রহ্ম লীলার বিষয়, এবং কর্ত্তা অকর্ত্তার বিষয় কাহাকে কি প্রকাশ করিবেন?

যদিও স্বরূপতঃ তোমরা কর্ত্তা ও ভোক্তা নহ, কারণ প্রত্যক্ষ দেখ, যখন তোমরা স্থূল শরীর ধারণ কর নাই অর্থাৎ জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে কখন কি এই বিচিত্র সৃষ্টিলীলা ও সুখ দুঃখ কর্ত্তা ভোক্তা দেখিয়াছিলে? কাহারও কি মনে আছে যে, তোমরা এবং এই জগৎ কখন কোথা হইতে আসিয়াছে? কিন্তু এক্ষণে প্রত্যক্ষ নানা প্রকার লীলা দেখিতেছ, ইহাতে কাহাকে কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিবে? কিন্তু তথাপি যে সকল ব্যবহারিক কার্য্য—যাহা তোমাদিগের দ্বারা হইতেছে, তোমরা উহার কর্ত্তা ভোক্তা মনে করিলে কোন ক্ষতি নাই এবং মনে করিতে পার এবং সৃষ্টি পালন ও লয় করিবার কর্ত্তা ঈশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিবে। সৃষ্টি করার অর্থ এই প্রকার জানিবে যে, পরমাত্মালীলা অভিপ্রায়ে নানাপ্রকার সাজ সাজিয়া জগৎরূপ বিস্তার হইয়া বিস্তারভাবকে আপন হইতে ভিন্ন বোধ করাইতেছেন, ইহাকে সৃষ্টি বলে। এবং আপনিই ভোগ্য সাজিয়া জগৎকে ভরণ পোষণ ও রক্ষা করাকে পালন করা বলে। এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নানা নাম রূপ গুণ ক্রিয়া আপনাতে অভেদ করিয়া স্বরূপে স্থিত করার নাম লয় করা বলে। স্বরূপে, সৃষ্টি, পালন ও লয়াদি নাই। যেমন, স্বপ্নে সৃষ্টি পালন কর্ত্তা ভোক্তাদি হইয়া থাকে, জাগ্রতাবস্থায় সৃষ্টি পালনকর্ত্তা ভোক্তা ভাব থাকে না এবং সুষুপ্তি অবস্থায় সৃষ্টি-অসৃষ্টি পালন লয়াদি, কর্ত্তা ও অকর্ত্তাদি এই প্রকার জগতের অজ্ঞান, জ্ঞান আদি অবস্থান্তর বুঝিয়া লইবে।

স্বপ্ন ও সৃষ্টির বিষয়।

অনেকে সৃষ্টি পদার্থকে স্বপ্নের পদার্থ হইতে বিশেষ মনে করিয়া থাকেন। ইহা কেবল বুঝিবার প্রভেদ মাত্র, স্বরূপতঃ ইহাতে কোন প্রভেদ নাই। যেমন তোমরা সমস্ত জীবনের সময়ের সহিত পাঁচ দণ্ড স্বপ্নের সময়ের তুলনায় যৎকিঞ্চিৎ বোধ কর, সেই প্রকার অনন্তকালের সহিত তোমাদিগের জীবিত সময়ের তুলনা করিলে ইহাও যৎকিঞ্চিৎ বোধ হইয়া থাকে। যেমন তোমাদিগের জীবিত অবস্থার সময়কে অনেক সময় এবং তাহাতে নানাপ্রকার কার্য্য করিতেছ ও সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছ বোধ কর, সেই প্রকার স্বপ্নাবস্থাতেও ঐপ্রকার অল্প সময়কে অধিক সময় ও নানাপ্রকার কার্য্য সুখ দুঃখাদি বোধ করিয়া থাকে। যেমন, ঈশ্বর মায়াশক্তিরূপে এই জগৎরূপ বিচিত্র লীলার সাজ সাজিয়াছেন, সেইরূপ তোমরাও মনরূপে স্বপ্নের নানা সাজ সাজিয়া থাক। যেমন জাগ্রতাবস্থায় তোমরা এই জগতের বিষয় সত্য সত্যই বোধ করিতেছ, সেই প্রকার স্বপ্নাবস্থাতেও স্বপ্নের বিষয় সমস্তকে সত্য সত্যই বোধ করিয়া থাকি। যেমন জাগ্রত হইলে এক মুহূর্ত্ত মধ্যেই সমস্ত স্বপ্নের ভান হইয়া যায়, সেই প্রকার

পরমাত্মার ইচ্ছায় একমুহূর্ত্তেই তাঁহাতে লয় হইতে পারে ; এই সৃষ্টির বিষয় স্বপ্নাবস্থার বিষয় হইতে প্রভেদ নাই। যেমন সমস্ত স্বপ্নের পদার্থ তোমারই রূপ মাত্র, সেই প্রকার এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড, পরমাত্মারই রূপ মাত্র জানিবে।

ব্রহ্ম মহিমা।—জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর প্রভেদ।

অজ্ঞানাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ ব্রহ্মশক্তির বিষয় অবগত না হইয়া বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বে প্রধান প্রধান ঋষি, মুনি, উলিয়া পীর, পেগম্বর, যীশুখৃষ্ট, অবতার ও পণ্ডিতগণ যে সকল নানা প্রকার শাস্ত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, ঐ সকল শাস্ত্রের উপদেশ কি মিথ্যা বলিব। এবং ঐ সমস্ত মহাত্মাগণ ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল বুঝিয়া সত্য প্রকাশ এবং তাহার প্রাপ্তির যথার্থ পথ-প্রদর্শন করিতে পারেন নাই মনে করিব। যদি সত্য একই হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে এত প্রভেদ কেন ?

বাস্তবিক অজ্ঞানাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের এ প্রকার মনে করা অসম্ভব নহে। কারণ ঐ সকল পুস্তকের মধ্যে—অনেক মত ভেদ দেখা যায়। ইহাতে কাহারও দোষ না দিয়া, উহা ব্রহ্মের মহিমা জানিবে। যেরূপ সামান্য একটী বাজিকর মনুষ্য রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজা পণ্ডিত জ্ঞানী অজ্ঞানী—প্রভৃতি সভাসদ সম্মুখে নানা প্রকার কৌশলে নানা প্রকার বিচিত্র লীলা দেখাইয়া কি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী সকলকে সমভাবে মুগ্ধ করিয়া থাকে, তাহা জ্ঞানীর চক্ষে এক প্রকার এবং অজ্ঞানীর চক্ষে অন্য প্রকার বোধ হয় না। কারণ তাহা হইলে বাজীকরের কৌশল পরিপাটী ও মোহন ক্ষমতা প্রকাশ পাইত না। কি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী উভয়েরই চক্ষুকে সমভাবে মোহিত করাই বাজীকরের মহিমা ও কৌশল। সেইরূপ বাজীকররূপী পরমাত্মা আপন মায়া শক্তি দ্বারা জগতরূপ বিচিত্র লীলা রচনা করিয়া, কি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী, কি মূর্খ কি পণ্ডিত সকলেরই চক্ষে ও অন্তরে সমভাবে নানা প্রকার বিচিত্র লীলা সত্য ও আশ্চর্য্যরূপ বোধ করাইতেছেন। যদি জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েই এই বিচিত্র লীলা সমভাবে আশ্চর্য্য বোধ না করিত অর্থাৎ জগতের সমস্ত বস্তু ভিন্ন ভিন্ন মনে না করিত, তবে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপের মায়াশক্তির ও কৌশলের মহিমা কে স্বীকার করিবে ? জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়কেই সমভাবে বিচিত্র লীলা দেখাইয়া মুগ্ধ করাই পরমাত্মার কৌশল ও মহিমা জানিবেন।

জ্ঞানী, অজ্ঞানী, মূর্খ, পণ্ডিত, ঋষি, মুনি প্রভৃতির মধ্যে এইমাত্র

প্রভেদ জানিবেন যে, যে প্রকার অজ্ঞানী মূর্খ ব্যক্তিগণ বাজিকরের কৌশলের বিষয় অবগত না হইয়া, বিচার ব্যতিরেকেই বিচিত্র লীলাকে সত্য বলিয়া বোধ ও বিশ্বাস করে, কিন্তু জ্ঞানী পণ্ডিতগণ বাজীকরের বিচিত্র লীলা চক্ষে সত্য বলিয়া দর্শন ও বোধ করিয়াও বিচার পূর্ব্বক বাজীকরের কৌশল বুঝিতে পারিয়া, উহার সত্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন অর্থাৎ বাজীকর যে মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা বলিয়া বোধ করাইতেছেন, ঐ কৌশল অবগত হইবার চেষ্টা করেন। সেই প্রকার অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ পরমাত্মার বিচিত্র লীলা ও মহিমার বিষয় অবগত না হইয়া, তাঁহার লীলাকে তাঁহা হইতে পৃথক ও ভিন্ন ভিন্ন নানা প্রকার পদার্থ বোধ করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানবান পণ্ডিত, তাঁহারা পরমাত্মার বিচিত্র লীলা দর্শন ও সত্য সত্য বোধ করিয়াও বুঝেন যে, এই সকল বিচিত্র লীলা—যাহা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থরূপে বোধ হইতেছে, উহা পরমাত্মার কৌশল মাত্র। একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান অনাদিকাল হইতে বিরাজমান থাকিয়া আপন ইচ্ছায় জগৎরূপে বিস্তার হইয়া কৌশলে জগতকে আপন হইতে ভিন্ন ও বিচিত্র বলিয়া বোধ করাইতেছেন। কিন্তু পরমাত্মাই একমাত্র সত্য স্বরূপে বিরাজমান আছেন। জ্ঞানীগণ এই প্রকার বোধ করত তাঁহার বিচিত্র লীলার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া অর্থাৎ উহাতে আসক্ত না হইয়া সত্যেরই অনুসরণ করেন।

বাজীকররূপী জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা অবতার ঋষি, মুনি, পণ্ডিত, জ্ঞানী, অজ্ঞানী প্রভৃতির অন্তরে প্রেরণা করিয়া যাহাকে যেরূপ দেখাইতেছেন, তাহারা সেইরূপ দেখিয়া অবস্থানুসারে নানা প্রকার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কেহ অজ্ঞানাবস্থায়, কেহ জ্ঞানাবস্থায়, কেহ বিজ্ঞানাবস্থায় যিনি যেরূপ বোধ করিয়াছিলেন, তিনি সেই প্রকার প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও সেই সেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের ভাব সত্য বোধ করিতেছেন, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত স্বরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ পরমাত্মার অভেদ হইয়া জগতের কল্যাণ জন্য উপদেশ প্রদান বা সত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই যথার্থ সত্য এবং তাহা অবশ্যই সকল সত্যের সহিত ঐক্য হইবেক, কখনই ভাবের ভেদাভেদ হইবে না ও হইবার সম্ভাবনা নাই। এই প্রকার সারভাব গ্রহণ করিয়া সত্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হউন। (ক্রমশঃ)

শিবনারায়ণ স্বামী।

মুর্শীদাবাদের ইতিহাস। *

এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম সন্তোষলাভ করিলাম। বঙ্গের অদৃষ্টদোষে বঙ্গের একখানিও বিশুদ্ধ ইতিহাস নাই। সাহেবেরা দয়া করিয়া তাঁহাদের ভাষায় যে দু-একখানি বঙ্গের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রকৃত ইতিহাসের জ্ঞাতব্য ঘটনাবলী, আমাদের জাতীয় গৌরবের বিষয় অতি অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেশের দু-একজন শিক্ষিত যুবক সাহেবের সংগৃহীত ইতিহাসের বর্ণে বর্ণে অনুবাদ করিয়া ইতিহাস লেখকের দলে গণ্য হইবার প্রয়াস পাইয়াছেন, দেশের বঙ্গবিদ্যালয় সমূহে তাহাই সাদরে পঠিত হইতেছে, ইহাকে বিড়ম্বনা বলিলে কেহই আমাদিগকে অযথা-বাদী বলিয়া দোষী করিবেন না। কারণ মার্শমান সাহেব তৎপ্রণীত বাঙ্গালা ইতিহাসের প্রথম পুঁক্তিতেই নাট্যশালার নটের ন্যায় নান্দী পাঠ করিয়াছেন, বাঙ্গালার আদিম ইতিহাসে বিষম গোলমাল, অতএব তিনি আদিসুরের রাজত্বকাল হইতেই যথাপ্রাপ্ত ঘটনা অবলম্বনে ইতিহাস আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাও যে সর্ব্বাংশে নির্ভুল, এমন কথা স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হইতে হয়। বিশেষতঃ ইংরাজী ইতিহাস-লেখকদিগের পদ্ধতিই স্বতন্ত্র। অমুক বংশের অমুকের পর অমুক রাজা হইলেন, রাজ্যের জন্য অমুকের সহিত যুদ্ধ হইল, মুসলমান রাজত্বে ভাই ভাই মারামারি কাটাকাটি হইল, পিতৃদ্রোহ, ভ্রাতৃদ্রোহ, গুপ্ত ষড়যন্ত্র, ইত্যাকার নিরস বিবরণ সেই পদ্ধতির সার; স্মরণীয় কীর্ত্তিকলাপাদি বিশেষ ঘটনার প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না; ইতিহাসের নির্ঘণ্ট সে প্রকার অঙ্গহীন থাকা কদাচ প্রার্থনীয় নহে। ঐতিহাসিক চর্চ্চায় এদেশের লোকের আস্থা নাই, এই একটা দুর্জ্জয় অপবাদ আমরা চিরদিন মস্তকে করিয়া বহন করিতেছি, ইহা বড়ই আক্ষেপের কথা!

বাবু নিখিলনাথ রায় মুর্শীদাবাদের ইতিহাসে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন; আলোচনা, গবেষণা, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান, স্থানীয় ঘটনা

* শ্রীযুক্ত বাবু নিখিলনাথ রায় বি, এল প্রণীত, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য আড়াই টাকা।

সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম হইয়াছে, পুস্তক পাঠ করিয়া তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়। প্রস্তাবিত পুস্তকখানি প্রথম খণ্ড; আটপেজি আকারে প্রায় সাতশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; মধ্যে মধ্যে ছত্রিশখানি সুন্দর সুন্দর চিত্র আছে।

এই প্রথম খণ্ডে দ্বাদশটি অধ্যায় আছে। এই দ্বাদশ অধ্যায়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক বিপ্লব, মহারাষ্ট্রীয় অভ্যুদয়, প্রাচীন মুর্শীদাবাদ, হিন্দু ও বৌদ্ধকাল, উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণের আগমন ও কৌলিন্য প্রথা, পাঠান রাজত্বকাল, মোগলরাজত্বকাল, ইয়োরোপীয়দিগের দুর্গ নির্ম্মাণের সূত্রপাত, নবাব মুর্শীদকূলী খাঁ, সুজা উদ্দি মহম্মদ খাঁ আল্লাউদ্দৌলা, সরফরাজ খাঁ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গসাহিত্যের অবস্থা, সংস্কৃত ও ফার্সি আলোচনা, উড়িয়া সাহিত্য ইত্যাদি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনাগুলি এত সহজ ও সুন্দর যে, পাঠ করিবামাত্র মর্ম্মগ্রহ হয়। ইতিহাস লিখিবার ক্ষমতা নিখিল বাবুর বিলক্ষণ আছে। মুর্শীদাবাদের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড দর্শনার্থ আমাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত রহিল। যে প্রণালীতে মুর্শীদাবাদের ইতিহাস লিখিত হইতেছে, এই প্রণালীতে বঙ্গের সমগ্র প্রদেশের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া একখানি পূর্ণাঙ্গ বঙ্গ ইতিহাস লিখিত হইলে ঐতিহাসিক সংস্কারকগণ যথেষ্ট উপকৃত হন, সাধারণের আহ্লাদ ও উৎসাহ পরিবর্দ্ধিত হয়, এ কথা আমরা গৌরব করিয়া বলিতে পারি। মুর্শীদাবাদের ইতিহাসে বাবু নিখিলনাথ যে অসীম পরিশ্রম করিয়াছেন, প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া আমরা বুঝিলাম, তাঁহার সে পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। ইতিহাসের ভাষায় যেরূপ গাম্ভির্য্য থাকা উচিত, ইহাতে তাহা আছে। ভূমিকায় দর্শন করিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম, কাশীমবাজারের বর্ত্তমান মহারাজা শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এতদ্‌গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণের সমস্ত ব্যয় প্রদান করিয়াছেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর উত্তরাধিকারীর উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে।

সমালোচনা।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।—মহর্ষির দুইখানি ছায়া চিত্রের সহিত সংক্ষিপ্ত জীবনী। শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু ইহা সংকলন করিয়াছেন। বাল্যশিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং ধর্ম্মজীবনের কর্ত্তব্য কার্য্যাবলীর আলোচনা এই পুস্তকে সংক্ষেপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্ম্মল চরিত্র যেরূপে বর্ণনা করা উচিত, ঈশান বাবু সম্পূর্ণরূপে সে ভাবে বর্ণনা করিতে বিরত হইয়াছেন। ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, মহর্ষির পূর্ণ জীবনী প্রকাশ করিবার অবসর এখন উপস্থিত হয় নাই। ফলতঃ রাজা রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত পন্থায় বিচরণ করিয়া শ্রীবৃদ্ধি সাধনকল্পে বাবু দেবেন্দ্রনাথ জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, পুস্তক রচনা, সংগীত রচনা, তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন, ব্রাহ্ম সমাজের সহিত ঐ সভার সম্মিলন এবং প্রশান্তভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়াছে, এই কথাগুলি বুঝাইয়া দিতে ঈশান বাবু অবশ্যই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ১৭৩৯ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে বাবু দেবেন্দ্রনাথের জন্ম, এখন শকাব্দা ১৮২৪, মহর্ষির বয়ঃক্রম এক্ষণে ৮৫ বৎসর।

লহরীলীলা।—এখানি গীতিনাট্য। শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, গ্রেট ইডেন প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ॥০ আট আনা। পাঠ করিয়া দেখা গেল, গীতগুলি মন্দ হয় নাই।

আক্কেল সেলামী।—সামাজিক প্রহসন। শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, গ্রেট ইডেন প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য।০ চারি আনা। বুদ্ধির বিভ্রমে অথবা ব্যক্তিক্রমে যাঁহারা কৃতকার্য্যের বিপরীত ফল প্রাপ্ত হন, ব্যঙ্গছলে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রহসনখানি লেখা হইয়াছে। "আক্কেল সেলামী" পাঠ করিয়া অনেকের আক্কেল পাইবার আশা আছে। রঙ্গালয়ে অভিনয় হইলে মন্দ হইবে না।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।)

১১শ বর্ষ। } জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ সাল। { ১১শ সংখ্যা।

পরম কল্যাণ গীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

জীব ও ব্রহ্মের জ্ঞান, অজ্ঞানবিষয়।

অজ্ঞানাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ মনে করিতে পারেন, যখন একমাত্র পূর্ণপর-ব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন এবং সকলই পরব্রহ্মের স্বরূপ, তখন ব্রহ্মজ্ঞানময় জীব অজ্ঞানাচ্ছন্ন কেন? কেনই বা ব্রহ্মে সর্ব্বশক্তি এবং জীবে অল্পাধিকা শক্তি দেখা যায়।

এ স্থলে স্বপ্নাবস্থা জীবভাবকে ও জাগ্রতাবস্থাকে ব্রহ্মভাবে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে সহজে বুঝা যায়। যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিই—ব্যক্তিগত এক হইলেও স্বপ্নাদি অবস্থান্তরে জ্ঞান অজ্ঞান ও শক্তির প্রভেদ হয়, সেই প্রকার জীব ও ব্রহ্মের জ্ঞান অজ্ঞান ও শক্তি বিষয়ের প্রভেদ জানিবে। যেমন স্বপ্নাবস্থায় ব্যক্তিগণ ক্ষণস্থায়ী কাল্পনিক বিষয়াসক্ত হইয়া তমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে এবং জাগ্রতাবস্থায় জ্ঞানরূপে প্রকাশ হয়, সেই প্রকার জীব অনিত্য জগতের ভোগে আসক্ত হইয়া শক্তিহীন অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া আছেন এবং পূর্ণপরব্রহ্ম জাগ্রতরূপ জ্ঞানময় ও সর্ব্বশক্তিরূপে সর্ব্বত্র প্রকাশ রহিয়াছেন। নচেৎ বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নাই। যথা—

পাশবদ্ধ ভবেৎ জীব।
পাশমুক্ত সদা শীব॥

অর্থাৎ অজ্ঞান আচ্ছন্ন থাকায়, আত্মাকে জীব এবং জ্ঞানরূপ প্রকাশ থাকায়, শিব বলা হয়।

মৃত্যু, আহার ও সুখ দুঃখ বিবরণ।

কেহ কেহ ইহা বলিয়া থাকেন, পূর্ণ পরব্রহ্ম এক হইলে—একজন ব্যক্তির মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু, আহারে আহার, ও সুখ দুঃখে—সুখী এবং দুঃখী হওয়া সম্ভব ছিল—কিন্তু তাহা হয় না কেন? এ স্থলে বিচার করিয়া দেখ, একমাত্র পরমাত্মা সূর্য্যনারায়ণ আকাশে রহিয়াছেন। ইহা হইতে আতুষী কাচের সাহায্যে অগ্নি বাহির করিয়া কোটী কোটী প্রদীপ জ্বালিয়া লউন, তাহা হইলে অগ্নি বা সূর্য্যনারায়ণ এক হইলেও প্রদীপজ্যোতিঃ ভিন্ন ভিন্ন কোটী কোটী বোধ হইবে ও ভিন্ন ভাবে কার্য্য হইবে। উহার একটিকে নির্ব্বাণ করিলে সকলগুলি নির্ব্বাণ এবং একটীতে তৈল ও শলিতা প্রদান করিলে, সকলগুলির পোষণ কিংম্বা একটীতে জলের ছিটা দিলে সকলগুলি পট পট (দুঃখভোগ) করে না। সেই প্রকার পরমাত্মা পূর্ণরূপে একমাত্র হইলেও জীবত্মারূপে বহুধা বিস্তার হওয়ায় এবং প্রত্যেক জীবাত্মাকে ভিন্নভাব প্রদান করায়, একজনের মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু, একজনের আহারে সকলের পুষ্টিসাধন এবং একজনের সুখ দুঃখে সকলের সুখ দুঃখ হয় না।

(ক্রমশঃ)

শিবনারায়ণ স্বামী।

যাহা চাই, তাহা কই?

আজ বিংশ শতাব্দী—সভ্যতার উষালোকে জগত আজ উদ্ভাসিত। জ্ঞান, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প এবং সাহিত্যে মানব এখন অতি উন্নতির মহা শৈলে আরোহণ করিয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে এই সভ্যতালোক অতি দীপ্তশীল। এক সময় যে গৌরবরবি ভারতের পূর্ব্বগগনে উজ্জ্বলালোকে দীপ্ত পাইত, তাহা বর্ত্তমান সময়ের সভ্য জাতীগণ সর্ব্ববাদীভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন;—কিন্তু কালের ভীম নিস্পেষণে আজ তাহা অনন্ত সাগর জলে চির নিমজ্জিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ভাগ্যে করুণাময় হরি সুসভ্য ইংরেজ করে ভারত-ভাগ্যচক্র পরিচালনের ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন, তাই আমরা আবার লুপ্ত গৌরব পুনারাধিকার করিতেছি।

বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস আলোচনার সঙ্গে আমাদের তুলনা করিলে দেখিতে পাই যে, এই কোটি কোটি ভারতবাসী একত্রিত

হইয়া আবার মানবের প্রকৃত মানবত্ব লাভের জন্য বড় উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। এই ঐকান্তিক ব্যগ্রতার মহাফল আমাদের "ন্যাশেনাল কংগ্রেস"। কিন্তু জাতীয় মহাসভা যদি এই দীর্ঘ ১২।১৩ বর্ষ পর্য্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত পরিচালিত হইত, তাহা হইলে আজ পুনর্ব্বার ভারতীয় লুপ্ত-গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া সভ্যতার অভিধানে পরিপূর্ণরূপে পরিচালিত হইতে পারিতাম।

আজ ১২।১৩ বর্ষ পর্য্যন্ত আমরা কত রাশী রাশী অর্থ, পরিশ্রম, আন্দোলন, আয়োজন, বক্তৃতা করিয়া আসিতেছি—কিন্তু কার্য্যের মধ্যে কি হইতেছে? ভাবিয়া দেখিলে আমাদের জাতীয় মহাসভা বরং আমাদের ভাবী উন্নতির মহা অন্তরায়। কংগ্রেসের গুণে আমরা কোথায় মনুষ্যত্ব পাইব—সভ্য জাতীর নিকট সভ্য বলিয়া প্রণয়ের পাত্র হইব, তা না হইয়া বিপরীত গুণ লাভ করিতেছি। ইংরেজ জাতীর বিদ্বেষ আর কুটিল রাজনীতির মহা আকর্ষণে আজ আমরা এই কোটি কোটি ভারতবাসী নিগৃহীত। ইংরেজ রাজা, তাঁহারা আমাদিগকে রাজদ্রোহী বলিয়া বুঝিলে আমাদের ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ অনিষ্ট;—ফলেও তাহাই হইতেছে। তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে, কংগ্রেস আমাদের পূর্ব্বের সেই একপ্রাণতা রূপ মহাধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছে। এই ভারতীয় মানব সমূহ জাতীয় মহাসভার নিকট যতদূর আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছে, তাহার একটিও যদি এই ১২।১৩ বর্ষের মহা সভা দ্বারা নিস্পন্ন হইত, তাহা হইলে শ্লাঘা জ্ঞান করিতে পারিত।

আমরা জানি, আমাদের সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে যতই কেন আশ্বাসের অমিয়মাখা বাক্য শ্রবণ করান না কেন, রাজনীতির উষরক্ষেত্রে ততটা চলিতে দিবেন না। জেতা-জেতৃ সম্বন্ধ চির উচ্চ নীচভাব। যাহারা মস্তকের ঘর্ম্ম পায়ে ফেলিয়া অতিকষ্টে অতিকৃচ্ছে এই অখণ্ড ভারতকে আমাদের ভারতীয় গৌরবের একটি মহা কেন্দ্রস্থান বলিয়া জ্ঞান করিতে-ছেন, তাঁহারা কি জীত জাতীকে দেশ-শাসনের মহাভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? সুসভ্য ইংরেজরাজ আমাদের যতটা সুখ-স্বচ্ছন্দতা দিয়া আপনাদিগের পার্থিব সুখের পরিচালনা করিতেছেন, তাহাই তাহাদের পূর্ণ করুন। ইহা ব্যতীত আমাদের আর অতিরিক্ত আশা করা বাতুলতা মাত্র। আমাদের জাতীয় মহাসভা যদি এতদিন রাজনীতির কঠোর ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে চেষ্টা না করিয়া সামাজিক শিক্ষায় মন দিয়া জাতীয়তা পথে হাঁটিতে যত্ন করিতেন, তবে নিশ্চয়ই আমরা এই দীর্ঘ

১২।১৩ বর্ষের মধ্যে জগতের অপর সভ্য জাতীর আদর্শে একটি মহা জাতী হইয়া জাতীয়তা লাভ করিতে পারিতাম এবং পরিশেষে চিরবাঞ্ছিত রাজনীতি কৌশলও লাভ করিতে পারিতাম। ভারতের সমস্ত অভাব বিনষ্ট হইয়া উন্নতির পথ প্রশস্ত হইত;—তাহা না হইয়া কেবল "আশায় বান্ধিয়া বুক, কিবা উত্তর কিবা পুব" হইয়া যাইতেছি।

এ কথা স্বীকার্য্য যে, রাজা কংগ্রেসের গুণেই আমাদের অনেক বিষয় স্নেহদৃষ্টি করিতেছেন—কিন্তু একটা কথা আছে—আমাদের মতে অগ্রে ঘরের বান্ধ দৃঢ় করিয়া পরে বেড়ার বান্ধন শক্ত করা উচিত।

ধরুন না কেন—এই যে দিন দিন ভারতীয় ব্রাহ্মণজাতীর উচ্ছেদ হইয়া যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশেরও মহা অনিষ্ট হইতেছে এবং কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির অভাবে শস্যশ্যামলা ভারত যে দুর্ভিক্ষরাক্ষসীর তাণ্ডব নৃত্যে পিশাচের আবাসভূমি হইয়া উঠিতেছে, ইহার উপায় কে করিবে? আমরা এখন সকল বল, সকল কল, এবং সকল কার্য্যই রাজার স্কন্ধে চাপাইতে চাহি। কি পরিতাপের কথা, তাহা হইলে আমাদের মনুষ্যত্ব কি? রাজা রাজদণ্ড পরিচালক, তাই কি তাঁহার প্রজার বস্ত্রখানি বুনিয়া পর্য্যন্ত দিতে হইবে? রাজশক্তির সাহায্য লও, আপনারা কার্য্য কর। তবেই সভ্য মানব মধ্যে দাঁড়াইতে পারিবে।

আর এক কথা—আমরা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পরাধীনাবস্থায় অজ্ঞানের ভীমতামসী আবরণে প্রকৃত মনুষ্যত্বটুকু অনেক দিন হারাইয়া ফেলিয়াছি। লোকের আচার লুপ্ত মানবীয়তা শিখিতে হইলে আমাদিগকে এইক্ষণ সভ্যদেশীয় সেই ব্যবহার, রীতি নীতি, কার্য্য কৌশল পূর্ণরূপে শিক্ষা করিতে হইবে এবং সভ্যদেশের কার্য্যকরণীশক্তি শিক্ষা করিয়া হৃদয়কে উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে হইবে। এই সকল শিক্ষা যাহাতে অবাধে হইতে পারে, তাহা না করিয়া অগ্রেই "এক কান্দি"।

প্রথম ধরুন, ভারতীয় ব্রাহ্মণ,—এই ব্রাহ্মণ প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে না পারিলে, অথবা যাহা মুষ্টিমেয় আছে, উহার কুনিয়ম, কুআচার, কুব্যবহার, কুসংস্কার দূর করিতে না পারিলে, ভারত কখনো উন্নত হইতে পারিবেন না। এই সভ্যতার দিনেও ভারতীয় ব্রাহ্মণ ভারতের উন্নতির কেন্দ্রস্থান। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণবংশ প্রায় নির্ব্বংশ হইয়া উঠিল। বিগত আদমসুমারীতে বঙ্গের লোক গণনা তালিকায় যে হিন্দু জাতীর সংখ্যা ২০,৭০,৭৫,২২৭ জন

ধার্য্য হইয়াছে, উহার মধ্যে ব্রাহ্মণভাগ মোটের উপর অষ্টমাংশ। কৌলিন্যের অযথা অভিমান, মেলবদ্ধতা, কন্যাবিক্রয়, আর রাঢ়ি বারেন্দ্র বৈদিক ভেদজ্ঞান এবং ব্রাহ্মণেতর জাতীর প্রতি অযথা বর্ণ বৈষম্যতা দ্বারা ও প্রকৃত শাস্ত্র শিক্ষার অভাব দ্বারাই ব্রাহ্মণ জাতীর এত হীনাবস্থা।

প্রথমতঃ ধরুন, বল্লালি কৌলিন্য যেভাবে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, অধুনা উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া "নবধাকুল লক্ষণের" পরিবর্ত্তে আমি বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান—উনি ফুলে মেল, ইনি নৈকশ, উনি ভঙ্গ ইত্যাদি মূর্খতার আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া "নৈকশ মহাশয় "ক" উচ্চারণ করিতে "চ" বলেন। আবার হয় ত সমস্ত রাত্রি মদ্যপানে বেশ্যার সঙ্গে অখাদ্য ভোজনে সিদ্ধপুরুষ মহাশয় পিতামাতার মাথায় "বাঞ্ছারাম" লাঠি আঘাত করিতে পশ্চাদ্-পদ নন—এইরূপ ব্যক্তির গৃহে স্ত্রীর হাট বসিয়াছে—অথচ ঐ যে শ্রোত্রিয়, কি বংশজ পুত্রটি অতি শিক্ষিত, সদাচার সম্পন্ন, বিনয়ী, উহার গৃহে ললনার পরিবর্ত্তে আরসুলা উড়িতেছে।

আবার কুলিনগণের "মেল" হইতেছে, আর একরূপ সর্ব্বধ্বংশী অবলা-পীড়ক বিষম প্রথা। ফুলিয়া মেলের যুবকটি এম-এ, পাশ করিয়াছে, মাসিক ৫০০৲ শত টাকা উপার্জ্জন করিতেছে, দেশের মধ্যে দশজনে বেশ উত্তমরূপ চিনে জানে; এরূপ পাত্র রাখিয়া আমি "খড়দহ মেল" আমার একমাত্র কিশোরী কন্যাটিকে একটি অতি নিরেট মূর্খ, পরপ্রত্যাশী খড়দহ মেলের বৃদ্ধের সঙ্গে পরিণীতা করিলাম। আবার অধিকাংশস্থলে স্বমেলের অভাবে কন্যার বিবাহ দিতে না পারিয়া, ব্যভিচারের আবরণে ভ্রূণহত্যা করিতে বসিলাম। মেলবদ্ধতা এমনিই ভয়ানক জিনিষ।

ইহার পর আবার আর এক কথা আছে, আমার চৌদ্দপুরুষ কুলিনে কন্যা দিয়া আসিতেছে, আমি না দিলে আমার মর্য্যাদা থাকে না, কাজেই হয়ত একটি গণ্ডমূর্খ গেঁজেলে মাতালের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিলাম, অথবা বিবাহ ব্যবসায়ী কুলিনকুমারের হাতে কন্যা অর্পণ করিয়া আজীবন কন্যার সঙ্গে, কন্যার পুত্রকন্যার পর্য্যন্ত ঘরবাড়ী প্রস্তুত করিতে বসিলাম, দারিদ্র্য-রাক্ষসী আমারে গ্রাস করিয়া বসিল। একমাত্র কন্যাই আমার ঘোর দরিদ্রতার মূল হইল। অথচ ঐ যে শ্রোত্রীয় বংশজের বি-এ উপাধিধারী বিষয় সম্পত্তিশালী যুবকটি অবিবাহিত থাকা অনুচিত বিধায়, একটি পাচক ব্রাহ্মণের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া মহাসুখে গৃহস্থালী করিতেছে—যাহা

দেখিয়া আমার ভূধণপ্রিয়া বস্ত্রবিহীন কন্যাটি মুখ কালি করিয়া শুকাইয়া যাইতেছে, তাহার সহিত বিবাহ দিতে পারিলাম না।

ইত্যাদি রূপ কৌলিন্য দোষদুষ্ট বিবাহপদ্ধতি দ্বারা ব্রাহ্মণবংশ অধঃপতিত, উচ্ছিন্ন এবং বিনষ্টপ্রায় কিনা, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়। এই কুপ্রথা দ্বারা ব্রাহ্মণবংশ উৎসন্ন এবং দেশের সার্ব্বজনীন দরিদ্রতা উপস্থিত হয় কিনা, এই চিন্তা কি আমাদের জাতীয় মহাসভা ক্ষণকাল চিন্তা করিতে পারেন না? শাস্ত্রসিদ্ধ কৌলিন্য স্থির রাখিয়া মেলবদ্ধতা ভঙ্গ করিয়া ব্রাহ্মণ জাতীর উন্নতি যদি কংগ্রেস এতদিন করিতে পারিতেন, তবে ভাবিতাম যে, ইহা প্রকৃতই আমাদের "জাতীয় সভা"।

তাহার পর কন্যা-বিক্রয়।—এই অতি অনিষ্টকর ব্রাহ্মণবংশ নির্ব্বংশপ্রথা অদ্যাপিও এই পূর্ণ সভ্যতার সান্ধ্যকিরণ রাগরঞ্জিত সময়েও ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রচলিত আছে। এই অর্থশোষক ঘৃণিত ব্যবসা দ্বারা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বংশ প্রায় নির্ব্বংশ হইয়া উঠিল। অনেকানেক হস্তী মূর্খ কেবল কন্যা বিক্রয় করিয়া ২।১ বর্ষ—অতি ধুমধামের সঙ্গে গৃহস্থালী করিয়া পরিশেষে অমিত-ব্যয়িতার গুণে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। কন্যা তো অগ্রেই ভিক্ষুকের হাতে গিয়া পড়ে। কন্যাবিক্রয়প্রথা দ্বারা অনেক ব্রাহ্মণবংশ নিরন্ন হইয়াছে, আবার অন্য পক্ষে অনেক বংশ আজীবন উদ্‌বাহতত্ত্বে ধারও ধারিতে পারেন না। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ একেত ব্রহ্মোত্তরভোগী, অলসপ্রকৃতি, সামান্য সংস্কৃতাভাস শিক্ষিত-জাযক প্রকৃতির গুরুপুরোহিত ব্যবসায়ী—পরপ্রত্যাশী নিরন্নজাতী, তাহাতে পণ দ্বারা বিবাহ করিয়া স্থানবিশেষে দরিদ্র, স্থান বিশেষে অমিতাচারী, স্থান বিশেষে অর্থভাবে সর্ব্বস্বান্তকারী দরিদ্র। এইরূপ ভাবের অবস্থাই ব্রাহ্মণ জাতিতে সংক্রামিত হইয়া আছে। নিম্নবর্ণের হিন্দুর মধ্যেও এই মহৎ বিঘ্নকর বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে।

আমরা জানি, এই সমাজ বিধ্বংশী প্রথার দ্বারা অনেক গণ্য মান্য বংশের পুত্রের বিবাহ হয় না অথচ রাধুনীর পুত্র মিঠাইওয়ালার বংশধর এবং পূজক ব্রাহ্মণের কুমার দাম্পত্য-সুখে সুখী। কন্যা বিক্রয়ী অর্থ লোভে সুকুমারী কন্যাকে হয়ত অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠী, বৃদ্ধ এমনটী মৃতদার অশীতপর বৃদ্ধের হস্তে অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত নয়। ইহাদের সর্ব্বস্ব ধন টাকা, বর দেখা নাই—ঘর দেখা নাই—কেবল টাকা—টাকা টাকা। অদ্যাপিও একটি একটি কন্যার পণ প্রকৃতই "নয়শ রূপিয়া" আছে।

আজকাল সভ্যতার খাতিরে আর একরূপ কন্যা বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে। ইহাকে "টিট্" নেওয়া কহে। বয়স্থা কন্যার পিতা অথবা পূর্ব্বের বেচাল প্রকৃতির আধুনিক সভ্যতার অভিযানে পরিচালিত কন্যাকর্ত্তাগণ বরপক্ষের নিকট হইতে বিবাহের ব্যয় বলিয়া প্রায় কন্যাবিক্রয়ীর ন্যায় টাকা লইয়া থাকেন, ইহাতে সমাজের আরো মহা কু-প্রথার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এই কু-নিয়মে অনেক মধ্যবিৎ প্রকৃতির ব্রাহ্মণ বংশ অবিবাহিতাবস্থায় বংশের জলপিণ্ডের সংস্থান না করিতে পারিয়া নির্ব্বংশ হইয়া যাইতেছে।

যদি এই প্রথমটিকে ব্রাহ্মণজাতীর সামাজিকতার মূল হইতে উঠাইয়া দিয়া আমাদের জাতীয় মহাসভা, নামের মহত্ত্ব রাখিতে পারিতেন, তবে বুঝিতাম যে, ন্যাশেনাল নাম স্বার্থক। যদি এই ঘৃণিত প্রথা উঠিয়া যায়, অথচ বৈদ্য ও কায়স্থের ন্যায় "দেখ পাশ খোল বাস" না হইয়া উঠে, তবে ব্রাহ্মণ বংশ নির্ব্বংশ হয় না। সুখের কথা যে, ভগবানের করুণাগুণে অদ্যাপি ভারতের শীর্ষস্থানীয় ধর্ম্মশিক্ষক ব্রাহ্মণজাতীর মধ্যে বিবাহে বি-এ, এম-এ, কুল পূর্ণরূপ উঠিতে পারে নাই। তবে বর্ত্তমান কালের আয় অপেক্ষা ব্যয়াধিক্যের গুণে ভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজ স্বাধীন উপার্জ্জনক্ষম বর অনুসন্ধান করিতেছেন—কিন্তু এক কন্যার জন্য অদ্যাপিও ব্রাহ্মণ পিতার ঘর বাড়ী বন্ধক পড়িতেছে না। ভই বিষয়ে কায়স্থ এবং বৈদ্যজাতী বড় মাত্রা ছাড়িয়া উঠিয়াছেন।

এখন ধরুন—কন্যা বিক্রয় প্রথাদ্বার, ব্রাহ্মণজাতীর যে অধঃগতি হইতেছে, উহা নিবারণ করিতে পারিলে ব্রাহ্মণরক্ষার সঙ্গে অখণ্ড ভারতের উপকার করা হয় কি না? যে দেশ ভিন্ন ভিন্ন জাতির বাসভূমি, সে দেশের একটি মহাজাতীর রক্ষা করিতে পারিলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যজাতীর উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। সমাজের মধ্যে এক জাতীর উন্নতি হইলে অপর জাতী সেই আদর্শ লইয়া অবশ্য চলিতে বাধ্য। ধরিতে হইলে এই ভারত ব্রাহ্মণজাতীর লীলাস্থলী। ব্রাহ্মণ উন্নত হইলে ভারত উন্নত—ব্রাহ্মণের অবনতিতে ভারত অধঃপতিত।

তাহার পর রাঢ়ি বারেন্দ্র বৈদিক প্রভেদ এই আবার এক ব্রাহ্মণ সংহারের মহা প্রতিবন্ধক বাধা। কান্যকুব্জ হইতে আনিত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানই এখনকার বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের গোষ্ঠিপতি। ভারতের অপর দেশীয় ব্রাহ্মণজাতীর মধ্যে এত রূপ বিঘ্ন বাধা নাই। যত আড়ি—যত বাড়ী সমস্তই বঙ্গদেশে। তাই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যস্থ কোন এক উচ্চ বংশজাত

এই লেখক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের আমূল পরিবর্ত্তন মানসে জাতীয় মহাসভার নিকট পরিবর্ত্তনপ্রার্থী।

বঙ্গের ব্রাহ্মণরক্ত কণোজ ভূমীর। রাঢ়ি. বারেন্দ্রের মূল শোণিত একি হৃদয় হইতে সঞ্জাত, কেবল বঙ্গের প্রদেশ বিশেষের বসতি নির্ণয়ের চিহ্নে ইহারা চিহ্নিত। আচার অনুষ্ঠান ক্রিয়াকাণ্ড সমস্তই এক কেবলমাত্র দেশ ভেদে আর সমাজের তৎকালিকের—আচার ভেদে রাঢ়ি বারেন্দ্র নাম। এই দুই মহাব্রাহ্মণ শ্রেণীর আদান প্রদান হইলে কাহারো ব্রাহ্মণত্বের বিঘ্ন হয় না—জাতীয়তাও বিন্দুমাত্র ব্রাহ্মণেতর জাতীর নিকট লাঘব হয় না। বৈদিক শ্রেণী এই দুই ব্রাহ্মণ শাখার সঙ্গে আপাততঃ দৃষ্টিতে কিছু ভিন্ন বটে কিন্তু ক্রিয়াকাণ্ড ইত্যাদিতে ইহাদের সঙ্গেও উপরোক্ত শ্রেণীদ্বয়ের পার্থক্য নাই। তবে কেন যে এই বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ অধঃপাতের যুগে শ্রেণীত্রয় পরস্পর আদান প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণ বংশ রক্ষা করিতেছেন না—বুঝিতে পারি না। কেহ কাহারো অন্ন খাইলে হানি নাই অথচ একটা মহা কু-নিয়মের বাধ্য হইয়া ব্রাহ্মণগণ দিন দিন ক্ষয় হইতেছেন—লক্ষ লক্ষ অসুবিধা লইয়া পুত্র কন্যার বিবাহ ব্যাপারে একেবারে হিম্ সিম্ খাইতেছেন অথচ কুসংস্কার ছাড়িয়া এক হইতেছেন না। এই সমস্ত কুনিয়ম দূর করিতে বর্ত্তমান-কালের কোন প্রতিভাবান্ ব্যক্তি প্রস্তুত নহেন। অথচ যাহা হিন্দুজাতীর হিন্দু আনিঢ় বিঘ্নকর, সেই সকল নিয়ম প্রচলিত করিতে গবর্ণমেণ্ট সহিত নব্য শিক্ষিতগণ বড় ব্যগ্র।

যাহা শত চেষ্টায় কখনো হিন্দুজাতী থাকিতে হইবে না—সেই বিধবা বিবাহ আর বাল্য বিবাহের ছুতা এবং গর্ভধান সংস্কার লইয়া কত মাথা কোটাকুটি হইতেছে। বিদ্যাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া নব ব্রাহ্মণদল সহিত মায় যশোহরের জমীদার রাজা প্রমথভূষণ পর্য্যন্ত কত লোকে বিধবার বিবাহ লইয়া আন্দোলন করিতে ছাড়েন নাই—কিন্তু কোন শক্তিধর ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণজাতীর উপরোক্ত কুনিয়মগুলির বিরুদ্ধে দেশময় একটী আন্দোলন তুলিয়া সভা সমিতি দ্বারা এই "জাতীয় মহাসভার" সাহায্য লইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এতদিন কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

ভূর্লোকে।

ঈশ্বর কে, তাহা আমরা জানি না। ঈশ্বর কিরূপ, তাহার কিছু আভাস ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়। যিনি প্রকাশমান্ ও অতি সমীপবর্ত্তী, যাঁহাতে পশু পক্ষী মনুষ্যাদি ও নিমেষাদি ক্রিয়াবান্ সমস্ত পদার্থ অবস্থিত, তিনিই ব্রহ্ম। যিনি দীপ্তিমান্, যিনি অণু হইতেও অণুতর, যিনি সাধারণ লোকের জ্ঞানাতীত, যাঁহাতে ভূরাদি লোক ও তত্তৎবাসী সমূহ নিহিত সেই অক্ষয় পদার্থই ব্রহ্ম। যাঁহারা আত্মাকে জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই সেই সর্ব্ব প্রকাশক সূর্য্যাদিরও প্রকাশক ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। তিনি অগ্রে পশ্চাতে, দক্ষিণে, উত্তরে, ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তাঁহার ধারণা করা আমাদিগের মত জীবের ক্ষমতার অতীত। যখন তিনি আপনাকে সীমাবদ্ধ করেন, তখনি তাঁহার লীলা, ক্রিয়া-কলাপ ও মহিমার কিয়দংশ বুঝিতে পারি। অপূর্ণ পূর্ণের ধারণা করিতে পারে না; আমরা অপূর্ণ, আমাদিগের মত জীবের পক্ষে সেই জ্ঞানাতীত অক্ষয় নিরাকার পরব্রহ্ম আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত নহে। জগতে তাঁহার যতটুকু অভিব্যক্তি, ততটুকু হইতেই আমরা তাঁহার লীলা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

যাঁহা হইতে জগৎ প্রসূত হয়, তিনি সেই পরব্রহ্মই বটেন, কিন্তু তখন তিনি আর নির্গুণ নহেন, তখন তিনি ত্রিগুণময় বা সগুণ, তখন তিনি আপনাকে সীমাবদ্ধ করেন। জগৎসৃষ্টির কারণ কি, তাহা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারি। সকল জীবের নিখিল কর্ম্ম উপভোগে ক্ষীণ হইয়া গেলে, জগৎ স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সেই ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়। তাহা প্রলয়াবস্থায়, কিছুকাল থাকিবার পর, যখন প্রাণিদিগের সকামকর্ম্ম সকল ফলোন্মুখ হয়, তখন সেই পরব্রহ্ম হইতে মায়া ও পুরুষের আবির্ভাব হয়। তাহার পর বিন্দুরূপে ত্রিগুণ বিশিষ্ট অব্যক্ত আবির্ভূত হন। এই বিন্দুর যে অংশ চিৎ, তাহা বীজ, আর যে অংশ চিৎ ও অচিৎ উভয় মিশ্রিত, তাহা নাদ। যাহা শব্দ ও অর্থ এই উভয় সংস্কাররূপ অবিদ্যা, তাহাই সেই বিন্দুর অচিদংশ। এই বিন্দুরূপী পদার্থের নাম শব্দব্রহ্ম। এই শব্দব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। সেই ঈশ্বরই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। এই নিখিল জড়পদার্থ তাঁহা হইতেই, ইহার শক্তি সকল তাঁহারই জীবনস্রোত, তিনি প্রতি পরমাণুতে অবস্থিত, তিনি সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বপালক ও সর্ব্বোন্নতি

বিধায়ক, তিনিই ইহার আদি, তিনিই ইহার অন্ত। তিনিই ইহার কেন্দ্র, তিনিই ইহার পরিধি। তিনি সর্ব্ববস্তুতে ও সর্ব্ববস্তু তাঁহাতে। ইহার অধিক আর কিছু বুঝিবার বা বুঝাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

শাস্ত্রপাঠে তাঁহার ত্রিবিধরূপের কথা জানা যায়।—(১) মূলসত্তা (২) প্রাণরূপ, চিৎ-জড়, ধনঋণ, মাতা-পিতা অথবা প্রকৃতি-পুরুষ এই দ্বৈতভাব, (৩) মহৎ। এই মহতে সকল পদার্থ মূলরূপে অবস্থিত, এই মহতই সকল জীবের আদি কারণ। জগতের ক্রমোন্নতিকালে যাহা কিছু প্রসূত ও পরিপুষ্ট হইবে, মহতে সে সকলই মূলরূপে স্থিত। এ সকল অতীত জগতের পরিণাম ও ভাবী জগতের বীজস্বরূপ।

প্রত্যেক জগৎ পরিবর্ত্তনের মূর্ত্তি, প্রতি জগৎ ক্রিয়াশীল। যাহা অপূর্ণ, তাহা ক্রিয়াশীল, অতএব জগৎও অপূর্ণ। সুতরাং জগতের চিৎ এবং ভূতও (Spirit and matter) পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু মূল চৈতন্য ও জড় বা পুরুষ ও মূলপ্রকৃতি অনাদি অনন্ত। মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরের স্বেচ্ছাকৃত আবরণী।

অভিব্যক্তির নিমিত্ত ঈশ্বর এই জাল গ্রহণ করেন। ইহা দ্বারাই জগৎ কর্ম্মশীল। এই মায়া হইতেই তিনি তাঁহার জগৎ বিবর্ত্তিত করেন, এবং আপনি তাহা বশীভূত করিয়া বিদ্যমান্।

ঈশ্বরের অতিবেগবিশিষ্ট ঘূর্ণিত শক্তি দ্বারা মূল প্রকৃতিতে ক্ষুদ্রতম গোলক সকল বিঘাত হয়; তাহাই আদি পরমাণু। এই সকল পরমাণু ও তাহাদের সমষ্টি জগন্ময় ব্যাপ্ত থাকিয়া, জগতর ভূরাদি সপ্তলোকের মধ্যে উচ্চতম বিভাগের চিৎ ও ভূতের উপবিভাগ (Sub-divisions) সৃষ্টি করে। এই অসংখ্য পরমাণুপুঞ্জের কতকগুলি ঘুরিতে ঘুরিতে যখন ঘন হইতে থাকে, তখন সেই ঘনায়তন পরমাণুগুলির আবর্ত্তভাব (Vortex) সপ্তম লোকের ঘনিষ্ঠ পরমাণু সমষ্টিমধ্যে আবদ্ধ হইয়া ষষ্ঠ লোকের সূক্ষ্ম পরমাণু পুঞ্জের সৃষ্টি করে। এইরূপে ষষ্ঠ লোকের পরমাণু পুঞ্জের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরমাণুগুলির আবর্ত্তনে পঞ্চমলোকের সূক্ষ্ম পরমাণু হয়; পঞ্চমলোকের ঘনিষ্ঠ পরমাণু পুঞ্জের আবর্ত্তনে চতুর্থ লোকের, চতুর্থের ঘনিষ্ঠ পরমাণুর আবর্ত্তনে তৃতীয়ের, তৃতীয়ের ঘনিষ্ঠ পরমাণুর আবর্ত্তনে দ্বিতীয়ের এবং দ্বিতীয়ের ঘনিষ্ঠ পরমাণুর আবর্ত্তনে প্রথমলোকের সূক্ষ্মপরমাণু পুঞ্জের সৃষ্টি করিয়া প্রতিলোকের চিৎ ও ভূতের উপবিভাগ সকল গঠিত করে।

জগতে কোন ভূতই প্রকৃত "জড়" নহে, অণু হইতে মহৎ পর্য্যন্ত সকল বস্তুই সজীব। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে;—

"ক্ব দেহো ভৌতিকোঽনাত্মা ক্ব চাত্মা প্রকৃতেঃ পরঃ।" বিজ্ঞানও তাহাই বলে। যেখানে শক্তি, সেখানেই ভূত, যেখানে ভূত, সেখানেই শক্তি। জগতের প্রলয় পর্য্যন্ত এই দুইকে কোনরূপে পৃথক্ করা যায় না। ভূতই রূপ, এমন রূপ নাই, যাহাতে প্রাণ নাই। চিতই প্রাণ; এমন প্রাণ নাই, যাহা রূপগত নহে। এমন কি, পরব্রহ্ম যখন মায়াশক্তি দ্বারা বিবিধ জগদাকারে বিবর্ত্তিত হন, তখন জগতই তাঁহার রূপ।

এই চিতসম্বিৎ প্রতি বস্তুতে ও ভূরাদি প্রতি লোকের চিৎ ও ভূতে বিদ্যমান্ বলিয়া, এবং প্রতিলোকের উপাদান সমূহের দেহ ও প্রাণ অথবা যন্ত্র ও শক্তি তন্নবস্থায় বিদ্যমান বলিয়া—এই দুই কারণেই ক্রমোন্নতির নিশ্চয়তা হয়, এই দুই কারণে ক্ষুদ্রতম কণা উচ্চতম জীবে পরিণত হয়। আগষ্ট কোম্‌ত বলিয়াছেন;—

"The order of nature necessarily contains within itself the germ of all possible progress. Progress···may be looked upon as order made manifest. *

উপাদানগঠন, বাটী নির্ম্মাণ ও সেই বাটীর অধিবাসীর বিবর্দ্ধন, অর্থাৎ চিজ্জড়, রূপ ও আত্মজ্ঞানের ক্রমবিকাশ, এ ভূর্লোকে মনুষ্যসম্বন্ধে এই ত্রিবিধ বিবর্ত্তের বিষয় বুদ্ধিগম্য। রূপ ও আত্মজ্ঞানবিকাশ সম্বন্ধে পরে বলা যাইতেছে।

যে লোকের উপর আমাদের সংসার স্থাপিত, যাহার সহিত আমাদের দেহের সম্বন্ধ, আমরা এখন সেই লোকের বিষয় আলোচনা করিব, এবং তৎসঙ্গে আমাদের পক্ষে এই ভূর্লোকের প্রয়োজনীয়তাসম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

কি খনিজ, কি উদ্ভিদ্, কি জীব, সকল রাজ্যেই আমরা আকৃতিগত ও অন্যান্য বৈসাদৃশ্য প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাই; কোমল ও কঠিন, স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ, তিক্ত ও মধুর প্রভৃতি ভেদে জড়পদার্থ বিবিধ। এই অগণ্য বৈসাদৃশ্য মধ্যে জড়ের ত্রিবিধ অবস্থা প্রধানতঃ লক্ষিত হয়;—যথা,—কঠিন,

* System of Positive Polity. P. 83—84.

তরল ও বায়বীয়।* আবার এই কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থগুলি, রাসায়নিকেরা যাহাকে রূঢ় পদার্থ (Element) বলেন, তদ্দ্বারা গঠিত *, এবং এই সকল স্ব স্ব প্রকৃতিগত পরিবর্ত্তন ব্যতীত ত্রিবিধ অবস্থাতেই থাকিতে পারে। এ তিনটী ছাড়া পদার্থের আর একটী অবস্থা আছে, তাহা ইথারীয় (নাভস্?) এই ইথারের আবার চারিটী পর্ব্ব। কোন বায়ব পদার্থকে ইথারের চারিটী পর্ব্বাবস্থায় লইয়া যাওয়া যায়। ইথারের শেষ পর্ব্বে সর্ব্বশেষ ভৌতিক পরমাণু বিদ্যমান্। ক্রমশঃ সূক্ষ্মাবস্থায় আগমনের সময় বায়বীয় পদার্থ ভূর্লোক হইতে অপসৃত হইয়া তদুপরিস্থ লোকে অবস্থিত হয়। সকল পদার্থের অন্তিমভৌতিক পরমাণু একই; এই সকল ভৌতিক পরমাণুর সংযোগ প্রকারের নানাত্বে রূঢ় পদার্থের নানাত্ব হয়। এইরূপে ভৌতিক পদার্থের সপ্তম বিভাগ হইতে প্রথম বিভাগ পর্য্যন্ত, ঐ ভৌতিক পরমাণুপুঞ্জের ক্রমশঃ মিশ্র সমষ্টি দ্বারা রূঢ় পদার্থ গঠিত হইয়াছে। বহু যুগ ধরিয়া উক্ত পদার্থ সকল গঠিত হইতেছে।

নিখিল জাগতিক পদার্থ যখন যথোচিত উন্নত অবস্থা পাইল, তখন সেই সগুণ ঈশ্বরের ভাবতরঙ্গে রূপের বিকাশ হইল; তিনি তাঁহার জগতের আত্মাবুদ্ধিরূপে নিয়ামক হইলেন। অপর অসংখ্য দেবতাগণ চিজ্জড়ের সমষ্টি দ্বারা দেহ গঠন করিতে নিযুক্ত হন। প্রতি রূপে সেই ব্রহ্মকৈন্দ্রিক, নিয়ামক ও পরিচালক শক্তি। সেই পরব্রহ্মের চিত্তে প্রত্যেক রূপই কল্পনাকারে থাকে; এই দ্বিতীয় ভাবতরঙ্গের অর্থাৎ রূপবিকাশ সময়ে সেই কল্পনাগুলি ঐ অসংখ্য দেবতাগণের সম্মুখে আদর্শরূপে ধৃত হয়। তাঁহাদিগের প্রযত্নে তৃতীয় ও দ্বিতীয় লোকে আদি, চিৎ ও ভূতের সমষ্টি সঞ্জাত পরমাণু সকল যথানিয়ম আকৃষ্ট হইয়া অণু সমষ্টি হয়, অণু সমষ্টি হইতে এক একটী পিণ্ড হয় এবং পিণ্ড সকল পরস্পর সংযুক্ত হইয়া ব্রহ্ম চিত্তস্থ কল্পনানুরূপ এক একটী দেহ হয়। এইরূপে খনিজ, উদ্ভিদ, জীব ও মনুষ্য রাজ্যের সৃষ্টি হয়। অতি সংক্ষেপে হইলেও মনুষ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। অন্যান্য রাজ্যবিষয়ে যাহা কিছু আমাদের বুঝিবার আছে, তাহা অন্যত্র বুঝিবার চেষ্টা করিব।

* প্রস্তাবচ্ছলে বলিয়া রাখিতেছি যে, রাসায়নিকের Element ও শাস্ত্রের "ভূত" এক পদার্থ নহে। ভূত Elementও বটে এবং তদ্ব্যতীত আরও কিছু। সে সম্বন্ধে অন্য প্রবন্ধে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

মানবদেহ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত;—অন্নময়কোষ বা স্থূলশরীর এবং ছায়াবয়ব বা সূক্ষ্মশরীর। ত্যাগ, গ্রহণ ও সঞ্চালন—স্থূলদেহের প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ ক্রিয়া, সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা সূর্য্যপ্রসূত জীবনীশক্তি সকল জড়দেহের উপযোগী হয়। সূক্ষ্মশরীর যে কেবল মনুষ্যেরই আছে তাহা নহে, স্থাবর জঙ্গম সকল পদার্থেরই সূক্ষ্ম শরীর আছে *, আর সূক্ষ্ম দেহের পঞ্চতন্মাত্রের পঞ্চীকরণ দ্বারা সকল পদার্থের স্থূলদেহ উৎপন্ন হয়। স্থাবর জঙ্গম সকল পদার্থও স্ব স্ব সূক্ষ্ম দেহদ্বারা ঐ সকল জীবনীশক্তি গ্রহণ করিয়া তাহার যথাবিধি ব্যবহার করে।

উপাদানের তারতম্যে মনুষ্যদেহ পরিষ্কৃত ও অপরিষ্কৃত অথবা পবিত্র ও অপবিত্র হয়। একটী সুসভ্য ও একটী অসভ্য মনুষ্যের দেহ তুলনা করিলেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তবে শুদ্ধ দেহকে অশুদ্ধ ও অশুদ্ধ দেহকে মার্জ্জিত করাও যায়। দেহ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, প্রতি জড়-কণা সপ্রাণ, প্রাণশক্তি সকল প্রতিনিয়ত যাইতেছে আসিতেছে। যে দেহ তাহাদিগের সংবাদী, তাহারা সেই দেহ আশ্রয় করে; যাহা বিসংবাদী, তদ্দ্বারা তাহা পরিত্যক্ত হয়। সকল বস্তুই তালে তালে স্পন্দিত হইয়া থাকে, সকলই ঈপ্সিত পদার্থ গ্রহণ ও অনীপ্সিত পদার্থ ত্যাগ করিয়া থাকে। পবিত্র দেহের স্পন্দনের সহিত মন্দদ্রব্যের স্পন্দনের একতা হয় না বলিয়া, পবিত্র দেহ তাহা ত্যাগ করে, আর অশুদ্ধ দেহের স্পন্দন সহিত মন্দ দ্রব্যের স্পন্দনের ঐক্য আছে বলিয়া অশুদ্ধ দেহ তাহা আকর্ষণ করে। মনুষ্য দেহ যে যে উপাদানে গঠিত, আহারও তত্তদুপাদান বিশিষ্ট হওয়া উচিত বটে, মনুষ্যদেহ পঞ্চভূতসমষ্টি, সুতরাং আহারও পাঞ্চভৌতিক হওয়া আবশ্যক বটে, কারণ ক্ষিতি, অপঃ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পাঁচ প্রকারের পাচক উষ্মা আহারস্থ যে পঞ্চপ্রকার পার্থিবাদি গুণের পরিপাক করে, সেই সকল পদা-

* "Just as the soul or astral in man is what 'makes the man', so the astral in an organic compound is what gives character to the compound."

Richmond's Religion of the Stars P. 99.

এই উদ্ধৃত বচনটী পূজ্যপাদ 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'-কারের "মানবতত্ত্ব ও বর্ণবিবেক" নামক পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

র্থের দ্রব্য ও গুণ সকল শারীরিক দ্রব্য ও গুণের পোষণ করে;—তথাপি ক্ষুধা দূর করাই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। শাস্ত্র যাহা অখাদ্য বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা কি ক্ষুধা দূর হয় না? তাহা নহে। আহার সাধারণতঃ সাত্ত্বিকাদিভেদে ত্রিবিধ। যে আহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, যাহাতে চরমোন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়; চিত্তশুদ্ধি হইলে যদ্দ্বারা অমিশ্র অবিনাশী সুখের অধিকারী হওয়া যায়, তাহাই সাত্ত্বিক বা পবিত্র আহার। মানবের স্বাস্থ্য সাত্ত্বিক আহারে অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। স্বাস্থ্যের সঙ্গে চিত্তের শুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে উচ্চেন্দ্রিয়গুলি তীক্ষ্ণ হয়, তাহা হইলে যে ভূর্লোকের সহিত এই স্থূলদেহ বিশিষ্টরূপে সম্বদ্ধ, তাহার অনেক অজ্ঞাত ও স্থূলেন্দ্রিয়াতীত বিষয় জানিতে পারা যায়। তাহা জানিতে পারিলে আত্মজ্ঞানের প্রসার হয়। এই স্থূলদেহ আত্মার নিম্নতম বিকাশক্ষেত্র; অতএব তৎ-সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

স্থূল দেহের উপর যে সকল ক্রিয়া হয়, তন্মধ্যে যেগুলি ইচ্ছাশক্তির বশবর্ত্তী আর যেগুলি বশবর্ত্তী নহে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব। এই দুই প্রকার ক্রিয়া বিভিন্ন স্নায়ুবিধান দ্বারা সাধিত হয়। একটী স্নায়ুবিধান দ্বারা ফুস্‌ফুস্‌দ্বয় সঙ্কুচিত হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া ও শরীরের ক্ষয়প্রাপ্ত শক্তির পুনরুপচয় হয়। এই স্নায়ুবিধান কতকগুলি অনিচ্ছাধীন (Involuntary) স্নায়ু দ্বারা গঠিত; এই বিধানকে সাধারণতঃ সাহানুভূতিক বা সমবেদক (Sympathetic system) বলা হয়। সংসার বিবর্ত্তের অতীতকালে এক সময়ে—যখন আমাদের দেহ সকল গঠিত হইয়া ছিল, তখন এই স্নায়ু বিধান নিকৃষ্ট জীবের বশবর্ত্তী ছিল; ক্রমে ইচ্ছাশক্তির অনধীন হইয়া বর্ত্তমানাবস্থায় দেহের স্বাভাবিক জীবনীক্রিয়া সকল সাধন করিতেছে। সুস্থ অবস্থায় কেহ এই সকল ক্রিয়া লক্ষ্য করেনা। যখন শ্বাসক্রিয়ায় কোনরূপ বাধা পড়ে, তখনই লোকে জানিতে পারে যে, সে শ্বাস নিক্ষেপ করিতেছে। কিন্তু সুদীর্ঘ কঠোর অভ্যাস দ্বারা এই সমবেদক স্নায়ুবিধান ইচ্ছার অধীন করিতে পারা যায়। হঠযোগীরা তাহা করিয়া থাকেন। অন্য প্রকার যে স্নায়ু বিধান তাহার মস্তিষ্ক কশেরুকামজ্জাগত (Cerebro spinal) যে সকল স্নায়ু পরিধি (perephery) হইতে মেরুদণ্ড (Axis) পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, তাহাদিগকে সংজ্ঞাবাহী স্নায়ু (Sensory nerves) বলা হয়। যে সকল স্নায়ু মেরুদণ্ড হইতে পরিধি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, যাহারা মস্তিষ্ক হইতে নিয়োগ

(impulse) বহন করিয়া পেশী সকলকে প্রদান করে, তাহাদিগের নাম সঞ্চালক স্নায়ু (Motor nerves) এই দ্বিবিধ স্নায়ু মস্তিষ্ক কশেরুকামজ্জা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, দেহের প্রত্যেক ভাগ হইতে আগত স্নায়ুসূত্রগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া গুচ্ছে পরিণত হয় এবং কশেরুকামজ্জার (Spinal cord) সহিত যোগ দান করিয়া উহার বাহ্য তাণ্ডব আকৃতি ধারণ করে; ক্রমে ঊর্দ্ধদিকে প্রসারিত হইয়া মস্তিষ্ক মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এই মস্তিষ্কই সকল প্রকার অনুভূতি ও মানসিক কার্য্যের আধার। এই স্নায়ু বিধান দ্বারাই মনুষ্য আপন ইচ্ছা ও বিদ্যাবুদ্ধি ব্যক্ত করিতে পারে। মস্তিষ্ক ও স্নায়ু বিধান ব্যতিরেকে মনুষ্য ভূর্লোকে কোন কার্য্যই করিতে পারে না।

সাহানুভূতিক স্নায়ু বিধান দুইটী গ্রন্থিময় (gangliated) স্নায়ু রজ্জু নির্ম্মিত। ইহারা পৃষ্ঠবংশের (Spine) প্রত্যেক ধারে থাকে, এবং করোটির (Cranium) তলদেশ হইতে নিম্নে শঙ্খাবর্ত্ত (Coceyx) পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রতি সহানুভূতিক স্নায়ু গ্রন্থি হইতে অন্তঃ ও বাহ্য শাখা নির্গত হইয়াছে। অন্তঃশাখা সমূহ আভ্যন্তর যন্ত্রে ও রক্তবহা নাড়ী সকলে ব্যাপ্ত। আভ্যন্তর যন্ত্রে পরিব্যাপ্ত শাখা প্রশাখা সকল বস্তি উদর ও বক্ষঃগহ্বরে (Pelvis, abdomen and heart) মস্তিষ্ক-কশেরুকামজ্জাগতা শাখা সকলের সহিত বৃহৎ স্নায়ু জাল (Plexus) নির্ম্মাণ করিয়াছে। শাস্ত্র যাহা 'চক্র' বলিয়াছেন, তাহা এই স্নায়ু জাল। এই সকল স্নায়ু জালে শাস্ত্র বর্ণিত দৈবী শক্তি নিয়ত ধ্যান করিলে, ভূমি ত্যাগ পূর্ব্বক আকাশ গমন শক্তি, অবাধে বায়ুসঞ্চার ও রসবৃদ্ধি, রোগ শান্তি, পাতালসিদ্ধি, পরদেহে প্রবেশ ক্ষমতা, দূরদর্শন ও দূর শ্রবণশক্তি প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে।

এই দুই স্নায়ু বিধান, দেহের প্রত্যেক অংশের ন্যায়—কতকগুলি কোষের (Cell) সমষ্টি। কোষগুলি অণু সকলের, অণু সকল পরমাণু সমূহের সমষ্টি। পরমাণু সকল বিবিধ প্রকারে সংযুক্ত হইয়া স্থূল দেহের কঠিন, তরল ও বায়ব পদার্থ নির্ম্মাণ করে। প্রত্যেক পরমাণু জীবনী-শক্তি বিশিষ্ট। এই সকল পরমাণুর—সমষ্টিও সজীব; প্রত্যেক কোষও জীবনী-শক্তির এক একটী আধার। এই সকল পরমাণু, অণু ও কোষ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একটী যান্ত্রিক সমষ্টি—একটী শরীর গঠিত করে।

এই সকল জীব সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল, অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে এই সকল কীটাণু দেখিতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, যে আমাদের দেহে উপকারী ও অপকারী কীটাণু আছে। কতকগুলি স্বাস্থ্যের সহায়তা করে, আর কতকগুলি অনিষ্ট করে।

এই স্থূলদেহ আত্মার উপযুক্ত আধার স্বরূপ করা আমাদের উচিত। আমরা এই সকল বিষয় অনেকেই জানি না বা তদ্বিষয়ে মনোযোগ করি না, তাই স্ব স্ব দেহশুদ্ধির আবশ্যকতা বুঝি না। শরীর ধারণ জন্য যে কোন উপকরণ পাই, তাহার গুণাগুণ বিচার না করিয়া, তদ্দ্বারা শরীর পোষণ করি। যাহা অবিনাশী, তাহার জন্য যে একটী পবিত্র মহানদেহ গঠিত করা কর্ত্তব্য, তাহা মনেই করি না। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট শক্তি কাহার দ্বারা আমরা স্ব স্ব দেহ মধ্যে অসংখ্য দেহরক্ষক জীবাণু আনিতে পারি ও তাহাদিগের দ্বারা দেহস্থ অশুদ্ধ কণিকাসকল বিনষ্ট করাইয়া দেহ লঘু ও পবিত্র করিতে পারিলে, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম তীক্ষ্ণ হয়; তাহা হইল ভূর্লোকস্থ অজ্ঞাত ও অদৃশ্য পদার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া ভূর্লোকে আমাদিগের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারি ও তদনুসারে কার্য্য করিলে, চরমোন্নতির এক ধাপ উঠিতে পারি। কোন মনুষ্যই এ প্রকৃত প্রস্তাবে, এ অপূর্ণ সংসারের অতৃপ্য আকাঙ্ক্ষা লইয়া সন্তুষ্ট নহে, প্রত্যেক মনুষ্যই জ্ঞানতঃ হউক বা অজ্ঞানতঃ হউক, এমন এক অবিনাশী পদার্থ খুঁজিয়া বেড়ায়, যাহা পাইলে, তাহাদিগের আকাঙ্ক্ষার শেষ হয়।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

খোকাবাবু!

(১)

একটু পরিচয়।

রাধারমণ বাবুর পৈতৃক বাস পল্লীগ্রামে, জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইহাঁর পিতা একজন মাঝারি-গোছের তালুকদার ছিলেন। বাড়ীতে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ, মাতৃ-পিতৃশ্রাদ্ধ, স্ত্রীলোকের বারব্রত নিয়ম, নিত্য-নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণ-ভোজন, ইত্যাকার ধর্ম্ম-কর্ম্ম বন্ধ যাইত না। কেবলমাত্র দুঃখ এই ছিল যে, অনেক বয়স পর্য্যন্ত রাধারমণ বাবুর সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। তাঁহার সহধর্ম্মিণী আদর্শস্থানীয়া পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী ছিলেন। অনেক বয়স পর্য্যন্ত সন্তানাদি হইল না বলিয়া, সেই সতীলক্ষ্মীটি প্রায় সর্ব্বক্ষণ ম্রিয়মাণা থাকিতেন। কত বারব্রত, কার্ত্তিক পূজা করিবার পর বিধাতার কৃপায় অধিক বয়সে গর্ভবতী হইয়া, পতিব্রতা ব্রাহ্মণী একটী পুত্র প্রসব করেন। সেই পুত্রের নামই "খোকাবাবু";—এই পুত্রটি না হইলে সম্ভবত পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে হইত, কারণ অর্থের অসদ্ভাব নাই।

অধিক বয়সের ছেলে বলিয়া, সূতিকাগার হইতেই মা বাপের কাছে খোকাবাবুর আদর আব্দার অধিক। পল্লীগ্রামে শৈশবে পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রমে ছেলেগুলিকে পাঠশালায় দিতে হয়। খোকাবাবুও পাঠশালে যাইত। তাহার বুদ্ধি মোটা ছিল না; কিন্তু লেখাপড়া শিখিতে পারে নাই। সকল দিন পাঠশালে যাইত না;—ষ্টেশনের সন্নিকট মাধব ঘোষের ষ্টেশনারী দোকানে পাততাড়ি ফেলিয়া, পাড়ার গোটা কতক বদ্‌খৎ ছেলে জুটাইয়া, রাস্তায় রাস্তায় খোকাবাবু ডাণ্ডা গুলি খেলিত। মাসের মধ্যে প্রায় ষোল দিন এই রকম;—তাহা ছাড়া কামাই। প্রথমত মা-বাপের একমাত্র আদুরে ছেলে, তাতে আবার টাকার মানুষ,—খেলা করিলে অথবা কামাই করিলে মা বাপ তাহাকে কিছুই বলিতেন না। প্রশ্রয় পাইয়া খোকাবাবু দিন দিন প্রকৃত বখাট হইয়া উঠিল। একাদশ বৎসরে খোকাবাবুর কণ্ঠদেশে যজ্ঞোপবীত শোভা পাইল। বাপ মা জানে, খোকাবাবু সন্ধ্যাহ্নিক করে, ঠাকুর পূজা করে, নূতন ব্রহ্মচারী, মাসের দুইদিন একাদশী করে, ব্রাহ্মণানুষ্ঠানগুলি খোকাবাবু সব করে;—ফলে কিন্তু খোকাবাবু কিছুই করে না। ধর্ম্ম কর্ম্ম, দেবদেবী কিছুই মানে না, পল্লীগ্রামেও ব্রাহ্মসমাজের হাওয়া গিয়াছে।

খোকাবাবুর পিতৃগ্রামে ক্ষুদ্র একটী ব্রাহ্মসভা বসিয়াছিল, কয়েকজন অসভ্য সভ্য হইয়াছিল, খোকাবাবু সেই সভার একজন মেম্বর ;—দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমে খোকাবাবু একজন ব্রহ্মজ্ঞানী। কথা আছে, ব্রহ্মজ্ঞানে গাঢ়-ভক্তির পরিচয় দিবার নিমিত্ত ;—দেবদেবী মানি না, এইরূপ নিষ্ঠাভাবের প্রমাণ দেখাইবার নিমিত্ত উপায় অবলম্বন করিতেন।

ব্রহ্মজ্ঞানী হইবার পর খোকাবাবু ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। সেখানেও পূর্ব্বোক্ত পাঠশালার ন্যায় সাময়িক গতিবিধি। সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য-ক্রমে দুই বৎসর পরে খোকাবাবুর পিতৃবিয়োগ হইল। খোকাবাবু একটু বাঁধা ছিল, এককালে খোলা ষাঁড় হইয়া উঠিল। ষাঁড়ের দশায় খোকাবাবু আপন ইচ্ছায় বাবু হইল। বাপের টাকা আছে, তালুক আছে, পাকা চকবন্দী বাড়ী আছে, তবে খোকাবাবু কেন বাবু হইবে না? অবশ্যই হইবে। চতুর্দ্দশ বৎসরের খোকাবাবুটী দিব্য একটি বাবুর মত বাবু হইল।

এক একখান পল্লীগ্রাম এমন আছে যে, সেখানে বিলাস দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, মদ পাওয়া যায়, মোসাহেব পাওয়া যায়, বাগান পাওয়া যায়, অনেক জিনিষের অভাব হয় না। খোকাবাবু সেখানে সকলি পাইল। এক বৎসর সুখে গেল। কলিকাতা দর্শনে খোকাবাবুর অভিলাষ হইল। পাঁচজন মোসাহেবকে সঙ্গে লইয়া, খোকাবাবু কলিকাতা সহর দেখিতে আসিল। দিব্য একখানি বাড়ী ভাড়া করিল। সঙ্গে দস্তুরমত টাকা ছিল, স্বচ্ছন্দে খোকাবাবু এই বিলাসপুরী কলিকাতা সহরে দিনকতক বিহার করিল। কেল্লা, জু, যাদুঘর, উইলসন্স হোটেল, হাইকোর্ট, মনুমেণ্ট, থিয়েটার, গাড়ী ঘোড়ার আড়গড়া, লাটসাহেবের বাড়ী, বাছা বাছা বাইজির বাড়ী দুই চারিবার দর্শন করা হইল। জন্মগ্রামেই পানভোজনের অভ্যাস হইয়াছিল, দেশে যাইবার সময় খোকাবাবু ঠিক ফলারে ব্রাহ্মণের ন্যায় পেট ভরিয়া খাইয়া, কয়েক ডজন স্যাম্পিন ব্র্যাণ্ডি ছাঁদা বাঁধিয়া সঙ্গে লইয়া গেল। ব্রাহ্মণের ছাঁদায় পয়সা লাগে না, খোকাবাবুর ছাঁদায় অনেকগুলি পয়সা খরচ হইল। অপব্যয়ের শ্রাদ্ধ।

খোকাবাবু—দেশে পৌঁছিল। মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আইসে, রঙ্গরস দেখিয়া যায়, তাহার পর দুই এক মাস গ্রাম্যবিহারে রত থাকে, আবার কলিকাতায় আইসে, পাঁচ সাতদিন থাকিয়া যায়, এই রকমে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। খোকাবাবুর বয়স বাড়িতে লাগিল। খোকাবাবু

সাবালক হইল। সাবালকের প্রথম কার্য্য কি? বাড়ীতে একজন প্রাচীন সদ্বংশজাত, নিঃস্বার্থ, বিশ্বাসী সদর গোমস্তা ছিল, খোকাবাবু সাবালক হইয়াই সর্ব্বাগ্রে সেই হিতৈষী প্রাচীন গোমস্তাটিকে তাড়াইয়া দিল, নিজের একজন মাতাল মোসাহেবকে অধিক বেতনে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিল। বৎসরের মধ্যেই খোকাবাবুর পৈতৃক ঐশ্বর্য্য গজভুক্ত কপিত্থবৎ ভিতর ভুয়া হইয়া পড়িল। সরকারি মাল গুজারির দায়ে, আইনের তীব্র প্রতাপে পৈতৃক তালুক দুখানি নীলামে চড়ে, ঔদাস্যবশে অথবা অর্থের অভাবে তাহার কোন প্রতিবিধান ঘটিয়া উঠে না। খোকা-বাবুর অন্য বিদ্যা না হউক, খোকাবাবু স্বভাবজাত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে দুটি পড়া বিদ্যায় বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল। খোকাবাবু উচ্চদরে জুয়া খেলিতে পারিত। ২য় বিদ্যা ভয়ঙ্করী! খোকাবাবুর লেখা পড়া শিক্ষা হয় নাই, কিন্তু তাহার ইংরাজী বাঙ্গালা হস্তাক্ষর অচল ছিল না। ভয়ঙ্করী বিদ্যার প্রসাদে খোকাবাবু সম্মুখে যেমন অক্ষর দেখিত, ঠিক অবিকল সেই রকম অক্ষর লিখিতে পারিত। স্থূল কথায়, খোকাবাবু জাল করিতে পারিত। সময়ে অসময়ে প্রয়োজন হইলে জাল করিত!

(২)

চৈত্র কিস্তির মাল গুজারী আদায় হইল না, খোকাবাবুর পিতার তালুক দু-খানি নীলাম হইয়া গেল। ভ্রূক্ষেপ নাই! মোসাহেবেরা পরামর্শ দিল, মায়ের কাছে যাও,—মায়ের আদুরে ছেলে তুমি ;—মা তোমার মনে কষ্ট দিবেন না। মায়ের হাতে নগত তিনলক্ষ টাকা মজুত ;—হার্ড ক্যাশ! তোমার আবার অভাব কি?

তালুক নীলামের একমাস পরে খোকাবাবুর টাকার বিশেষ প্রয়োজন। জননীর শরণাপন্ন না হইলে বুঝি আর রক্ষা নাই। খোকাবাবু শরণাপন্ন হইল না ;—একদিন মাতার সম্মুখে গিয়া জোর করিয়া দাবী করিল, পঞ্চাশ হাজার!

পুত্রবৎসলা পতিব্রতা তৎক্ষণাৎ পঞ্চাশ হাজার টাকা বাহির করিয়া দিলেন, খোকাবাবু তখনও ঘোর বাবু। পঞ্চাশ হাজার তাহার কয়দিনই বা চলিবে? এক মাসের মধ্যে তিনবার কলিকাতায় যাতায়াত করিতেই পঞ্চাশ হাজার উড়িয়া গেল! যাতায়াত মানে কলিকাতার রঙ্গভূমে প্রবেশ ও প্রস্থান।

টাকা ফুরাইল। উপায় কি? আবার জননীকে মনে পড়িল, এবারও খোকাবাবু মায়ের কাছে টাকা চাহিল, চাহিবামাত্রই পাইল। এই রকম পাঁচবার। ক্রমশই বাড়াবাড়ী! শেষবারে যখন খোকাবাবু পুনরায় পঞ্চাশ হাজার দাবী করিল, বিধবা তখন দিবেন না বলিয়া পুত্রকে গুটিকতক হিতোপদেশ দিলেন। শুনিবার মত সুবোধ শিশুই বটে খোকাবাবু!—কর্ণপাতও করিল না!—মুখ বাঁকাইয়া, ভয় দেখাইয়া, দম্ভ করিয়া, খোকাবাবু বলিল, "দিবে না? দিবে না? আচ্ছা,—থাক তুমি।—আমি আফিঙ খাইয়া মরিব! জলে ডুবিয়া মরিব! বিষ খাইয়া মরিব! বুকে ছুরি মারিয়া মরিব! টের পাবে মজাটা।" স্নেহবতী জননীর চক্ষে জল পড়িল, আমাদের কুলবালাদের পুত্রস্নেহ যত প্রবল, পুত্রের অমঙ্গল আকাঙ্ক্ষাও ততদূর বলবতী। টাকা না পাইলে খোকাবাবু আত্মঘাতী হইবে, সাধের ধন নীলমণি,—সেই খোকাবাবু টাকা থাকিতে সামান্য টাকার জন্য বিষ খাইয়া মরিবে, স্নেহময়ীর প্রাণে সেই কথা বড় বাজিল। তিনি তৎক্ষণাৎ পঞ্চাশ হাজার টাকা আনিয়া খোকাবাবুর হস্তে প্রদান করিলেন, আব্দার রক্ষা হইল দেখিয়া, খোকাবাবু নব উৎসাহে আবার বলিল, "আর একটি কাজ কর মা! আর আমি তোমার নিকট টাকা চাহিব না। তোমার সেই পুরাতন গহনাগুলি আমাকে দাও। আমার একটি বন্ধু চাহিয়াছেন, তাঁহাকে দিব; তোমার যখন টাকার অভাব, তিনি যাহা কিছু মূল্য দিবেন বলিয়াছেন, যদি দেন, তোমাকেই আনিয়া দিব, আমি একটি পায়সাও লইব না।"

পুত্রের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, খোকাবাবুর আত্মহত্যার ভয়ে, সরলা বিধবা রমণী আপনার অলঙ্কারের বাক্সটির চাবি খুলিয়া, পুত্রকে অম্লানবদনে বলিলেন, "লও!"

যেন ছোঁ মারিয়া বাক্স তুলিয়া লইয়া, আহ্লাদের স্বরে খোকাবাবু তাড়াতাড়ি বলিল, "এই ভাল! এই ভাল! কেন জান মা? তুমি আর পরিবে না, তবে আর জিনিষগুলো পোকায় খায় কেন, পাঁচজনের উপকারে আসিলে তোমার ধর্ম্ম হবে।" মায়ের দিকে না চাহিয়াই, গহনার বাক্স লইয়া খোকাবাবুর প্রস্থান। বিধবা অশ্রুমুখী। বাহির বাড়ীতে খোকাবাবুর আনন্দ। নগদ পঞ্চাশ হাজার, গহনার দাম অতি কম দশ হাজার। সর্ব্ব সমেত বাট হাজার। বিষ খাইবার কথা না বলিলে, মা

হয় ত ভয় পাইত না;—মনে এইটুকু ভাবিয়া, খোকাবাবু আপনার মোসাহেবের দলকে সে দিনের রোজগারগুলি দেখাইয়া, কৌশলে আদায়ের কথা বলিল; মোসাহেবেরা ইত্যগ্রে বৈঠকখানায় বসিয়া রোজগার দেখিয়া, মাথায় হাত দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল।

(৩)

পরামর্শ হইল, এবারে আর দেশে থাকা হইবে না। এ টাকা ফুরাইলে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে হইবে। সুতরাং একবার কলিকাতা হইতে এক চক্র ঘুরিয়া, খোকাবাবু শীঘ্র শীঘ্র মোসাহেব সমভিব্যাহারে পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া গেল। লুক্কায়িত মতলবে খোকাবাবু ইতিপূর্ব্বে কয়েক প্রকার দামী দামী পোষাক প্রস্তুত করাইয়াছিল, এক এক রকম পোষাক পরিয়া, পশ্চিমের এক এক সহরে বাঙ্গালী রাজপুত্র সাজিয়া, খোকাবাবু কিছুদিন প্রণালীপূর্ব্বক জুয়াচুরি খেলিল। সঙ্গে টাকা ছিল, প্রথম প্রথম দিনকতক বড় বড় জহুরির দোকানে, শালওয়ালার দোকানে, বাদ্যযন্ত্রের দোকানে, নগদ নগদ জিনিষ কিনিয়া, ক্রমে ক্রমে খোকাবাবু দোকানে দোকানে বিশ্বাস দাঁড় করাইল; তাহার পর, একে একে হাজার, দশ হাজার ধার লইতে লাগিল। এই রকমে পাঁচ সাতটা সহর ফিরিয়া খোকাবাবু বিলক্ষণ সলাভ বাণিজ্য করিল; খোকাবাবুর অনেকগুলি টাকা উপার্জ্জন হইল। এক স্থানে লক্ষ টাকা ধার হইলেই খোকাবাবু তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করে, অন্য বেশে অন্য সহরে গিয়া রাজা সাজে! মাস কতক এই প্রকারে বিদেশে বাণিজ্য করিয়া, অনেক টাকার মালিক হইয়া, খোকাবাবু আবার দলবল সহ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

মা রহিলেন পল্লীগ্রামে, নানারঙ্গে খোকাবাবু রহিল কলিকাতায়। জুয়াচুরীর টাকায় খোকাবাবু স্বচ্ছন্দে সহরে একখানা বাড়ী কিনিতে পারিত, তাহা কিনিল না; বেশী ভাড়ায় একখানা সৌখীন বাড়ী লইয়া আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ক্রীড়া করিতে লাগিল। কলিকাতায় খোকাবাবু রাজাও নহে, রাজপুত্রও নহে; দশের সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতায় খোকাবাবু নূতন আমদানী একজন কাপ্তেন বাবু। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে থিয়েটারে, নর্ত্তকী মহলে, হোটেলে, গুপ্ত গুপ্ত জুয়ার আড্ডায় খোকাবাবুর নিত্য গতিবিধি;—নিত্য নিত্য ঐ সকল জায়গায় খোকাবাবুর বিলক্ষণ পসার প্রতিপত্তি। পূর্ব্বে পূর্ব্বে খোকাবাবু যখন বাবু সাজিয়া কলিকাতায় আসিত,

সেই সময় জনকতক সমকক্ষ বাবুর সহিত তাহার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল, চেহারাটা ভাল ছিল, জমিদারের ছেলে বলিয়া পরিচয় দিত, অবস্থাপন্ন ছেলের মতন নিত্য নূতন নূতন বেশভূষা করিত, নানাবিধ আমোদ প্রমোদে বিলক্ষণ দশ টাকা খরচ করিত, কাজেই ইয়ারবক্সী মহলে খোকাবাবুর বিলক্ষণ নাম জাহির হইয়াছিল।

এখন খোকাবাবু কলিকাতায় দস্তুরমত বাড়ী লইয়া, আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছে, নিত্য সন্ধ্যার পর পূর্ব্বপরিচিত ইয়ার বাবুরা খোকাবাবুর সৌখিন বৈঠকখানায় দলে দলে জমা হইত, রাত্রি দশটার পর খোকাবাবুকে লইয়া বাহির হইয়া যাইত। এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর, ক্রমাগত এই রকম। জুয়াখেলায় খোকাবাবুর পরিপক্কতা জন্মিয়াছিল, কলিকাতার ন্যায় সহরে জুয়া খেলিয়া খোকাবাবু দিন দিন অনেক টাকা জিতিয়া লইতে লাগিল। পড়্‌তা ভাল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, খোকাবাবু জাল করিতে পারিত। ইয়ার বন্ধুর নিকট বড়লোক বলিয়া বিখ্যাত হইবার আকাঙ্ক্ষায় খোকাবাবু অবকাশকালে নানা রকম অক্ষরে নানা রকম পত্র লিখিত ;—বলা বাহুল্য, সকল পত্রেই তাহার নিজের নামে শিরোনাম। খোকাবাবু সেই সকল পত্রের খাম খুলিয়া, অযত্নে জাজিমের উপর ফেলিয়া রাখিত। কোনখানাতে কোন মহারাজের দস্তখৎ, কোনখানাতে কোন সিবিলিয়ানের দস্তখত, কোনখানাতে হাকীম লোকের দস্তখত। কেহ যেন খোকাবাবুকে নিশা ভোজে নিমন্ত্রণ করিতেছে, কেহ যেন খোকাবাবুর নিকট আশী হাজার টাকা কর্জ্জ চাহিতেছে, কেহ যেন খোকাবাবুকে রাজা বাহাদুর উপাধি দিবার যুক্তি করিতেছে। একখানা পত্রে বঙ্গের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর যেন একটা সৎকার্য্যে লক্ষ টাকা দান উপলক্ষে খোকাবাবুকে ধন্যবাদ দিতেছেন, এইরূপ নানা রকমের অনেক প্রকারের অনেক পত্র জাজিমের উপর খোলা পড়িয়া থাকে, দেখিয়া দেখিয়া ইয়ার লোকগুলির তাক লাগিয়া যায়! তাহারা সকলি ভাবে, সত্য সত্য খোকাবাবু একজন মস্ত লোক। বাস্তবিক কিন্তু সমস্ত পত্রই জাল।

জুয়াচুরিতে বেশী লাভ হইলে আরও জুয়াচুরি করিতে জুয়াচোরদিগের লোভ হয়। খোকাবাবু একবার কোম্পানীর নোট জাল করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। পার্শিচার্চ্চ ষ্ট্রীটের পার্শ্বে ক্ষুদ্র একটা অন্ধ গলির

মধ্যে খোকাবাবু একটা একতালা ঘর ভাড়া লইয়াছিল ; তিনজন বদ্‌মাস ইয়ারের সহায়তায় খোকাবাবু সেই ঘরে নোট জাল করিত—দশ টাকার নোট। এক বৎসর বিনা ব্যাঘাতে সেই জাল কারবারটা বেশ চলিয়াছিল ; তাহার পর গোয়েন্দা লাগিল। খোকাবাবুকে ধরিতে পারিল না। জাল করিবার যন্ত্র তন্ত্র পাছে ধরা পড়ে, পাছে কেহ চুরি করিয়া লয়, সেই ভয়ে খোকাবাবুর দুইজন মোসাহেব রাত্রিকালে সেই জাল করিবার ঘরে শয়ন করিয়া থাকিত। লালবাজার পুলিশের অতি সন্নিকটেই পার্শি চার্চ্চ ষ্ট্রীট। সেইখানেই জাল। সাহস কম নয়! একরাত্রে পুলিশ আসিয়া আসবাব যন্ত্র সহ সেই ঘর হইতে খানকতক জাল নোট বাহির করে ; সেই দুইজন প্রহরী মোসাহেবকেও বাঁধিয়া লইয়া যায়। অবশ্যই তাহাদের দস্তুরমত সাজা হইয়াছিল, কিন্তু খোকাবাবুর অঙ্গে বিন্দুমাত্র পাপপঙ্ক স্পর্শ করে নাই। ইয়ার দুটি নিমকহারাম ছিল না, পুলিশে অথবা ফৌজদারী আদালতে তাহারা খোকাবাবুর নাম আদৌ করে নাই।

খোকাবাবুও নিতান্ত বেইমান ছিল না। উপকারী ইয়ার দুটিকে বাঁচাইবার জন্য গোপনে গোপনে খোকাবাবু ঐ জালিয়াতি মামলায় বিস্তর টাকা খরচ করিয়াছিল। ফল কিন্তু কিছুই হইল না ; ইয়ারেরা দ্বীপান্তরে গেল।

যাহারা যাইবার, তাহারাই যায়, যাহাদের ভোগ থাকে, তাহারা আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকে। খোকাবাবুর ভোগ বাকি ছিল, রাজদণ্ড হইতে খোকাবাবু অব্যাহতি পাইল ; কিন্তু নূতন নূতন দিনকতক খোকাবাবু যেন মনে মনে মরিয়া রহিল। স্ফূর্ত্তি নাই, উৎসাহ নাই, জুয়া নাই, জাল নাই, আছে কেবল গুপ্ত গুপ্ত বাবুগিরি। মোকদ্দমার খরচায় টাকা অনেক ফুরাইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং নিত্য আর বাইমহলে অথবা থিয়েটারের নর্ত্তকী-মহলে যাওয়া আসা চলিল না ; সুন্দরী সুন্দরী নর্ত্তকী-চক্রে বিঘূর্ণিত হইয়া খোকাবাবু এতদিন সংসারের একটা প্রধান কার্য্য ভুলিয়াছিল। বিবাহের কথাটা খোকাবাবুর মনে ছিল না। এই সময়ে খোকাবাবুর বিবাহ করিবার সাধ হইল। বয়স ২০ বৎসর। খোকাবাবু ইংরাজী জানিত না, ইংরাজের সহিত মিশিতে পারিত না, লোকমুখে শুনিয়া শুনিয়া কিন্তু ইংরাজী বিবাহের গুণপক্ষপাতী হইয়াছিল। বিবিরা কোর্টশিপ করিয়া পছন্দ করিয়া বিবাহ করে ; সাহেবেরাও কোর্টশিপ করিয়া, পছন্দ করিয়া বিবাহ করে ; বিবাহ হইবামাত্র প্রেমিক দম্পতী

মধুময় হনিমুনে চলিয়া যায় ;—এই বিবাহই উত্তম। খোকাবাবু ব্রহ্মজ্ঞানী, অতএব ইংরাজী-প্রথায় বিবাহ করিতে তাহার মতি হইল। টাকা আছে কম ; আরো কিছু টাকা চাই। কি প্রকারে সংগ্রহ হয় ? খোকাবাবু একবার দেশে গেল ;—দুঃখিনী মাতাকে মাতুলালয়ে প্রেরণ করিয়া ভদ্রাসন বাড়ীখানি বিক্রয় করিল। পল্লীগ্রামের বাড়ী, অধিক মূল্য হইল না, আশা পুরিল না, আরো বেশী টাকার অভাব বোধ হইল।

এবারে আবার কি হয় ?—সূক্ষ্ম বুদ্ধিপ্রভাবে পাঁচ সাত দিনের মধ্যে খোকাবাবুর মনে একটা নূতন ফন্দি জোগাইল। খোকাবাবু মুর্শিদাবাদে চলিয়া গেল। গুপ্ত সন্ধানে জানিল, ঢাকা জেলার একটি ব্রাহ্মণকুমার বহরমপুরে একটি স্বনামলব্ধ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। সহরে তাঁহার পশার প্রতিপত্তি বিলক্ষণ। সকলের কাছেই মান্য, সকলের সঙ্গেই আলাপ, স্বভাব অমায়িক। খোকাবাবু একদিন বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় বড় একটা ব্যাগ হাতে করিয়া সেই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসায় গিয়া উপস্থিত।

বাসার চাকর লোকেরা কেহ কেহ ঘুমাইতেছিল, কেহ কেহ বাবুর বসিবার বিছানায় তাকিয়া ঠেস দিয়া, আলবোলা টানিতেছিল, খোকাবাবু সম্মুখে দেখিয়া জাগ্রত লোকেরা চমকিয়া উঠিল। খোকাবাবু হাতের ব্যাগটা ব্যস্তভাবে বিছানায় ফেলিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা কোথায় ? দাদা কোথায় ? বড় গরম ! বড় গরম ! তামাক আছে ?"

একজন চাকর তামাক সাজিয়াছিল, চাদরের বাতাস খাইতে খাইতে খোকাবাবু সেই চাকরের প্রসাদী আলবোলার নলটা চোঁচাপটে মুখে লাগাইল। বাবুর ছোট ভাই, অনেকদিন বিদেশে ছিলেন, কন্যার বিবাহ দিবার জন্য সম্প্রতি দেশে আসিয়াছেন, দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বিশেষ দরকার, এই পরিচয় পাইয়া, একজন চাকর বড় একখানা আড়ানী লইয়া, বাবুর ছোট ভাইকে বাতাস করিতে আরম্ভ করিল। একজন চাকর বলিল, "বাবুকে কি খবর দিব ?"

প্রশ্ন শুনিয়াই চমকিয়া খোকাবাবু বলিল, "না না, এখন খবর দিতে হইবে না, হাকিম মানুষ তিনি, খবর পাইলেই ত আসিতে পারিবেন না, কাজ কি ? ব্যস্ত কেন ? আমার আহারাদি হইয়া গিয়াছে, বৃথা কেন তাঁহাকে অসময়ে ব্যস্ত করা ? রাত্রে আমি থাকিব, ধীরে সুস্থে কথা হইবে, ব্যস্ত

কেন ? হাঁ, বাবুর আফিসে ক'জন আমলা ? চাকর বলিল, "ষোল সতের জন।" খোকাবাবু বলিল, "বেশ, তোমরা এক কর্ম্ম কর, আজ রাত্রে তাহাদের সকলকে আমি নিমন্ত্রণ করিব। তোমরা ঘি, ময়দা, চিনি, সন্দেশ, দধি ইত্যাদি শীঘ্র শীঘ্র সংগ্রহ কর,—আর দেখ, তিনটে বড় বড় পাঁঠা কাটিয়া আন।" এই বলিয়া মণিব্যাগ খুলিয়া, খোকাবাবু তৎক্ষণাৎ ঝন্ ঝন্ করিয়া বিছানার উপর একমুঠা টাকা ফেলিয়া দিল,—দুইজন চাকর তাড়াতাড়ি বাজারে বাজার করিতে চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ দম রাখিয়া হাসিতে হাসিতে খোকাবাবু বলিল, "মেয়ের বিয়ে, বড় দায়, বহুৎ খরচ, দিন নিকট, মেয়েটি ছোট, একটিমাত্র মেয়ে, জ্যেঠামশাই বলিতে অজ্ঞান ; জ্যেঠামশাই হাকিম, বাবাও (আমিও) একজন হাকিম, ঘটা করিতে হইবে, দিন নাই, গহনা তৈয়ারী হইয়া উঠিবে না, আপাততঃ বাজারের গহনাই কিনিয়া লইতে হইবে। ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে শাল বিতরণ করিতে হইবে, একজন ঘাগু, বাবুর জানা শুনা দুই একজন জহুরীকে, দুই একজন শালওয়ালাকে, বারাণসী চেলীওয়ালাকে ডাকিয়া আন, জিনিষের নমুনা আনিতে বলিও, আমি দেখিব।" যথার্থই বাবুর জানা শোনা ব্যবসায়ী অনেক ছিল। বাসার সর্দ্দার চাকর তৎক্ষণাৎ দোকানদার ডাকিতে বাহির হইল। বিশ মিনিটের মধ্যেই বস্তা বস্তা শাল, বস্তা বস্তা চেলী, এবং বাক্স বাক্স অলঙ্কার বাবুর বাসায় আসিয়া পৌঁছিল, বাছিয়া বাছিয়া ভাল ভাল কতকগুলি জিনিষ গ্রহণ করিয়া, খোকাবাবু বিছানার বালিসের পার্শ্বে রাখিয়া দিল ; বাবু আসিলে সন্ধ্যার পর দরদস্তুর হইবে, নগদ টাকা চুকাইয়া দেওয়া হইবে, এইরূপ কথা।

দোকানদারেরা জিনিষ রাখিয়া চলিয়া গেল। খোকাবাবু একটু শয়ন করিল। ক্ষণকাল মায়া-নিদ্রায় অচেতন। হঠাৎ মায়া ভাঙ্গিয়া জাগিয়া, খোকাবাবু ঘড়ী দেখিল, তিনটা বাজিতে দশ মিনিট বাকি। খোকাবাবু ব্যস্ত হইল। হুকুম দিল, মুটে ডাক। পাঁচটার ট্রেণে এই সকল জিনিষ রওনা করিতে হইবে, জিনিষ পছন্দ হইয়াছে, দামের ফর্দ্দ আমি রাখিয়াছি, কোন গোল হইবে না, শীঘ্র মুটে ডাক।

বাঙ্গাল দেশের কথা খোকাবাবু বেশ অভ্যাস করিয়াছিল, ঢাকাই বাবুর ভাই, বাঙ্গালের সুরে সকল কথা বলাতে খোকাবাবুকে ভাই বলিয়া সকলের প্রত্যয় জন্মিল, অবিলম্বে একজন মুটিয়া আসিয়া সম্মুখে

দাঁড়াইল; তাহার মাথায় জিনিষগুলি তুলিয়া দিয়া, খোকাবাবু বলিল, "শীঘ্র চল, রেলওয়ে ষ্টেশনে পাঁচটার মধ্যে পৌছিতে হইবে।" মুটেকে এই কথা বলিয়া, চাকরগণকে বলিল, "তোমরা আহারাদির আয়োজন কর, সন্ধ্যার মধ্যেই আমি ফিরিব।"

মুটে লইয়া খোকাবাবু পলাইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ডেপুটিবাবু বাসায় আসিলেন, ভাই আসিয়াছে শুনিলেন। তাঁহার সহোদর ভাই ছিল না, হয়ত অন্য কোন ভাই আসিয়া থাকিবে, ডেপুটি বাবু ইহাই ভাবিলেন। রাত্রি ৯টা বাজিল। কেহই আসিল না। সমস্তই ফাঁকি। খোকাবাবু রাত্রির মধ্যেই পলায়ন করিয়া কলিকাতায় আসিল। বিবাহ করিয়া সংসারি হইল। কাঙ্গালিনী হইয়া, মা রহিলেন পল্লীগ্রামের একখানি কুটীরে। সুতা কাটিয়া, পৈতা বেচিয়া, মাঠের গোবর কুড়াইয়া, ঘুঁটে বেচিয়া, ব্রাহ্মণের ঘরের দুঃখিনী বিধবা অতিকষ্টে দিন গুজরান করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত পুত্র একবার আর তাঁহার তত্ত্ব লইল না। পুণ্যবল ফুরাইল, পাপের ফলে ১৮ মাসের মধ্যে খোকাবাবু ফকির—খোকাবাবু ফতুর—খোকাবাবু পথের ভিখারী!!!

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

ডিটেক্‌টিভের পুরস্কার।

"বিষম সঙ্কট মহাশয়, এ বিপদের ত্রাণকর্ত্তা একমাত্র আপনি। আপনার ক্ষমতা ও কার্য্য-সৌকর্য্যের উপর আমার বিশেষ আস্থা আছে। যে কূট উপায় অবলম্বন করিয়া আপনি রাধাবাজারের হত্যাকাণ্ডের কিনারা করিয়াছেন, তাহাতে যে আমাকে এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন, তাহা সন্দেহাতীত।" আমি বৈঠকখানায় বসিয়া 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' পড়িতেছিলাম, ইতিমধ্যে এক ভদ্রবেশধারী যুবক অতি ব্যস্তে আসিয়া এই কথাগুলি বলিল।

"কি হইয়াছে? ঘটনাটি বিশদরূপে বিবৃত করুন, যদি আমার দ্বারা আপনার কোন উপকার হইবার তিলমাত্র সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহার ত্রুটী হইবে না।"

আগন্তুকের নাম রাধাকিশোর পাণ্ডা, কলিকাতায় ব্যবসা করে। আমার উক্তি শ্রবণ করিয়া বলিল, "তবে মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া আমার

সঙ্গে আমার বাটীতে চলুন। এই ঘটনার আবশ্যকীয় কাগজ-পত্র বাসাতে আছে। আপনি সম্মত হইবেন কি না ভাবিয়া তাহা সঙ্গে করিয়া আনি নাই। ঘটনাও সেই স্থানে বলিব।"

"আপনার বাড়ী কতদূর?"

"প্রায় দুইক্রোশ দূরে? পদব্রজে যাইতে হইবে না, আমার সঙ্গে গাড়ী আছে।"

আমি আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া, চাকরকে চাদর ও জুতা আনিতে আদেশ করিলাম। তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রতিপালিত হইল। আমি জুতা ও উত্তরীয় বসন গ্রহণ করিয়া রাধাকিশোরের সঙ্গে তাহার গাড়ীতে উঠিলাম। উঠিবামাত্র চালক অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিল,—অশ্ব ছুটিল। প্রায় কুড়ি মিনিট পর, এক হর্ম্ম্য-অট্টালিকার নিকট যাইয়া অশ্বের গতিরোধ হইল। গাড়ী থামিলে রাধাকিশোর চারিদিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আমার বোধ হইল, সে যেন পূর্ব্বে কখনও এ স্থানে আসে নাই। যাহা হউক, সে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া আমাকে বলিল,—"আসুন।"

রাধাকিশোর একটি ক্ষুদ্র অন্ধকারময় গলি-রাস্তা অতিক্রম করিয়া, একটী নূতন বাড়ীতে প্রবেশ করিল। আমিও তাহার পশ্চাতে গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলাম,—"মহাশয়, আপনার বক্তব্য প্রকাশ করুন, অধিক বিলম্ব করিতে পারিব না। আপনার কথা এত কি গোপনীয় যে, গাড়ীর মধ্যেও বলিলেন না?"

"কোন চিন্তা নাই মহাশয়, যখন আপনাকে এত কষ্ট করিয়া আনিয়াছি, তখন অবশ্যই আপনাকে বলিব। তবে এত ব্যস্ত হইলে চলিবে না,—এ ব্যস্ততার কাজ নয়।"

রাধাকিশোর এই কথাগুলি বলিবার সময়—গৃহের চারিদিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। আমি তাহার ঐরূপ ভাব দেখিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখি, কক্ষে আরো লোক আছে। তদ্দর্শনে আমি বলিলাম,—

"এ গৃহে আর কে আছে? আমার বোধ হইতেছে, এখানে আরো লোক আছে?"

"নিশ্চয়ই, আমি একলা নাই। আরো আমার দুই একজন বন্ধু-বান্ধব এখানে উপস্থিত আছেন।" রাধাকিশোর এই কথা বলিয়াই একটা

সঙ্কেত করিল। সঙ্গে সঙ্গে চারিজন ভীষণাকার পুরুষ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাদের সেই যমদূত সদৃশ বিকটাকার মূর্ত্তি দেখিয়া আমি স্তম্ভিত ও চমকিত হইলাম। আমাকে বিস্মিত হইতে দেখিয়া রাধাকিশোর হো হো করিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। হাস্যলহরী নিবৃত্ত হইলে সে বলিল,—"তামাক খান।"

তাম্রকূট সেবনের পর রাধাকিশোর বলিল,—"আমার বক্তব্য শুনুন। অগ্রেই বলিয়া রাখি, আমি বিশেষ কোন প্রয়োজনের নিমিত্ত বা রহস্য উদ্ঘাটনের নিমিত্ত আপনাকে আনয়ন করি নাই। একদা আমি আমার বন্ধু হরিনারায়ণের সঙ্গে গল্প করিতেছিলাম, কথাপ্রসঙ্গে রাধাবাজারের হত্যাকাণ্ডের কথা উঠিল। আপনি যেরূপ দক্ষতার সহিত কার্য্য উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ করিয়া আপনার খুব প্রশংসা করিলাম। তৎপরে আমরা একটী ঘটনা কল্পনা করিয়াছি, আপনার দ্বারা তাহার রহস্য ভেদ করিতে ইচ্ছা করি। ঘটনাটী আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করিয়া রহস্য উদ্ঘাটন করুন। যদি আপনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তবে আপনার পরিশ্রমের জন্য ১০০৲ টাকা পুরস্কার দিব। কি বলেন?"

রাধাকিশোর শেষে প্রশ্ন করিল, "কি বলেন?" আমি ত তাহার কথা শুনিয়া একবারে অবাক্! কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলাম, "ইহা বোধ হয় ভদ্রোচিত কার্য্য নহে, আমি ওরূপ ভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে আদৌ ইচ্ছুক নহি।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চারিজন বিকটাকার পুরুষ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদের নাম যথাক্রমে—মাণিকলাল, ছোট্টুলাল, চুণিলাল এবং কানাইলাল। তন্মধ্যে প্রথম ব্যক্তি বলিল,—"আপনাকে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে!" আমি তৎকালিন অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। আমার সম্মতিতে রাধাকিশোর হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—"ঘটনার প্রথমাংশ এইরূপ;—গত রজনীতে আমি এবং কালীদাস এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া কানাই এবং চুণিলালকে আহ্বান করিলাম, তাহারা বাড়ীর ভিতর ছিল এবং ছোট্টুলাল ও মাণিকলালের তখনই আসিবার কথা ছিল বলিয়া, তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আমরা প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বসিয়া রহিলাম, কিন্তু তাহারা আসিল না, চুণি ও কানাই বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির

হইল না। তাহাতে আমরা বিরক্ত হইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম,—বন্ধুত্ব আছে বলিয়া আমরা এরূপ যাইয়া থাকি। আমরা উভয়ে দ্বিতলে উঠিয়া ছোট্টুর গৃহে যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমাদের বুদ্ধি লোপ পাইল। আমরা কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিঃচেষ্টভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরে প্রকৃতস্থ হইয়া ভাল করিয়া দেখিলাম যে, ছোট্টুলাল রক্তাক্ত কলেবরে মেজের উপর পড়িয়া আছে, তাহার পার্শ্বে মাণিকলাল। সে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল, কেবল সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইতেছে এইরূপ বোধ হইল।

এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ছোট্টুলাল নিহত হইয়াছে এবং মাণিকলালই তাহাকে হত্যা করিয়াছে, পরে সে কোনরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। আমরা তাহাকে দোষী বিবেচনা করিয়াছি, কিন্তু সে অস্বীকার করিতেছে। তাহার নিজের মুখেই শুনুন কি বলে। মাণিক! বল ত ব্যাপারখানা কি?"

মাণিকলাল বলিতে লাগিল,—"গত কল্য রজনী নয় ঘটিকার সময় আমি ছোট্টুলালকে বৈঠকখানায় দেখিতে না পাইয়া উপরে আসিলাম। ভিতরে কাহারো সাড়া-শব্দ না পাওয়ায়, প্রথমতঃ আমি বিবেচনা করিলাম, ছোট্টু বাড়ী নাই। তাহার শয়ন-কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখি-গৃহদ্বার রুদ্ধ। এ পর্য্যন্ত আমি কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। আমি যেই তাহার গৃহে প্রবেশ করিব, অমনি কাহার পদশব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। শব্দ শুনিয়া, আমি পশ্চাতে মুখ ফিরাইতেই কে যেন আমার মস্তকে বিষম আঘাত করিয়া অন্তর্হিত হইল। আমি চীৎকার করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র দেখি, ছোট্টুলাল মাটিতে পড়িয়া আছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত,—তীরবেগে রুধিরধারা নির্গত হইতেছে। আমি তদ্দর্শনে অজ্ঞান হইয়া ভূমে আপতিত হইলাম। চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া ইহাদের দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হইলাম। কিন্তু মহাশয়! শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী!"

রাধাকিশোর বলিল,—"তোমার আর কিছু বক্তব্য আছে? তুমি যে ছোট্টুকে হত্যা কর নাই তাহার কোন প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পার?"

"পারি না সত্য, কিন্তু আমি যে কোন প্রকারেই তাহাকে হত্যা করিতে পারি না।"

'আচ্ছা থাম।' পরে রাধা আমাকে বলিল,—"মহাশয়! ঘটনা শুনি-

লেন, আসামীর জবাবও শুনিলেন। এখন হয় তাহাকে দোষী, না হয় নির্দ্দোষী প্রমাণ করুন। আপনার কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে ব্যক্ত করিতে পারেন।"

আমি একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম,—"মাণিকলালের ইহাতে কি স্বার্থ আছে যে, সে হত্যা করিবে? তাহার সঙ্গে, কি আপনাদের কাহারো সঙ্গে ছোট্টুলালের কোন দিন বিবাদ হইয়াছিল?"

রাধা।—আমার ও মাণিক উভয়েরই সঙ্গে কিয়দ্দিবস হইল তাহার বিবাদ হইয়াছিল।

আমি তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম,—"গতকল্য রাত্রিতে হত্যার পূর্ব্বে ছোট্টুলালের সঙ্গে আপনাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল?"

"হাঁ, আমার সহিত হইয়াছিল। নয়টার কিছু পূর্ব্বে আমি তাহাকে সুস্থ দেখিয়া গিয়াছিলাম। তখন রাত্রি নয়টা, তাহা সে আমাকে বলিয়াছিল।" কিছুক্ষণ পরে রাধা পুনরায় বলিল,—"যদি আপততঃ আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য না থাকে, তবে আমাদের সঙ্গে উপরে চলুন, মাণিক ও ছোট্টুকে আমরা যে অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, তাহা আপনাকে দেখাইব।"

"আমার আপাততঃ আর কিছু জিজ্ঞাস্য নাই।"

"অতি উত্তম। মাণিকলাল! তুমি এবং কালীদাস অগ্রে উপরে যাও এবং তোমাদিগকে যাহা করিতে হইবে তজ্জন্য প্রস্তুত হও। কি করিতে হইবে তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না? দরজায় প্রহার করিবে।"

রাধাকিশোরের বাক্য শেষ হইতে না হইতে তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পশ্চাৎ ফিরিয়া একবার আমার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহাদের সে দৃষ্টি যেন কপটতা, ক্রূরতা এবং বিসংবাদে পরিপূর্ণ।

রাধা বলিল, "তাহারা অল্প সময়ের মধ্যেই প্রস্তুত হইবে। এ কার্য্যে কিছু সামর্থ্যের প্রয়োজন। মাণিককে কিছু অসুস্থ দেখিতেছি।"

চুণি উচ্চহাস্যে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিল,—"উহাকে একটু ঔষধ দাও।" পরক্ষণেই বলিল,—"সকলে এস, দেখ; আর বৃথা বাক্যালাপ করিও না, উহারা প্রস্তুত হইয়াছে, মাণিক দরজায় ঘা মারিতেছে।"

রাধা হস্তস্থিত হুকা বৈঠকে রক্ষা করিয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। উপরে উঠিয়া একটী কক্ষের নিকট যাইয়া আমাকে বলিল, "আমরা

ছোট্টুকে কল্য যে অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, কালীদাস সেই অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া দেখুন।"

আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। ক্রীড়াচ্ছলে যে এরূপ অভিনয় করা যাইতে পারে, ইতিপূর্ব্বে তাহা আমার বোধগম্য ছিল না। আমি দেখিলাম, কালীদাস লালরঙ্গের একটী পোষাক পরিধান করিয়া মেজের উপর রক্ত-স্রোতে ভাসিতেছে,—আচম্বিতে দেখিলে মনে হয়, শোণিতধারার জবামাল্য বিভূষিতা রণরঙ্গিণী উন্মাদিনী শ্যামা লোলজিহ্বা মুখাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া শোকসন্তপ্তহৃদয়ে পরিম্লানমুখশ্রীতে পড়িয়া আছে। কালীদাসের মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু স্থির—যেন প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহার পার্শ্বে একখানি তরবারি ও একগাছি মোটা লাঠি। বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া আমার ত চক্ষু স্থির,—নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

রাধা। এখন মাণিক কি প্রকারে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা দেখা যাউক। কিন্তু ইহাতে তাদৃশ প্রয়োজন নাই, তবে তাহার যদি ইচ্ছা হয়, তবে দেখাইতে পারে। মাণিক! দেখাও, তুমি কেমন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলে?

'আচ্ছা' বলিয়া মাণিক ঘরের আলোর তেজ কিছু কমাইয়া বহির্গত হইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। অবিলম্বেই দ্বার উন্মুক্ত করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য এক পদ অগ্রসর হইয়া নিজে নিজেই বলিল,—"ছোট্টু বোধ হয় বাড়ীতে নাই, তাহার জন্য নীচে অপেক্ষা করিগে। একটা কার্য্য—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে হঠাৎ থামিল এবং কে যেন অলক্ষ্যিতে আসিয়া তাহার মস্তকে বিষম আঘাত করিয়া গেল, এইরূপ ভাব দেখাইয়া, ভীতিকণ্ঠে অস্পষ্ট স্বরে 'হা হতোস্মি' বলিয়া চীৎকার করিয়া মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া ছোট্টুর কল্পিত মৃতদেহের নিকট উপস্থিত হইয়া, যেন অজ্ঞান হইয়া বায়ু-সঞ্চালিত কদলী-বৃক্ষের ন্যায় ভূমে পতিত হইল। অভিনয় করিতে গিয়া মাণিক প্রকৃতই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেল।

"ওহো, মাণিক প্রকৃতই মূর্চ্ছিত হইয়াছে। জল আন, জল আন, কালীদাস! গাত্রোত্থান করিয়া ইহার শুশ্রূষা কর" বলিয়া রাধা চীৎকার করিয়া উঠিল।

অবিলম্বেই মাণিক চেতনা প্রাপ্ত হইল এবং চক্ষু উন্মিলীত করিয়া

চতুর্দ্দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিল। তৎপরে তাহার অন্যান্য সহচরেরা ক্ষণকালের নিমিত্ত একবার চারিদিকে চাহিল। আমি শুনিতে পাই, অথচ গোপনীয়—এই ভাবে মাণিক বলি,—"শুন শুন, রক্ষা কর! তোমাদিগকে সানুনয় বলিতেছি, আমায় রক্ষা কর। আমি—"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই কালীদাস এক বোতল মদিরা লইয়া তাহার মুখের নিকটে ধরিয়া বলিল,—"কোন ভয় নাই।" পরে তাহাকে উত্তোলন করিয়া শয্যায় শয়ন করাইল!

অবসাদগ্রস্ত মাণিকের ছোট ছোট কথায় আমার সন্দেহ হইল, যেন ইহার মধ্যে কোন রহস্য নিশ্চয় নিহিত আছে, সম্প্রতি আমি তাহা ধরিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, আমার মনে যেন কোন সন্দেহই হয় নাই, এইভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং পরিহাস সহকারে বলিলাম,—

"ছোট্টুলালের কল্পিত আঘাত কোনস্থানে লাগিয়াছে?" কালীদাস সেই স্থান প্রদর্শন করিলে আমি বলিলাম,—"আঘাত সাঙ্ঘাতিক নহে।"

রাধা ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিয়া বলিল,—"সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল আর কি? ঐ ক্ষতস্থান হইতে কি পরিমাণ রুধির নির্গত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়।"

"সত্য, আমি তাহার বস্ত্র একবার পরীক্ষা করিব।"

"বস্ত্রের মধ্যে কিছুই নাই এবং কিছুই পাওয়া যাইবে না।"

"কিছুই না? কানাই যে ঘড়ির কথা বলিয়াছিল, তাহা বোধ হয়, ঐ ঘড়ি?"

কানাই। হাঁ, ছোট্টু ঐ ঘড়ি দেখিয়া আমাকে সময় বলিয়াছিল।"

"অতি উত্তম" বলিয়া আমি কালিদাসের পকেট হইতে ঘড়িটী বাহির করিয়া উপরটা দেখিলাম।

কালী। উপরের এই কোণটা অন্ধকার। এইস্থানে কেহ লুকাইয়া থাকিলে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় তাহাকে দেখা যায় না। কানাই! তুমি বোধ হয় এখানেই লুকাইয়াছিলে?

কানাই। কি বল? আমি ছোট্টুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বরাবর নীচে নামিয়া যাই। স্মরণ রাখিও, মাণিক বলিয়াছে, এখানে কেহ ছিল না—কাহাকেও সে দেখিতে পায় নাই।

আমি। বেশ, আপনি ছিলেন না সত্য; কিন্তু একটী মুমূর্ষু ব্যক্তি কি

এরূপভাবে অন্যকে প্রহার করিতে পারে, যাহাতে এক ঘণ্টাকাল সে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকে? আমার দেখিবার ও জানিবার যাহা ছিল, তাহা ঠিক হইয়াছে, এখন চলুন, নীচে যাই।

রাধা সম্মত হইল। মাণিক সুস্থ হইয়াছিল, আমরা পাঁচজন নীচে যাইয়া বৈঠকখানায় বসিলাম। কিয়ৎক্ষণ পর, আমি কি ঠিক করিয়াছি, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল।

আমি ঠিক করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা আপনাদের মনঃপূত না হইতে পারে। যাহা হউক, আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন,—প্রথমতঃ, মাণিক নির্দ্দোষী, সে যাহা বলিয়াছে, আমি তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। দ্বিতীয়তঃ, আদালতে আমার সাক্ষ্যে কানাই অপরাধী না হইলেও, আমি মুক্তকণ্ঠে তাহাকেই অপরাধী বলিব।

ক্ষণকাল সকলেই মৌন হইয়া রহিল। পূর্ণ নিস্তব্ধতা গৃহে বিরাজ করিতে লাগিল। অতঃপর কানাই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল,—"আপনার কি প্রমাণ আছে?" গৃহ হইতে প্রতিধ্বনি হইল, "আপনার কি প্রমাণ আছে?"

প্রথমতঃ, এই জামাটি যাহা উপরের সেই অন্ধকার কোণে পাওয়া গেল, ইহা তোমার। সেই সময় ইহা তোমার গায়ে ছিল। ইহা দ্বারা এই প্রমাণ হইতেছে যে, তুমি ঐ স্থানে লুকাইয়াছিলে। দ্বিতীয়তঃ, আমার একটী প্রশ্ন আছে,—"রাত্রি সাড়ে আটটা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত তোমরা কেহ ছোট্টুর সঙ্গে ছিলে?"

রাধা। আমি তাহার সঙ্গে ছিলাম। আর দেখুন, কালিদাসই প্রকৃত ছোট্টু।

আমি। তিনি ঘড়ি লইয়া কি করিতেছিলেন, তাহা কি আপনি দেখিয়াছিলেন?

রাধা। সে ঘড়ি খুলিয়াছিল, তাহা আমি দেখিয়াছি, কিন্তু কি করিতেছিল, বলিতে পারি না।

আমি। আপনি তাহার হস্তের দিকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন? বোধ হয় না।

রাধা। না, কিন্তু তাহার দুই হস্তই যেন একস্থানে ছিল।

আমি। তিনি পৌনে নয় ঘটিকার সময় ঘড়ি বন্ধ করিয়া দিয়া বলেন

যে, ইহা হইতেও কম রাত্রি হইয়াছে, ছোট্টু তাহাকে বলিয়াছে। ইহা সত্য নহে। মাণিক যখন সেই গৃহে প্রবেশ করে, তখন কানাই নিশ্চয়ই সেই অন্ধকার স্থানে ছিল, নচেৎ তিনি মনুষ্যের পদধ্বনি কেমন করিয়া শুনিতে পাইলেন?

"আপনি ঠিক বলিয়াছেন, আসুন, কোলাকুলি করি" বলিয়া কানাই লম্ফ দিয়া আমার উপরে পড়িল এবং তাহার চেয়ার উত্তোলন করিয়া আমার মস্তকে ভীষণ প্রহার করিল। আমি হতচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম। তাহার পর কি হইল, তাহা আমি বলিতে পারি না। সংজ্ঞা-লাভ হইলে দেখি যে, আমি আমার বাড়ীতে নিজ শয়ন-কক্ষে শুইয়া আছি, আমার স্ত্রী সাশ্রুনয়নে ব্যজন করিতেছে। আমি চক্ষু মেলিয়া অতিকষ্টে বলিলাম,—

"কতক্ষণ হইতে আমি এখানে আসিয়াছি?"

"অদ্য প্রাতঃকালে একজন ডাক্তার, আর একটি অপরিচিত লোক একখানি গাড়ীতে করিয়া তোমাকে রাখিয়া গিয়াছে। এখন একটু আরাম বোধ হইতেছে কি?"

"হাঁ, আমি অনেক সুস্থ হইয়াছি। সেই অপরিচিত লোকটীর চেহারা কেমন বলিতে পার?"

"আমি ডাক্তার কিম্বা সেই লোকটী কাহাকেও দেখি নাই। তবে একখানা পত্র দিয়া বলিয়া গিয়াছে, যত শীঘ্র পার, পাঠ করিও। এখন পড়িতে পারিবে কি?"

আমি তাহাকে পত্র আনিতে বলিলাম। পত্র খুলিয়াই তাহার মধ্যে একখানা একশত টাকার নোট দেখিতে পাইলাম। পত্রে লেখা ছিল,—

"প্রিয়বন্ধু! আমি আপনাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিলাম, তাহার কারণ আপনি আমার জীবনরক্ষা করিয়াছেন। গত রজনীর বৃত্তান্ত অলীক নহে, বাস্তবিক আমাদের মধ্যে একজন নিহত হইয়াছে। তবে গত কল্য যে ছোট্টুকে দেখিয়াছিলেন, সে নিহত হয় নাই, নিহত ব্যক্তি ঐ সময় ঐ বাড়ীতেই ছিল। আমরা জৈন, আমাদের নিজের আইন কানুন আছে। আমি আমাদের বিচারপতির নিকট অপরাধী প্রমাণিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আপনার সাহায্যে আমি অব্যাহতি পাইয়াছি। কানাই প্রকৃত দোষী, কল্য আপনাকে আক্রমণ করার পর সে তাহা স্বীকার করিয়াছে।

যাহা হউক, বেশী দিন সে আর এ পৃথিবীতে থাকিতে পাইবে না, অবিলম্বেই আমাদের আইনানুসারে তাহাকে দণ্ডভোগ করিতে হইবে। আমি আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, আমাদের অনুসন্ধান কখনো করিবেন না। যখন আপনি এই পত্র পাঠ করিবেন, তখন আমরা বহুদূরে চলিয়া যাইব, অন্বেষণ করিয়া পাইবেন না। আপনাকে অগণিত ধন্যবাদ দিতেছি। তবে এখন বিদায়——

বিনয়াবনত,

মাণিকলাল।"

আমি সুস্থ হইয়া সেই বাড়ীতে গিয়াছিলাম, এবং নিকটবর্ত্তী লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাদের কোন সন্ধানই পাই নাই। কিন্তু সেই রজনীতে রহস্যভেদ করিতে যাইয়া আমি যে শিক্ষা পাইয়াছিলাম, তাহা এখনো স্মৃতিপথে অঙ্কিত আছে,—এ জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

"শিবাখ্যা-কিঙ্কর" কাব্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীধর্ম্মদেবের উক্তি।

নিতান্ত নিরীহ অনুচরগণ
সমীর সমান অতীব ধীর।
দেখিবে তাদের বেশ ভয়ঙ্কর
প্রভঞ্জন সম হ'বে গম্ভীর॥
তাঁহার প্রসাদে পশিব প্রাসাদে
অবাধে মোহিব মহিলা-মন।
সূচের মতন রহিব অদৃশ্য
করিব আপন কাজ সাধন॥

হইব কখনো সুজন ব্রাহ্মণ
ধরিব কখনো ভিকারীবেশ।
কখনো রাণীর নিকটে যাইব
দেখা'ব আমার গুণ অশেষ॥
পাপ প্রলোভনে পাপাচারীগণ
বাড়িবে সময়ে সাগর প্রায়।
মম প্রিয়তর অনুচরগণে
সদলে সহজে ডুবাবে তায়॥
জলচর মত জীবনী শকতি
পাইবে তাহারা উঠিবে ভে'সে।
অতি সুকৌশলে অগস্ত্য যেমন
গণ্ডুষে শুষিব সাগরে শেষে॥
মন্দারের মত দলবল লয়ে
মথিব সাগর কর্দ্দম-ময়।
গজ, রমা আদি রতন সম্ভার
লইব, সাজাব মম আলয়॥
ধরি হলাহল দু'হাতে করিয়া
আপনি খাওয়াব সে সব জনে।
যাদের লাগিয়া ত্যজিয়া ভবন
বিরলে একাকী বসিয়া বনে॥
শম দান আদি বিধি চতুষ্টয়
করিব প্রয়োগ মত রাজার।
কে ঘুমায় সুখে জানিয়া শুনিয়া
পশিয়াছে চোর ভবনে তার॥
মনের বাসনা পূরাও জননি
দীন-জনে দুঃখ দিওনা আর।
মায়ে যে সন্তানে ভাল নাহি বাসে
জগৎ কি কাঁদে দুঃখে তাহার॥
এস দেবি এস সাকারে সুভগে
নিরাকার রূপ ত্যজ এখন।

করে ধরি অসি দনুজ দলনি
রিপুর দলনে কর গমন॥
কে আছে আমার এ অরুু পুরে
সহায় সম্পদ সকল হীন।
করুণা-নয়নে দেখ সুনয়নে
বিপদ পাথারে ভাসিছে দীন॥
কিঙ্কর কাতর হের হররমে
তাপিত তনয়ে ত্রাসে তরাও।
জানিয়া শুনিয়া কেমন করিয়া
নয়নের জলে দীনে ভাসাও॥
সকলি ত জান তথাপি নিদয়া
মহিমা তোমার বুঝিতে নারি।
হয় কর নয় নয় কর হয়
অনুগত জনে বিপদ ভারী॥
বিচিত্র চরিত্র জননি! তোমার
যথার্থ নির্ণয়ে ক্ষমতা কার।
কে তুমি কেমন কোথা আছ নাই
কে বলিবে কিবা কাজ তোমার॥
নির্লিপ্তা জগতে তথাপি জননি
জগৎ তোমাতে জড়িত আছে।
নির্গুণা তথাপি তথাপি গুণের নিদান
সকলি সম্ভব তোমার কাছে॥
নাহি দুঃখ সুখ তথাপি জীবের
দুখেতে তোমার হৃদয় গলে।
নাহি দয়া মায়া তবু কর দান
মুছাও ভকত নয়ন-জলে॥
নাহিক বাসনা বাসনা তোমার
সতত পুরিছে জগৎময়।
নিশ্চেষ্ট হইয়া পালিছে পৃথিবী
সকলি তোমাতে সম্ভব হয়॥

নিরাকার তবু আকার ধারণ
স্বয়ম্ভু তথাপি জনম লও।
এক মেঘাশ্রিত বারিধারা যথা
বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন হও॥
বহুরূপী হেরি রূপ নিরূপণে
দশের বিতর্ক বিফল যথা।
মীমাংসা প্রভৃতি করে বহু তর্ক
কিন্তু সে ফল বিফল তথা॥
কবে জ্ঞানীগণ তোমার ধারণা
যার যতদূর ধারণা চলে।
বাক্য মনাতীত হইলে যখনি
তখনি তোমারে "তুরীয়" বলে॥

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কে তুমি ?

কে তুমি চাহ না ফিরে শুন না মরম-কথা !
পাষাণ-প্রতিমা যেন নাহি স্নেহ সরলতা॥
চলেছ আপন মনে যথা তব মন চায়,
ঘৃণার চাহনি তা'ও দেখিনা নয়নে হায়।
দেখিলে নয়ন-জল বহে না নয়নাসার,
তথাপি তুলনা নাই ও মোহিনী প্রতিমার।
হাসি নাহি দেখিয়াছি কখন ও বিম্বাধরে,
তথাপি মাধুরি তব প্রাণ আছে আলো করে।
প্রতি তুচ্ছ ঘৃণা তব প্রতি তব অবহেলা,
মনে হয় সুগভীর প্রণয়ের মৌন খেলা।
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে দেখিলে আকুল হই।
ভাবিলে যাতনা বাড়ে ভুলে যেতে পারি কই ?
কে তুমি, রয়েছ মগ্ন আপনার মহিমায় ?
"কে তুমি ?" ভাবিতে শুধু ভাবনা বাড়িয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র মিত্র।

সমালোচনা।

কয়েকখানি পত্র।—শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, প্রণীত, জয়ন্তী প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ৸০ (বার) আনা। প্রথম খণ্ডে আমরা পনেরখানি পত্র দেখিলাম। একাদশ বর্ষীয়া একটি বালিকাকে বিবাহ করিয়া, বিবাহের বর বিবাহের পনের দিন পরে, সেই নবপত্নীকে প্রথম পত্র লেখেন। ক্রমে ক্রমে পনেরখানি লেখা হয়, পত্রগুলি উপদেশ পূর্ণ। বঙ্গবালাগণের কিরূপ বিদ্যাশিক্ষা আবশ্যক, এই সকল পত্রে পরিষ্কাররূপে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রস্তাবিত পঞ্চদশ পত্রই বরের লেখা। বধূ প্রত্যেক পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন, সে উত্তরগুলি কিন্তু এ পুস্তকে স্থান পায় নাই দেখিয়া, আমাদের আহ্লাদ হইল, পত্রলেখক যদু বাবুই এই বিবাহের বর। পত্রগুলিকে প্রেমপত্রিকা বলিয়া উল্লেখ করা যায় না, এগুলি যথার্থই উপদেশ-পত্রিকা।

সেকালের লোক।—সুপণ্ডিত পাদ্রি যুশন ইহার লেখক। পৃথিবীর সৃষ্টিপ্রকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া, আব্রাহামের মৃত্যু পর্য্যন্ত এই পুস্তকে লেখা আছে। সৃষ্টিপ্রকরণের প্রথমে প্রাকৃতিক ভূগোলের গুটিকতক কথা দৃষ্ট হইল। সৃষ্টির প্রথমে সৃষ্টিকর্ত্তা ফেরাত নদীকূলে একটা বাগান প্রস্তুত করিয়া আদম এবং হাওয়াকে সেই বাগানে রাখিয়া ছিলেন। আব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বরের সাক্ষাত এবং তাহার কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি এই পুস্তকের বর্ণনীয় বিষয়। পাদ্রিযুশনের মতে আব্রাহামের বংশাবলীই সেকালের লোক। তৎপূর্ব্বে পৃথিবীতে আর লোক ছিল কি না, পাদ্রিযুশন তাহা বলেন নাই। পাদ্রিদের বিশ্বাস, পৃথিবীর বয়ঃক্রম আজও ছয় সহস্র বৎসর পূর্ণ হয় নাই। তুরাণ ও মিশরের প্রতি ঈশ্বরের বেশী অনুগ্রহ, অন্য স্থানের উল্লেখ দেখা যায় না। সেকালের লোকেরা ঐ দুই স্থানেই ছিলেন, ইহাই যেন বুঝিতে হয়। যাহা হউক, মাষ লিখিত "সুসমাচার" এবং দায়ুদের গীত প্রভৃতি অপেক্ষা এ পুস্তকের ভাষা উত্তম ও অনেক পরিষ্কার। পাদ্রি যুশনকে ধন্যবাদ।

রেজেষ্টারি দর্পণ।—সব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত বাবু অনুকূল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। পঞ্চম সংস্করণ। মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র। পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত পাঠে সম্যক প্রীতি লাভ করিলাম।

লেখক একজন বহুদর্শী সবরেজিষ্ট্রার; পুস্তকখানিতে তাঁহার বহুদর্শিতার ও বঙ্গভাষাভিজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে বিশদরূপে ও প্রাঞ্জল ভাষায় দলিল আদি লিখিবার নিয়মাবলী, ষ্ট্যাম্প আইন, (কিরূপ দলিলে কত মূল্যের ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিতে হয় এবং না করিলে কিরূপ শাস্তি পাইতে হয়) দলিল আদি রেজিষ্টারি করণোপায়, রেজেষ্ট্রী ফি (কোন দলিলে কি পরিমাণ ফি লাগে) ষ্ট্যাম্পের পরিমাণ (কোন দলিলে কি পরিমাণ ষ্ট্যাম্প দিতে হয় এবং কোন কোন গুলিতে ষ্ট্যাম্প লাগে না), নিরূপিত সময়ে দলিল আদি রেজেষ্টারি না হইলে তদুপায়, কমিশন জন্য দরখাস্ত এবং কমিশন ফি, দলিলকারক দলিল রেজিষ্টারী না করিয়া দিলে দলিলকারকের বিরুদ্ধে শমন প্রার্থনা, বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইনের আবশ্যকীয় নিয়মাবলী ইত্যাদি বিষয়গুলি লিখিত থাকায়, মহাজন, খাতক, জমিদার, প্রজা সকলেরই মহোপকারী।

সাধারণতঃ যত প্রকরে দলিল হইতে পারে, তাহাদের প্রত্যেকের এক একটী মুসবিদা থাকায়, পুস্তকখানি দলিল-লেখকগণের পরম সহায়। ভাষা সরল হওয়ায় অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিও ইহার সাহায্যে অনায়াসে দলিলাদি লিখিতে ও রেজিষ্ট্রী করিবার জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগত হইতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরিশিষ্টে দলিলাদিতে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য উর্দ্দূ ও পারসী শব্দগুলির বাঙ্গালা অর্থ থাকায়, আপামর সাধারণের বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। মোট কথা, এই পুস্তকখানি থাকিলে দলিলাদি লিখন ও রেজিষ্টারি করণের সাহায্য জন্য কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইবে না। পুস্তকখানির মুদ্রাঙ্কণ সুন্দর ও কাগজ উৎকৃষ্ট। মূল্যও প্রয়োজনীয়তানুসারে আশাতিরিক্ত সুলভ।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।)

১১শ বর্ষ। } আষাঢ়, ১৩১০ সাল। { ১২শ সংখ্যা।

পরম কল্যাণ গীতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

ভোগাদি বন্ধন বিষয়।

অনেকে নশ্বর জগতের ভোগে বন্ধন হইবার ভয়ে, বলপূর্ব্বক ভোগ বন্ধ করিতে গিয়া, নানাপ্রকার কষ্টভোগ করেন। তাঁহাদিগের বিচার পূর্ব্বক বুঝা উচিত যে, ভোগের দ্বারা বন্ধন হয় না। আসক্তিই বন্ধনের কারণ। এই আসক্তি ত্যাগ করিয়া, পরমাত্মার নিয়মানুসারে যে ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ, তাহা করিলে কোন ক্ষতি হয় না এবং না করিলে, কখনই স্থূল শরীর প্রাণাদি রক্ষা হইবেক না। বলপূর্ব্বক বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে দুঃখ পাইতে হইবে। জ্যোতিঃ-স্বরূপ পরমাত্মা ব্যতীত কেহই নাই, যিনি খণ্ডন করিতে পারেন।

যেমন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অগ্নিব্রহ্ম সাকাররূপে বর্ত্তমান থাকেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তৈল শলিতার প্রয়োজন হয় এবং অগ্নিব্রহ্মকে এই প্রকাশাবস্থায় তৈল শলিতা ও সুখ দুঃখ ভোগ করিতেই হয়, নচেৎ প্রকাশ থাকিতে পারিবেন না। যখন নির্ব্বাণ হইয়া নাম রূপ রহিত নিরাকার হন, তখন কোটী কোটী মন তৈলাদি উপস্থিত থাকিলেও, অগ্নিব্রহ্মের কোন প্রয়োজন আইসে না। সেই প্রকার যতক্ষণ জীবাত্মা স্থূল শরীর ইন্দ্রিয়াদিতে প্রকাশমান থাকিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্থূল পদার্থ ও সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। নচেৎ দর্শন, শ্রবণ, মনন, আহার, বিহারাদি স্থূল শরীর

ও প্রাণরক্ষা হইবে না। যখন মৃত্যু অর্থাৎ জীবাত্মা স্থূলশরীরে নির্ব্বাণ হইয়া যাইবেন, তখন আর ভোগের কোন প্রয়োজন থাকিবে না। পার্থিব নানাপ্রকার ভোগ্যবস্তু বর্ত্তমান থাকিলেও, নির্ব্বাপিত জীবাত্মার কোন আবশ্যক হইবে না। এমন কি, স্থূলশরীর ও জীবাত্মার অপ্রয়োজন হেতু উহা ভস্ম করিলে জীবাত্মার কোন সুখ দুঃখ বা আসক্তি হয় না। যতক্ষণ স্থূলশরীরে প্রকাশমান থাকিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভোগাদির প্রয়োজনও করিতে হইবে। আসক্তি ত্যাগ করিয়া ভোগ কর, তাহা হইলে কোন বন্ধনই হইবে না। পরমাত্মার ইচ্ছাই আসক্তি অনাসক্তি বন্ধন ও মুক্তির কারণ। তাহার শরণাগত হও। বৃথা অহঙ্কার প্রযুক্ত ভোগাদি ত্যাগ করিতে গিয়া, পরমাত্মাকে অবিশ্বাস এবং কষ্টভোগ করিও না।

বিন্দু অর্দ্ধমাত্রা অর্থাৎ ওঁকার প্রণব বর্ণন।

অকার, উকার, মকার, রূপান্তরভেদে ব্রহ্মের নানা নাম কল্পিত আছে। ইহা একটী বীজকে দৃষ্টান্ত দ্বারা ভাব বুঝিয়া লইবে। যেমন একটী বীজ হইতে অঙ্কুর এবং ঐ অঙ্কুর হইতে দুইটী শাখা বাহির হয়। একটী শাখা ঠুঠা অর্থাৎ তাহা হইতে আর শাখা বাহির হয় না, এবং অপরটী হইতে তিনটী শাখা বাহির হইয়া, উহাতে শাখা, প্রশাখা, ফল, ফুলাদি ধরে। দেখ! একটী বীজ হইতে কত শাখা প্রশাখা, ফল, ফুল, মিষ্ট, তিক্ত, অম্ল, সুগন্ধ, দুর্গন্ধাদি প্রকাশ পায়, এবং ভিন্ন ভিন্ন বোধ ও ক্রিয়া হয়। সেই প্রকার একমাত্র বীজরূপ কারণ পূর্ণপরব্রহ্ম হইতে একটী অর্দ্ধমাত্ররূপ ঠুঠা এবং আর একটী বিন্দুরূপ শাখা এবং বিন্দুরূপ শাখা হইতে অকার, উকার, মকার, তিনগুণ প্রকাশ পাইয়া জগৎরূপ বহু বিস্তার হইয়াছেন এবং নানা পদার্থ ও জীব, স্থাবর জঙ্গম জন্তু আদি বহু ভিন্ন বোধ ও কার্য্য হইতেছে। অকার, উকার, মকারকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অর্থাৎ অগ্নি, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ বিরাট ব্রহ্মা জানিবে। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অঙ্কারাদি চারি অন্তঃকরণ, আশা, তৃষ্ণা, লোভ, মোহাদি ইহার প্রশাখা এবং শান্তি, সুখ, দুঃখাদি ইহার ফল, মূল।

অকার, উকার, মকার, সত্য, রজ, তম, এই তিনগুণে পরমাত্মা জগৎ সৃষ্টি, পালন ও লয় করিয়া থাকেন। অকার রজগুণ বিশিষ্ট সূর্য্যনারায়ণ রূপে জগৎরূপ প্রকাশ করায়, ব্রহ্মা নামে অভিহীত হন।

উকার সত্যগুণবিশিষ্ট চন্দ্রমারূপে পালন করা, বিষ্ণু নাম, এবং মকার তমোগুণ বিশিষ্ট—অগ্নি ব্রহ্মারূপে জগত লয় অর্থাৎ সংহার করায় মহেশ্বর নামে কল্পিত হন। পরমাত্মাকে সর্ব্বশক্তি নাম, গুণ বিশিষ্ট ও ইহার অতীত জানিবে। পরমাত্মাই এই তিন গুণ বা শক্তি দ্বারা সমস্ত জগৎ চরাচর সৃষ্টি, পালন ও লয় করিতেছেন এবং ইহারই দ্বারা ব্যবহারিক ও পরমার্থিক কার্য্য হয়। প্রয়োজনানুসারে এই তিন গুণ ব্যবহার না করিলে, জগতের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। যেরূপ তুমি আপন সত্যগুণ দ্বারা ভৃত্যকে কোন কার্য্য করিতে বলিলে যদি তাহার তমোগুণ অধিক থাকায়, কার্য্যে অবহেলা করে, তাহা হইলে রজগুণ দ্বারা তাড়িত হইলে, কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। যদি নিতান্ত তমোগুণ অধিক থাকায়, তাড়নাতে কার্য্যসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তমোগুণ দ্বারা তাড়না ও প্রহারাদি দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ করিতে হয়। পরমাত্মার বিষয় এইরূপ ভাব বুঝিয়া লইবে।

ওঁকার, অকার, উকার, মকার, বিরাট ভগবানকে কেহ শিব, কেহ বিষ্ণু, কেহ ব্রহ্মা প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন এবং কেহ কেহ এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, দুর্গা প্রভৃতি নাম পৃথক পৃথক দেবদেবীর নাম মনে করেন। কিন্তু তাহা নহে, একমাত্র পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ব্রহ্মের নাম জানিবে। ইনি একমাত্র নিরাকার, সাকার অখণ্ডাকারে সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণরূপে সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র চরাচর লইয়া বিরাজমান আছেন। স্বরূপতঃ কোনকালে অকার, উকার, মকার নাই, ছিল না, হইবে না, হইবার সম্ভবনাও নাই। ইনি যাহা, তাহাই আছেন। কার্য্যকারণ হেতু নানা নাম কল্পিত হয়। অকার, উকার, মকার বা ওঁকারকে ব্রহ্মের শক্তি ও ব্রহ্মরূপই জানিবে।

জীবের অধীনতা।

কোন কোন মতে জীবকে পরমাত্মার অধীন এবং কোন কোন মতে জীবকে প্রকৃতির অধীন বলে। কিন্তু যথার্থ জ্ঞান বা স্বরূপ বোধ না হইলে, ইহা বুঝা ও বুঝান অত্যন্ত কঠিন। আপনাদিগকে জলের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি, সুক্ষ্মভাবে সারভাব গ্রহণ করিবেন। যেমন, উপাধিভেদে একই জল পদার্থতে জল, মেঘ, বরফ উপাধি হওয়ায়,

জলের অধীন মেঘ ও বরফ এবং মেঘের অধীন বরফ বলা হয়। জলই মেঘ ও বরফের কারণ। এই মেঘ হইতে বারি বর্ষণ হয়। সেই জল জমিয়া বরফ হয়। জল, মেঘ, বরফাদি উপাধীর দিকে দৃষ্টি না দিয়া, বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিলে কিংবা সকলেই জলভাবে পরিণত হইলে, কেহ কাহারই অধীন থাকে না। বস্তুতঃ, তিনটী একই কারণরূপ জল বোধ হইবে। রূপান্তর হেতু উপাধীভেদে এবং কারণ কার্য্যভাবে অধীনতা ও স্বাধীনতা ঘটিতেছে বা বোধ হইতেছে এবং মানিতেও হইবেক। কিন্তু স্বরূপ পক্ষে, স্বাধীনতা ও অধীনতা নাই। বস্তুতঃ, যাহা তাহাই থাকে। সেইরূপ জলরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম যখন জগতরূপে বিস্তার হন, তখন তাঁহাতে প্রকৃতি পুরুষ সংজ্ঞা হয় এবং বহুবিস্তার হওয়া, অবিদ্যাচ্ছন্ন হওয়া জীবরূপে প্রকাশ হন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব অজ্ঞান বশতঃ মায়া, মোহ, তৃষ্ণাতে আসক্ত থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব পরব্রহ্ম কিম্বা প্রকৃতির অধীন বলিয়া বোধ হয় ও মানিতে হইবে। যখন স্বরূপ বোধ হয়, তখন জীবাত্মা প্রকৃতি ও পরমাত্মা ভাব একীভূত হইয়া একই পরমাত্মারূপে ভাসমান হন, অধীন বা স্বাধীন ভাব থাকে না। সত্যস্বরূপ যাহা, তাহাই থাকেন।

পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের নানা নাম, কল্পনা ও শান্তি বিষয়।

পূর্ণপরব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, অপরব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান, পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বিশ্বনাথ, দেবীমাতা, মহামায়া, মহালক্ষ্মী, মহাদেবী, মহাসরস্বতী, মহাভগবতী, মহাশক্তি, কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, গণেশ, ইন্দ্রদেব, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ, আল্লা, খোদা, গড্, সাবিত্রী, গায়ত্রী, শালগ্রাম, অব্যয়, কূটস্থ, সর্ব্বব্যাপী, নিষ্ক্রিয়, দুর্লভ, অন্তর্যামী, বেষ্টি, সমষ্টি, দ্বৈত, অদ্বৈত, নিরাকার, সাকার, সগুণ, নির্গুণ, কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল, বিরাট, শূন্য, প্রকৃতি, পুরুষ, প্রভৃতি নাম দেশ ও ভাষা এবং সম্প্রদায়ভেদে কত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু একমাত্র পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, মাতা, পিতা, আত্মা, নিরাকার, সাকার, অখণ্ডাকারে সর্ব্বশক্তিমানরূপে পূর্ণভাবে বিরাজমান আছেন। ইহাঁ ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ নাই, ছিলেন না, হইবেন না, হইবার সম্ভবনাও নাই। সকল নামই কেবল

কল্পনা মাত্র। তিনি বস্তুতঃ যাহা, তাহাই আছেন। এ নামটী আমার এবং এ নাম আমার নহে, এরূপ ভাব তাহাতে নাই। যেমন একই জলের দেশ ও ভাষা বিরোধে জল, পানী, নীর, অম্বু, তোয়ঃ, সরিতা, বারি, জীবন, ওয়াটার, আব, লীলু, তমী, গরুনী, ভরণী, তরুণী প্রভৃতি নানা নাম কল্পিত আছে, যে যে নাম করিয়া জল বস্তুকে পান করিবে, তাহারই পিপাসা যাইবেক। নামের প্রতি জলের সংস্কার নাই। যাহাতে জল এক নাম ধরিয়া পান করিলে পিপাসা নিবারণ করিবে, অন্য নাম ধরিয়া পান করিলে পিপাসা নিবারণ করিবে না। এই প্রকার যে যে নাম ধরিয়া পরমাত্মাকে ধারণ করিবে, তাহারই শান্তি হইবে।

পক্ষপাত বশতঃ সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ এক নামকে কল্যাণ ও শান্তিদাতা এবং অপর নামকে অকল্যাণ অশান্তিকর মনে করেন। যেমন, শিব-নামকে কল্যাণকর মনে করে। কিন্তু বিচার পূর্ব্বক দেখ, সকল নামই মনুষ্যের কল্পিত, পরমাত্মা কোন নাম আপনার বলিয়া প্রকাশ পূর্ব্বক কল্যাণ বা অকল্যাণকর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন নাই। যদি একটী কল্পিত নাম কল্যাণ বা অকল্যাণকর হয়, তাহা হইলে সকল নামই কল্যাণ বা অকল্যাণকর হইবে।

অতএব বৃথা মান, অপমান, সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্য স্বরূপ শান্তিময় পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা, পিতা, আত্মগুরুকে চিনিয়া, তাঁহার শরণাগত হও, যাহাতে শান্তিলাভ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবে।

পূর্ণপরব্রহ্মের উপাসনার প্রয়োজন।

অনেকে মনে করিতে পারেন, যখন সকলই পূর্ণ পরব্রহ্মের স্বরূপ এবং আমরা তাঁহাকে উপাসনা করি, এরূপ ইচ্ছা বা অনিচ্ছা নাই, তখন তাঁহাকে উপাসনা করিবার প্রয়োজন কি? এ বিষয় জলের দৃষ্টান্তে এইরূপ বুঝিবে। যেমন, জলকে কেহ পান করে, অথবা না করে এরূপ কোন ইচ্ছা জলের নাই। কিন্তু পিপাসা নিবারণার্থ পিপাসার্থ ব্যক্তির জল পান করিবার প্রয়োজন হয়, সেই প্রকার ত্রিতাপ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার জন্য ত্রিতাপ-তাপিত ব্যক্তির ব্রহ্ম উপাসনার প্রয়োজন হয়।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বরূপ বোধ অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত অভেদভাব না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভক্তি পূর্ব্বক উপাসনার প্রয়োজন। যেমন, যাহাকে নদী

পার হইতে হইবেক, তাঁহার নৌকার প্রয়োজন থাকে। নদী পার হইলে আর নৌকার আবশ্যক থাকে না। সেই প্রকার অজ্ঞান অবিদ্যারূপ নদী পার হইবার প্রয়োজন হইলে, জ্ঞানরূপ নৌকা ও মাঝিরূপ পরমাত্মার আবশ্যক। যিনি অজ্ঞান মায়ারূপী নদী পার হইয়া, পরমাত্মার সহিত অভেদ হইয়াছেন, তাঁহার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। নচেৎ অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ত্রিতাপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ স্বামী।

প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী।

(১)

বসন্ত অভিসার বিনোদিনী সঙ্গে করল পয়াল,
নিভৃত নিকুঞ্জে মিলল বরকাল,
দুহুঁ মুখপদ্ম হেরি দুহুঁ মল ভেল ভোর,
দুহুঁ কোন নয়ীনে বহে আনন্দ লোর,
দুহুঁ অঙ্গ পুলকিত গদ গদ ভাস,
নয়ন ইঙ্গিতে কত রস পরকাশ ;
হরি খেলল রঙ্গ কৌতুক ভাল, বিনোদিনী সঙ্গ নন্দগোপাল,
চৌদিকে বেড়ল সখিগণ যাই।
গোবিন্দ দাস হের ত তোহি ধাই ॥

(২)

হোরি। রাগ মল্লার।

বৃষভানু নন্দিনী নন্দকুমার,—
রঙ্গে খেলত হোরি হে ঝম্‌াক ঝম্‌াক পগচমকী,
হোরি করে রঙ্গ অঙ্গে অরুণ মবর মন আনন্দ অপার, (জুয়া)
চন্দন ফাগু অঙ্গত হিনব অহুরাগে খেল্‌ত তহুমন জোরি ভোরি ভোরি।
দুহুঁক তায় রঙ্গরস ভাতি,
তনু তনু পরসেই রসে মন মাতল দুহুপর দুঁহু পতু মাতি।
ব্রজবণিতা যত ঝিরি ঝিরি যত রস গারি মৃদুল হাস।
শ্রমজল কলেবর হেরি চামর করু রাধামোহন দাস ॥

(৩)

কল্যাণী বিতরাজ ব্রজসমাঝ, হেরি রঙ্গে রঙ্গিয়া,
নাগরি বর হোরি রঙ্গ উনমত চিত্ত শ্যাম সঙ্গ নাচত কত ভঙ্গিয়া (ধ্রু)
গাওত কত রস প্রসঙ্গ বাসুত বিলাসো চাঙ্গ থৈয়া থৈয়া ॥
চঞ্চল গতি অতি সুরঙ্গ নিরখিত লেকত অনঙ্গরস সুরঙ্গিয়া,
খেলি গোলাল নয়ান বয়ান নিরখত পেচ্‌কারি প্রেমগোলাল বসন হিম,
লাগ দুঁহু অঙ্গ পরিমল চোয়া চন্দন ফাগু রঙ্গ হিতহিন বয়হু রাগ।
খেলি গুলাল অঙ্গলাল সুন্দর বরদুতি রসাল রঙ্গিনীগণ সঙ্গিয়া ॥
ব্রজবধুগণ ধরতাল গাওত পদ নন্দদুলাল রাই অঙ্গে অম্বিয়া।
হো হো ! করি করভাষ করতালি ঘনমন উল্লাস জয় জয় বর রঙ্গিয়া ॥
গোবিন্দগুণ করু প্রকাশ রচিত উদ্ধব দাস হরি রস তরঙ্গিয়া।

শ্রীরজনীকান্ত বসু ভক্তিবিনোদ।

বাসনা।

কেহ কি করেছ কভু বাসনারে জয় ?
মায়াবিনি বাসনা দুর্জ্জয় ;
স্বপ্নময় মোহময় সংশয় হৃদয়।
লোকমাঝে দেহ পরিচয়।

শূন্যময় হৃদি যবে অবসানপ্রায়,
প্রতিবাদী বাসনা প্রবল.
যার কায়াছায়া কভু নাহি দেখা যায়,
কল্পনাতে হেরি ভূমণ্ডল।

প্রাণময়ী প্রেমময়ী মূরতি অন্তরে,
স্মৃতি তার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর,
বাসনা হৃদয়'পরে জাগে স্তরে স্তরে
কেবা জানে কিবা মনোহর।

'বাসনার নাহি এবে কভু অবসান,
সুখ দুঃখে সদা ভাসমান্ ;
মানব হৃদয়মাঝে করে অধিষ্ঠান,
পুলকিত সকাতর প্রাণ।

বাসনা প্রবলবহ্নি হুতাশ বাতাস,
স্থির নহে-শান্তির কারণ ;
বাসনার তৃপ্তি হেতু এ পান্থনিবাস,
প্রাণ করে স্মৃতি আলিঙ্গন।

সুখদুঃখ কান্নাহাসি মানব-সমাজে,
দিন আসে দিন চলে যায় ;
স্বপন সমান যেন শূন্যেতে বিরাজে,
আশাপুষ্প বিকশিত তায়।

হৃদয়ে সমুদ্রসম প্রমোদ উচ্ছ্বাস,
তৃষ্ণায়ত্ত চাতকের প্রায়,
বাসনা অমর আত্মা নাহিক বিনাশ,
আত্মঘাতী কেন মরে যায়।

হৃদয়েতে বাসনার ঘন আবর্ত্তন,
প্রাণ চাহে ঐশ্বর্য্য কেবল ;
সুখদুঃখ ক্ষণপ্রভা নিয়তি গঠন,
দীর্ঘশ্বাস বহে অবিরল।

বাসনা পিয়াসা ব্যথা আশা আকিঞ্চন,
বিমোহিত করিয়া মায়ায় ;
সতত মানবগণে করে উত্তেজন,
নিঃস্বার্থ বলিয়া স্বার্থ চায়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

TEN COMMANDMENTS.

(আদেশ-দশকম্)

(এই ঘোর কলিকালে প্রায় সকল দেশেরই রমণীগণ স্বামিগণের উপরি কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। এজন্য বিলাতের কোনও এক সাহেব তাহাদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া ইংরাজী ভাষায় নিম্ন-লিখিত শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় এই শ্লোকগুলির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।)

(1)

Remember that I am thy wife
Whom thou must cherish all thy life.

ভার্য্যাহং তব হে নাথ ত্বয়ৈব স্মর্য্যতামিতি।
যাবজ্জীবসি তাবন্মাং সংবর্দ্ধয়িতুমর্হসি॥

ভার্য্যারূপে তুমি মোরে করেছ গ্রহণ,—
মনে মনে ইহা সদা করিও স্মরণ।
এ সংসারে যত দিন বাঁচিয়া রহিবে,
আমার তোয়াজ্ তুমি অবশ্য করিবে!

(2)

Thou shalt not stay out late at night
When lodgers, friends and clubs invite.

সুহৃদ্ভির্বা সভাসদ্ভিঃ পরবেশ্মনিবাসিভিঃ।
আহূতোঽধিকযামিন্যাং মা তিষ্ঠ ত্বং গৃহাদ্ বহিঃ॥

বন্ধু সভাসৎ পর-গৃহ-বাসী জন
যে কেহ করুক্ কভু তব নিমন্ত্রণ,
যখন অধিক রাত্রি হইয়া পড়িবে,
ঘরের বাহিরে তুমি কিছুতে না রবে!

(3)

Thou shalt not smoke in doors and out
Or chew tobacco round about.

ধূমপানং ন কর্ত্তব্যং গৃহান্তে বা গৃহাৎ বহিঃ।
তাম্রকূটং সমন্তাৎ বা চর্ব্বণীয়ং কদাপি ন॥

বাটীর ভিতরে কিংবা বাটীর বাহিরে
ধূমপানে জলাঞ্জলি দিবে একেবারে।
কিংবা তাম্রকূট নামে রহে যেই ধন,
কিছুতেই তাহা নাহি করিবে চর্ব্বণ!

(4)

Thou shalt not praise nor receive my foes
Nor pastry made by me dispose.

ন প্রশস্যা ন চাভ্যর্থ্যাঃ শত্রবো মে ত্বয়া ক্বচিৎ।
মৎকৃতং পিষ্টকং তেভ্যো ন দাতব্যং কদাচন॥

যাহাকে আমার শত্রু বলিয়া জানিবে,
তার স্তুতি অভ্যর্থনা কভু না করিবে।
নিজহস্তে যে পিষ্টক করিব রচন,
না দিবে তাহাকে তাহা কিছুতে কখন!

(5)

My mother thou shalt strive to please
And let her live with us at ease.

যতস্ব সর্ব্বথা নাথ মাতুর্মে চিত্ততোষণে।
আবাভ্যাং সহ তাং নিত্যং বাসয় ত্বং যথাসুখম্॥

আমার মাতার মন তুষ্ট যাহে রয়,
বিধিমতে সেই চেষ্টা করিবে নিশ্চয়।
যাহাতে পরম সুখে আমাদের সনে
থাকিতে পারেন তিনি, রেখো তাহা মনে!

(6)

Remember 'tis thy duty clear
To dress me well throughout the year.

হে নাথ বৎসরং ব্যাপ্য নানাবসনভূষণৈঃ।
মমালঙ্করণং কার্য্যমবশ্যং স্মর্য্যতামিতি॥

বিচিত্র বসনে আর বিচিত্র ভূষণে
সংবৎসর ধরিয়াই পরম যতনে
আমারে সুন্দররূপে রেখো সাজাইয়া,—
কিছুতে এ কথা যেন না যাও ভুলিয়া!

(7)

Thou shalt in manner mild and meek
Give me thy wages every week.

সমালম্ব্য মহাশান্তশিষ্টাচারং নিরন্তরম্।
ত্বদ্ভৃতিং প্রতিসপ্তাহং প্রদাতুং মে ত্বমর্হসি॥

অতি শান্ত-শিষ্ট-ভাব আমার উপর
প্রকাশ করিয়া তুমি রবে নিরন্তর।
প্রতি সপ্তাহেই যাহা করিবে অর্জ্জন,
তাহাই আমার করে করিবে অর্পণ!

(8)

Thou shalt not be a drinking man
But live in strict tee-total plan.

কিঞ্চিদপি সুরাপানং ন কর্ত্তব্যং কদাচন।
মাদকদ্রব্যমন্যচ্চ সেব্যতাং ন ত্বয়া ক্বচিৎ॥

অবধান কর,—এক কথা বলি আমি,
কিছুমাত্র সুরাপান না করিবে তুমি।
এ সংসারে যত দিন জীবিত রহিবে,
কিছুতে মাদক দ্রব্য কভু না সেবিবে!

(9)

Thou must not flirt but must allow.
Thy wife some freedom anyhow.

অন্যাভিঃ প্রমদাভিস্ত্বং ন প্রেমলুলিতং কুরু।
ভার্য্যায়ৈ তে প্রদাতব্যং স্বাতন্ত্র্যঞ্চ কথঞ্চন॥

যোগাবার তরে অন্য রমণীর মন
কোনরূপ কার্য্য নাহি করিবে কখন।
যে কোন প্রকারে হোগ্, ভার্য্যারে তোমার
স্বাধীনতা-সুখে রত রেখো অনিবার!

(10)

Thou shalt get up when baby cries
And try the child to tranquillise.

রোদনে শ্রুতিমাপন্নে স্তনপস্য শিশোর্মম।
ত্বয়ৈব সান্ত্বনীয়ঃ স নিদ্রাং বিমুচ্য তৎক্ষণাৎ॥

স্তন্যপায়ী শিশু মোর যখনি কাঁদিবে,
ক্রন্দনের ধ্বনি তার তখনি শুনিবে।
নিদ্রা ত্যাগ করিয়াই অমনি তখন
অবশ্য করিবে তার সান্ত্বনা-সাধন!

বি-এ, কাব্যরত্নোদ্ভটসাগরোপাধিকস্য
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে দাসস্য।

সংস্কৃতের শব্দ সম্পদ্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

অভিধানও সংস্কৃত ভাষায় কম নহে। অমর,—মেদিনী, হেমচন্দ্র, ত্রিকাণ্ড-বোধ, হলায়ুধ, হারাবলী, বিশ্ব প্রকাশ, ইঙ্গনা, শাশত, নির্ঘণ্টু, অভয়, নানার্থ ধ্বনি মঞ্জরী, একাক্ষর কোষ, ইত্যাদি অনেক প্রকার অভিধান এখনও দেখিতে পাওয়া যায়; ইতঃপূর্ব্বে হয়ত আরও ছিল, ক্রমে লুপ্ত

হইয়াছে। এই সমস্ত অভিধানে নানা ভাবে নানা প্রকার শব্দ সঞ্চিত থাকিয়া ভাষার সমৃদ্ধি প্রকাশ করিতেছে।

তারপর আবার একই শব্দের নানাপ্রকার অর্থও বড় কম নাই। এই সব কারণে সংস্কৃত ভাষা অতি সুন্দর ও মনোহররূপে মনোভাবকে প্রকটিত করিতে স্পর্দ্ধা করে এবং তাহাতে সে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্যও হইয়া থাকে।

কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া থাকেন যে, সংস্কৃত ভাষা তেমন করিয়া বীররস প্রকাশ করিতে সক্ষমা নহেন, এ বিষয়ে বোধ হয় এখন আর বাদানুবাদ করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ এরূপ সন্দিগ্ধ লোক এখন না থাকিবারই সম্ভব। যাহা হউক, এইরূপ যদি কেহ থাকেন, তাঁহাদিগকে আমি বেণীসংহার নাটকখানি একবার পড়িতে অনুরোধ করি। উইলসন সাহেব স্বীয় বেণীসংহারের মুখবন্ধে যে সমালোচনাটি লিখিয়াছেন, তাহাও একবার তাঁহাদিগকে পাঠ করিয়া দেখিতে বলি। যদি কেহ বেণীসংহারের অর্থবোধ করিতেও অসক্ত হন, তথাপি আমার বিশ্বাস যে, শব্দের ও ভাষার প্রভাবেই তিনি স্বীয় ধারণা পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবেন। তার পর মাঘ, ভারবী প্রভৃতির বক্তৃতাগুলি এবং অন্যান্য সাহিত্য নাটকের কথা তো ছাড়িয়াই দিলাম।

বর্ণনার বিষয়ের উপযোগী শব্দ সংযোগ দ্বারা শব্দের ধ্বনির সহায়তাতেই বর্ণিত বিষয়ের রস পাঠকের মনে উদ্দীপনা যে কেমন সুন্দররূপে করা যাইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত সংস্কৃত ভাষায় যত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই ভাষায় তাহা যত সুন্দররূপে প্রকটিত হইতে পারে, এমন আর অন্য সাহিত্যে হইতে পারে কি না জানি না।

কাদম্বরী, দশকুমার, ইত্যাদির গদ্যভাগ এবং কুমার, ভারবী, মেঘদূত, রঘুবংশ, মাঘ, নৈষধ ইত্যাদি কাব্য, বীরচরিত, মালতীমাধব, উত্তরচরিত, শকুন্তলা মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস ইত্যাদি নাটক ইত্যাদির বিষয় আলোচনা করিলে এ বিষয় বিশেষরূপে প্রতিভাত হইবে।

শব্দসম্পদ্ ইহার প্রধান কারণ; প্রত্যেক বস্তু বা কার্য্যের উপযুক্ত নানা আকারের নানা ছন্দের এবং নানা ধ্বনি ও ভাবসমন্বিত শব্দ বাহুল্য থাকায় কবি বা লেখক স্বীয় ইচ্ছামত ভাবের উপযুক্ত শব্দাবলী সংগ্রহ করিয়া সুন্দররূপে সেই ভাবের অভিব্যক্তি করিয়া দিতে সক্ষম হন, শব্দের পর

শব্দ আনিয়া, বাক্যের পর বাক্য সজ্জিত করিয়া, পাঠককে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারেন, অথচ পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হইতে হয় না।

আমাদের এই কথার প্রমাণ পাঠকবর্গ যে কোন সাহিত্য বা নাটকের মধ্য হইতেই বোধ হয় পাইতে পারিবেন।

অবশ্য এইরূপ উপযুক্ত শব্দ নির্ব্বাচন ও যোজনার ক্ষমতা সকলের নাই, কিন্তু সেটা তাঁহার বুদ্ধি বা বিবেচনা শক্তির অল্পতা, ভাষা তাহার জন্য দোষী নহে। ভাষার উদ্যানে অসংখ্য নানাবর্ণের, নানা আকারের পুষ্প সর্ব্বদা প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, উপযুক্ত মালাকর তাহার মধ্য হইতে পুষ্প নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া মালা গ্রন্থন করিবেন;—মালার চমৎকারিত্ব তাঁহার নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে, উদ্যানকে দোষী করিবার উপায় নাই।

কিন্তু উদ্যানে যদি এই পুষ্পসম্ভার না থাকিত, তবে তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য থাকিলেও কিরূপে মাল্য রচনায় তাহার পরিচয় দিতে পারিতেন।

শব্দ নির্ব্বাচন ও যোজনাও একটি বিশেষ শক্তি; জহরতের খাঁটি ও ঝুঁটা নির্ব্বাচন করা সাধারণ জহুরীর কার্য্য নহে।

আমাদের বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের কন্যা বলিয়া তাহারও শব্দসম্পদ্ কম নহে এবং উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে তাহাও অতি সুন্দর মাধুর্য্য বিতরণে সক্ষম, তাহা সুকবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন। বুঝিতে পারা যদি নাও যায়, তথাপি তাহা শ্রবণ বা পাঠ করিলেই একটা প্রসন্নতা বা তদুপযোগী কোন একটা ভাবের আবির্ভাব মনে মনে হইয়া থাকে। হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যা, ভারত সঙ্গীত, পদ্মের মৃণাল ইত্যাদির প্রভাব কিরূপ, তাহা সকলেই বোধ হয় জ্ঞাত আছেন।

এই শব্দসম্পদের বলে ঠিক ভাব বা কার্য্যের অনুকারী কবিতার মাধুর্য্য সংস্কৃত কাব্য নাটকাদিতে খুব বেশী পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যাঁহারা সামান্য দু-চারখানি ভাল কাব্য নাটকাদিও পড়িয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

শকুন্তলা, উত্তররাম চরিত, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস, চণ্ডকৌশিক, বেণী-সংহার, বিক্রমোর্ব্বশী ইত্যাদি নাটক এবং প্রধান প্রধান গদ্য ও পদ্য কাব্যাবলী ইহার প্রভূত সাক্ষী হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছে। অধিক কথা কি, জ্যোতিষ এবং গণিত গ্রন্থেও এই মাধুর্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শব্দসম্পদ এ বিষয় প্রধান সাধক, ইহা ব্যতীত

ছন্দঃ এবং অলঙ্কার বৈচিত্রও ইহার একটি কারণ। নানাপ্রকার যতি ও গণ সমন্বিত ছন্দের অবতারণা দ্বারা সংস্কৃতের মাধুর্য্য যে বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং এই সব ছন্দঃ মানবহৃদয়ের গূঢ় ভাবের এবং প্রবৃত্তির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হওয়ায়, উপযুক্ত ভাব অনুসারে ছন্দটির প্রয়োগ করিয়া দিলে, ছন্দের গুণেই হৃদয়ে যেন স্বতঃই তত্তৎ ভাবের উদ্দীপনা হয়;—

"যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
অন্তর্বাষ্পভরোপরোধি গদিতং চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মমতাবদীদৃশমহো—স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়া বিশেষদুঃখের্ণবৈঃ।

অথবা—

"হাহা দেবি ক্রটতি হৃদয়ং ত্রংসতে দেহবন্ধঃ"

ইত্যাদি কবিতা পাঠ করিতে কাহার নয়ন না অশ্রুকলুষিত হয়? ইহার মধ্যে যেন এমন একটা বেদনার ভাব মাখান আছে, যাহাতে শ্রোতৃ-মাত্রেরই হৃদয়ে সেই বিষাদের ছায়াপাত হইয়া থাকে।

'রতি বিলাপ' এবং 'অজ বিলাপ' পড়িতে গেলে, বোদ্ধা তো না অধীর হইয়া পারিবেনই না, আমাদের বোধ হয় এবং বিশ্বাস যে, ঐ ছন্দঃ এবং শব্দ যোজনারই এমন একটা প্রভাব আছে, যাহাতে তাহা সকলকেই একটা বিষাদভারে আচ্ছন্ন করিবে। মেঘদূতের সেই বেদনাময় কবিতাগুলির উপরও আমরা ঠিক এই মতই প্রকাশ করি।

মালতীমাধব নাটকের বহুস্থলে সংস্কৃতের শব্দসম্পদের উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ছন্দের সহায়তা করিবার জন্য এইরূপ শব্দ বাহুল্যের একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। আমাদের বোধ হয় যে, যতই মনীষিগণ মানবীয় নানা ভাবের অনুযায়ী নব নব ছন্দঃ প্রণয়ন করিয়াছেন, ততই ক্রমশঃ তাহাদের অঙ্গরাগবর্দ্ধন জন্য শব্দের নব নব পর্য্যায় বা প্রতি শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। সংস্কৃত ছন্দঃ শাস্ত্রের ন্যায় এত বিস্তৃত, বিচিত্র নানাপ্রকার ছন্দ ভাণ্ডার ছন্দঃ শাস্ত্র অন্য ভাষায় আছে বলিয়া বোধ হয় না, এবং ছন্দ সম্বন্ধে এরূপ কাঠিন্য এবং দৃঢ়তাও অন্য ভাষার অলঙ্কার শাস্ত্রে আছে কিনা জানি না। এই ছন্দের বাঁধাবাঁধি শব্দসম্পদ্ বৃদ্ধির সহায়তা বিশেষ ভাবে করিয়াছে বলিয়া আমাদের বোধ হয়। এজন্যই যে সমস্ত শব্দ

কাব্যশাস্ত্রে অধিক পরিমাণে প্রযুক্ত হয়, সেই সমস্ত শব্দেরই অধিক বৈচিত্র আমরা লক্ষ্য করি। পার্থিব এবং অপার্থিব বস্তু, গুণ ইত্যাদির নাম-বৈচিত্রই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কারণ এ গুলির সাহিত্য-রাজ্যে কার্য্যকারিতাও অধিক।

তারপর অলঙ্কার বৈচিত্র্যও এই শব্দ সম্পদের অন্যতম কারণ বলিয়া আমাদের অনুমান হয়। অলঙ্কার শাস্ত্র সংস্কৃতের শোভা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির পক্ষে কম আনুকুল্য করে নাই। শব্দ ও ছন্দ প্রাচুর্য্যের সহিত এই নানা প্রকার অলঙ্কার ভাষার প্রকৃতই অলঙ্কার হইয়া পড়িয়াছে। অলঙ্কারও স্বীয় প্রভাব ভাষার উপর বিস্তারের সুবিধার জন্য অনেক শব্দসঙ্কলন করিয়াছে, এরূপ আমাদিগের ধারণা। সংস্কৃত শাস্ত্রে অলঙ্কার সংখ্যায় কম নহে; শব্দালঙ্কার শব্দের বৈচিত্র্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং শব্দালঙ্কারের দ্বারা শব্দ সৃষ্ট হওয়া বিশেষ স্বাভাবিক। তারপর অর্থালঙ্কারও স্বীয় স্বীয় ভাব প্রস্ফুট করিবার জন্য যখনই কোন শব্দের অভাব অনুভব করিয়াছে, তখনই একটি নূতন অর্থবান্ শব্দ সৃষ্টি বা কোন প্রচলিত শব্দের নূতন অর্থ প্রকট করিয়াছে। সেই শব্দমালা ন্যায়ানুমোদিত হইয়া ভাষার অঙ্গ শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। শব্দালঙ্কারিক কবিগণ যিনি যে পরিমাণে সংস্কৃতের শব্দভাণ্ডার আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তিনি সেই পরিমাণে উক্ত অলঙ্কার দ্বারা ভাষার এবং সাহিত্যের বৈচিত্র্য সম্পাদনে সক্ষম হইয়াছিলেন।

অর্থালঙ্কারিকগণের পক্ষেও এ কথা প্রযোজ্য, তবে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় অলঙ্কারের ভাব গাম্ভীর্য্য এবং গূঢ়ত্বের দিকেই অধিক দৃষ্টি রাখিয়াছেন বলিয়া, তাহা এতদূর লালিত্যসম্পন্ন।

অতএব আমরা বোধ করি যে, সংস্কৃতের যে প্রচুর শব্দ সম্পদ্ আমরা এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি, তাহার উপর ছন্দ এবং অলঙ্কারের অনেকটা কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে।

মানবীয় নানাপ্রকার মানসিক ভাবের গূঢ় অধ্যয়ন, প্রকৃতির অতুল শোভাসম্পদ্ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ইত্যাদি কবি-হৃদয়ের সম্পত্তি, এগুলিতেও সংস্কৃতের শব্দভাণ্ডার যথেষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

এইরূপ করিতে করিতে সংস্কৃতভাষার উদ্যান বহুমূল্য নানাবিধ শব্দকুসুমে ভূষিত,—সংস্কৃতের ভাণ্ডার শব্দরত্নরাজিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এবং সুদক্ষ মালাকারগণ স্বীয় স্বীয় নৈপুণ্যবলে তাহা হইতে উপযুক্ত পুষ্প এবং

মণিরত্ন নির্ব্বাচনপূর্ব্বক এমন মোহনমালা গাঁথিয়াছেন যে, যে দেখিতেছে, সেই মুগ্ধ হইতেছে এবং আমরাও দ্রষ্টৃগণের বিস্ময়ে আনন্দাপ্লুত এবং স্পর্দ্ধিত হইতেছি। এমন মধুরভাষিণী বীণানিনাদগঞ্জিনী ভাষার আদর হউক—কে না প্রার্থনা করিবে ?

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

যাহা চাই, তাহা কৈ ?

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

আমরা অনেক শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রাচীন পণ্ডিতগণ ধরিয়া পুরস্ত্রীর সহিত বঙ্গের অজাতশ্মশ্রু যুবকগণের মধ্যে এই বিষয়ের উত্থাপন করিয়া দেখিয়াছি, সকলেই একবাক্যে উপরোক্ত কু-নিয়মগুলির পরিবর্ত্তনপ্রার্থী। আমাদের ন্যাশেনাল কংগ্রেস, নামে ন্যাশেনাল—কার্য্যে পারস্ন্যাল। তবে সুখের কথা যে, এতদিন পরে বিগত জাতীয় মহাসভার অধিবেশনের সময় "সোসিয়াল কনফারেন্স" নামে যে একটি বক্তৃতাময় প্রহসনের অভিনয় হইয়াছে, উহা দ্বারা ভাবী উন্নতির বীজ রোপিত হইয়াছে।

অতঃপর উক্ত কনফারেন্স যদি প্রকৃতই সামাজিক উন্নতিজনক কার্য্য করিতে পারেন, তবে যাহা ১২।১৩ বর্ষের অধিবেশনে হয় নাই, তাহা দুই এক বর্ষেই সুসম্পন্ন হইবে। অতঃপর আর একটী কথা আছে,—বঙ্গের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় আজকাল অর্থকরিবিদ্যা আর রাজ-জাতীর ভাষা শিখিয়া, সংসারে উচ্চভাবে বেড়াইতেছেন বটে; কিন্তু তাহাদের সর্ব্ব-প্রধান শিক্ষা যে শাস্ত্র অধ্যয়ন, তাহা ক্রমশই শিথিল হইতেছে। অতি পূর্ব্বের কথা যাউক, ভারতের মধ্যযুগে ব্রাহ্মণগণ পুত্রকে উপবীত করিয়া বাড়ীতে রাখিয়া সন্ধ্যা, পূজা, ব্রত ইত্যাদি শিক্ষা দিয়া, তাহার পর অধ্যাপকের নিকট ব্যাকরণ, স্মৃতি, শ্রুতি, ন্যায়, দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন। দশবিধ সংস্কার তো অগ্রেই শিক্ষা হইত—কাজেই তৎকালে ব্রাহ্মণের প্রকৃত মহত্ব এবং ব্রাহ্মণেতর জাতীর নিকট অক্ষুণ্ণ মর্য্যাদা স্থাপিত হইত। আর এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। হিন্দু রাজাও নাই, হিন্দুর হিন্দুত্বও নাই। এখন ব্রাহ্মণগণ পুত্রকে

ইংরাজী বুলি ধরাইয়া শাস্ত্র শিক্ষা দূরে থাকুক, আচার ব্যবহারে পর্য্যন্ত বজ্জিত রাখেন, কাজেই ব্রাহ্মণেতর জাতী আর সেরূপ ভক্তি করে না অথবা "গুরু" বলিয়া স্বীকার করে না।

এইরূপ ভাবে ব্রাহ্মণজাতীর অধঃপতন যাহা ঘটিতেছে, উহা নিবৃত্ত করিতে হইলে কোন শক্তিধর প্রতিভাশালী ব্যক্তি অগ্রবর্ত্তী না হইলে আর উপায় নাই—কিন্তু সেরূপ শক্তিধর প্রতিভাবান ব্যক্তি বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে অতি বিরল। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় কিম্বা দেবীবর ঘটক, রামমোহন রায় প্রভৃতির ন্যায় ব্যক্তি ভিন্ন একের জীবনে এরূপ দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে না—তাই বলিতেছিলাম, আমাদের জাতীয় মহাসভা উক্ত ব্যক্তিগত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে নিশ্চয়ই আমরা আবার ভারতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইব—সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় ভারতের সেই অতীত গৌরব আবার উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে। ব্রাহ্মণপ্রধান দেশের উন্নতি যে ব্রাহ্মণ হস্তে আলখ্যের ন্যায় আবদ্ধ, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবে না।

আমরা সেই জন্য আমাদের এই জাতীয় মহাসভার নিকট সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ-উন্নতি কামনা করি—তাহার পর আরো তিনটী দেশব্যাপী প্রার্থনা আছে।

এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য বঙ্গের সমগ্র ব্রাহ্মণজাতী একত্রিত হইয়া একটি "ব্রাহ্মণ সমিতি" গঠন করিতে পারিলে কার্য্য আরো সুগম হয়। বর্ত্তমান কায়স্থ পুত্রগণ যেমন উপবীত ধারণ জন্য সভা করিতে অতি ব্যগ্র, সেইরূপ একটি প্রতিকূল বান্ধ দিতে আমরা ব্রাহ্মণজাতীকে আহ্বান করি—কিন্তু এই সভারূপ বান্ধ দ্বারা কোন জাতীর সহিত ঘাত সহিষ্ণুতার আবশ্যক নাই, কেবল নিজ নিজ ব্রাহ্মণত্ব স্থির করিতে হইবে মাত্র। আইস ভাই—ব্রাহ্মণ-গণ! আমরা এই কার্য্যে অগ্রসর হই—একটি ব্রাহ্মণসভা কোন বৃহৎ নগরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কংগ্রেসের ন্যায় কার্য্য করিতে পারিলে নিশ্চয়ই সর্ব্বজনীন হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাতে দলাদলি নাই, দ্বেষাদ্বেষী নাই। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যবর্ণের হিন্দুগণ পর্য্যন্ত এই কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হউন, কেন না, ব্রাহ্মণের উন্নতি ভারতের উন্নতি। এইরূপ ভাবে অগ্রে দেশহিতকর কার্য্য না হইলে "ভারত যে আঁধারে সেই আঁধারে থাকিবে।"

তাহার পর ধরুন—কৃষি।—এই যে বর্ষে বর্ষে ভারতের নরনারী দুর্ভিক্ষের ভীষণ পেষনে নিষ্পেষিত হইতেছে—কোটি কোটি ভারতবাসী উদরান্নের জন্য পরমুখপ্রেক্ষী হইয়া কঙ্কালসার হইতেছে—কৃষির অবনতি

কি ইহার মূল নহে! অতি পূর্ব্বকালে যখন ভারতবর্ষ শস্যশ্যামলা বসুধার কেন্দ্রস্থান ছিল, তখন যে পরিমাণে লোকসংখ্যা ছিল, ঠিক্ সেই পরিমাণে কৃষিজমীর আবাদ হইত।

ভারতীয় কৃষক যদিও বৈজ্ঞানিক নিয়মে কৃষিকার্য্য করিতে অভ্যস্ত নহে, তথাপি যেভাবে—যেরূপে যে আকারে কৃষিকার্য্য হইত, সেইরূপ আকারে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইত। ধান্য, গোধূম, যব, মসুর, মটর, ছোলা, তিল, সরিষা, ইক্ষু চিরদিনই ভারতীয় কৃষির অবলম্বন। তাহার পর পাট্, হরিদ্রা, লঙ্কা ইত্যাদিও আছে।

এই সকল কৃষিজাত অর্থ দ্বারা ভারতের ভীম উদর পূর্ণ হইয়া আবার সময় সময় কোটি কোটি মণ দ্রব্য মজুত থাকিত। মধ্যকালের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নবাব সায়েস্তাখাঁর সময় ১৲ টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রয় হইত। ১২ সের তৈলের মূল্য ১৲ এক টাকা ছিল। ইংরেজ শাসনের প্রথমে মহম্মদরেজাখাঁর অধীনে এক হুগলির গোলায় ১০ লক্ষমণ ধান্য আর প্রভূত গম আবদ্ধ ছিল। তখন সাধারণ গৃহস্থ আহারের জন্য মাত্র লবণ ব্যতীত প্রায় অন্য দ্রব্য ক্রয় করিত না—আর আজ—ভাবিয়া দেখিলেও হৃদয় শিহরিয়া উঠে।

তৎকালে ভারতে কৃষিকার্য্যের উপরোক্ত জমির অল্পতা ছিল না—ভূমির উর্ব্বরতা ছিল। লোকসংখ্যা কম ছিল। বৈদেশিক রপ্তানি প্রায়ই হইত না। কৃষক-পুত্র কৃষক ছিল। আর এখন হইতেছে রেল রাস্তার বিস্তারে রপ্তানীর সুগমতা, জল নিকাশের অসুবিধা, লোকবৃদ্ধির বহুলতা, কৃষক-পুত্রের প্রাইমারি বিদ্যাশিক্ষাজনিত, বিলাসিতা, কৃষি জমির অল্পতা, বহুবিধ অলসতা, কাজেই এখন দেশে শস্য উৎপত্তি কম হয়, কিন্তু খাইবার লোক আর লইবার লোক যথেষ্ট আছে। সুতরাং দুর্ভিক্ষ না হইবে কেন?

এই সমস্ত অভাব যাহাতে বিদূরিত হয়—এই দুর্দ্দিনে তাহার উপায় করিতে না পারিলে আর ভারতের দুর্ভিক্ষ নিবারণ হইবে না, কেবল রাজ-শক্তির উপর সমস্ত বিষয় নির্ভর করিলে চলিবে না। যাহারা খাইবে, তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি এবং পরিশ্রম কৌশলের পূর্ণ আবশ্যক। নতুবা "ঘরে ছুঁচার কীর্ত্তন, বাহিরে কোঁচার পত্তন" হইলে চলিবে না। পেটে অন্ন না থাকিলে রাজা প্রজা উভয় তখন এক হইয়া উঠে—মাতৃকোলে শিশুর সদ্যপ্রসূত শরীর শুকাইয়া যায়। কুলবধূ তখন রাজপথে ভিক্ষার

অভাবে শাক কচু খাইয়া জীবন অতিবাহিত করে। এই জন্যই বলিতেছিলাম, যা চাই—তা পাই কই?

আমাদের কংগ্রেস যদি এতদিন এই কৃষিবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন, তবে আর আজ আমাদের দয়ালু গবর্ণমেণ্ট লক্ষ্মীর পুত্র ভারতবাসীর জন্য মার্কিন, জর্ম্মানি, রুষিয়া, লণ্ডন হইতে ভিক্ষা করিয়া প্রজার জীবনরক্ষার জন্য উদ্‌গ্রীব হইতেন না। আমরাও পরমুখপ্রেক্ষী হইয়া উদরপূরণ জন্য হাঁ করিয়া থাকিতাম না।

তাহার পর ধরুন—শিল্প। একদিন এই অভিসপ্ত পরাধীন জাতীর জন্মভূমি হইতে শিল্পজাত দ্রব্য জগৎময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সুদূর ইউরোপ একদিন এই ভারতীয় শিল্পের প্রশংসা একমুখে করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ভারতীয় শিল্পবিদ্যাই পাশ্চাত্যজাতীর শিল্পশিক্ষক, ইহা ইতিহাস চিরদিনই সাক্ষ্য দিতেছে। যদিও অভিনব বৈজ্ঞানিক শিল্পের প্রথরতাংশ ভারতে বহু বিস্তৃত নয়, তথাপি এখন ভারতে ভূরি ভূরি শিল্পকৌশল পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। দীল্লির "কুতব মিনার" আগ্রার "তাজমহল" জয়পুরের "মানমন্দির" ঢাকাই "মস্‌লিন" কাশ্মীরি শাল, বাণেশ্বরের প্রস্তরকার্য্য—খাগড়াই বাসন, শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গার ধুতি কাপড়, রংপুরের সতরঞ্চ—আর কত নাম করিব? ইহাত এখনো জাগ্রত।

দেশ যখন যেরূপ ভাবে পরিচালিত হয় অথবা যেরূপ ভাবের রাজশক্তি দ্বারা শাসিত হয়, দেশে তখন সেইরূপ ভাবের শিল্পের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইয়া থাকে—ইহা প্রকৃতির সমীকরণের অবশ্যম্ভাবী ফল। ভারত এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার শাসনে অনুপ্রাণিত সুতরাং এখানে এই ব্যাস বাল্মীকি অর্জ্জুন ভীষ্মের জন্মভূমিতে সিজর, হানিবল, রবার্টসের আদর্শ পূর্ণরূপ প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং আজ কালের আবশ্যকীয় শিল্পবিদ্যা এবং কৌশল লইয়া সাবেক কালের "মরিচাপড়া" শিল্প ছাড়িয়া দিতে হইবে।

অতঃপর ভারতের প্রত্যেক নর নারীকে আবশ্যকীয় শিল্প এবং দেশব্যাপী শিল্পালয়ে গিয়া শিক্ষা করিতে হইবে। গৃহস্থালীর খুঁটি নাটী কার্য্যটি হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গোৎসব পর্য্যন্ত যখন আজ কাল শিল্পজাত দ্রব্যের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিত চলিতে হইবে—তখন ঘরে ঘরে শিল্প আর শিল্পী চাই—এইজন্য বলি যে, আমাদের যাহা আবশ্যক, তাহা কই?

যদি কেহ মনে করেন যে, রাজশক্তি প্রবলরূপ উন্নত না হইলে প্রকৃতরূপ দেশব্যাপী শিল্প শিক্ষা এবং কৃষি শিক্ষা হইতে পারে না, তবে আমরা তাহাকে এই মাত্র বলি যে—আজন্ম অসভ্য জাপান আজ জগতের দ্বিতীয় শক্তি বলিয়া যে এত উচ্চে মস্তক উঠাইয়াছে, উহারও প্রথমে সমাজ শিল্প কৃষি উন্নত করিয়া তবে রাজশক্তি রাজনীতির উন্নতি করিয়াছে। আবার সভ্য বুয়র লক্ষ্মী শিল্প আর সমাজের অবনতিতে আজ অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়াও ইংলণ্ডের নিকট পরাজিত।

শিল্পের উন্নতি রাজনীতির একটি স্বর্ণমাখা অঙ্গ। সুতরাং অগ্রে আমাদের শিল্পবিষয়ক শিক্ষার উন্নতির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই জন্য আমাদের প্রার্থনা যে, যখন ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা শিল্পের উন্নতি অনিশ্চিত; তখন আমাদের সমগ্র দেশের মুখপাত্র কংগ্রেস এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে আশা করি, ভবিষ্যতে শিল্পের উন্নতি হইতে পারে।

এই যে সে দিন—বিগত অধিবেশনে কংগ্রেসের দ্বারা একটি কৃষি শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল—উহা যদি কংগ্রেসের জন্ম হইতে উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে ভরসা করি, আজ ভারতভূমি দুরূহ বৈজ্ঞানিক শিল্পের পর্য্যন্ত উন্নতি করিতে পারিত।

বিধাতার অপার করুণা—তাই এতদিন পরে কংগ্রেসময় জীবন বাবুগণের মতি গতি কৃষি শিল্পের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

এখন ধরুন—মানবজাতীর সংসারিক উন্নতির সর্ব্বময় উন্নত ক্রিয়া—বাণিজ্য। যাহা দ্বারা অসভ্য জাপান আজ জগতে উন্নতির গন্তব্য রেখায় অদ্যাপিও "শিশু জাপান" নাম ছাড়িতে পারে নাই! যে বাণিজ্য-তরীর নাবিক আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের বণিক ইংরেজ, এই ধনধান্যশালিনী বীরজননী প্রকৃতির রম্যক্ষেত্র ভারতের একছত্রী রাজা,—সেই মহামহিমাময়ী বাণিজ্য ক্রিয়া আজ ভারতের বিশাল বক্ষ হইতে যেন অনন্ত নীল শূন্য প্রদেশে লীন হইয়া গিয়াছে।

শুনিয়াছি, আমাদের দেশীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ী সওদাগরগণ না কি বহির্বাণিজ্য করিতেন, কিন্তু তাহা আবার ভারত সাগরের ধারে ধারে দ্বীপপুঞ্জে মাত্র! ধনপতি সাগরের সিংহল বাণিজ্য তাহার দৃষ্টান্ত! দুঃখের কথা—যে জাতীর শিশু বৃদ্ধ পর্য্যন্ত জানে যে, "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী" সেই জাতীর ভাগ্যে বিধাতা কেন যে বাণিজ্য প্রথা বিনাশক কতকগুলি

কুনিয়ম তাহাদের শাস্ত্রকারগণের উর্ব্বর মস্তিষ্কে ধারণা করিয়া দিয়াছেন, বুঝিতে পারি না। হায় ভারতভাগ্য! তোমার শাস্ত্রবিধি যেমন তোমার রত্ন; আবার তোমারি অপ্রস্তাবিক শাস্ত্রবিধি তোমার উন্নতি পথের মহা-কণ্টক। যাহা হউক, বাণিজ্য যে সংসারিক জীবনে উন্নতির মহাকণ্টক, তাহা ভারতবাসী জানিত বলিয়াই "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী" বলিয়া থাকে।

এক দেশের কৃষি শিল্পজাত দ্রব্য অন্য দেশের সহিত আদান প্রদানে যে অর্থ উপার্জ্জিত হয়, উহাকে বাণিজ্য ব্যবসা কহে। এই বাণিজ্য ব্যবসা দ্বারা আজ ইংরেজজাতী কোটি কোটি ভারতবাসীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াছে। বাণিজ্য ক্রিয়া মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ ইচ্ছাশক্তি—কেন না এক ব্যক্তির জীবন ধারণের সভ্য ভাবের দ্রব্যাদি কখনো সেই একই ব্যক্তি দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারে না। হইলেও তাহা মানবের প্রকৃতিগত ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। এইজন্য মানুষ, মানবেতর জাতীর ন্যায় সাত্যন্ত্রনীতির বাধ্য নহে। আসঙ্গনিপাপ একটি মানবীয় মহা প্রকৃতি। মনুষ্য সমাজ-বদ্ধ হইয়া বাস করে এবং পরস্পর পরস্পরের মুখ চাহিয়া থাকে। এইজন্য সভ্যাসভ্য মানবমাত্রেই বণিকবৃত্তি কুশলতায় অভ্যস্ত। তাই মানবজাতী বাণিজ্য লইয়া সাংসারিক উন্নতি করিতে চাহে, কিন্তু আমরা বর্ত্তমানে এমনি হীন অবস্থায় পড়িয়াছি যে, মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছি।

বাণিজ্য শক্তির প্রসারতা পরিবর্দ্ধিত না হইলে দেশে ধনাগম সুগম হয় না। আবার ধনাগম সুবিধামত না হইলে দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতি হয় না। সুতরাং যাহাতে ভারতীয় লোকে বাণিজ্য করিতে অভ্যস্ত হয়, তাহা শিক্ষা করা উচিত। আমরা দীর্ঘ দিন পরপদসেবনতৎপর হইয়া স্বাবলম্বন বিস্মৃত হইয়াছি—তাই বাণিজ্য পর্য্যন্ত ছাড়িয়া চাকুরি করিতে অভ্যস্ত হইতেছি। পরাধীন জাতীর বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইতে পারে না, ইহা যাহারা বলেন, তাহারা ভারতের জ্ঞান, ধর্ম্ম, পারিশ্রমিক ক্ষমতা পর্য্যা-লোচনা করুন, দেখিবেন, পর অন্নে প্রতিপোষিত ভারতবাসী আজ এতটা উন্নতি করিয়াছে। যাহা হউক, বাণিজ্য বিষয়ে উন্নতি না হইলে ভারতের মঙ্গল নাই, অগ্রে অন্তর্বাণিজ্য পরে বহির্বাণিজ্য বিষয় দেখিতে হইবে।

এই যে আমাদেরই শ্রমজাত রাশী রাশী দ্রব্য অকাতরে জাহাজ বোঝাই হইতেছে, ইহা হইতে বিদেশী বণিক কোটি কোটি অর্থ উপার্জ্জন করিয়া

লক্ষ্মীর বরপুত্ররূপে গণ্য হইতেছে। ইহা দেখিয়া কি আমাদের চৈতন্য হইতেছে না?—এই বাণিজ্য উন্নতির পথ যে ব্যক্তি ভারতীয় লোক সমূহকে দেখাইয়া দিতে পারিবেন, তিনিই প্রকৃত ভারত সন্তান—এই জন্য আমরা বলি যে, আজ আমরা প্রদীপ জ্বালিবার পল্‌তে ও দেশালাই পর্য্যন্ত বিলাতী শিল্পি বণিকের নিকট হইতে না লইয়া যাহাতে আপন আপন কার্য্য আপনা হইতে সহজে হইতে পারে, তাহা আমাদের সমগ্র দেশের মুখপাত্র কংগ্রেস দৃষ্টি করিবেন কি?

এই সকল অত্যাবশ্যক কার্য্য লইয়া এতদিন যদি জাতীয় মহাসভা কার্য্য করিতেন, তবে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। আজ কাল আমাদের রাজনীতির পথে হাঁটিবার কতকটা ক্ষমতা জন্মিয়াছে, বটে কিন্তু সে শক্তি যে পরের অন্নবলের উপর নির্ভর করে। আজ যদি ম্যাঞ্চেস্‌টার একদিন কল বন্ধ করিয়া দেয় অথবা দৈবাৎ কোন দৈব ঘটনায় জাহাজ আসিতে ২ দিন বিলম্ব হয়, তবে এ জাতী অন্নবস্ত্রের অভাবে বন্যপশুর সঙ্গে একত্র বাস করিতে আরম্ভ করিবে।

এই জন্য আমরা বলি যে, "যা চাই, তা কই" যখন সাংসারিক অসচ্ছলতা বিদূরিত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দ উদরে দুটি অন্ন দিতে পারিব, তখন নয় বলিব, হে ইংরেজ! আমি তোমার সমান হইব। নতুবা সামাজিক অবনতী দ্বারা বংশলোপ, কৃষি বাণিজ্য শিল্প অভাবে খাদ্য লোপ করিয়া, খালি পেটে খালি গায়ে হাতে লাঠি ধরিলে তাহা পড়িয়া যাইবে, ইহা নিশ্চিত সত্য।

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

প্রার্থনার উত্তর।

জড়বাদ-পরিপূর্ণ আধুনিক সভ্যসমাজে প্রার্থনা করা দুর্ব্বলতার পরি-চায়ক; প্রার্থনা করিলে তাহার উত্তর পাওয়া যায় কি না, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা ত দূরের কথা। সভ্য সমাজের মত এই যে, ভগবানের নিকট 'দরখাস্ত' করিবার কোন প্রয়োজন নাই; কারণ, তাহারা বলেন যে, ভগবান কি ঘুষখোর যে, তিনি ঘুষ চাহেন, না তিনি কখন কর্ম্মফল ব্যতিক্রম করিয়া প্রার্থনার উত্তর দিবেন? তাহারা আরও বলেন যে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহাকে কি কখন প্রার্থনার দ্বারা কোন বিষয় পরিজ্ঞাত করিতে হয়, না

যিনি পরম দয়ালু, তাঁহাকে দয়া প্রদর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করিতে হয়? কিন্তু যাঁহারা প্রার্থনা করেন, তাঁহারা জানেন যে, কে যেন প্রত্যক্ষ তাঁহাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়া থাকেন। একজন লোক অর্থের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল, তৎপরে কোন সূত্রে সে সেই অর্থ পাইল; একজন ক্ষুধিত স্ত্রীলোক আহার পাইবার জন্য প্রার্থনা করিল, কোথা হইতে একজন আসিয়া তাহাকে আহার প্রদান করিয়া যাইল; একজন হয়তো দান করিবার জন্য সাধু ইচ্ছা করিয়াছে এবং আর একজনের সেই সময়ে অর্থের অভাব হইয়াছে, সে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নিকট তাহার আকাঙ্ক্ষিত অর্থ পাইয়া গেল এবং পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিরও সাধু ইচ্ছা পূরণ হইল,—এইরূপ ঘটনা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই অবগত আছেন যে, তারকেশ্বরে কিম্বা অন্য কোন দেবতাস্থানে 'হত্যা' দিয়া লোকে ঔষধাদি পাইয়া থাকে। কি প্রকারে এ সকলের ব্যাখ্যা করা যায়, তাহার আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রার্থনার উত্তর সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতে গেলে, সকল প্রার্থনার উত্তর পাওয়া যায় না কেন, সে সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা উচিত। যেমন, কত শত ব্যক্তি ক্ষুধায় প্রপীড়িত হইয়া দুর্ভিক্ষের কালকবলে পতিত হইতেছে, কত শত ব্যক্তি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহারা কি বাঁচিবার জন্য প্রার্থনা করে না? মাতা প্রাণাধিক পুত্রের জীবনের জন্য প্রার্থনা করিতেছে, কিন্তু করালকাল তাহাকে গ্রাস করিতেছে। পত্নী ভগবানের নিকট তাহার প্রিয়তম স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করিতেছে, কিন্তু যম আসিয়া তাহার ক্রোড় হইতে তাহার স্বামীকে লইয়া যাইতেছে,—এই প্রকার সকল প্রার্থনার উত্তর পাওয়া যায় না কেন, তাহার মীমাংসা করা উচিত। সময় সময় এমন দেখিতে পাওয়া যায় যে, সামান্য বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিলে প্রার্থনার উত্তর পাওয়া যায়, কিন্তু প্রিয়তম ব্যক্তির জীবন সকাতরে ভিক্ষা করিয়াও, প্রার্থনার উত্তর পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রার্থনার উত্তর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, কোন্ নিয়মের দ্বারা প্রার্থনার উত্তর পাওয়া যায় অথবা উত্তর পাওয়া যায় না, তাহা সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।

পূর্ব্বোক্ত নিয়ম বুঝিতে হইলে প্রার্থনা সমূহকে বিশ্লেষণ করা উচিত, কারণ 'প্রার্থনা' কথাটীর দ্বারা সংবিতের বিভিন্ন প্রকার কার্য্যকারিতাকে

লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। আমরা সবিশেষ আলোচনা করিয়া অবগত হই যে, যত প্রকার প্রার্থনা হইতে পারে, তাহাদিগকে মোটা মুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, পার্থিব উন্নতি অথবা পার্থিব প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা; যেমন আহার, পরিচ্ছদ, অর্থ, চাকরি, ব্যবসায়ে সফলতা, পীড়া হইতে আরোগ্য, ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, নৈতিক এবং মানসিক কষ্ট হইতে পরিত্রাণের জন্য অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রার্থনা,—যেমন রিপুগণ হইতে পরিত্রাণের জন্য, মানসিক বলের জন্য, মানসিক বিকাশের জন্য, ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ, কোন বিষয়ই চাই না, এইরূপ প্রার্থনা এবং পরমার্থিক চিন্তা ও ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা।

আমরা শাস্ত্রাদি হইতে অবগত হইয়া থাকি যে, এই দৃশ্য জগৎ ভিন্ন অদৃশ্য জগৎ এবং অদৃশ্য জীব সমূহের অস্তিত্ব আছে। উহাদিগকে আমরা স্থূলচক্ষে দেখিতে পাই না। অদৃশ্য জীবসমূহ আমাদিগের আশে পাশে চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে, কিন্তু আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না। এই সকল জীবের ভিতর কতকগুলি প্রভূত অধ্যাত্মিক ক্ষমতা বিশিষ্ট,—ইহাদিগকে কেহ মহাপুরুষ, কেহ মহাত্মা, কেহ দেবতা প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন; এবং অপরগুলির সংবিত মনুষ্যের সংবিত অপেক্ষাও হীন,—ইহাদিগকে ভূত, প্রেত ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। এই সকল অদৃশ্য জীবের মধ্যে কেহ মনুষ্যের অনুনয়ে কর্ণপাত করিয়া থাকে এবং কেহ বা তাহা করে না। এই সকল অদৃশ্য জীব ভিন্ন, মনুষ্য স্বয়ং অসংখ্য অদৃশ্য পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বা সৃজন করিতেছে। মনুষ্য কামনা ও ভাবনার দ্বারা অদৃশ্য জগতে এক প্রকার কম্পন উৎপন্ন করিয়া থাকে, তাহার ফলে ঐ সকল কামনা ও ভাবনা সূক্ষ্ম পদার্থ গ্রহণ করিয়া শরীর ধারণ করিয়া থাকে; উহাদিগকে ভাবনার আকৃতি বা কামনার আকৃতি বলা হয়; এই সকল আকৃতির প্রাণ বা জীবনীশক্তি হইতেছে—মনুষ্যের এক একটী কামনা বা ভাবনা। যাঁহারা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিসম্পন্ন (Clairvoyant), তাঁহারা এই সকল আকৃতি দেখিতে পান। এই সকল আকৃতি দেখিতে অতি সুন্দর ও নানা বর্ণ বিশিষ্ট। মনুষ্য তাহার ভাবনা বা কামনা পূর্ণ করিবার জন্য এই প্রকারে অংসখ্য আদেশবাহক ভৃত্য সমূহকে সৃষ্টি করিতেছে। ইহা ভিন্ন এই পৃথিবীতে আরও এমন কতকগুলি ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা পরোপকার করিবার জন্য সর্ব্বদাই সুযোগ অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহারা আমাদিগের

স্থূল শরীর নিদ্রিত অবস্থায় ত্যাগ করিয়া, সূক্ষ্ম শরীরে কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা সাহায্য পাইবার প্রার্থনা শ্রবণ করিলেই, সাহায্য করিতে উৎসুক হইয়া থাকেন। কিন্তু সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ ভগবান তাঁহার দয়া বিস্তার করিয়া এ পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। যেমন আমাদের শরীরে কিছু স্পর্শ করিলে, স্নায়ু দ্বারা সেই অনুভব মস্তিষ্কে নীত হয় এবং পরে সুখ কিম্বা দুঃখ বোধ হয়, সেই প্রকার ভগবানের এই বিশ্বরূপ দেহে প্রার্থনার স্পন্দন আঘাত করিলে তাহা তাঁহার সংবিতে উপস্থিত হয় এবং তথা হইতে তাহার উত্তর আসিয়া থাকে। স্নায়ু সকল কিম্বা অন্যান্য শারীরিক পরমাণু সমূহ আমাদের অনুভবের নিমিত্ত কারণ মাত্র হইতে পারে, কিন্তু যিনি মনুষ্য-রূপে বিরাজ করিতেছেন, অর্থাৎ আত্মা,—তিনিই কেবল অনুভব করিয়া থাকেন; সেই প্রকার অংসখ্য দৃশ্য ও অদৃশ্য পৃথক পৃথক সত্ত্বা সমূহ নিমিত্ত কারণ মাত্র, যিনি ভগবান তিনিই কেবল প্রার্থনা অবগত হইয়া তাহার উত্তর দিয়া থাকেন। এমন কোন ক্ষুদ্র বিষয় থাকিতে পারে না, যাহা তাঁহার সর্ব্বব্যাপী সম্বিতকে স্পন্দন করিতে সক্ষম হয় না, কিম্বা এমন কোন মহান্ বিষয় থাকিতে পারে না, যাহা তাঁহার সম্বিত অতিক্রম করিয়া যায়। যাহার সম্বিত যত বিস্তৃত হয়, তত শীঘ্র তাহা স্পন্দিত হইয়া থাকে। সুতরাং যে সকল জীব পরোপকার করিতেছেন, তাহারা নিমিত্ত মাত্র, ভগবানই তাহাদিগের ভিতর দিয়া ঐ সকল করিতেছেন; তিনি যন্ত্রী, উহারা যন্ত্র স্বরূপ।

ভগবান পাতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলিয়াছেন যে, "তদ্যথা অমাত্যানাং রাজ্ঞা-সহ সমবায়ে পারতন্ত্র্যং ব্যবায়ে স্বাতন্ত্রম্।" যেমন—লোকে যখন রাজাকে দেখিতে পায় না, কিম্বা দেখিবার আবশ্যক বোধ করে না, তখন তাহারা অমাত্যকেই রাজসম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে, অর্থাৎ লোকে তাহাকে স্বতন্ত্র ভাবিয়া থাকে; কিন্তু অমাত্য যখন রাজার সহিত থাকেন, তখন লোকে তাঁহার পার্থকতা বুঝিতে পারে; সেইরূপ যাঁহারা ভগবানকে দেখিতে পান না, কিম্বা দেখিবার আবশ্যক বোধ করেন না, তাঁহারা ঐ সকল অদৃশ্য মহান সত্ত্বা সমূহকে যে ঈশ্বর ভাবিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমরা লৌকিক জগতে দেখিতে পাই যে, রাজপ্রতিনিধিগণ স্বেচ্ছাক্রমে রাজার আজ্ঞা বা নিয়ম অবহেলা করিয়া কোন কার্য্য করিতে পারে না, তখন তাহাদিগকে রাজা বলিয়া বুঝিতে ক্ষতি কি? লোকে ও তাহাই

করিয়া থাকে। সেইরূপ ঐ সকল অদৃশ্য মহান সত্ত্বা সমূহকে যাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের স্বতন্ত্র কিম্বা পরতন্ত্র বুঝিবার কোন আবশ্যক নাই।

এইবার প্রার্থনার বিভিন্ন শ্রেণী সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। যখন এক ব্যক্তি প্রথম শ্রেণীর প্রার্থনা উচ্চারণ করেন, তখন অনেক উপায়ে তাহার প্রার্থনার উত্তর আসিতে পারে। ঐ প্রকার ব্যক্তি সরল এবং স্বভাবতঃ আস্তিক হয় এবং ক্রমাভি ব্যক্তির (evolution) যে সোপানে সে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই সোপানের উপযোগী, ভগবান সম্বন্ধে তাহার মত জন্মিয়া থাকে; সে ব্যক্তি তাঁহাকে তাহার অভাব পূরণের কর্ত্তা বলিয়া জানে এবং শিশুর কোন প্রয়োজন হইলে সে যেমন স্বভাবতঃ তাহার পিতা মাতার দিকে ফিরিয়া থাকে, সেইরূপ সেই ব্যক্তি তাহার প্রয়োজন পরিপূর্ণ করিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বৃষ্টল নগরস্থ জর্জ মূলারের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তিনি পরোপকারী বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ যখন তাঁহার অর্থ কিম্বা বন্ধু কেহই ছিল না, তখন তিনি কি করিতেন? যে সকল অনাথ বালক-বালিকারা তাঁহার দয়ার উপর জীবনযাত্রা নির্ভর করিয়া থাকিত, তিনি তাহাদিগের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার প্রার্থনা সমূহ, দৃঢ় ও উৎসাহপূর্ণ কামনা মাত্র। সেই কামনা আকৃতি ধারণ করিত; এই আকৃতির জীবনীশক্তি হইতেছে ঐ কামনা। এই স্পন্দিত ও জীবন্ত সত্ত্বা কেবলমাত্র একটী ভাব লইয়া উৎপন্ন হইয়াছে,—তাহা হইতেছে সাহায্যের প্রয়োজন। এই একটী ভাব লইয়া ইহা সূক্ষ্ম জগতে সাহায্য অন্বেষণ করিয়া বেড়াইত। হয় তো এমন হইত যে, সেই সময়েই কোন দানশীল দয়ালু ব্যক্তি দান করিবার জন্য পাত্র ও সুবিধা অন্বেষণ করিতেছিল। যেমন অয়স্কান্ত সন্নিধানে লৌহখণ্ড সমূহ আকর্ষিত হইয়া থাকে, সেই প্রকার সেই ব্যক্তির নিকট পূর্ব্বোক্ত কামনার আকৃতি আকর্ষিত হইবে এবং তাহার ফলে ঐ আকৃতির স্পন্দনের অনুযায়ী স্পন্দন তাহার মস্তিষ্কে উত্থিত হইবে।—মূলার, তাহার আতুর আশ্রম এবং তাহার সাহায্যের প্রয়োজন,—এবং তিনি এই প্রকারে তাহার দানের পাত্র পাইয়া, তৎক্ষণাৎ সাহায্য পাঠাইয়া দিবেন। জর্জ মূলার কিন্তু স্বভাবতঃ ভাবিতেন যে, ভগবান সেই দাতার মস্তিষ্কে সাহায্য করিবার ভাব উদ্রিক্ত করিয়া দিয়াছেন।

ধীরভাবে আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ভগবানই যে ঐ সাহায্য পাঠাইতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রার্থনাকারীর স্বকৃত কামনার আকৃতিই ঐশ্বরিক নিয়ম অনুসারে মধ্যবর্ত্তী প্রতিনিধিস্বরূপ কার্য্য করিয়াছিল।

প্রার্থনার দ্বারা যে প্রকার ফল লাভ করা যায়, সেই প্রকার ফল বুদ্ধি-পূর্ব্বক ইচ্ছাশক্তির চালনার দ্বারাও লাভ করা যায়; তখন প্রার্থনার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা করিবে, কি উপায়ে ইচ্ছাশক্তি পরিচালনা করিতে হয়, তাহা তাহার ভাল করিয়া জানা উচিত। যে ব্যক্তি ইচ্ছাশক্তি পরিচালনা করিতে সম্যক্ অবগত আছে, সে তাহার অভাব সম্বন্ধে পরিষ্কাররূপে চিন্তা করিতে পারে এবং সেই ব্যক্তি তাহার চিন্তার শরীর ধারণোপযোগী সূক্ষ্ম পদার্থ সকল আকর্ষণ পূর্ব্বক, তাহা দ্বারা তাহার চিন্তাকে আবৃত করিয়া, কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট তাহার অভাব জানাইবার জন্য পাঠাইয়া থাকে, কিম্বা তাহার প্রতিবাসীদের নিকট পাঠাইয়া দেয় এবং সেই স্থলে হয়তো কোন দানশীল ব্যক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থলে কোন প্রার্থনার প্রয়োজন নাই, কিন্তু বুদ্ধি পূর্ব্বক ইচ্ছা ও জ্ঞানের পরিচালনা করিতে হয়।

কিন্তু সাধারণ লোকেরা অদৃশ্য জগতের শক্তি সম্বন্ধে এবং তাহাদের চিন্তাসমূহ পরিচালনা করিতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; সেই জন্য কোন কার্য্যের সফলতার জন্য যে প্রকার মনের একাগ্রতা এবং কামনার দৃঢ়তার প্রয়োজন হয়, তাহা তাহারা স্বকীয় শক্তির পরিচালনা করিবার জন্য বুদ্ধি পূর্ব্বক আন্তরিক চেষ্টা দ্বারা অপেক্ষা, প্রার্থনার দ্বারা অতি সহজে সেই কার্য্যের সফলতা সম্পাদন করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল অজ্ঞব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত মত বুঝিতে পারিলেও, তাহাদিগের নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দীহান হইবে; এবং একবার সন্দেহ আসিলে, তাহার আর ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা হইবে না, কারণ ইচ্ছাশক্তির পরিচালনের জন্য সন্দেহ প্রধান অন্তরায়। কিন্তু যে লোক প্রার্থনা করে, সে নিজে কি প্রকারে ঐশ্বরিক যন্ত্র চালাইতেছে, তাহা বুঝিতে না পারিলেও, সফলতা সম্বন্ধে কোন সন্দীহান হয় না। কোন শিশু যেমন কোন বিষয় পাইবার জন্য তাহার হাত বাড়াইয়া সেই বিষয় ধরিয়া থাকে এবং যখন সে ঐ বিষয় ধরিতে যায়, তখন সে হাত বাড়াইলে, তাহার স্নায়বিক প্রসারণের জন্য শরীরের ভিতর যে বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক

কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা বুঝিবার প্রয়োজন হয় না; সে যে জিনিষ চায়, সে জিনিষ পাইবার জন্য ইচ্ছা করিলে তাহার শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্র-সমূহ আপনাআপনি চলিতে থাকে,—সে নিজে কিন্তু ঐ সকল যন্ত্রের ক্রিয়া জানিতেও পারে না। সেই প্রকার যে ব্যক্তি প্রার্থনা করে, তাহারও ঐরূপ হইয়া থাকে; সে নিজে চিন্তার কার্য্যকারিতাশক্তি সম্বন্ধে, কিম্বা তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য সে যে সকল জীবন্ত সত্ত্বা প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইলেও, তাহার প্রার্থনার উত্তর পাইয়া থাকে। ঐ শিশুর ন্যায় সে ব্যক্তিও অবুদ্ধি পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত দুইটী উদাহরণে, ভগবানই প্রধান কারণ, সমুদয় শক্তি তাঁহা হইতে আসিতেছে; এই উদাহরণ দুইটীতে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার ঐশ্বরিক নিয়মের দ্বারা যে যন্ত্র চালিত হইতেছে, সেই যন্ত্রের দ্বারা কার্য্য হইয়া থাকে।

কিন্তু কেবলমাত্র পূর্ব্বোক্ত উপায়ের দ্বারাই যে এই শ্রেণীর প্রার্থনা সমূহের উত্তর পাওয়া যায় তাহা নহে, আরও অন্য উপায় আছে। কোন ব্যক্তি যদি সেই সময়ে স্থূলদেহ হইতে বহির্গত হইয়া অদৃশ্য জগতে ভ্রমণ করিতে থাকেন, কিম্বা কোন ঐশ্বরিক বিভব সম্পন্ন আত্মা,—যাহাকে লোকে দেবতা প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে,—উক্ত সময়ে সেই স্থান দিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহারা সাহায্যের প্রার্থনা শ্রবণ করিতে পান এবং কোন দয়াশীল ব্যক্তির মস্তিষ্কে ঈপ্সিত সাহায্য দান করিবার প্রবৃত্তি প্রেরণ করিয়া থাকেন। সেই দয়ালু ব্যক্তি হয়তো বলিবে যে, 'অমুকের চিন্তা আজ হঠাৎ আমার মনে আসিল এবং তাহার প্রয়োজনে আসিতে পারে বলিয়া, আমি অমনি তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ পাঠাইয়া দিয়াছি।' অনেক প্রার্থনার উত্তর এই প্রকারে আসিয়া থাকে। প্রার্থনা করিলে অদৃশ্য সাহায্যকারীদের দ্বারা সময় সময় আমাদের অভাব পূর্ণ হইয়া থাকে।

কিন্তু এই শ্রেণীর প্রার্থনা যে কেন বিফল হয়, তাহার এক নিগূঢ় কারণ আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি ঋণ করিতেছে, তাহাকে সেই ঋণ শোধ করিতে হইবে; তাহার মন্দ ভাবনা, মন্দ কামনা এবং মন্দ কৃতি, তাহার পথে কণ্টক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে এবং কারাবাসীদিগকে কারা-গৃহের প্রাচীর যেরূপ আবদ্ধ করিয়া রাখে, পূর্ব্বোক্ত মন্দ বিষয় সমূহ

মনুষ্যকে সেইরূপ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কষ্ট সহ্য দ্বারা মন্দ কর্ম্মের ঋণ শোধ করিতে হয়; লোকে যেরূপ মন্দ কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহার সেইরূপ ফলও ভোগ করিয়া থাকে। একজন ব্যক্তির মন্দ কর্ম্মের ফলের জন্য যদি অনশনে প্রাণত্যাগ করা উচিত হয়, তাহা হইলে যতই প্রার্থনা করা হউক্ না কেন, তাহার সেই কর্ম্মফল ভোগ হইবেই। প্রার্থনার ফলে কামনার আকৃতি সমূহ সৃজিত হইবে এবং সেই সকল আকৃতি সাহায্য অন্বেষণ করিতে থাকিবে বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির কর্ম্মফলের জন্য সাহায্য অন্বেষণ করিয়া কিছুই পাইবে না। আমরা নিয়মের জগতে বাস করিতেছি; অন্য শক্তির সংস্রবে আসিয়া আমাদের শক্তি সফল কিম্বা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। আমরা এই পার্থিব জগতে দেখিতে পাই যে, দুইটী সমান গোলাকে সমান শক্তি প্রয়োগ করিতে পারা যায়; তন্মধ্যে একটী গোলাতে অন্য শক্তি প্রয়োগ না করিলে উহা লক্ষ্য স্থানে ঠিক্ পৌঁছাইবে এবং অপর গোলায় অন্য শক্তি প্রয়োগ করিলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া অন্য পথে যাইবে। দুইটী সমান প্রার্থনাও ঐ প্রকার; একটী দ্বারা কার্য্য সফল হইয়া থাকে, উহা লক্ষ্য স্থানে উপস্থিত হয় এবং অপরটী অতীত মন্দকর্ম্মের ফলরূপ শক্তির দ্বারা বিফল হইয়া থাকে, লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। এই প্রকারে একটী প্রার্থনার উত্তর পাওয়া যায় এবং অপরটীর উত্তর পাওয়া যায় না; কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে একই নিয়মের পরিচালনা হইতেছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রার্থনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, নৈতিক এবং মানসিক কষ্টে পড়িয়া সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করিলে দুই প্রকার ফল লাভ হয়; প্রথমতঃ, যে বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করা যায়, সেই বিষয়ের সাহায্য লাভ হইয়া থাকে এবং দ্বিতীয়তঃ, যে লোক প্রার্থনা করে, তাহারও মানসিক উপকার হইয়া থাকে। ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন মহাপুরুষদিগের কিম্বা যাঁহারা স্থূলদেহ হইতে সময় বিশেষের জন্য মুক্ত হইয়া পরের উপকার করিয়া বেড়াইয়া থাকেন, তাঁহাদের মনোযোগ ঐরূপ প্রার্থনার দ্বারা আকর্ষিত হইয়া থাকে; তাঁহারা সৎ উপদেশ, উৎসাহ এবং জ্ঞানের আলোক প্রার্থনাকারীর মস্তিষ্কে প্রেরণ করিয়া থাকেন এবং এই প্রকারে তাহাদের প্রার্থনার প্রত্যক্ষ উত্তর আসিয়া থাকে। মানসিক কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কিম্বা কঠিন নৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে জ্ঞানের আলোক পাইবার জন্য ভাব সকল উদিত হইয়া থাকে; অথবা সন্তপ্ত

চিত্তের ব্যাকুলতা নাশ করিবার জন্য শান্তিবারি বর্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি সেই সময়ের জন্য কোন ঐশ্বরিক পুরুষ সেই স্থান দিয়া না যান, তত্রাচ ব্যাকুলতার ক্রন্দন ভগবানের নিকট পৌঁছাইবে এবং যে প্রকারেই হউক, ভগবানের সান্ত্বনাবার্ত্তা তাহার নিকট প্রেরিত হইবে।

কিন্তু এই প্রকার প্রার্থনার দ্বারা প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া ভিন্ন প্রার্থনাকারীর অন্য প্রকার উপকার হইয়া থাকে। প্রার্থনা করিতে করিতে তাহার মন ও অন্তঃকরণ এমন অবস্থায় আসিয়া থাকে যে, তাহার অধোমুখী প্রবৃত্তি সমূহ ও মন্দ স্বভাব শান্ত হইয়া যায় এবং মনের অন্ধকার দূরীভূত হইয়া মনে বল আসিয়া উপস্থিত হয়। যে শক্তির প্রবাহ আত্মা হইতে বহির্গত হইয়া মস্তিষ্কজ সম্বিতের সহিত বহির্গত হইয়া বাহ্যিক ও সাংসারিক ব্যাপারে সদা সর্ব্বদা লিপ্ত হইয়া যাইতেছে, প্রার্থনার দ্বারা সেই প্রবাহকে বহির্মুখী না করিয়া অন্তর্মুখী করা যায়। এই মস্তিষ্কজ সম্বিতকে বহির্মুখী না করিয়া যখন অন্তর্মুখী করা যায়, তখন বহিরস্থ দ্বার সমূহ বন্ধ হইয়া যায় এবং অন্তরে বিশ্বজয়িনী সম্বিত ক্রমশঃ জাগ্রত হইয়া উঠে। এই অবস্থায় আত্মদেবের সুমধুর বাক্য শ্রবণ করা যায়।

যখন অধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, এবং অধ্যাত্মিক আলোক পাইবার জন্য প্রার্থনা করা যায়, তখন প্রকৃষ্টরূপে অন্তর ও বহির হইতে সাহায্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এই শ্রেণীর প্রার্থনা সমূহ সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যতই নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে পারা যাইবে এবং যত আকাঙ্ক্ষা ঊর্দ্ধগামী হইবে, তত আমরা অন্তর ও বহিরস্থ বিশ্বব্যাপী সুমহান্ জীবন হইতে উত্তর পাইতে থাকিব। আমরা নিজেদের খণ্ড খণ্ড করিয়া শতধা বিভক্ত করিয়াছি; যদি আমরা এই খণ্ডতা ও পার্থক্য ত্যাগ করিয়া মহানজীবনের সহিত মিশিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, মনের বল ও জ্ঞানের আলোক আমাদের অন্তরে প্রবাহিত হইতেছে। যদি আমরা আমাদের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া আমাদের পৃথক ও খণ্ডিত ইচ্ছাকে ভগবানের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের ভিতরে ঐশ্বরিক বলের আবির্ভাব হইবে। যখন মানুষ স্রোতের বিরুদ্ধে সন্তরণ করিতে যায়, তখন তাহার গতি অতি অল্প হয়; কিন্তু যখন স্রোতের সহিত সন্তরণ করিতে থাকে, তখন স্রোতের সমুদয় বেগের সহিত চলিয়া যায়। যখন আমরা আমাদের পৃথক ও খণ্ডিত ইচ্ছাকে ভগবানের কার্য্যে

নিযুক্ত করিতে পারিব, তখনই আমাদের যথার্থ আত্মসমর্পণ হইবে; কারণ, ভগবানের ইচ্ছায় আমাদের নিজের ইচ্ছাকে মিশ্রিত করার নাম আত্মসমর্পণ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রার্থনা যত উচ্চতর অঙ্গের হইতে থাকে, তত উহা তৃতীয় শ্রেণীর প্রার্থনার সহিত মিলিত হইয়া যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর উচ্চতম অঙ্গের প্রার্থনা যিনি করেন, তিনি জোর বলিবেন যে, "হে ভগবান! আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও," কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর প্রার্থনায় যাচিঞা থাকে না, তখন আর প্রার্থনাকারী বলে না যে, 'ভগবান! আমায় এই বিষয় দাও, কিম্বা ঐ বিষয় দাও।' তখন প্রার্থনাকারী ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন হন। ভগবচ্চিন্তার দ্বারা মন স্থির ভাব ধারণ করে, রিপু সকল দমন হইয়া যায়। ভগবচ্চিন্তাকে শাস্ত্রে অনুচ্চারিত প্রার্থনা বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই প্রকার প্রার্থনার দ্বারা আত্মা মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং জীবের সহিত পরমেশ্বরের মিলন হইয়া যায়। চিন্তার নিয়মই হইতেছে যে, মনুষ্য যাহা চিন্তা করে, নিজে তাহা হইয়া থাকে। যখন সে ভগবানকে ভাবিতে থাকে, তখন সে ঐশ্বরিক ভাবাপন্ন হইয়া যায়। এবং এই প্রকারে আত্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পার্থক্যতা নষ্ট করিয়া ফেলে এবং অবশেষে কারণে গিয়া মিলিত হয়।

যে পূজায় স্বার্থের লেশমাত্র থাকে না, যে পূজায় কামনা থাকে না এবং যে পূজার দ্বারা ভগবানের দিকে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, সেইরূপ পূজার দ্বারা সহজে ভগবানের দর্শন পাওয়া যায়। ভগবানের জন্য যখন প্রাণ ব্যাকুল হয়, তখনই যথার্থ ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। ভগবানের জন্য প্রাণ সদাসর্ব্বদা ব্যাকুল হইলে, ভগবানকে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাণের ভিতর এই ব্যাকুলতা না জাগ্রত হইলে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যাঁহার প্রাণে এই ব্যাকুলতা জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার স্বার্থ রোধ হইয়া গিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন যে,—

"সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্রে আমরা তন্ত্রে চলি।
যা করাও গো তাই করি, যা বলাও মা তাই বলি।" (রামপ্রসাদ)

তিনি তখন বুঝিতে পারেন যে,—

"ছায়াবাজীর পুতুল আমরা,
যেমন নাচায় তেমনি নাচি।" (কর্ত্তাভজা)

যাঁহার প্রাণে এইরূপ ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে, তিনি সর্ব্বদা ভগবানকে

স্মরণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার আত্মা সদা সর্ব্বদা রমণীয়তা উপভোগ করিতে থাকেন। তিনি তখন বুঝিতে পারেন যে, আত্মদেব তাঁহার অন্তরে বিরাজ করিতেছেন।

মনুষ্য যখন পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় উপস্থিত হয়, তখন তাহার ধ্যান ও পূজা ভিন্ন অন্য প্রকার প্রার্থনার প্রয়োজন হয় না; তখন তাহার ইহলোকের কিম্বা পরলোকের জন্য কোন কামনাই থাকে না; সদা সর্ব্বদা তাহার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যাকুলতা হইতেছে শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা।

শ্রীআশুতোষ দেব।

প্রণয়ে প্রাণদণ্ড।

স্কটলণ্ডের রাণী মেরীকে যে, ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজেবেথের জন্য কারারুদ্ধা হইয়া শেষে হত হইতে হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের বিদিত আছে। রাজ-সিংহাসনে মেরীর দাবী দাওয়া অধিক ছিল, তাঁহার ভক্ত অনুগত অনেক হইয়াছিল; এই জন্যই ত তাঁহাকে ঘাতকের হাতে পড়িতে হইয়াছিল। অনেক গণ্য মান্য মহাবংশীয় লোকে পূর্ব্বাহ্নে মেরীর পক্ষ লইয়াছিলেন। কতকগুলি সম্ভ্রান্তবংশীয় বিদ্বান্ যুবককে কিন্তু বিনা পাপেই মেরীর জন্য প্রাণ দিতে হইয়াছিল, নিষ্ঠুরভাবে হত হইতে হইয়াছিল। প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই উহাঁদিগের অন্ত্রতন্ত্র বাহির করিয়া ফেলা হইয়াছিল। তৎকালে এরূপ দণ্ডের প্রচলনও ছিল। কিন্তু সেই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল বালার্দ্দ নামে এক জেসুইট বা কাথলিক পাদরির জন্য! সেই ত এণ্টনি বেবিংটনকে ষড়যন্ত্রে জড়াইয়াছিল। বেবিংটন মহাকুলে জন্মিয়াছিলেন, উচ্চশিক্ষায় অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব চরিত্র ছিল অতি সুন্দর! বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রাণের অপেক্ষা ভাল বাসিতেন, তাঁহারাও প্রাণাধিক বেবিংটনকে কিছুতেই ছাড়িতে পারিতেন না। ষড়যন্ত্র হইয়াছিল—স্কটলণ্ডের রাণী মেরীর মঙ্গলার্থে। সঙ্কল্প হইয়াছিল, এলিজেবেথকে মারিয়া ফেলিতে হইবে! ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র। কিন্তু পরে প্রচার হইয়াছে, এলিজেবেথের কুটমন্ত্রী ওয়াল্‌সিংহামই ঐ বালার্দ্দকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। তাঁহারই চাতুরীর ভিতর পড়িয়া বালার্দ্দ পাপা-

চারের একশেষ করিয়াছিল, ষড়যন্ত্রের যত রহস্য ওয়ালসিংহামকে জানাইয়াছিল। যে যে যুবক বেবিংটনের দলে যোগ দিয়াছিলেন, বালার্দ্দের সাহায্যে ওয়ালসিংহাম তাঁহাদিগের চিত্র পর্য্যন্ত হস্তগত করিয়াছিলেন। কারাগারে গিয়া উহারা মেরীর সহিত দেখা করিতেছেন, মন্ত্রণার সময়ে তাঁহার চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছে। এরূপ চিত্রও বালার্দ্দের জন্য ওয়ালসিংহামের হস্তগত হইয়াছিল! বালার্দ্দ বিশ্বাসঘাতকতার ত্রুটি করে নাই, সুতরাং অপরাধী ধরিতে বা অপরাধ প্রতিপন্ন করিতে কষ্ট হয় নাই। আর বেবিংটন ও তাঁহার সহযোগীরা সকলেই একবাক্যে অপরাধের স্বীকারও করিয়াছিলেন। বালার্দ্দ নিশ্চিতই উৎকোচে ক্রীত হইয়াছিল। বেবিংটন হৃদয়ের আবেগে আর বালার্দ্দের কুহকে ভুলিয়াছিলেন, মেরীর জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু যে ষড়যন্ত্রে টানিয়াছে, সেই ধরাইয়া দিবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। আর তাঁহার সমবয়স্ক বন্ধুরা শুদ্ধ তাঁহার প্রেমেই আবদ্ধ ছিলেন, তিনি যেদিকে, উহারাও সেই দিকে। ধন প্রাণ সব তুচ্ছ, আত্মীয় স্বজন অগ্রাহ্য; বন্ধুকে তুষ্ট করাই জীবনের প্রধান কার্য্য! কেহ বা আশা করিয়াছিলেন, হয় ত বন্ধু বেবিংটনকে ষড়যন্ত্র হইতে বাহির করিয়া লইবেন। কেহ বা আশা করিয়াছিলেন, বেবিংটনের চৈতন্য হইলেই জাল ছিঁড়িয়া যাইবে। কেহ বা কোন ভাবনাই ভাবেন নাই. যেখানে বেবিংটন, আমিও সেইখানে। এরূপ বন্ধুত্ব—বিচিত্র বন্ধুত্ব—বিচিত্র উপাখ্যানেও বিরল! রাজার ভাবনা নাই, রাজ্যের ভাবনা নাই, স্বজনের ভাবনা নাই, নিজের ভাবনা নাই, কেবল বন্ধুত্বের উপাসনা! পরিণাম যাহাই হউক, এরূপ বন্ধুত্বের পূজা করিতে হয়! আবার যেমন বন্ধুত্ব, তেমনই মহত্ত্ব। বিচারের সময়ে সরলতার একশেষ, সকলেই সরলতার অবতার! "হাঁ, রাজদ্রোহ হইয়াছে, অপরাধের দণ্ড হউক, কিন্তু হৃদয়ে কোন চিন্তাই ছিল না। কেবল বন্ধু বেবিংটনের প্রেমেই পাপে পড়িয়াছিলাম, এ পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত আছি! বন্ধু বেবিংটন যেখানে, আমিও সেইখানে, তাঁহার প্রাণদণ্ডে আমার প্রাণদণ্ড না হইলে আমার মৃত্যু-যন্ত্রণা হইবে। বন্ধুর সাহায্যার্থে প্রাণ দেওয়াই আমার পক্ষে একান্ত প্রার্থনীয়। আমার প্রাণ দিয়া বন্ধুর প্রাণ রাখিতে পারিলে কৃতার্থ হইব, আর যদি বন্ধুর প্রাণরক্ষা না হয়, তাহা হইলে আমার এ ক্ষুদ্র ছার প্রাণ ত রাখিব না। ষড়যন্ত্র চক্রান্ত

করিব, কিসে কি হইবে, তাহা একবারও ভাবি নাই। বন্ধুত্বের মোহেই মোহিত হইয়াছিলাম। এখনও সেই বন্ধুত্বের জন্যই আত্মবলি দিতে আসিয়াছি!" প্রত্যেক মুখেই এই কথা! প্রচার—বিচারকদিগকেও, এলিজেবেথের নিষ্ঠুর বিচারকদিগকেও—করুণরসে আক্রান্ত হইতে হইয়াছিল। হইয়াছিল কিন্তু হৃদয়ে—কার্য্যে নহে! সকলেই বুঝিয়া ছিলেন, বালার্দ্দই সর্ব্বনাশ করিয়াছে! বালার্দ্দকে তিরস্কার করিতেও ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু মন্ত্রী ওয়ালসিংহামের চতুরী বোধ হয়, তখন সেরূপ প্রকাশ পায় নাই, তিনিই যে মেরীর মুণ্ডপাতের জন্য কতকগুলি নিরীহ নিষ্পাপ নির্ব্বোধ সম্ভ্রান্ত যুবককে পাপে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, ষড়যন্ত্রে ফেলিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় তখন ততটা প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু রাণী এলিজেবেথ জানিতে পারিয়াছিলেন, তিনি যে স্কটলণ্ডের রাণী মেরীকে যেন তেন প্রকারেণ নিপাত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন! যাহা হউক, বিচার হইয়া গেল, প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়া গেল; প্রাণদণ্ড হইতে লাগিল; কয়েকজনের জীয়ন্তেই নাড়ীভূড়ী বাহির করিয়া ফেলা হইল। যুবকেরা কিন্তু তখনও নিষ্পাপ, বদন তখনও প্রফুল্ল! বন্ধুর জন্য বন্ধুর সঙ্গে প্রাণ দিতেছেন। পাপের সত্য সত্যই লেশমাত্র নাই। রাজাদেশে প্রাণ গেল, ধনও গেল; বিষয় সম্পত্তি সমস্তই বাজে আপ্ত হইল! ভাবনা কেবল আশ্রিত আত্মীয় স্বজনের জন্য, আশ্রিত প্রতিপালিত ভৃত্যগণের জন্য, আর বড় ভাবনা উত্তমর্ণদিগের জন্য। আশ্রিতদিগকে কে আশ্রয় দিবে? উত্তমর্ণদিগের যে, ঋণশোধ হইল না! মৃত্যুকালে মনে এই চিন্তা, মুখে এই উক্তি। তথাপি যদি পাপের অবতারণা করিতে চাও, তাহা হইলে পাঠক, তোমাকেই পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে হইবে! দলে ছিলেন এক টিচবোরণ। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি প্রিয়তমা পত্নীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে হৃদয় পুলকিত হয়—হাঁ, সেই করুণরসপূর্ণ পত্রেও হৃদয় পুলকিত হইতে হয়! সে সময়েও যিনি নিজের ধৈর্য্য অটল রাখিয়া পত্নীকে ধর্ম্মের উপদেশ দিতে পারেন, সহিষ্ণুতার উপদেশ দিতে পারেন, আশ্রিতবাৎসল্যের উপদেশ দিতে পারেন, তিনি মহাপুরুষ। পত্রে এই মহাপুরুষের মহাপুরুষত্ব প্রতিফলিত হইতেছে ছত্রে ছত্রে অক্ষরে অক্ষরে! পাঠক, পুলকিত না হইবে কেন? মহাব্যসনেও মহোৎসুখের সুখ না পাইবে কেন? নিষ্পাপ টিচবোরণের মনে

পাপ নাই, পাপের চিন্তা নাই, পাপের উদ্বেগ নাই, আতঙ্ক নাই। বন্ধুত্বের উপাসক—বন্ধুত্বের স্বয়ং অবতার—টিচবোরণ শুদ্ধ বন্ধুত্বের জন্য প্রাণ দিতেছেন। পরকালে বন্ধুর সহিত মিলিবেন, প্রিয়তমা পত্নীর সহিত সমবেত হইবেন। হৃদয়ে দুঃখ নাই, খেদ নাই, কেবল আনন্দ। তিনি পুলকিত হইয়া মরিয়াছিলেন, তুমি পাঠক, পুলকিত হইয়া পড়িবে কেন? কিন্তু এরূপ বন্ধুত্ব সংসারে অদৃশ্য! বলিয়াছি ত বিচিত্র উপাখ্যানেও অদৃশ্য!

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল যৎ।

আর কতকাল কাঁদ্‌বো তারা তোর কারণে,
বারেক করুণা কর অকৃতি জনে।
মা-হারা সন্তানের মত, কাঁদি আমি অবিরত,
দেখে কি হয় না দয়া পাষাণপ্রাণে॥
তুমি কি অনিলে, কি অনলে, কিবা বনে, কিবা জলে,
সর্ব্বস্থলে, কিন্তু নাহি হেরি নয়নে।
তুমি স্থূল হতেও স্থূলরূপে, আছ গো মা বিশ্বব্যাপে,
আবার এমনি সূক্ষ্ম যে মা না এসে ধ্যানে॥
সূদন কয় সাধনার কথা, সে কেবল কথার কথা,
সে পায় তোমারে, যারে হের নয়নে॥

একাদশ বর্ষ সম্পূর্ণ।